[মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অনুমোদিত নূতন পাঠ্যসূচী অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণের জন্য লিখিত।]

[Vide Circular No. HS/1/58 dated 7.3.58]

নব-প্রবেশিকা রচনা ও অনুবাদ

(উপপাঠ্য সহায়িকাসহ)

[উচ্চতর মাধ্যমিক সংস্করণ]

(নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য)

অশোকনাথ শাস্ত্রী, এম্‌. এ.

ও

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী, এম্‌. এ.

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

(পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত)

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৯৬০

নিবেদন

'নব-প্রবেশিকা রচনা ও অনুবাদ—উচ্চতর মাধ্যমিক সংস্করণ' সম্পূর্ণ একখানি পৃথক ও নূতন পুস্তক। পুস্তকখানি বিশেষভাবে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালযের ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত। সপ্তম শ্রেণী ও একাদশ শ্রেণী এই উভযের মধ্যে মানের পার্থক্য এত অধিক যে একখানি পুস্তকের সাহায্যে এই উভয় শ্রেণীর প্রযোজন মিটাইতে চেষ্টা করিলে কোন শ্রেণীর প্রতিই সুবিচার করা যায় না।

পুস্তকখানি যদিও মূলত রচনার, তবুও ছাত্রছাত্রীগণের সুবিধার জন্য ইহাতে ব্যাকরণের নূতন অনুমোদিত পাঠসূচী অনুসরণ করা হইযাছে। বাংলা ভাষার শিক্ষায ও পরীক্ষায ব্যাকরণের উপর যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, তাহাতে ব্যাকরণের কতকগুলি নির্বাচিত অংশ অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করা বা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওযা—কোনটাই সম্ভব নয। এই কারণে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাসের বহির্ভূত কতকগুলি প্রসঙ্গেরও আলোচনা করা হইযাছে। কারণ ঐগুলি ভাষা শিক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক বলিয়াই বিবেচিত হয। ছন্দ ও অলঙ্কার সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হওযায ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত বাংলার পরীক্ষার্থীদেরও প্রযোজন মিটিবে আশা করি। ইংরাজী হইতে বাংলা ভাষায অনুবাদ বর্তমানে পরীক্ষায বাদ দেওযা হইতেছে বলিয়া এই প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয নাই।

বইখানিকে সব দিক দিযা ছাত্রছাত্রীগণের উপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইযাছে। আমাদের রচিত 'নব-প্রবেশিকা রচনা ও অনুবাদ' দীর্ঘকাল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীগণের সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায ভরসা করি এই পুস্তকখানিও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সমাদর লাভে সমর্থ হইবে। অনবধানতাপ্রসূত ভুল-ত্রুটি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠবিধি

(Vide Circular No. HS/1/58)

পাঠ্যসূচী

(ক) ভূমিকা-প্রকরণ : ভাষা—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা।

(খ) বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ—

১। বর্ণের শ্রেণীবিভাগ : বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের (যথা অ, এ, হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর) ও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য, একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি, ধ্বনিবিলোপ ইত্যাদি।

২। সন্ধি : বাংলা ভাষায় সন্ধির বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃত সন্ধির সঙ্গে পার্থক্য : স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গসন্ধির পূর্ণ আলোচনা। ৩। ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান।

(গ) পদ-প্রকরণ—

১। পদের প্রকার ভেদ : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়াপদ। ২। বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ। ৩। লিঙ্গ : স্ত্রী-প্রত্যয় (সংস্কৃত ও বাংলা), লিঙ্গ-পরিবর্তন। ৪। বচন। ৫। পুরুষ। ৬। কারক ও তাহার বিভক্তি : অনুসর্গ : কারক-বিভক্তি ও অন্যপ্রকার বিভক্তি। ৭। বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ : সংখ্যা ও পূরণবাচক বিশেষণ। ৮। বিশেষণের তারতম্য। ৯। ক্রিয়াপদ : ধাতু ও প্রত্যয়—মৌলিক ধাতু, প্রযোজক ধাতু, ধ্বন্যাত্মক ধাতু, নামধাতু, সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ারূপ। Participles and gerunds ; moods. ১০। অব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ ও বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ। ১১। সমাস : আলোচনায় একশেষ, দ্বন্দ্ব, অবিগ্রহ সমাস, স্বপদবিগ্রহ ও অস্বপদবিগ্রহ সমাস, প্রাদি সমাস, কু-তৎপুরুষ সমাস, সুপ্সুপা সমাস বর্জনীয়।

(ঘ) শব্দ-প্রকরণ—

১। শব্দ ও পদের পার্থক্য। ২। বাংলা শব্দসম্ভার : তৎসম ও তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী ও বিদেশী শব্দ : ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত।

৩। কৃৎ-প্রত্যয়—

সংস্কৃত কৃৎ—তব্য, অনীয়, যৎ, শতৃ, শানচ্, ক্ত, ক্তি, ণক, তৃচ্। অন—বিবিধ বাচ্যে : ইষ্ণু, ক্বিপ্, আলু ইত্যাদি প্রধান প্রধান প্রত্যয় ও অ প্রত্যয় (অচ্, অণ্, অপ্, অস্, ক, কঙ্, খঙ্, খচ্, খল্, খশ্, ঘঞ্, ট, ড, শ ইত্যাদি সংস্কৃত প্রত্যয়গুলির অ ছাড়া বাকী অংশ ইৎ যায়, অতএব বাংলায় শুধু অ প্রত্যয় বলিলেই চলিবে)।

বাংলা কৃৎ—অন, অন্ত, আ, আনো, না, আনি, ই, উ, তি, উয়া, ইয়া, ইত্যাদি।

৪। তদ্ধিত প্রত্যয়—

সংস্কৃত-তদ্ধিত—অ (ষ্ণ), ই (ষ্ণি), য (ষ্ণ্য), এয (ষ্ণেয়), ঈ (ষ্ণীয), ঈন, ইক, ইত, ইল, ইন্, বিন্, ঈয়স্, ইষ্ঠ, তর, তম, ময়, মতুপ্, তন, তা, ত্ব, ইমন্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রত্যয়।

বাংলা-তদ্ধিত—ই, ঈ, ইয়া, উয়া, আ, আই, আনি, আলি, আলো, আনা, পনা, গিরি, আরি (রী), দার, ইয়াল, ওয়ালা ইত্যাদি প্রধান প্রধান প্রত্যয়।

৫। উপসর্গ—অর্থপরিবর্তন ও নূতন শব্দগঠন (বিস্তারিত আলোচনা)।

(৬) বাক্য-প্রকরণ—

বাক্যের প্রকার-ভেদ : সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য। বাক্যান্তরীকরণ। বিভিন্ন ধরণের বাক্য (অস্ত্যর্থক. নাস্ত্যর্থক, নির্দেশক, প্রশ্নবোধক ইত্যাদি) ও তাহাদের রূপান্তরসাধন।

বাচ্য : বাচ্য পরিবর্তন।

শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ (idiomatic use of words and phrases), প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগ্‌ধারা (idioms and proverbs) —বিস্তারিত আলোচনা।

আলোচনার ক্রম বর্ণধ্বনি-প্রকরণে আরম্ভ ও বাক্য-প্রকরণে সমাপ্ত হইবে।

অলঙ্কার—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, ব্যতিরেক ও সমাসোক্তি।

কোন ব্যাকরণ পুস্তক পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে না। নির্দিষ্ট পাঠসূচী অনুযায়ী লিখিত যে কোন পুস্তক নির্বাচন করা চলিবে।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

(ব্যাকরণ, অনুবাদ, ভাবসম্প্রসারণ, ছন্দ ও অলঙ্কার)

দ্বিতীয় ভাগ

(প্রবন্ধ-রচনা)

তৃতীয় ভাগ

(উপপাঠ্য সহায়িকা)

বিষয় — পৃষ্ঠা

(নবম শ্রেণী)

(দশম শ্রেণী)

(একাদশ শ্রেণী)

ভূমিকা-প্রকরণ

[বাংলা ভাষা—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা]

যাহাকে আমরা বাংলা ভাষা বলি, মনোভাব প্রকাশ করিবার ধ্বনিময় এই সঙ্কেতটি প্রায় হাজার বৎসর হইল, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রথম পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মাগধী প্রাকৃতের একটি বিশেষ অপভ্রংশ ভাষা হইতে বাংলা ভাষা তাহার নিজস্ব উচ্চারণ ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রকাশিত হয়।

বঙ্গভাষার উৎপত্তিস্থল নিরূপণ করিতে গিয়া গবেষকদের অনুসন্ধান ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সুপ্রাচীন ভাষা-গোষ্ঠীর ইন্দো-ইরাণীয় শাখা হইতে ভারতীয় প্রাচীন আর্যভাষার উদ্ভব হইয়াছে। নদীর গতি ও প্রকৃতি যেমন যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, এই প্রাচীন ভাষাও ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন আর্যভাষা-ভাষী জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পর দেশ ও কালের প্রভাবে তাহাদের ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভাষার মধ্যে যে বিকৃতি বা রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা বিদূরিত করিবার জন্য ভাষাবিদ্‌গণ ভাষাকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সংস্কৃত ভাষা তাহার অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু তাহাতে ভাষার পরিবর্তনের ধর্মটি খর্ব হয় নাই। হাজার বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছে। পূর্বাঞ্চলে মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশ আসিয়াছে। তাহার পর এই অপভ্রংশ হইতেই অসমীয়া, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাংলা উদ্ভূত হইয়াছে। আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা এই প্রাচীন বাংলা ভাষারই ক্রম-বিবর্তিত রূপ।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ বলিয়াছেন—'ভাষার প্রবাহ নদীপ্রবাহের ন্যায়, বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন নাম।'

নদীর উৎপত্তিস্থলের ন্যায়, ভাষার উৎপত্তিস্থলও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। নদী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা যেমন সহজে নির্ণয় করা যায় না, ভাষাও যে আদিতে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নির্দেশ করা যায় না। নদীর উৎপত্তির মতো প্রাকৃতিক কারণেই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

নদীর প্রথম রূপ যে ঝরণা, তাহা ক্ষীণতোয়া—ভাষার আদিরূপও তেমনি

হ্রস্বকায়। ঝরণা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পর্বতবাসীর ব্যবহারযোগ্য। আদিভাষাও অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নদী যেমন সমভূমিতে নামিয়া আসিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়, নানা উপনদী তাহাতে আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে নানা শাখানদী নির্গত হয়,—তেমনই ভাষাও ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে, অপর ভাষাও তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে, আবার তাহা হইতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষারও উদ্ভব হয়। নদী যেমন অবিরতভাবে বহিয়া চলিয়াছে, ভাষাও তেমনই ভাবে অনির্দেশ্য পরিণতির দিকে চিরকাল অগ্রসর হইতেছে।

বাংলা ভাষা প্রায় সাতকোটি নরনারীর মাতৃভাষা। কেবল পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যেই বাংলা ভাষা আবদ্ধ নয়, এই সীমারেখা পার হইয়াও ইহার বিস্তৃতি ও প্রসার। আসামের গোয়ালপাড়া ও কাছাড়, এবং সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম ও পূর্ণিয়া জেলার অধিকাংশ অধিবাসীর দেশভাষা বাংলা ভাষা। ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ধরিলে বাংলা ভাষা পৃথিবীর ভাষাগুলির মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাংলা ভাষার সঙ্গে নিকটতম সম্বন্ধ আসাম প্রদেশের অসমীয়া ভাষার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ওড়িয়া ভাষার।

পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের যে সুবৃহৎ অঞ্চল জুড়িয়া বাংলা ভাষার প্রসার তাহাতে বাংলা কথ্য ভাষার মধ্যে কতকগুলি আঞ্চলিক রূপ আছে। সমস্ত জীবন্ত ভাষাতেই এই প্রকার অবস্থা দেখা যায়। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি জেলায় এইভাবে এক একটি উপভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। এক জেলার ভাষা অন্য জেলার লোকের পক্ষে বুঝিতে পারা অনেক সময় কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। এই কথ্য ভাষার মধ্যে একটি রূপ সাহিত্যে ইতিমধ্যেই চলিত হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর তীরের কথ্য ভাষার উপর ভিত্তি করিয়াই সাহিত্যের চলিত ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। উপন্যাসে ও নাটকে, বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে চলিত ভাষার এই রূপটি বাংলাদেশে ও বাংলার বাহিরে বাংলাভাষা-ভাষীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। এই চলিত ভাষা এখন মাত্র লোকের মুখেই সীমাবদ্ধ নয় বর্তমান সময়ে প্রচুর পরিমাণে সাহিত্যের ভাষারূপে ইহার ব্যবহার চলিতেছে।

এই কথ্য ভাষা ছাড়া বাংলার একটি লেখ্য রূপ আছে, তাহার নাম সাধু ভাষা। বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙ্গালী পাঠক ও লেখক সাধুভাষাকে নিজস্ব বলিয়া শ্রদ্ধা করে। এই ভাষার বাক্যগঠন ও শব্দপ্রয়োগের রীতিতে সংস্কৃতের প্রভাব

অধিক। ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদগুলির রূপ পূর্ণতর। সাধুভাষাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমগ্র সাহিত্য রচিত হইয়াছে—এখনও ইহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বাহন হইয়া আছে।

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হইতেছে।

সাধুভাষার রচনার আদর্শ

(১) মাণিকলাল তখনই রূপনগরে ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রূপনগরের বাজারে গিয়া মাণিক দেখিল যে, বাজার অত্যন্ত শোভাময়। দোকানের শত শত প্রদীপের শোভায় বাজার আলোকময় হইয়াছে—নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উজ্জ্বলবর্ণে রসনা আকুল করিতেছে—পুষ্প, পুষ্পমালা থরে থরে নয়ন রঞ্জিত, এবং ঘ্রাণে মন মুগ্ধ করিতেছে। মাণিকের উদ্দেশ্য—অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, কিন্তু তাই বলিয়া আপন উদরকে বঞ্চনা করা মাণিকের অভিপ্রায় ছিল না। মাণিক গিয়া কিছু মিঠাই কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সের পাঁচ ছয় ভোজন করিয়া মাণিক দেড় সের জল খাইল এবং দোকানদারকে উচিত মূল্য দান করিয়া তাম্বুলান্বেষণে গেল। (বঙ্কিমচন্দ্র)

(২) ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত চীন জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বার-বাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত চীন জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো। (রবীন্দ্রনাথ)

(৩) মাসখানেক হইল কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও জর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আসিয়াছিলেন। কারণ গৃহ-দেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার যো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ ছয় দিন ছিল। মনের মতন নূতন মা পাইয়াই হোক বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে তাহাকে

জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল। (শরৎচন্দ্র)

উপরের এই তিনটি নিদর্শন হইতে সাধুভাষা সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা যায়। সাধুভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত বেশী এবং ক্রিয়া ও সর্বনাম পদগুলির আকার পূর্ণতর।

চলিত ভাষার রচনার আদর্শ

(১) অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে বাড়ির বৌ।—কি করে সেখানে আমাকে ভিখারীর মত, দিনের বেলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে পাঠাতে চাচ্ছ? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাওনি! কেন পাওনি জান? আমরা বড় দুঃখী, আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা ভিক্ষাবৃত্তি করে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেছ ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশি কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প! আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসিকৌতুকের আর মালমশলা যুগিয়ে দেব না। (শরৎচন্দ্র)

(২) আমাদের সঙ্গে ফরাসী ইতালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদশাহী রকমের কুঁড়ে। কুঁড়ে বল্লে বোধহয় ভুল বলা হয়, বরং বলি বিশ্রামপ্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদের মত বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা বলে এরা যে কম খাটে না। পারীর যারা আসল অধিবাসী খুব খাটতে পারে বলে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করবার সময়েও জামা সেলাই করছে, শৌখিন জামা। জামাকাপড়ের শখটা ফরাসীদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ করে ফরাসী মেয়েদের ও শিশুদের, পুরুষরা কতকটা বেপরোয়া। (অন্নদাশঙ্কর রায়)

(৩) "মা এমন করে একলা বসে যে?"

বেড়িয়ে ফিরে বাড়ীতে ঢুকেই প্রশ্ন করে পরেশ—"কি হলো? শরীর টরীর খারাপ হয়নি তো?"

মন্দাকিনী ত্রস্তে উঠে পড়েন। বলেন—"না, না, শরীর খারাপ হবে কেন? দাদা এসেছিলেন, এইমাত্র গেলেন—"

"মামাবাবু এসেছিলেন? এক্ষুনি চলে গেলেন?"

"হ্যাঁ, বললেন কি সব কিনতে টিনতে হবে—"

"ও—তা কিনবেন বৈকি! লম্বা পাড়ি দিচ্ছেন, কতো কি দরকার।"

মন্দাকিনী রহস্যের হাসি হেসে বললেন, "লম্বাপাড়ি ত আমিও দিচ্ছিরে।"

পরেশ সবিস্ময়ে বলে, "তার মানে?"

মন্দাকিনী ধীরে বলেন, "তার মানে আমিও যাচ্ছি দাদার সঙ্গে।"

পরেশ চমকে ওঠে না, শুধু একটি 'থতিয়ে' যায়। তারপর ভুরু কুঁচকে বলে, "তাই নাকি? হঠাৎ?"

"হঠাৎ ছাড়া—ধীরে সুস্থে কিছু হবে? তা—আমি কি চিরদিনই তোদের সংসারে হাঁড়ি ঠেলবো? একটু পরকালের কাজ করবো না?"

(আশাপূর্ণা দেবী)

চলিত ভাষার নিদর্শনগুলি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, এই রচনা-রীতিতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদগুলি একটা সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ করিয়াছে।

লিখিবার সময় হয় সাধু অথবা চলিত যে-কোন একটি রীতিতে লিখিতে হয়। দুইটি রীতি মিশিয়া গেলে ভাষার গুরুচণ্ডালী দোষ হয়। অনেক সময় অজ্ঞতার জন্য অথবা ব্যস্ততার জন্য দুইটি রীতি একসঙ্গে মিশিয়া যায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কতকগুলি সাধারণ উদাহরণ দিয়া সাধু এবং চলিত শব্দের পার্থক্য দেখান যাইতেছে।

বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
চন্দ্র	চাঁদ	সন্ধ্যা	সাঁঝ
কৃষ্ণ	কেষ্ট	হস্ত	হাত
গ্রাম	গাঁ	বন্যা	বান
বধূ	বৌ	উৎসর্গ	উচ্ছুগ্‌গু
অগ্রহায়ণ	অঘ্রাণ	মহোৎসব	মচ্ছব
বৃদ্ধ	বুড়া	মৃত	মড়া
শুষ্ক	শুক্‌না, শুখা	গৌর	গোরা

সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
তাহারা	তারা	যাহার	যার
যাহারা	যারা	ইহাদের	এদের
ইহারা	এরা	আমাদিগের	আমাদের
কাহাদের	কাদের	তাহাদিগের	তাদের
তাঁহাদের	তাঁদের	যাহাদিগের	যাদের
করিব	করব	করিত	করত
করিবার	করবার	করিলাম	করলাম
করিলে	করলে	করিতেছিলাম	করছিলাম

বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ

[বর্ণের শ্রেণী বিভাগ ঃ বাংলা—স্বর-ব্যঞ্জনের ও যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য]

আমরা ভাষায় যে শব্দ উচ্চারণ করি সেই শব্দের অবিভাজ্য ক্ষুদ্র অংশের নাম **ধ্বনি** এবং যে চিহ্ন ব্যবহার করিয়া ধ্বনি নির্দেশ করি তাহার নাম **বর্ণ**।

বাংলা বর্ণমালায় যে ৪৭টি বর্ণ আছে তাহার মধ্যে ১২টি স্বরবর্ণ ও ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ—হ্রস্ব ও দীর্ঘ

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ এই বারটি স্বরবর্ণের মধ্যে ঌএর ব্যবহার বাংলায় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে অ, ই, উ, ঋ এই চারটি হ্রস্বস্বর এবং আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ এই সাতটি দীর্ঘস্বর। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে সংস্কৃত উচ্চারণের বিশুদ্ধি বজায় নাই বলিয়া বাংলায় হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর বলিয়া কোন ধরাবাঁধা নিয়ম করা যায় না। বাংলায় হ্রস্বস্বরও দীর্ঘ উচ্চারিত হয়—আবার দীর্ঘস্বরেরও হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। কেবল ঐ ও ঔ বাংলায় সংস্কৃতের মতই সর্বদাই দীর্ঘ উচ্চারিত হয়।

বাংলা স্বরবর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

হ্রস্ব অ—চলা, করা, চটা, ধন, জন। **দীর্ঘ অ**—ঘণ্টা, কর, রণ, কল।

হ্রস্ব আ—ভারত, রামায়ণ। **দীর্ঘ আ**—ভাত, গাছ, হায়, রাম।

হ্রস্ব ই—বিশ, তিরিশ, কিষাণ। **দীর্ঘ ই**—ইষ্ট, দিন।

হ্রস্ব ঈ—ধীরেন, দীনেশ। **দীর্ঘ ঈ**—দীন, হীন।

হ্রস্ব উ—উঁচা, উচিত। **দীর্ঘ উ**—উচ্চ, পুচ্ছ, মুক্ত।

হ্রস্ব ঊ—মূর্খের কথা, কূপের জল। **দীর্ঘ ঊ**—কূপ, মূর্খ, সূর্য।

হ্রস্ব এ—একটি, একলা। **দীর্ঘ এ**—ভেক, এক।

হ্রস্ব ও—ভোমরা, তোমরা, ওল। **দীর্ঘ ও**—ওষ্ঠ, গোষ্ঠ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ঐ এবং ঔ সর্বদাই দীর্ঘ।

ব্যঞ্জনবর্ণ—

৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ক হইতে ম পর্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ স্পর্শবর্ণ। কারণ এইগুলি উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার সহিত বাগ্‌যন্ত্রের কোন-না-কোন অংশের স্পর্শ হয়। যে স্থান স্পর্শ করে সেই অনুসারে স্পর্শ বর্ণগুলিকে পাঁচটি বর্গে বা শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। এইভাবে ক খ গ ঘ ঙ **কণ্ঠ্য বর্ণ** (ক-বর্গ), চ ছ জ ঝ ঞ **তালব্য-বর্ণ** (চ-বর্গ), ট ঠ ড ঢ ণ **মূর্ধন্য বর্ণ** (ট-বর্গ), ত থ দ ধ ন **দন্ত্য বর্ণ** (ত-বর্গ), প ফ ব ভ ম **ওষ্ঠ্য বর্ণ** (প-বর্গ)।

য র ল ব এই চারিটি **অন্তঃস্থ বর্ণ**।

শ ষ স হ্ এই চারিটি **উষ্ম বর্ণ**।

স্বরতন্ত্রী কাঁপাইয়া যে সমস্ত বর্ণ উচ্চারণ করিতে হয় সেগুলি **ঘোষ বর্ণ** এবং যে সমস্ত বর্ণের উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না সেগুলি **অঘোষ বর্ণ**।

সমস্ত স্বরবর্ণ এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ ও য র ল ব হ এইগুলি ঘোষবর্ণ।

বর্ণকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। 'হ'কার জাতীয় ধ্বনি অথবা বর্ণ মহাপ্রাণ। খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ এইগুলি মহাপ্রাণ বর্ণ, কারণ এইগুলির সঙ্গে একটি 'হ'কার জাতীয় ধ্বনি যুক্ত আছে।

বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ ও উচ্চারণ-স্থান নির্ণয়

বাংলা স্বরবর্ণের মধ্যে অ, আ এবং এ এই তিনটি বর্ণের উচ্চারণে একটু বৈচিত্র্য আছে।

অ-কারের দুইরকম উচ্চারণ বাংলায় দেখা যায়:

(ক) প্রকৃত বা সহজ উচ্চারণ—

অলস, অচল, অধম, অমর, সকল, জল, ঘট, বট, শত, সহস্র, অযুত, অবিরাম।

(খ) বিকৃত বা ওকার-ঘেঁষা উচ্চারণ—

ধন, জন, বন, মন, নদী, মধু, সত্য, সহ্য, লক্ষ্য, প্রধান।

আ-কারের দুইরকম উচ্চারণ বাংলায় দেখা যায়।

(ক) আ-কারের সহজ উচ্চারণের দৃষ্টান্ত—

আহার, আমরা, কাদা, কাণা, দানা, ছানা।

(খ) আ-কারের বিকৃত উচ্চারণের দৃষ্টান্ত—

আজ, চার, রাত।

এ-কারের দুইরকম উচ্চারণ—

(ক) এ-কারের সহজ উচ্চারণের দৃষ্টান্ত—

ছেলে, মেয়ে, তেল, বেল, কেশ, বেশ।

(খ) এ-কারের বিকৃত উচ্চারণের দৃষ্টান্ত—

দেখা, মেলা, খেলা, কেন, পেঁচা, একা।

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-স্থান অনুসারে বর্ণগুলির নামকরণ হইয়াছে। উচ্চারণ স্থান নির্ণয করিতে পারিলে বর্ণের নাম জানা যায়। আবার বর্ণের নাম জানিলে উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় করার অসুবিধা হয় না। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ-গুলির উচ্চারণ-স্থান দেওয়া হইতেছে।

অ, আ—ইহাদের উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ এবং সেইজন্য ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলা হইয়া থাকে। অ-কারের উচ্চারণে জিহ্বা শাযিত থাকে; আ-কারের উচ্চাবণে ভিতরের দিকে জিহ্বার একটু আকর্ষণ থাকে।

ই, ঈ—ইহাদের উচ্চারণের সময় জিহ্বার সম্মুখভাগ প্রায় তালুর কাছাকাছি যায়, সেইজন্য ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলা হয়।

উ, ঊ—ইহাদের উচ্চারণের সময় ওষ্ঠাধর গোল আকার ধারণ করে এবং মুখগহ্বরের বাতাস সেই গোলাকার পথে বাহির হইয়া আসে। উ, ঊকে ঔষ্ঠ্য বর্ণ বলা হয়।

ঋ, ৯—বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণে ইহাদের স্থান হইলেও ৯র অস্তিত্ব বাংলায় একেবারেই নাই এবং ঋ-র উচ্চারণ স্বরবর্ণের হিসাবে হয় না। ঋ-র উচ্চারণ রি।

এ, ঐ—কণ্ঠ ও তালু এই দুটির উচ্চারণ-স্থান বলিয়া ইহাদিগকে কণ্ঠ্য-তালব্য বর্ণ বলে।

ও, ঔ—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান বলিয়া এই দুইটি বর্ণকে কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

ঐ, ঔ—এই দুইটি সন্ধ্যস্বর নামেও পরিচিত। অর্থাৎ ঐ এই ধ্বনিটি আসলে 'ও' আর 'ই'। এই ভাবে ঔ এই ধ্বনিটির মধ্যে 'ও', 'উ' এই দুইটি ধ্বনি রহিয়া গিয়াছে।

ক—ইহা কণ্ঠ্য ধ্বনি। ইহার উচ্চারণের সময় জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ তালুর কোমল অংশে একটু স্পর্শ করে। ক অঘোষ, অল্পপ্রাণ, কণ্ঠ্য ধ্বনি।

খ—ইহা অঘোষ কণ্ঠ্য মহাপ্রাণ ধ্বনি। খ আসলে ক ও হ্ এই দুইটি ধ্বনির সংযুক্ত উচ্চারণ।

গ—ইহা ঘোষ বর্ণ। ক-এর ঘোষরূপই গ। সুতরাং ইহা কণ্ঠ্য ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি।

ঘ—ইহা কণ্ঠ্য ঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি। ঘ আসলে গ ও হ এই দুইটির সংযুক্ত উচ্চারণ।

ঙ—বাংলা উচ্চারণে উঁঅ রূপ পায়। ইহা নাসিক্য কণ্ঠ্য ধ্বনি। গ উচ্চারণ করিতে গিয়া নাক দিয়া নিঃশ্বাস বাহির করিয়া দিলে ঙ'র উচ্চারণ পাওয়া যায়।

চ—ইহা তালব্য ধ্বনি। জিহ্বার সহিত তালুর স্পর্শ হয়। ইহা অঘোষ ধ্বনি ও অল্পপ্রাণ।

ছ—চ-এর মহাপ্রাণ ধ্বনি হইতেছে ছ। ছ মহাপ্রাণ অঘোষ তালব্য স্পর্শ ধ্বনি।

জ—চ-এর ঘোষরূপ জ।

ঝ—জ ও হ-এর সংযুক্ত উচ্চারণই ঝ। ইহা ঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য স্পর্শ ধ্বনি।

ঞ—বাংলায় ইহার উচ্চারণ ইঁঅ। জ বলিতে গিয়া যদি নাসিকার মধ্য দিয়া নিঃশ্বাস বাহির করিয়া দেওয়া যায় তবে 'ঞ' ধ্বনির উচ্চারণ পাওয়া যায়। ইহা তালব্য নাসিক্য ধ্বনি।

ট—ইহা অঘোষ মূর্ধন্য স্পর্শ বর্ণ। ইহার উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ মূর্ধা স্পর্শ করে বলিয়া ইহা মূর্ধন্য বর্ণ। ট অল্পপ্রাণ।

ঠ—ট-এর মহাপ্রাণ ঠ। অর্থাৎ ট ও হ এই দুইটির সংযুক্ত উচ্চারণ ঠ।

ড—ইহা ট-এর ঘোষরূপ। এই বর্ণের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া মূর্ধা স্পর্শ করিতে হয় বলিয়া ইহা মূর্ধন্য বর্ণ।

ঢ—ইহা ড-এর ঘোষরূপ। ঢ মহাপ্রাণ।

ণ—বাঙলায় মূর্ধন্য আলাদাভাবে উচ্চারিত হয় না। ন-এর মত ইহার উচ্চারণ।

ত—এই বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা দাঁতের গোড়ায় ঠেকে। ত অঘোষ বর্ণ।

থ—ইহা ত-এর মহাপ্রাণ রূপ।

দ—ইহা ত-এর ঘোষ রূপ।

ধ—ইহা ঘোষ ও মহাপ্রাণ দন্ত্য বর্ণ। দ ও হ-এর সংযুক্ত রূপ ধ।

ন—দ উচ্চারণ করিতে গিয়া জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়া দন্ত স্পর্শ করিয়া যদি নাক দিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবেই ন এই নাসিক্য ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

প—অধর ও ওষ্ঠ অর্থাৎ উপর ও নীচে দুইটি ঠোঁট সম্পূর্ণ চাপিয়া ধরিয়া যদি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দেওয়া যায় এবং স্বরতন্ত্রী না কাঁপে, তবে প উচ্চারিত হয়। ইহা অঘোষ ও ওষ্ঠ্য বর্ণ।

ফ—প-এর মহাপ্রাণ রূপ ফ।

ব—প-এর ঘোষ রূপ ব।

ভ—ব ও হ এই দুইটির সংযুক্ত রূপ ভ। ইহা মহাপ্রাণ।

ম—ব উচ্চারণ করিতে গিয়া যদি নাক দিয়া নিঃশ্বাস বাহির করিয়া দেওয়া যায় তবে ম-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। ইহা নাসিক্য ও ওষ্ঠ্য ধ্বনি।

য—বাংলায় ইহার উচ্চারণ তালব্য জ-এর মত।

র—ইহার উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতের মাঢ়ীতে ঠেকাইয়া কাঁপাইতে হয়।

ল—জিহ্বার অগ্রভাগ দাঁতে ঠেকাইয়া জিহ্বা দ্বারা আটকান বাতাস ত্যাগ করিলেই ল উচ্চারিত হয়।

ব—বাংলায় অন্তঃস্থ্য ব-এর কোন স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই।

ং—মুখবিবরের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া নাক দিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ং উচ্চারণ করা হয়।

ঃ—ইহার উচ্চারণ হসন্ত হ-এর মত। কিন্তু বাংলায় বিসর্গের পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব করিয়া বিসর্গের উচ্চারণ হইয়া থাকে। যেমন দুখ্‌খ—দুঃখে।

[বাংলা যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য]

একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়া যখন একটি সংযুক্ত বর্ণ হয় তখন সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ থাকা উচিত ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলায় তাহা হয়—কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম আছে। সেগুলি দেখান হইতেছে।

ক্ষ—কৃষ এই উচ্চারণ হওয়া উচিত কিন্তু কৃখ রূপে উচ্চারিত হয়। **অক্ষর** (অকখর), রাক্ষস (রাকখোস), বক্ষ (বোক্‌খো)।

জ্ঞ—জ ও ঞ-এর মিলিত উচ্চারণ বাংলায় গ্যঁ। বিজ্ঞান (বিগ্যাঁন), আজ্ঞা (আগ্যাঁ)।

ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন—বিশ্ব (বিশ্‌শ), সত্বর (সত্‌তর), বিল্ব (বিল্‌ল)।

য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনেও 'য' এর উচ্চারণ থাকে না, ব্যঞ্জনটিরই দ্বিত্ব হয়। বিদ্যা (বিদ্দা), সহ্য (সোজ্‌ঝ), সত্য (সোততো)।

ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনেও 'ম' এর প্রভাবে একটি লঘু অনুনাসিক ধ্বনি মাত্র থাকে। পদ্ম (পদ্‌দঁ), স্মরণ (সঁরণ)।

[একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি]

সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণের বিশুদ্ধি বাংলায় বজায় না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে একই বর্ণ বিভিন্ন ধ্বনি প্রকাশ করিয়া থাকে। 'অ' এর উচ্চারণ অকাল, অসময়, অবিকল প্রভৃতি শব্দে অবিকৃত থাকে কিন্তু অতুল, অনুকূল প্রভৃতি শব্দ একটু ও-ঘেঁসা হয়। লজ্জা ও লজ্জিত, নন্দন ও নন্দিত, শক্ত ও শক্তি এইগুলির উচ্চারণ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। একারে দুই রকম উচ্চারণ একদা ও একা, একটি ও একলা, ফেনা ও ফেনিল এই শব্দগুলির মধ্যে ধরা পড়ে।

[বিভিন্ন বর্ণের একই ধ্বনি]

সংস্কৃত বর্ণের উচ্চারণের স্পষ্টতা বাংলায় রক্ষিত হয় নাই বলিয়াই শ, ষ ও স এই তিনটি বর্ণ আছে কিন্তু তিনটিকেই আমরা একই ভাবে উচ্চারণ করিয়া

থাকি। ন ণ বর্ণ আলাদা হইলেও বাংলায় ধ্বনি এক। জ ও য, স্ব ও দ্দ, ক্ষ ও খ্য বর্ণ পৃথক হইলেও উচ্চারণ একই।

[বাংলায় ধ্বনি-পরিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম]

সমীকরণ—একই শব্দের মধ্যে যদি পাশাপাশি দুইটি বিভিন্ন ব্যঞ্জন থাকে, তবে অনেক সময় দুইটি বিভিন্ন ব্যঞ্জন একই ব্যঞ্জনবর্ণে রূপান্তরিত হয়। এই প্রকার রূপান্তর-সাধনের নাম সমীকরণ। যথা :—গল্প—গপ্প, তর্ক—তক্ক, কর্তা—কত্তা, মূর্খ—মুখ্যু, লাল নীল—লাল লীল।

অসমীকরণ—শব্দের মধ্যে পাশাপাশি একই প্রকার স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণ থাকিলে একটি ধ্বনির পরিবর্তন সাধন করিয়া উচ্চারণে একটি নূতনত্ব আনয়ন করা হয়। উচ্চারণের এই বৈচিত্র্য সাধনের নাম বিষমীকরণ বা অসমীকরণ। যথা :—বয়স—বয়েস, হরিতকী—হরতুকী, হাস্নাহানা—হাস্নুহানা।

বর্ণবিপর্যয়—শব্দের মধ্যে দুইটি বর্ণ যখন পরস্পর স্থান-বিনিময় করে, তখন বর্ণবিপর্যয় হয়। যথা :—পিশাচ—পিচাশ, বাক্স—বাস্ক, হ্রদ—দহ, মুকুট,—মটুক, বারাণসী—বেনারসী।

ধ্বনি বিলোপ বা বর্ণলোপ—কোন শব্দের একটি স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ যখন উচ্চারণে লোপ পায় তখন তাহাকে বর্ণলোপ বলে। যথা—নারিকেল—নারকেল, স্ফটিক—ফটিক, নাতিনী—নাতনী, কাঁচাকলা—কাঁচকলা, অতিথি—অতিথ, মিশিকাল—মিশ্‌কালো।

বর্ণাগম—একটি শব্দের মধ্যে যদি কোন নূতন বর্ণের আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে বর্ণাগম বলে। যথা :—(আদ্যাগম) স্কুল—ইস্কুল, স্টিমার—ইস্টিমার, স্টেশন—ইস্টেশন। (মধ্যাগম) বানর—বান্দর, অম্ল—অম্বল। (অন্ত্যাগম) নস্য—নস্যি, বেঞ্চ—বেঞ্চি, মুণ্ড—মুণ্ডু।

স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ—উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে একটি স্বরবর্ণ প্রবেশ করাইয়া অনেক সময় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ভাঙ্গিয়া

দেওয়া হয়। যুক্তবর্ণের মধ্যে এইপ্রকার স্বরবর্ণের অনুপ্রবেশের নাম **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ**। স্বরভক্তিতে অ, ই, উ, এ এবং ও এই পাঁচটি স্বরেরই আগম হয়। যথা :—কর্ম—করম, ধৈর্য—ধৈরজ, গর্ব—গরব, ভক্তি—ভকতি, চক্র—চকর, বর্ষ—বরষ, বর্ষা—বরষা, গর্জন—গরজন। শ্রী—ছিরি, বর্ষণ—বরিষণ, চিত্র—চিত্তির, স্নান—সিনান, মিত্র—মিত্তির, প্রীতি—পীরিতি। ভ্রূ—ভুরু, পুত্র—পুত্তুর, শুক্র—শুকুর, শূদ্র—শূদ্দুর, প্রেত—পেরেত, গ্রাম—গেরাম, শ্রাদ্ধ—ছেরাদ্দ, শ্লোক—শোলোক।

স্বরসঙ্গতি—শব্দের মধ্যে যদি একাধিক স্বর থাকে তবে অনেক সময় শব্দটি উচ্চারণ করিবার সময় একটি সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি স্থাপন করা হয়। ইহার ফলে উচ্চারণটি পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। এই বৈশিষ্ট্যের নাম স্বরসঙ্গতি। যথা :—নিরামিষ—নিরিমিষ, বিলাতি—বিলিতি, উনান—উনুন, দেশি—দিশি, হুঁকা—হুঁকো, কুঁজা—কুঁজো, কুড়াল—কুড়ুল, পুরোহিত—পুরুত, শুনা—শোনা, ভুলে—ভোলে।

অপিনিহিতি—শব্দের মধ্যে ই বা উ থাকিলে সেই ই বা উ কে যথাকালে উচ্চারণ না করিয়া আগে হইতেই উহা উচ্চারণ করিবার যে বৈশিষ্ট্য বাংলা উচ্চারণে আছে, তাহার নামই অপিনিহিতি। একসময় উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য সমগ্র বাংলাদেশেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, এখন মাত্র পূর্ববঙ্গে সীমাবদ্ধ আছে। যথা :—রাতি—রাইত, আজি—আইজ, কালি—কাইল, গাঁঠি—গাঁইট, সত্য—সইত্য, কাব্য—কাইব্য, রাখিয়া—রাইখ্যা, মারিয়া—মাইর‍্যা, সাধু—সাউধ, গাছুয়া—গাউছা, জলুয়া—জউলা।

অভিশ্রুতি—অপিনিহিতির প্রভাবে যে পরিবর্তন হয় তাহা পূর্ববঙ্গে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া চলিত আধুনিক ভাষায় অপিনিহিত স্বর পূর্বস্থিত স্বরের পরিবর্তন সাধন করে। অভিশ্রুতি বাংলা উচ্চারণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যথা :—বলিল—বোল্‌ল, করিল—কোর্‌ল, চলিল—চোলল, বলিব—বোলব, পড়িব—পোড়ব, বলিয়া—বোলে, বসিয়া—বোসে, করিয়া—কোরে, কবিরাজ—কোবরেজ, কাটিয়া—কেটে, রাখিয়া—রেখে, ছাঁটিয়া—ছেঁটে, মারিয়া—মেরে, পানিহাটি—পেনেটি, গাছুয়া—গেছো, মাছুয়া—মেছো, মাধুয়া—মেধো, জলুয়া—জোলো, পটুয়া—পোটো।

অনুশীলনী

১। ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। বাংলায় আ-কার ও এ-কারের যে বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ হয় তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি, অপিনিহিতি ও বিপ্রকর্ষ এই সংজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা কর। উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

৪। উচ্চারণ-স্থান নির্ণয় কর :—

(ক) এ, ঙ, চ, ঞ, জ্ঞ (১৯৪৬) ; (খ) ঈ, ঐ, ঙ, য, শ, চ (১৯৪৫) ; (গ) ঋ, উ, ঞ, ভ, স, হ (১৯৪৪) ; (ঘ) অ, ঋ, স, ং, ক্ষ (১৯৪৩)।

সন্ধি

সন্ধি অর্থ মিলন। বর্ণের সহিত বর্ণের মিলন হইলে সন্ধি হয়। দুইটি বর্ণ অত্যন্ত সন্নিহিত ও নিকটবর্তী হইলে অর্থাৎ পাশাপাশি থাকিলে দুই বর্ণ মিলাইয়া যে একবর্ণে পরিণত করা হয়, তাহার নাম সন্ধি।

একটি শব্দের শেষবর্ণ আর একটি শব্দের প্রথম বর্ণ তাড়াতাড়ি কথা বলিবার সময় আমরা সর্বদাই মিলাইয়া এক করিয়া দিয়া থাকি। 'কারা আগার', 'হিম অচল' দ্রুত উচ্চারণে 'কারাগার', 'হিমাচল' হইয়া দাঁড়ায়। উচ্চারণের সুবিধার জন্যই অর্থাৎ দ্রুত উচ্চারণ, ভাষার কর্কশতা-নিবারণ, প্রভৃতির জন্যই সন্ধি করা হয়।

সন্ধি দুই প্রকার—স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে সন্ধি হইলে স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বর বা ব্যঞ্জনের সন্ধির নাম ব্যঞ্জনসন্ধি। বিসর্গসন্ধিও ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

[বাংলা ভাষায় সন্ধির বৈশিষ্ট্য]

বাংলার কতকগুলি নিজস্ব সন্ধি আছে। এইগুলির মধ্যে অনেকগুলির এখনও লিখিত রূপ নাই। কেবল উচ্চারণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ আছে।

খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

আর + এক = আরেক   বার + এক = বারেক   তিল + এক = তিলেক ক্ষণ + এক = ক্ষণেক।

এখন লক্ষ্য রাখিতে হইবে তিল, ক্ষণ প্রভৃতি শব্দে শেষের অক্ষরটি অ-কারান্ত কিন্তু বাংলা উচ্চারণে ঐগুলি হসন্ত যুক্ত। এইভাবে যেমন + ই = যেমনি ; তেমন + ই = তেমনি ; আমার + ও = আমারো ; কাহার + ও = কাহারো ; কখন + ও = কখনো ইত্যাদি সন্ধি হয়।

এই শব্দগুলির দেখাদেখি কয়েকটি শব্দে যেখানে শেষ অক্ষরটি অকারান্ত সেগুলিও উপরের এই নিয়মে পড়িয়া যায়। শত + এক = শতেক ; অর্ধ + এক = অর্ধেক।

বাংলায় কতকগুলি ক্ষেত্রে, পূর্বস্বরের লোপ হয়—পানি + ফল = পানফল ; মিশি + কালো = মিশকালো ; ঘোড়া + গাড়ী = ঘোড়গাড়ী ; কাঁচা + কলা = কাঁচকলা ; বেশী + কম = বেশকম ; মাসী + শাশুড়ী = মাসশাশুড়ী।

বাংলাতে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বিসর্গ বর্জিত করিয়া উচ্চারণ করা হয় বলিয়া মন + অন্তর – মনান্তর, বক্ষ + উপরি = বক্ষোপরি, যশ + আকাঙ্ক্ষা = যশাকাঙ্ক্ষা বাংলায় চলিতেছে। বলা বাহুল্য এগুলি শিষ্ট প্রয়োগ নয়।

কতকগুলি সন্ধি এখনও লিখিত রূপ পায় নাই কিন্তু উচ্চারণে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। যথা—এত + দিন = এদ্দিন, পাঁচ + জন = পাঁজ্জন, বড় + ঠাকুর = বট্‌ঠাকুর, পাঁচ + সের = পাঁচসের, নাতি + জামাই = নাতজামাই।

[স্বরসন্ধি]

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয় ; আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

হিম + অচল = হিমাচল ; ধর্ম + অধর্ম = ধর্মাধর্ম ; অপর + অপর = অপরাপর ; মঙ্গল + অমঙ্গল = মঙ্গলামঙ্গল ; নর + অধম = নরাধম ; নব + অন্ন = নবান্ন ; সাধ্য + অনুসারে = সাধ্যানুসারে ; জল + আশয় = জলাশয় ; হিম + আলয় = হিমালয় ; দেব + আলয় = দেবালয় ; সিংহ + আসন = সিংহাসন ; গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার ; কুশ + আসন = কুশাসন ; তথা + অপি = তথাপি ; যথা + অর্থ = যথার্থ ; আজ্ঞা + অধীন = আজ্ঞাধীন ; সন্ধ্যা + অবধি = সন্ধ্যাবধি ; আশা +

অতিরিক্ত = আশাতিরিক্ত ; বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় ; মহা + আশয় = মহাশয় ; কারা + আগার = কারাগার ; সদা + আনন্দ = সদানন্দ ; মহা + আত্মা = মহাত্মা ; কশা + আঘাত = কশাঘাত।

২। ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে, উভয় মিলিয়া ঈ-কার হয় ; ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র ; অতি + ইব = অতীব ; অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট ; অতি + ইত = অতীত ; পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা ; প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা ; মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র ; সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র ; শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র ; সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র ; শ্রী + ঈশ = শ্রীশ ; সতী + ঈশ = সতীশ ; পৃথ্বী + ঈশ্বর = পৃথ্বীশ্বর ; যোগী + ঈশ্বর = যোগীশ্বর।

৩। উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ-কার হয় ; ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

কটু + উক্তি = কটূক্তি বিধু + উদয় = বিধূদয়
বধূ + উক্তি = বধূক্তি ; ভূ + ঊর্দ্ধ = ভূর্দ্ধ

এই নিয়মে সন্ধি-নিষ্পন্ন শব্দের ব্যবহার বাংলায় নাই বলিলেই চলে, কেবল নিয়মটি বুঝাইবার জন্য সূত্র ও উদাহরণ দেওয়া হইল।

৪। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া এ-কার হয় : এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র
স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা ইতর + ইতর = ইতরেতর
দেব + ঈশ = দেবেশ গণ + ঈশ = গণেশ
পরম + ঈশ্বর = পরমেশ্বর।
মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা
যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট
রমা + ঈশ = রমেশ উমা + ঈশ = উমেশ
লঙ্কা + ঈশ্বর = লঙ্কেশ্বর ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊকার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় ; ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সূর্য + উদয় = সূর্যোদয় নর + উত্তম = নরোত্তম
পদ + উন্নতি = পদোন্নতি পর + উপকার = পরোপকার
হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ
চল + ঊর্মি = চলোর্মি নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া
যথা + উচিত = যথোচিত মহা + উৎসব = মহোৎসব
দুর্গা + উৎসব = দুর্গোৎসব কথা + উপকথন = কথোপকথন
গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

৬। অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া ঐ-কার হয় ; ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

জন + এক = জনৈক এক + এক = একৈক
মত + ঐক্য = মতৈক্য বিপুল + ঐশ্বর্য = বিপুলৈশ্বর্য
সদা + এব = সদৈব তথা + এব = তথৈব
মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

বাংলা ভাষায় এই নিয়মের সন্ধিটিরও বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। শব্দের আদিতে এ-কার বা ঐ-কার আছে, এরূপ উদাহরণ বাংলায় খুব বেশী নাই। যে কয়টি শব্দ আছে, শ্রুতিকটু হইবে বলিয়া তাহার সহিত সন্ধি করা হয় না। বরং চলিত কথায় 'বারেক', 'জনেক', 'ক্ষণেক', 'আধেক', 'তিলেক' এইরূপ প্রয়োগই সাধারণত দেখা যায়।

৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয় ; ঔকার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ও = ঔ

জল + ওঘ = জলৌঘ বন + ওষধি = বনৌষধি

অ + ঔ = ঔ

চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য পরম + ঔষধ = পরমৌষধ

আ + ও = ঔ

মহা + ওষধি = মহৌষধি

আ + ঔ = ঔ

মহা + ঔষধ = মহৌষধ

বাংলা ভাষার পক্ষে এই নিয়মটিও নিষ্প্রয়োজন। কারণ ও-কার কিংবা ঔ-কার আদিতে আছে এইরূপ শব্দের ব্যবহার বাংলায় খুবই কম।

৮। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। অর্-এর অ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, এবং র্ রেফ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়।

অ + ঋ = অর্

দেব + ঋষি = দেবর্ষি	সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি

আ + ঋ = অর্

মহা + ঋষি = মহর্ষি

৯। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, এ-কার স্থানে অয্, ঐ-কার স্থানে আয্, ও-কার স্থানে অব্, ঔ-কার স্থানে আব্ হয়। অ-কার বা আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। য্ বা ব্ পরস্বরে যুক্ত হয়।

শে + অন = শয়ন	নে + অন = নয়ন
গৈ + অক = গায়ক	ভো + অন = ভবন
নৌ + ইক = নাবিক	ভৌ + উক = ভাবুক

১০। ই, ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ই-কার এবং ঈ-কার স্থানে য্ হয়; য্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর য্-কারে যুক্ত হয়।

আদি + অন্ত = আদ্যন্ত	অতি + আচার = অত্যাচার
অতি + অন্ত = অত্যন্ত	প্রতি + অহ = প্রত্যহ
যদি + অপি = যদ্যপি	পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা

১১। উ, ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, উ বা ঊ স্থানে ব্ হয়; ব্ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব্-কারে যুক্ত হয়।

মনু + অন্তর = মন্বন্তর	পশু + আচার = পশ্বাচার
সু + আগত = স্বাগত	অনু + এষণ = অন্বেষণ

বিঃ দ্রঃ—স্বরসন্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। কেবল সংস্কৃত শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দেরই সন্ধি হইবে। বাংলা শব্দের সহিত বাংলা শব্দের সন্ধি সাধু ভাষায় হয় না। সংস্কৃত শব্দের সহিত বাংলা শব্দেরও সন্ধি হয় না।

কচু + আলু + আদা সন্ধি করিয়া কচ্বাল্বাদা হইবে না।

আমি + উপরে সন্ধি হইবে না।

তিনি + অধম সন্ধি হইবে না।

বিদেশী শব্দের সন্ধি করা উচিত নয়; কিন্তু পোস্টাফিস, খরচান্ত, আইনানুসারে, বাপান্ত প্রভৃতি দুই একটি সন্ধিযুক্ত পদ বাংলা ভাষায় বেশ চলিতেছে। শ্রুতিকটু হইলে বাংলাতে সন্ধি করিবে না।

কিন্তু সমাসে ও ধাতুর সহিত উপসর্গের যোগ হইলে সন্ধি করা অবশ্য কর্তব্য।

স্বরসন্ধির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে, এইগুলি ব্যতিক্রম অর্থাৎ সূত্র অনুসারে নিষ্পন্ন হয় নাই। ইহাদিগকে **নিপাতনে সিদ্ধ** বলে।

সীম + অন্ত = সীমন্ত (সীঁথি অর্থে) কিন্তু হওয়া উচিত ছিল সীমান্ত।

কুল + অটা = কুলটা কিন্তু হওয়া উচিত কুলাটা।

মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল মার্তাণ্ড।

স্ব + ঈর = স্বৈর, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল স্বের।

প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল প্রোঢ়।

অক্ষ + উহিণী = অক্ষৌহিণী, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল অক্ষোহিণী।

শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল শুদ্ধৌদন।

[ব্যঞ্জনসন্ধি]

১। চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়।

উৎ + চারণ = উচ্চারণ

জগৎ + চন্দ্র = জগচ্চন্দ্র

সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র

উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ

শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র

ভগবৎ + চিন্তা = ভগবচ্চিন্তা

চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র

২। জ্ কিংবা ঝ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়।

তৎ + জন্য = তজ্জন্য

বিপদ + জাল = বিপজ্জাল

সৎ + জন = সজ্জন

উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল

যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন

৩। **ল্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়।**

উৎ + লেখ = উল্লেখ   উৎ + লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন

৪। **ক্ চ্ ট্ ত্ প্—ইহাদের পর স্বরবর্ণ থাকিলে, ক্ চ্ ট্ ত্ প্ স্থানে যথাক্রমে গ্ জ্ ড্ দ্ ব্ হয়।**

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত   বাক্ + ঈশ = বাগীশ

ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত   ষট্ + আনন + ষড়ানন

জগৎ + ইন্দ্র = জগদিন্দ্র   জগৎ + ঈশ্বর = জগদীশ্বর

৫। **বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্ হ্ থাকিলে, বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।**

বাক্ + দত্ত = বাগ্‌দত্ত   সৎ + গুরু = সদ্‌গুরু

উৎ + যোগ = উদ্যোগ   জগৎ + গুরু = জগদ্‌গুরু

ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র

৬। **স্বরবর্ণের পরবর্তী ছ্ স্থানে চ্ছ্ হয়।**

পরি + ছদ = পরিচ্ছদ   পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ

বি + ছেদ = বিচ্ছেদ   আ + ছাদন = আচ্ছাদন

বট + ছায়া = বটচ্ছায়া

৭। **শ্ পরে থাকিলে, ত্ ও দ্ স্থানে চ্, আর শ্ স্থানে ছ হয়।**

উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল   উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস

চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি

৮। **ত্ কিংবা দ্ এর পর হ্ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া দ্ধ্ হয়।**

উৎ + হত = উদ্ধত   উৎ + হৃত = উদ্ধৃত

তৎ + হিত = তদ্ধিত

৯। **ন্ কিংবা ম্ পরে থাকিলে, বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।**

বাক্ + ময় = বাঙ্ময়   জগৎ + মাতা = জগন্মাতা

জগৎ + নাথ = জগন্নাথ   দিক্ + মণ্ডল = দিঙ্‌মণ্ডল

মৃৎ + ময় = মৃণ্ময়   দিক্ + নাগ = দিঙ্‌নাগ

কিঞ্চিৎ + মাত্র = কিঞ্চিন্মাত্র

১০। **ম্ এর পরে য্, র্, ল্, ব্, শ্, ষ্, স্ থাকিলে, ম্ স্থানে (ং) হয়।**

সম্ + যোগ = সংযোগ　　সম্ + হার = সংহার

কিম্ + বা = কিংবা　　সম্ + শয় = সংশয়

সম্ + বাদ = সংবাদ　　সম্ + সার = সংসার

সম্ + শোধন = সংশোধন　　সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন

১১। **স্পর্শবর্ণ (ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত বর্ণ) পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়, অথবা যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।**

সম্ + কীর্ণ = সংকীর্ণ অথবা সঙ্কীর্ণ　　অহম্ + কার = অহংকার অথবা অহঙ্কার

সম্ + খ্যা = সংখ্যা অথবা সঙ্খ্যা

সম্ + পূর্ণ = সংপূর্ণ অথবা সম্পূর্ণ　　সম্ + বুদ্ধ = সংবুদ্ধ অথবা সম্বুদ্ধ

১২। **উৎ উপসর্গের পরে স্থা ও স্তন্ভ্ ধাতুর স্-কারের লোপ হয়।**

উৎ + স্থান = উত্থান　　উৎ + স্থিত = উত্থিত

১৩। **বর্গের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ণ অথবা শ্, ষ্, স্ পরে থাকিলে, বর্গের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়।**

আপদ্ + কাল = আপৎকাল　　ক্ষুধ্ + পীড়িত = ক্ষুৎপীড়িত

বিপদ্ + কাল = বিপৎকাল　　হৃদ্ + কমল = হৃৎকমল

বিপদ্ + সময় = বিপৎসময়

১৪। **সম্ ও পরি উপসর্গের পরে কৃ-ধাতু থাকিলে, উপসর্গের পর স্ আগম হয়।**

সম্ + কৃত = সংস্কৃত　　পরি + কৃত = পরিষ্কৃত

[বিসর্গসন্ধি]

১। **র্-জাত কিংবা স্-জাত বিসর্গের পরে চ্ বা ছ্ থাকিলে, বিসর্গ স্থানে শ্ হয়।**

নিঃ + চয় = নিশ্চয়　　দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য

নিঃ + চল = নিশ্চল　　শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ

দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা　　দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র

২। র্-জাত কিংবা স্-জাত বিসর্গের পরে ট বা ঠ থাকিলে, বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়।

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার

৩। র্-জাত কিংবা স্-জাত বিসর্গের পর ত্ বা থ্ থাকিলে, বিসর্গ স্থানে স্ হয়।

মনঃ + তাপ = মনস্তাপ ইতঃ + তত = ইতস্তত

নিঃ + তার = নিস্তার অধঃ + তন = অধস্তন

দুঃ + তর = দুস্তর নভঃ + তল = নভস্তল

৪। ক্, খ্, প্, ফ্ পরে থাকিলে, অ-কার বা আ-কারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে স্ হয়।

নমঃ + কার = নমস্কার পুরঃ + কার = পুরস্কার

অয়ঃ + কান্ত = অয়স্কান্ত ভাঃ + কর = ভাস্কর

এই নিয়মের ব্যতিক্রমঃ—

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া অধঃ + পাত = অধঃপাত

মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ

কিন্তু অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়।

আবিঃ + কার = আবিষ্কার ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র

নিঃ + কর = নিষ্কর নিঃ + ফল = নিষ্ফল

৫। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্, পরে থাকিলে, পদের অন্তস্থিত র্-জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয়।

অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা পুনঃ + আগত = পুনরাগত

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী

প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ প্রাতঃ + ভোজন = প্রাতর্ভোজন

অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম

৬। অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গের পরে যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য্, র্, ব্, হ্ থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে র হয়।

দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা দুঃ + গম = দুর্গম

দুঃ + নাম = দুর্নাম দুঃ + লভ = দুর্লভ

নিঃ + অবধি = নিরবধি　　নিঃ + গত = নির্গত

ধনুঃ + বিদ্যা = ধনুর্বিদ্যা　　চক্ষুঃ + দান = চক্ষুর্দান

দুঃ + ভাবনা = দুর্ভাবনা

৭। **অ-কারের পরস্থিত সজাত বিসর্গের পরে যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ ও পরবর্তী অ-কার—উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়।**

মনঃ + যোগ = মনোযোগ　　মনঃ + ভাব = মনোভাব

তপঃ + বল = তপোবল　　যশঃ + লাভ = যশোলাভ

মনঃ + রম = মনোরম　　বয়ঃ + বৃদ্ধি = বয়োবৃদ্ধি

অধঃ + গতি = অধোগতি　　যৎপরঃ + নাস্তি = যৎপরোনাস্তি

ব্যঞ্জনসন্ধির মধ্যে যেগুলি **নিপাতনে সিদ্ধ**, সেগুলি অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদের জানিয়া রাখা উচিত।

এক + দশ = একাদশ　　পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি

ষট্ + দশ = ষোড়শ　　বন + পতি = বনস্পতি

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি　　গো + পদ = গোষ্পদ

হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র　　তৎ + কর = তস্কর

আ + চর্য = আশ্চর্য　　দিব + মনি = দ্যুমণি

দিব + লোক = দ্যুলোক　　আ + পদ = আস্পদ

সম্ + কৃত = সংস্কৃত

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাহাকে বলে? কোথায় কোথায় সন্ধি হয় না, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। সূত্র উল্লেখপূর্বক সন্ধি কর:—

রত্ন + আকর; হিম + ঋত, অপ + জ; নিঃ + অবধি; তদ্ + হিত; দিক্ + অন্ত, গো + অক্ষ; উপরি + উপরি।

৩। (ক) সন্ধি বিচ্ছেদ কর:—

ক্ষুধার্ত, অক্ষৌহিণী, প্রৌঢ়, উচ্ছ্বাস, প্রাতরাশ, তরুচ্ছায়া, সম্রাট, মনোরম, ষষ্ঠ।

(খ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

উল্লেখ, উত্তমর্ণ, হিতৈষী, নীরস, গবাক্ষ।

৪। নিম্নলিখিত পদগুলিতে সন্ধিঘটিত যে ভুল আছে তাহা দেখাও :—

উজ্জল, ভুম্যাধিকারী, সম্পদ, সন্মুখ, দুরাদৃষ্ট, যশেচ্ছা, দুরাবস্থা, সত্ত্বজাত, জগবন্ধু, মনোকষ্ট।

৫। নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কাহাকে বলে? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

৬। শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

(ক) গ্যাসালোকিত রাজপথের উপর আমরা পর্যাটন করিতে লাগিলাম।

(খ) আমাপেক্ষা ভাগ্যহীন আর কে আছে?

(গ) আমার মনোকষ্টের সীমা নাই।

(ঘ) উপরোক্ত বিষযে তোমার সম্মতি আছে কিনা জানাইবে।

(ঙ) খুলনাভিমুখে গাড়ী ছাড়িল, এবার আমরা বাট্যাভিমুখে যাইতেছি।

(চ) প্রাতঃভ্রমণ বড়ই প্রীতিপদ।

(ছ) আমি কাযমনবাক্যে প্রার্থনা করি তুমি আরোগ্য লাভ কর।

(জ) বর্তমান সময়ে অর্থের অত্যাধিক অভাব।

(ঝ) পুত্রের নিরস বদনমণ্ডল ও তেজহীন চক্ষুদ্বয় দেখিয়া জননীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

(ঞ) যে ঘটনা ঘটিযাছে তাহা বড়ই লজ্জাস্কর।

[ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান]

সংস্কৃত শব্দে কোনখানে ণ ও কোনখানে ষ ব্যবহার করা হয়, এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে। এই নিয়মকে ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধি বলে। ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধি প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয় বলিয়াই বাংলা ব্যাকরণেও ণত্ব-বিধি ও ষত্ব-বিধির আলোচনা প্রয়োজন।

ণত্ব-বিধান—ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত পদমধ্যগত ন ণ হয়। ঋণ, বর্ণ, ঘৃণা, তৃষ্ণা, স্বর্ণ, তৃণ, জীর্ণ, কর্ণ ইত্যাদি।

ঋ, র ও ষ এর পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ প-বর্গ,, য, ব, হ এবং ং ব্যবধান থাকিলেও ন ণ হয়। কৃপণ, হরিণ, পাষাণ, গ্রহণ, বৃংহণ।

ট, ঠ, ডয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে ন সর্বদাই ণ হয়। কণ্ঠ, ঘণ্টা, দণ্ড, পণ্ডিত, কণ্টক, লুণ্ঠন।

প্র, পরা, পরি ও নি এই চারিটি উপসর্গের পরে ন ণ হয়। প্রণাম, পরায়ণ, পরিণাম, নির্ণয়।

পদের শেষে ন ণ হয় না। করেন, করুন।

ত, থ, দ ও ধ-এর সহিত যুক্ত হইলে সর্বদাই ন হয়। চিন্তা, সন্তান, পন্থা, মন্দ, সন্ধ্যা।

কতকগুলি শব্দের ণ স্বাভাবিক।

চাণক্য, মাণিক্য, গণ্য, বাণিজ্য, লবণ।
কল্যাণ, কণিকা, অণু, পুণ্য, বীণা, কোণ।
লাবণ্য, চিক্কণ, বাণী, গণিক, মৎকুণ
বেণু, কণা, চুণ, তৃণ, গণিকা, নিপুণ।
গণ, বাণ, পাণি, শোণ, গণনা, শোণিত
কঙ্কণ, কফোণি, মণি, কণাদ, শাণিত।
বেণী, ফণী, স্থাণু, ফণ, বিপণি, আপণ॥

ষত্ব-বিধান—অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক ও র-এর পরবর্তী প্রত্যয়ের স ষ হয়।

বিষয়, পরিষ্কার, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, শ্রীচরণেষু।

কিন্তু সাৎ প্রত্যয়ের স ষ হয় না।

অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ,ধূলিসাৎ।

অতি, অধি, অণু, অপি, অভি, নি, পরি, প্রতি, বি, সু এই উপসর্গগুলির পর কতকগুলি ধাতুর স ষ হয়।

প্রতিষেধ, অভিষেক, নিষেধ, নিষাদ।

পিতৃ ও মাতৃ শব্দের সহিত স্বসৃ শব্দের যোগ হইলে স্বসৃ শব্দের স ষ হয়।

মাতৃষ্বসা, পিতৃ[illegible]।

কতগুলি শব্দে ষ স্বাভাবিক।

নিকষ, পাষাণ, মেষ, কষায়, প্রদোষ
আষাঢ়, ষোড়শ, ঊষা, কৃষি, হর্ষ, রোষ।
পাষণ্ড, ঈষৎ, বাষ্প, বিষাণ, দূষণ
বর্ষণ, বিশেষ্য, ভূষা, বিষয়, বর্ষণ।

কুষ্মাণ্ড, গণ্ডূষ, ঈর্ষা, ঊষর, ঔষধ
বাষ্প, শ্লেষ্মা, ভীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ, ভিষক, নৈষধ।
তুষার, সর্ষপ, ভাষা, পৌষ, ষট্, মাষ
পুরুষ, মূষিক, ওষ্ঠ, শেষ, অভিলাষ।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—
মুমুর্ষু, প্রনাম, ভূমিসাৎ, শ্রদ্ধাস্পদেষু, সর্বণাম, কল্যানীয়াষু।

পদ-প্রকরণ

[পদের প্রকার-ভেদ]

এক বা একাধিক বর্ণ দ্বারা শব্দ গঠিত হয়। বাক্যে ব্যবহার করিবার সময় শব্দগুলিকে বিভক্তিযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। বিভক্তি-যুক্ত শব্দের বা ধাতুর নামই পদ। বিভক্তি দুই প্রকার। শব্দবিভক্তি ও ধাতু-বিভক্তি।

ছেলেরা, লোকে, মানুষের, ঘরে, ঘোড়ায় প্রভৃতি শব্দবিভক্তি-যুক্ত পদ। যাইতেছি, বলিয়াছিল, করিলাম, খাইব প্রভৃতি ধাতুবিভক্তি-যুক্ত পদ।

শব্দ ও পদের এই সংজ্ঞা সংস্কৃত ব্যাকরণের। সংস্কৃত ভাষায় বিভক্তি-যুক্ত না হইলে কোন শব্দই পদ হইবে না এবং বিভক্তি-যুক্ত না করিয়া কোন বাক্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত—এই নিয়ম সংস্কৃতে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই কিন্তু বাংলা ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যে ব্যবহৃত হইয়াছে এমন পদে বিভক্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

মধু বলিল, আমি এখন বাড়ী যাইব।

এই বাক্যে মধু এবং বাড়ী এই দুইটি পদে কোন বিভক্তির চিহ্ন নাই।

সুতরাং বিভক্তির চিহ্ন থাকুক বা না থাকুক বাক্যে ব্যবহৃত হইয়া অর্থ প্রকাশ করিতেছে এইরূপ হইলেই তাহাকে পদ বলা হয়।

অনেকে বাংলায় যে সমস্ত পদে বিভক্তির চিহ্ন দেখা যায় না সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য 'শূন্য বিভক্তি' কল্পনা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে বিনা বিভক্তিতে কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহার করা যায় না—সংস্কৃত বাক্যের এই নিয়ম তাঁহারা মানিয়া লন।

পদ পাঁচ প্রকার—**বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।**

[বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ]

যে পদে নাম বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য বলে। এই নাম কোন ব্যক্তি, বস্তু জাতি, সমষ্টি, গুণ বা কার্যের নাম হইতে পারে।

যাহা দ্বারা কোন ব্যক্তি, স্থান বা দেশ বুঝায় তাহাকে **সংজ্ঞাবাচক** বিশেষ্য বলে। ব্যক্তির নাম, স্থানের নাম, নদীর নাম, পর্বতের নাম, গ্রন্থের নাম—নাম হইলেই হইল। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি বুঝাইতে হইবে।

রাম, রহিম, রামায়ণ, গঙ্গা এইগুলি সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক বিশেষ্য।

কোন বস্তুর নাম বুঝাইলে তাহাকে **বস্তুবাচক** বিশেষ্য বলে।

লোহা, কয়লা, বন, দুধ, চিনি এইগুলি কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের নাম নয়, এইগুলি সাধারণ নাম। সাধারণতঃ বস্তুবাচক বিশেষ্যে যে দ্রব্য বুঝায় তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ওজন করিয়া তাহার পরিমাণ নির্দেশ করা যায়।

কোন জাতি বা শ্রেণীর নাম বুঝাইলে তাহাকে **জাতিবাচক** বিশেষ্য বলা হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ঘোড়া, গরু এইগুলি নির্দিষ্ট একটিকে না বুঝাইয়া সেই জাতি বা শ্রেণীকে বুঝায়।

যাহার দ্বারা কোন গুণ, দোষ বা অবস্থা বুঝাইয়া তাহাকে **গুণবাচক** বিশেষ্য বলে। ক্রোধ, করুণা, দয়া, ক্ষমা, সাধুতা, আলস্য, চাঞ্চল্য, বার্ধক্য গুণবাচক বিশেষ্য।

যাহা দ্বারা কোন কিছু পৃথকভাবে না বুঝাইয়া সকলের সমষ্টিকে বুঝায়, তাহাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। সেনা, সভা, শ্রেণী, জনতা, ছাত্রসমাজ এইগুলি সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ।

যাহা দ্বারা কোন একটি কার্যের নাম বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। শয়ন, গমন, ভোজন, আহার, মরণ, বাঁচন প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ।

বিশেষ্য পদের লিঙ্গ ও বচনভেদে রূপান্তর হয়।

[লিঙ্গ]

বিশেষ্য পদগুলি হয় কোন পুরুষ-জাতীয় জীব বা জন্তু, অথবা কোন স্ত্রী-জাতীয় জীব বা জন্তু, অথবা কোন অচেতন পদার্থ বুঝায়। যে শব্দ পুরুষ-বোধক তাহা পুংলিঙ্গ, যে শব্দ স্ত্রীবোধক তাহা স্ত্রীলিঙ্গ এবং যে শব্দে স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বুঝায় না তাহা ক্লীবলিঙ্গ। লিঙ্গ শব্দের আসল অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ।

ছাত্র, পুত্র, লেখক, সিংহ, তপস্বী প্রভৃতি শব্দ পুরুষ-জাতীয় জীব বুঝায় বলিয়া এইগুলি পুংলিঙ্গ।

ছাত্রী, কন্যা, লেখিকা, সিংহী, তপস্বিনী প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীজাতীয় জীব বুঝায় বলিয়া এইগুলি স্ত্রীলিঙ্গ।

ফল, জল, ঘৃত, দুগ্ধ, পাথর প্রভৃতি শব্দ স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বুঝায় না, এই জন্য এইগুলি ক্লীবলিঙ্গ।

সংস্কৃতে বৃক্ষ শব্দ পুংলিঙ্গ, লতা স্ত্রীলিঙ্গ, ফল ক্লীবলিঙ্গ। বন্ধু শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। পত্নী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু দার শব্দ পুংলিঙ্গ ও কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

বাংলা ভাষায় লিঙ্গ অর্থগত—অর্থাৎ যে শব্দ পুরুষ-জাতীয় ব্যক্তি বা জীব বুঝাইবে তাহা পুংলিঙ্গ, ও যে শব্দ স্ত্রীজাতীয় ব্যক্তি বা জীব বুঝাইবে তাহা স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলায় কেবল বিশেষ্য পদেরই লিঙ্গ আছে। সর্বনাম পদের লিঙ্গ নির্ণয় করিবার সময় দেখিতে হইবে কোন্ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনামটি বসিয়াছে; সেই অনুসারে সর্বনাম পদের লিঙ্গ হইবে। বিশেষণ পদ যে বিশেষ্যের পূর্বে বসে সেই বিশেষ্যের লিঙ্গ পাইয়া থাকে।

সাধুভাষায় গুরুগম্ভীর রচনা করিবার সময় বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে, যেমন—মহতী সভা, পল্লবিনী লতা, পয়স্বিনী গাভী, শস্যশ্যামলা ভূমি। কিন্তু সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় প্রচলিত ব্যবহারে বিশেষণের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মী মেয়ে, বড় দাদা, বড় দিদি, মেজ বাবু, মেজ গিন্নী—এইগুলি খাঁটি বাংলা প্রয়োগ।

[স্ত্রী-প্রত্যয়—সংস্কৃত ও বাংলা]

পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে আ, ঈ, আনী প্রভৃতি যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করা হয়, সেগুলির নাম স্ত্রী-প্রত্যয়।

[লিঙ্গ পরিবর্তন]

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করিবার সাধারণ নিয়ম তিনটি :—

(১) স্ত্রীবাচক নূতন শব্দের ব্যবহার।

(২) পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে স্ত্রীপ্রত্যয় যোগ।

(৩) পুরুষবাচক শব্দের পূর্বে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দের যোগ।

স্ত্রীবাচক নূতন শব্দ ব্যবহার দ্বারা লিঙ্গ-পরিবর্তন

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পতি	পত্নী	বর	বধূ
স্বামী	স্ত্রী	কর্তা	গিন্নী
পিতা	মাতা	নবাব	বেগম
বাবা	মা	শুক	শারী
ভ্রাতা	ভগিনী	বলদ	গাই
ঠাকুরপো	ঠাকুরঝি	পুরুষ	স্ত্রী
খানসামা	আয়া	রাজা	রাণী
গোলাম	বাঁদি	যুবক	যুবতী
বাদশা	বেগম	জনক	জননী
বেয়াই	বেয়ান	পুত্র	কন্যা
বিদ্বান	বিদুষী	ছেলে	মেয়ে
শ্বশুর	শাশুড়ী	সাহেব	মেম
ভূত	পেত্নী	ঠাকুরদাদা	ঠাকুরমা
ভাই	বোন	ফুপা	ফুপু
মিঞা	বিবি	আব্বা	আম্মা
মর্দা	মাদী	শাহ্‌জাদা	শাহ্‌জাদী

বিভিন্ন স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ করিয়া লিঙ্গ-পরিবর্তন

(ক) আ যোগ করিয়া—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অনাথ	অনাথা	চপল	চপলা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	অজ	অজা
দীন	দীনা	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা
সুশীল	সুশীলা	কোকিল	কোকিলা
কৃপণ	কৃপণা	সরল	সরলা
কৃশ	কৃশা	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া
বৎস	বৎসা	চতুর	চতুরা
দরিদ্র	দরিদ্রা	অনুকূল	অনুকূলা
প্রথম	প্রথমা	শিষ্য	শিষ্যা

(খ) ঈ যোগ করিয়া—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দেব	দেবী	সুন্দর	সুন্দরী
গৌর	গৌরী	মৎস্য	মৎস্যী
মানব	মানবী	ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী
কাকা	কাকী	খুড়া	খুড়ী
চাচা	চাচী	নানা	নানী
বুড়া	বুড়ী	পুত্র	পুত্রী
ছাত্র	ছাত্রী	দাস	দাসী
দূত	দূতী	তরুণ	তরুণী
কুমার	কুমারী	দানব	দানবী
পিশাচ	পিশাচী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
শৃগাল	শৃগালী	সিংহ	সিংহী

(গ) স্ত্রীলিঙ্গে অক-স্থানে ইকা হয়

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পাচক	পাচিকা	পাঠক	পাঠিকা
গায়ক	গায়িকা	নায়ক	নায়িকা
সাধক	সাধিকা	পালক	পালিকা
সেবক	সেবিকা	বালক	বালিকা
গ্রাহক	গ্রাহিকা	নাটক	নাটিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	অভিভাবক	অভিভাবিকা

(ঘ) অৎ, বৎ, মৎ, ইন্, বিন্, ঈয়স্, বর, চর, দৃশ, ময় প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে থাকিলে, ঈ যোগ করিতে হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সৎ	সতী	মানী	মানিনী
শ্রীমান্ (শ্রীমৎ)	শ্রীমতী	মায়াবী	মায়াবিনী
মহান্ (মহৎ)	মহতী	তপস্বী	তপস্বিনী
ভগবান (ভগবৎ)	ভগবতী	প্রেয়ান্	প্রেয়সী
বলবান (বলবৎ)	বলবতী	গরীয়ান্	গরীয়সী
গুণবান (গুণবৎ)	গুণবতী	মহীয়ান্	মহীয়সী
হিতকর	হিতকরী	সুখকর	সুখকরী
খেচর	খেচরী	ভূচর	ভূচরী
সহচর	সহচরী	নিশাচর	নিশাচরী
তাদৃশ	তাদৃশী	মৃন্ময়	মৃন্ময়ী
ঈদৃশ		চিন্ময়	চিন্ময়ী

(ঙ) তা (তৃ) যে পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে থাকে, তাহাকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করিতে হইলে ত্রী করিতে হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা	দাত্রী	ধাতা	ধাত্রী
কর্তা	কর্ত্রী	বিধাতা	বিধাত্রী
শিক্ষয়িতা	শিক্ষয়িত্রী	অভিনেতা	অভিনেত্রী
প্রণেতা	প্রণেত্রী	রচয়িতা	রচয়িত্রী

(চ) অঙ্গবাচক অ-কারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আ ও ঈ উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সুকেশ	সুকেশা, সুকেশী	বিম্বোষ্ঠ	বিম্বোষ্ঠা, বিম্বোষ্ঠী
কুন্দদন্ত	কুন্দদন্তা, কুন্দদন্তী	বিমুখ	বিমুখা, বিমুখী
সুকণ্ঠ	সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী	কৃশাঙ্গ	কৃশাঙ্গা, কৃশাঙ্গী
কৃশোদর	কৃশোদরী, কৃশোদরা		

এই নিয়মের কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে ; নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে কেবল আ হয়—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ত্রিনেত্র	ত্রিনেত্রা	ত্রিনয়ন	ত্রিনয়না
চতুর্ভুজ	চতুর্ভুজা	দশভুজ	দশভুজা
শশিবদন	শশিবদনা	করালবদন	করালবদনা

(ছ) পত্নী অর্থে কতকগুলি শব্দে—আনী প্রত্যয় যোগ করা হয়—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ভব	ভবানী	রুদ্র	রুদ্রানী
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	ব্রহ্ম	ব্রহ্মানী
আচার্য	আচার্যানী	মাতুল	মাতুলানী

(জ) আচার্য, ক্ষত্রিয়, উপাধ্যায় শব্দের উত্তর বিকল্পে আনী যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয় পত্নী) ক্ষত্রিয়ানী বা ক্ষত্রিয়া (ক্ষত্রিয়-জাতীযা স্ত্রী)
আচার্য	আচার্যানী (আচার্য পত্নী) আচার্যা (স্বয়ং অধ্যাপিকা)
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ানী (উপাধ্যায়-পত্নী) উপাধ্যায়া (স্বয়ং অধ্যাপিকা)

স্ত্রী বা পত্নী বাচক শব্দ যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পুরুষমানুষ	মেয়েমানুষ	সভা	মহিলা-সভা
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	কর্মী	নারী কর্মী
মদ্দা কুকুর	মাদী কুকুর	প্রভু	প্রভু-পত্নী
গরু	গাই-গরু	বীর	বীরাঙ্গনা, বীরজায়া
হাঁস	মাদী-হাঁস	বন্ধু	বন্ধুজায়া

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গয়লা	গয়লা-বৌ	ভ্রাতা	ভ্রাতৃজায়া
গোঁসাই ঠাকুর	মা-গোঁসাই	ঋষি	ঋষি-পত্নী
কবি	মহিলা-কবি	দত্ত	দত্ত-গিন্নী
সভাপতি	সভানেত্রী	ময়রা	ময়রা-বৌ

(ঝ) স্ত্রী-জাতীয়া বা পত্নী বুঝাইতে 'নী' 'ইনি' ও 'আনী' বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বামুন	বামনী	বেদে	বেদেনী
বাঘ	বাঘিনী	ঠাকুর	ঠাকুরাণী
সাপ	সাপিনী	চৌধুরী	চৌধুরাণী
কাঙাল	কাঙালিনী	মেছো	মেছুনী
জেলে	জেলেনী	ডাক	ডাকিনী
পূজারী	পূজারিণী	গয়লা	গয়লানী
মালী	মালিনী	রজক	রজকিনী
ভিখারী	ভিখারিণী	চাকর	চাকরাণী
চাতক	চাতকিনী	মাষ্টার	মাষ্টারণী
কৃপণ	কৃপণী	মেথর	মেথরাণী

আয়া, ধাই, সই, সতীন প্রভৃতি শব্দ নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ—পুংলিঙ্গে ইহাদের কোনও রূপ নাই।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—

শুক, মৎস্য, আচার্য, কবি, ভূত, শিক্ষক, গোলাম, চাকর, মেম, বোন, ননদ, নবাব।

২। নিম্নলিখিত পুংলিঙ্গ শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গে কি রূপ হইবে বল :—

মালী, মেথর, পক্ষী, ঘোষ, ভ্রমর, বোনাই, শিব, তৃতীয়, তাদৃশ, মনোহর, নায়ক, মাষ্টার, ছাত্র, বাবু।

৩। নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলির পুংলিঙ্গে কি রূপ হইবে বল :—

জননী, গিন্নী, ধাত্রী, বোন, নন্দিনী, গায়িকা, শ্রীমতী, বেগম, শিক্ষয়িত্রী, ননদ।

৪। লিঙ্গঘটিত ভুলগুলি শুদ্ধ কর :—

সুন্দর কন্যা। অচল ভক্তি। শস্যশ্যামলা দেশ। মহান সভা। চতুর্থ তিথি। পরাধীনী রমণী। বিদ্বান মহিলা। বুদ্ধিমান ও গুণবান বালিকা।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে 'তিনি' এই পদটি যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয় তবে অন্যান্য পদগুলির কি কি পরিবর্তন হইবে লিখ :—

(ক) তিনি অদ্বিতীয় সুরজ্ঞ গায়ক ছিলেন।

(খ) তিনি মধুরভাষী, হিতোপদেষ্টা জননায়ক ছিলেন।

(গ) তিনি আমাদের হিতৈষী আরাধ্য মাতুল।

(ঘ) তিনি রূপবান, বিদ্বান ও যশস্বী।

৬। লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—

(ক) পুত্র, তেজস্বী, অশ্ব, শ্বশুর।

(খ) মাতুল, কর্তা, বিদ্বান, সখা।

(গ) ভিখারী, বাঘ, দৌহিত্র, গায়ক, মাদী, বেগম, কনে।

(ঘ) কানা, মাসী, শূদ্র, নবাব।

(ঙ) পাচক, রজক, বৈশ্য, বিধাতা, রুদ্র।

৭। শূদ্রা ও শূদ্রানী, আচার্যা ও আচার্যানী—অর্থের পার্থক্য কি ?

বচন ও পুরুষ

[বচন]

একটি সংখ্যা বুঝাইলে একবচন ও একাধিক সংখ্যা বুঝাইলে বহুবচন হয়। বাংলায় দ্বিবচন নাই। একবচনের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণতঃ বাংলায় কোন প্রত্যয়ের ব্যবহার নাই। প্রসঙ্গ দেখিয়া নির্ণয় করিতে হয় পদটি একবচন না বহুবচন।

অনেক সময় টি, টা, খানি, খানা, গাছি, গাছা, টুকু ইত্যাদি নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করিয়া একবচনের অর্থ প্রকাশ করিতে হয়। মেয়েটি, ছেলেটা, দড়িগাছি, ঝাঁটাগাছা, বইখানা, লাঠিখানি, দুধটুকু, মালাগাছি, ঘরখানি এইরকম ব্যবহার বাংলায় খুব প্রচলিত।

অনেক সময় আকারে একবচন হইলেও বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা হয়।

বাগান ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

গাছে আম ধরিতেছে না।

শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরিতেছিল।

আকাশের তারা কেহ গণিয়া শেষ করিতে পারে না।

বহুবচন প্রকাশ করিবার উপায় বাংলায় সাধারণতঃ এই কয়টি :—

(১) রা, এরা, গুলি, গুলা, গুলিন, গুলান প্রভৃতি বহুবচনবোধক প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করিয়া। ছেলেরা, বালকেরা, কাকগুলি, টাকাগুলা, লোকগুলো প্রভৃতি।

(২) শব্দের শেষে গণ, সকল, সব, সমূহ, বর্গ, মহল, বৃন্দ, কুল, মালা, গ্রাম, মণ্ডলী, নিচয়। শিশুগণ, লোকসকল, ভাইসব, গ্রামসমূহ, শিক্ষকবর্গ, লেখকমহল, ছাত্রবৃন্দ, বিহঙ্গকুল, তরঙ্গমালা, ইন্দ্রিয়গ্রাম, পণ্ডিতমণ্ডলী, নক্ষত্রনিচয়।

(৩) শব্দের পূর্বে বহুবচনবোধক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া। বহু লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, দুই কুড়ি কমলালেবু, এক শত পদাতিক সৈন্য।

(৪) একই বিশেষণ দুইবার ব্যবহার করিয়া।

বড় বড় গাছ, পাকা পাকা আম, কাল কাল মেঘ।

বিশেষ্য ও সর্বনামের দ্বিত্ব দ্বারাও বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করার রীতি আছে।

ঘরে ঘরে সকলেই জ্বরে পড়িয়াছে।
'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'
'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি কস্তুরী মৃগসম।'

যে যে বেতন দিয়াছে তাহাদের স্কুলে আসিবার দরকার নাই।

[পুরুষ]

পুরুষ তিন প্রকার—উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ। ক্রিয়ার যে বক্তা তাকে উত্তম পুরুষ; আমি, আমরা উত্তম পুরুষ। ক্রিয়ার সম্মুখবর্তী শ্রোতা মধ্যম পুরুষ; তুমি, তোমরা, তুই, তোরা মধ্যম পুরুষ। আমি তুমি ভিন্ন সমস্তই প্রথম পুরুষ। অনুপস্থিত বা দূরবর্তী যাহাদের সম্বন্ধে ক্রিয়া কিছু বলে তাহা প্রথম পুরুষ।

সে, তিনি, ইনি, উনি প্রভৃতি সর্বনাম ও সমুদয় বিশেষ্যপদ প্রথম পুরুষ।

[কারক ও বিভক্তি]

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয় বা সম্বন্ধ থাকে তাহাকে কারক বলে। বাংলায় অনেক বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকে না। কিন্তু সেখানেও ব্যাকরণের খাতিরে একটি ক্রিয়াপদ কল্পনা করিয়া লওয়া হয়।—বলা হয় ক্রিয়াপদ উহ্য আছে। বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সহিত ক্রিয়ার ছয় প্রকার সম্বন্ধ হইতে পারে। এই সম্বন্ধ অনুসারে ছয় প্রকার কারক হইয়াছে এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে।

গভীর বনে সুধীর বৃক্ষ হইতে স্বহস্তে ফল আহরণ করিয়া ভিক্ষুককে দিল।

এই বাক্যে 'দিল' ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যের অন্তর্গত অন্য অন্য পদের নানারূপ সম্বন্ধ আছে।

কে দিল?—সুধীর। এইখানে ক্রিয়ার সহিত কর্তৃ সম্বন্ধ। অতএব সুধীর কর্তৃকারক। 'দিল' এই ক্রিয়ার কর্তা 'সুধীর'।

কি দিল?—ফল। এখানে ক্রিয়ার সহিত কর্ম সম্বন্ধ। সুতরাং 'ফল' কর্মকারক।

কিসের দ্বারা দিল ?—স্বহস্তে। এখানে করণ সম্বন্ধ। সুতরাং 'স্বহস্তে' করণ কারক।

কাহাকে দিল ?—ভিক্ষুককে। এই পদের সহিত ক্রিয়ার সম্প্রদান সম্বন্ধ। অতএব 'ভিক্ষুককে' সম্প্রদান কারক।

কোথা হইতে দিয়াছিল ?—বৃক্ষ হইতে। এখানে অপাদান সম্বন্ধ। অতএব 'বৃক্ষ হইতে' অপাদান কারক।

কোথায় দিল ?—বনে। এইখানে অধিকরণ সম্বন্ধ। সুতরাং 'বনে' অধিকরণ কারক।

কারক ছয় প্রকার—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হয় না বলিয়া অর্থাৎ কোন সম্পর্ক থাকে না বলিয়া সম্বন্ধ পদে ক্রিয়া ভিন্ন অন্যান্য শব্দের সহিত বিশেষ্যের বা সর্বনামের সম্পর্ক থাকে। সম্বন্ধ কারক নহে পদ।

সম্বোধনও কারক নহে পদ। যে বিশেষ্য পদের দ্বারা কাহাকেও সম্বোধন করা যায় তাহাকে সম্বোধন পদ বলা যায়।

যে সমস্ত চিহ্নের সংযোগে কারক নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে, সেগুলির নাম বিভক্তি। বাংলায় বিভক্তি দুই প্রকার—

১। **খাঁটি বিভক্তি**—কতকগুলি পদাংশ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া কারকের চিহ্ন হিসাবে কাজ করে। যেমন, **এ, কে, রে, তে** ইত্যাদি। এগুলির কোন স্বাধীন ব্যবহার বাংলায় নাই। পৃথক শব্দ হিসাবে এগুলির কোন অর্থও হয় না। বাংলায় খাঁটি বিভক্তি এইগুলি **এ, য়ে, য়, তে, এতে, কে, রে, এর** ইত্যাদি।

২। **বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত পরপদ**—কতকগুলি পদ বাংলা ভাষায় বিভক্তির কাজ করিয়া থাকে। **দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, উপরে, তবে** ইত্যাদি পরপদ বাংলা শব্দের পরে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এইগুলির স্বতন্ত্র ব্যবহার ভাষায় আছে, তবে বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসিয়া এগুলি কারক বিভক্তির কাজ করিয়া থাকে। বাংলা ভাষায় ইহাদের সংখ্যাই বেশী। সংস্কৃত ব্যাকরণের মত বাংলায় এত কারক বিভক্তি নাই, সেইজন্য বাংলা শব্দরূপে জটিলতা নাই বলিলেই চলে।

কারক ও বিভক্তির ব্যবহার

কর্তৃকারক

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা **কর্তা**। কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়।

জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।

তাহারা কোথায় যাইবে? বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন।

কর্তৃকারকে একবচনে সাধারণতঃ বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না।

মিনি বড় চঞ্চল মেয়ে। সে রোজ ইস্কুল হইতে পলায়।

'মহাবীর শিখ এক পথ বহি যায়।' দিন যায়, সন্ধ্যা আসে।

অনেক স্থলেই কর্তায় 'এ' বা 'তে' বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয়।

যেখানে কর্তা সুনির্দিষ্ট কাহাকেও বুঝায় না, প্রায় সেখানেই 'এ', 'য়', 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয়। যথা—

লোকে বলে। চোরে চুরি করে।

এ কাজ সকলেই পারে।

গরুতে ঘাস খায়। গাধায় বোঝা বয়।

বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়।

'পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়।'

'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।'

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?'

'মূর্খেতে বুঝিবে কিবা, পণ্ডিতে লাগে ধন্দ।'

রামে মারিলেও নির্বংশ, রাবণে মারিলেও নির্বংশ।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক করছে।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে।

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিতেছে।

কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কখনও কখনও 'কে' বা 'য়' বা 'র' বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয়।

তোমাকে যাইতে হইবে। তোমায় যাইতে হইবে।

আমাকে এখন পড়িতে হইবে।

সুনীলের না গেলেই নয়।

সমধাতুজ কর্তৃপদের ব্যবহার—
তোমার বড় বাড় বেড়েছে।
কাল সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটেছিল।
এবার তেমন ফল ফলিল না।

কর্মকারক

ক্রিয়াপদের উদ্দিষ্ট বিষয়ের নাম কর্ম অর্থাৎ কর্তা যাহা করে, খায়, দেখে, তাহাই কর্ম। কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। **কে, রে, এ** ইত্যাদি দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। বাংলায় কর্মকারকে বিভক্তির চিহ্ন অনেক সময় লোপ হয়, কখন কখন লোপ হয় না।

অচেতন পদার্থ বুঝাইলে সাধারণতঃ কর্মকারকে একবচনে বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয় না। যথা—

বই পড়। দোয়াত আন। কলম দাও।
কলম লও। হাত মুখ ধোও।
হাত ধুইয়া ভাত খাও।
একটা গল্প বলুন না। সে কাজ করিতেছে।

ব্যক্তির নাম বুঝাইলে প্রায়ই কর্মে 'কে' বিভক্তি থাকে। যথা—
মানুষকে অবিশ্বাস করিও না।
কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিতে নাই।
মধুকে দেখছি কিন্তু যদুকে দেখছি না কেন ?
মেয়েটাকে যে মেরেই ফেললে !
বিশেষভাবে নির্দেশ করিলে কর্মে 'কে' বিভক্তি হয়। যথা—
নতুন চাদরটাকে এরই মধ্যে ছিঁড়ে ফেলেছে ?
নিজের মাথাটিকে আগে বাঁচাও, তারপর পরের ভাবনা ভেবো।
'এ', 'রে' বিভক্তিগুলি কবিতাতেই সাধারণতঃ দেখা যায়। যথা—
'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।'
'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে।'
'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে।'

'ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।'

'বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছ ভালবাসি।'

কর্মবাচ্যে কর্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়।

পুস্তকখানি অপহৃত হইয়াছে।

বালকগণ কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে।

করণ কারক

যে উপায়ে বা যাহার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহা করণ কারক। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। **এ, য়, তে, এতে** তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন।

ইহা ছাড়া **দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক** ইত্যাদি শব্দও বিশেষ্য ও সর্বনামের পরে বসিয়া করণ কারকের সৃষ্টি করে। ব্যক্তিবাচক সংস্কৃত শব্দের সহিত 'কর্তৃক' পদ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

'এ', 'য়', 'তে', 'এতে' বিভক্তির যোগে। যথা :—

সে কানে শোনে না।

আগুনে সীতার দেহ দগ্ধ হয় নাই।

টাকায় সব হয়।

মিষ্ট কথায় সকলেই বশীভূত হয়।

ভক্তের সেবায় ভগবান তুষ্ট হন।

ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছি।

এই পথে নিত্য যাতায়াত করি।

'দ্বারা', 'দিয়া', 'কর্তৃক' ইত্যাদি পরপদ সাহায্যে যথা :—

মানুষ দ্বারা এদেশে পশুর কাজ করান হয়।

'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?'

'মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।'

গুপ্তধন তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইল।

সাধারণতঃ ক্রীড়ার্থক ও প্রহারার্থক ধাতুর বেলায় করণ কারকের বিভক্তি থাকে না। যথা :—

যাহার কাজ নাই, সেই-ই সারাদিন তাস (তাস দিয়া) খেলে।
লাঠি (দ্বারা) মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দিল।
এমন নিমকহারামকে ঝাঁটা (দিয়া) মারিতে হয়।

সম্প্রদান কারক

যাহাকে কিছু দান করা যায় বা যাহার উদ্দেশ্যে কিছু বলা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। বাংলায় সম্প্রদান কারকের পৃথক কোন বিভক্তি-চিহ্ন নাই। কর্মকারকের **কে, রে, এ, য়** ইত্যাদি বিভক্তি-চিহ্নই সম্প্রদানে ব্যবহার করা হয়।

স্বত্বত্যাগপূর্বক দান হইলেই সম্প্রদান কারক হয়। যথা :—
সৎপাত্রে দান কর।
'গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'
আমায় একটু জল দেবেন কি?
'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।'
তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইবে।
'জন্য', 'তবে' ইত্যাদি সংযোগেও সম্প্রদান হয়। যথা :—
'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।'
'কার তরে তুই শয্যা দাসী রচিস আনন্দে।'

অপাদান কারক

যে স্থান হইতে কোন ঘটনার আরম্ভ বা যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তির উৎপত্তি, চলন, ভয়, উত্থান, পতন ইত্যাদি সংঘটিত হয়, তাহা অপাদান কারক। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। বাংলায় অপাদান কারক বুঝাইবার জন্য কোন খাঁটি বিভক্তি-চিহ্ন নাই। 'হইতে', 'চেয়ে', 'কাছে', 'অপেক্ষা', 'থেকে', 'পর্যন্ত', 'অবধি' ইত্যাদি পরপদ সহযোগে অপাদান কারকের অর্থ বুঝান হইয়া থাকে। যথা :—

তাহারা ঘর হইতে বাহির হইল।
রাম অপেক্ষা শ্যাম বলবান।
ধন থেকে মান বড়।

কখনও কখনও 'এ' বিভক্তি-চিহ্নের সাহায্যে অপাদান কারকের অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যথা :—

মেঘে জল হয়।

'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।'

চেষ্টায় বিরত হইও না।

বাঘের ভয়, ভূতের ভয়, সাপের ভয়—এগুলিরও অপাদান সম্বন্ধ।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়ার আধার অর্থাৎ যে স্থানে বা যে কালে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম অধিকরণ। অধিকরণ সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার :—

(ক) **স্থানাধিকরণ**—

বনে বাঘ থাকে।

বাংলা দেশে বাঙালী ভাত পায় না।

(খ) **কালাধিকরণ**—

শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে অর্থোপার্জন ও বার্ধক্যে ধর্মচর্চা করিবে।

'প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ।'

(গ) **বিষয়াধিকরণ**—

ধর্মে মতি হউক।

(ঘ) **ভাবাধিকরণ**—

বড় দুঃখে পড়িয়া আমি আপনার শরণ লইয়াছি।

(ঙ) **ব্যাপ্তি অধিকরণ**—

তিলে তৈল থাকে, দুধে ঘি থাকে।

অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। একবচনে এই বিভক্তির চিহ্ন **এ, য়, তে, এতে** ইত্যাদি। যথা :—

'কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।'

রথের মেলায় অনেক লোক জড় হয়।

নদীতে এখন জোয়ার আসিবে।

ইহা ছাড়া 'মধ্যে' 'উপরে' প্রভৃতি পরপদের সাহায্যেও অধিকরণ কারকের অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যথা :—

বাক্সটি মাথার উপরে তোল।

অনেক স্থলে অধিকরণে কোন বিভক্তি থাকে না।

আজ নগদ কাল ধার।

আগামী শনিবার আমি কলিকাতা যাইব।

প্রত্যেক অর্থ বুঝাইলে অধিকরণ কারকে দ্বিত্ব হয়।

'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।'

এইরূপ ডালে ডালে, বনে বনে, দ্বারে দ্বারে ইত্যাদি।

সম্বন্ধ পদ

পূর্বে বলা হইয়াছে ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে, তাহা কারক। ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলে কারক-পদ হয় না। কারক নয় অথচ বিভক্তিযুক্ত এরূপ পদগুলির মধ্যে সম্বন্ধ পদই প্রধান। **র, এর** প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হইয়া অন্য পদের সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করে।

এই সম্বন্ধ অনেক প্রকারের হইতে পারে। কয়েকটি বিশেষ প্রকার নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) কর্তৃসম্বন্ধ—শিশুর শয়ন, ঘোড়ার দৌড়।

(২) কর্ম সম্বন্ধ—রোগীর সেবা, দেবতার পূজা।

(৩) করণ সম্বন্ধ—লাঠির আঘাত, মায়ার খেলা।

(৪) অপাদান সম্বন্ধ—ভূতের ভয়, গুরুর উপদেশ।

(৫) অধিকরণ সম্বন্ধ—আকাশের চাঁদ, বনের বাঘ।

(৬) জন্য-জনক সম্বন্ধ—রাজার ছেলে, গরীবের ঘর।

(৭) রূপক সম্বন্ধ—শোকের আগুন, অজ্ঞানের অন্ধকার।

(৮) বিশেষণ সম্বন্ধ—সুখের সংসার, দিনের উপার্জন।

[কারক বিভক্তি ও অন্য প্রকার বিভক্তি]

বাংলায় যে-কোন কারকে যে-কোন বিভক্তি ব্যবহার করা হয়। যখন বলা হয় কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়, তখন তাহাতে এইটুকুই বুঝা যায়

যে, ইহা মাত্র সাধারণ নিয়ম। ইহার ব্যতিক্রমের সংখ্যা বিস্তর। আসলে বাংলার কোনও বিভক্তিই কোনও কারকের নিজস্ব নহে। এইজন্য প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা ব্যাকরণে অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

(যেখানে বিভক্তির কোনও চিহ্ন নাই অথচ ব্যাকরণ অনুসারে বিভক্তি কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তাহাকে শূন্য বিভক্তি বলে। আজকাল অনেক ব্যাকরণকার প্রথমা, দ্বিতীয়া বিভক্তি না বলিয়া 'এ' বিভক্তি, 'কে' বিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তির চিহ্ন অনুসারে নামকরণ করিয়া থাকেন।)

প্রথমা বিভক্তি—

যেখানে কেবল নাম নির্দেশ করিবার জন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেখানে সেই শব্দের প্রথমা বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়।

মা, বাবা, আকাশ, পৃথিবী, বালক, বালিকা ইত্যাদি।

কতৃর্বাচ্যে কর্তায় সাধারণতঃ প্রথমা বিভক্তি হয়।

সূর্য উঠিয়াছে জল পড়িতেছে।

অসমাপিকা ক্রিয়ায় কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়।

রমেশ আসিলে গণেশ যাইবে।

'বিনা', 'ব্যতীত', 'বলিয়া', 'নামে' প্রভৃতি অব্যয় যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়।

বিভাসিন্ধু বলিয়া একটি ছেলের সহিত আমি পড়িতাম।

'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?'

ডাক্তার ছাড়া এখন কে আর সাহায্য করিতে পারে?

ঔষধ ব্যতীত এ অসুখ ভাল হইবে না।

বাংলায় সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়।

বালকগণ, তোমরা স্থির হইয়া শোন।

মেয়েরা, গোলমাল করিও না।

দ্বিতীয়া বিভক্তি—

কতৃর্বাচ্যে কর্মকারকে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ব্যক্তিবাচক কর্ম হইলে 'কে' বিভক্তি বসে। অন্য অবস্থায় বিভক্তির চিহ্ন থাকে না।

তুমি সুনীলকে ডাকিয়াছিলে কেন?

শান্ত ছেলেকে সকলেই ভালবাসে।

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার গৌণকর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে) হয়। মুখ্যকর্মে বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না।

মামাবাবু রমেশকে একখানি ছবির বই দিয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও।

ব্যাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক ও স্থানবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। বিভক্তির অবশ্য কোন চিহ্ন থাকে না।

পাঁচ দিন কেবল বৃষ্টি হইতেছে।

সম্রাট আকবর পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই পথটি সোজা পাঁচ ক্রোশ গিয়াছে।

ক্রিয়া-বিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় কিন্তু বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না।

সত্বর স্নান করিয়া এস।

শীঘ্র চল। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে।

'বিনা', 'ছাড়া', 'ভিন্ন', 'ধিক্', 'ধন্যবাদ' শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

কৃপণকে ধিক্, স্বজাতিদ্রোহীকে শতবার ধিক্।

মাকে ছাড়া ছেলে একদণ্ড থাকিতে পারে না।

তোমাকে ভিন্ন এ কথা কাহাকেও বলি নাই।

ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, এবার বাঁচিয়া গিয়াছি।

তৃতীয়া বিভক্তি—

করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

আমরা কান দিয়া শুনি, চোখ দিয়া দেখি।

নূতন কলম দিয়া তাড়াতাড়ি লেখা যায় না।

কর্মবাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

দস্যু কর্তৃক পথিক নিহত হইয়াছে।

শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র তিরস্কৃত হইয়াছিল।

হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

সে রাগে কাঁপিতে লাগিল।

আতঙ্কে তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে।

তাহারা আনন্দে নাচিতেছিল।

হীনার্থ ও প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

মধু অপেক্ষা যদু বুদ্ধিতে হীন।

কলহে প্রয়োজন নাই।

আমাদের অসার জীবনে কি প্রয়োজন?

ক্রিয়া-বিশেষণে অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

মন দিয়া পড়াশুনা কর।

জোরে চলিতে আরম্ভ কর।

সে প্রাণ দিয়া দেশের কাজে লাগিয়া গেল।

চতুর্থী বিভক্তি—

সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়।

বাংলায় দ্বিতীয়া বিভক্তি ও চতুর্থী বিভক্তির একই চিহ্ন।

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও।

তোমাকে আমি সর্বস্ব সমর্পণ করিব।

পঞ্চমী বিভক্তি—

অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

গাছ হইতে ফুল পড়িতেছে।

তিল হইতে তৈল হয়।

মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়।

দুই বা বহুর মধ্যে একটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইবার জন্য পঞ্চমী বিভক্তির ব্যবহার হয়।

ধন হইতে মান বড়।

জন্মভূমি স্বর্গ হইতে বড়।

রূপ হইতে গুণ বড়।

'নিকট' ও 'দূর' শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

আমার বাড়ী কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নয়।

তোমাদের বাসা কি রসা রোড হইতে নিকটে?

হেতু বা কারণ অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

অজীর্ণ হইতে অনেক রোগের সূত্রপাত হয়।

এই ছেলে হইতে তোমার কষ্ট দূর হইবে।

'পৃথক' ও 'ভিন্ন' শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

আমা হইতে তোমাকে ভিন্ন ভাবিতেছ কেন ?

পাকিস্তান ভারত হইতে পৃথক।

ষষ্ঠী বিভক্তি—

সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

আমার বাড়ী। তোমার বই। দেশের স্বার্থ।

'তুল্য' ও 'সদৃশ' শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

কর্ণের তুল্য দাতা নাই। দয়ার মতন (সমান, তুল্য) ধর্ম নাই।

গঙ্গার তুল্য নদী নাই। হিমালয়ের সদৃশ পর্বত নাই।

নির্ধারণে অর্থাৎ অনেকের মধ্যে একটি বুঝাইলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

লেখাপড়া শিখ, দশজনের একজন হও।

তোমাদের মধ্যে কে বেশী বুদ্ধিমান ?

'মধ্যে', 'সমীপে', 'উপরে', 'নীচে', 'সম্মুখে', 'পিছনে' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

এই কবিতার মধ্যে বিশেষ বুঝাইবার কিছুই নাই।

বিদ্যালয়ের সমীপেই একটি মন্দির।

'মাথার উপরে বাড়ী পড়-পড়।'

'মায়ের কাছে মামাবাড়ীর গল্প!'

বাঁধের নীচেই গ্রামের শ্মশান।

তাহার মুখের সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য ?

সুখের পিছনে ছুটিলেই কি সুখ পাওয়া যায় ?

সপ্তমী বিভক্তি—

অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

আমরা গ্রামে বাস করি।

জলে মাছ থাকে।

দিনে বড়ই গরম।

'বিনা' ও 'ধিক্' শব্দ যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

বিনা টাকায় কি আর হইতে পারে ?

তোমার অহঙ্কারে ধিক্!

হেতু ও নিমিত্ত বুঝাইলে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

তিনি রাগে কাঁপিতে লাগিলেন।

লজ্জায় যে মাথা হেঁট হইয়া গেল!

'প্রয়োজন' অর্থ বুঝাইলে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

আমার মত হতভাগার জীবনের প্রয়োজন কি?

আর বিবাদে কাজ নাই, এখন ক্ষান্ত দাও।

'পরস্পর' অর্থ বুঝাইলে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া চলিতেছে।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়।

চোরে চোরে মাসতুত ভাই।

'সাধু', 'নিপুণ', 'পণ্ডিত', 'প্রবীণ', 'কুশল' প্রভৃতি শব্দ যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

তিনি তর্কে খুব নিপুণ।

অঙ্কে তাঁর মত পণ্ডিত খুব কম দেখা যায়।

ভূতনাথ বাবু বয়সে প্রবীণ, ব্যবহারে সাধু, সকলেই তাঁহাকে মান্য করে।

অনুসর্গের ব্যবহার

দিয়ে—মুখ দিয়ে খৈ ফুটতে লাগল।

চেয়ে—প্রাণের চেয়ে মান বড়।

সুখের চেয়ে শান্তি ভাল।

ছাড়া—বাড়ী ছাড়া থাকবে কোথায়?

মা ছাড়া শিশু কি বাঁচবে?

থেকে—গাছ থেকে যে বেলটি পড়ল, সেটি তুলে আন।

অবধি—সেই দিন অবধি আমরা দিন গণিতেছিলাম।

অনুশীলনী

১। উদাহরণ দাও :—

কর্তায় কে বিভক্তি; করণে হইতে বিভক্তি বা পরপদ; অপাদানে এ বিভক্তি; অধিকরণে বিভক্তির লোপ।

২। বাংলায় ব্যবহৃত বিভক্তি-চিহ্নগুলির নাম লিখ। কোন্ বিভক্তিতে কোন্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় লিখ।

৩। বড় অক্ষরের পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) সারা **দিন** বৃষ্টি পড়িতেছে।

(খ) **দিন** গেল, সন্ধ্যা এল।

(গ) **মায়ে ঝিয়ে** ঝগড়া করিতেছে।

(ঘ) **তোমার** এখন না গেলেই নয় ?

(ঙ) তাহার **মুখ দিয়া** খৈ ফুটিতে লাগিল।

(চ) **মেঘে** বৃষ্টি হয়।

(ছ) 'তিল হইতে তৈল হয় **দুধে** হয় দৈ।
ধানেতে তৈয়ার হয় মুড়ি চিড়া খৈ।'

৪। বাংলায় 'এ' বিভক্তিটি সকল কারকেই ব্যবহৃত হয়, তাহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর :—

কর্তৃকারকে এ বিভক্তি—**বাঘে বলদে** এক ঘাটে জল খায়।
কর্মকারকে এ বিভক্তি—**অন্ধজনে** দয়া কর।
করণ কারকে এ বিভক্তি—**অতি লোভে** তাঁতী নষ্ট।
সম্প্রদানে এ বিভক্তি—'**ঈশ্বরে** অর্পিত মোর সর্বদেহমন।'
অপাদানে এ বিভক্তি—**মেঘে** জল হয়।
অধিকরণে এ বিভক্তি—এই **গ্রামে** নদী নাই।

৫। বিভক্তি-চিহ্ন বসে নাই এমন কোন কারকের উদাহরণ দিতে পার ?

উত্তর :—প্রায় সমস্ত কারকেই বিভক্তি-চিহ্ন না বসিতে পারে।

কর্তা—চাঁদ উঠিয়াছে।
কর্ম—আমি ভাত খাইব।
করণ—তাহারা এখন তাস খেলিবে।
অপাদান—স্কুল পালিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?
অধিকরণ—এ বৎসর ভাল ধান হয় নাই।

৬। অধিকরণ কারক কয় প্রকার ? উদাহরণ দাও।

৭। ধিক্, বিনা, সঙ্গে, তুল্য, উপরে, নীচে—এই কয়টি শব্দের যোগে যে যে বিভক্তি হয় তাহা বাক্য রচনা করিয়া দেখাও।

৮। বড় অক্ষরে লিখিত পদগুলিতে কোন্ বিভক্তি এবং কেন বসিয়াছে বল :—

(১) **লোভে** পাপ, **পাপে** মৃত্যু। (২) এত বড় **বিপদে** আমাকে রক্ষা করিবে না? (৩) তুমি আমার **প্রাণের** বন্ধু। (৪) মেঘদূত **কাহার** রচিত? (৫) **আমা** হতে এ কার্য হবে না। (৬) নদীতে বড় **কুমীরের** ভয়।

[বিশেষণের শ্রেণীবিভাগ]

অন্য পদের কোন গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা, প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য যে পদ ব্যবহার করা হয় তাহার নাম বিশেষণ।

শীতল বাতাস বহিতেছে।

নিন্দিত আচরণ কখনও করিও না।

তিনটি আম কুড়াইয়া পাইয়াছি।

লঘু আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

এই বাক্যগুলিতে 'শীতল' পদটি বাতাসের বিশেষ অবস্থা বুঝাইতেছে, কিরূপ বাতাস? উত্তর—শীতল বাতাস।

"নিন্দিত আচরণ"—আচরণের দোষ বুঝাইতেছে। "তিনটি আম"—আমের সংখ্যা বুঝাইতেছে। "লঘু আহার"—আহারের অবস্থা বা পরিমাণ বুঝাইতেছে। সুতরাং শীতল, নিন্দিত, তিনটি, লঘু এইগুলি বিশেষণ পদ।

উপরের এই চারিটি বাক্যে বিশেষণ পদগুলি বিশেষ্যের গুণাগুণ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া এইগুলি বিশেষ্যের বিশেষণ।

যে পদটি বিশেষ্যের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে **বিশেষ্যের বিশেষণ** বলে।

এই অঙ্কটি অত্যন্ত কঠিন।

তাহার রোগ বড়ই জটিল।

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট।

এই পদগুলিতে অত্যন্ত, বড়ই, নেহাৎ, পদগুলি কঠিন, জটিল, গরীব প্রভৃতি বিশেষণকে বিশেষভাবে নির্দেশ করিতেছে। অত্যন্ত কঠিন অর্থ একটু আধটু

কঠিন নয়, রীতিমত কঠিন। অর্থাৎ ইহার কাঠিন্য সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা সংশয় নাই। বড়ই জটিল অর্থ সামান্য জটিল নয়, একেবারে ঘোরালো। এইগুলিকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।

যে পদ বিশেষণকে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করে তাহাকে **বিশেষণের বিশেষণ** বলে।

ধীরে চল।

তাড়াতাড়ি কথা বলিও না।

নিঃশব্দে কাজ করিবে।

এই বাক্যগুলিতে ধীরে, তাড়াতাড়ি, নিঃশব্দে পদগুলি চলা, বলা ও করা—এই তিনটি ক্রিয়াকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছে। এইগুলি ক্রিয়া বিশেষণ।

যে পদ ক্রিয়াকে বিশেষণরূপে নির্দিষ্ট করে, তাহাকে **ক্রিয়া বিশেষণ** বলে।

বাংলা সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই বহু বিচিত্র ক্রিয়া বিশেষণের প্রয়োগ দেখা যায়। নিম্নে কতকগুলি প্রচলিত প্রয়োগ দেওয়া হইল :—

অগত্যা তোমার কথায় রাজি হইলাম।

আবার দেখা হবে, চিন্তা নাই।

আর ফিরিব না, একেবারে চলিলাম।

কেবল কাজ করিতেছ কেন?

খামকা লোকটাকে অপমান করা কি ভাল হয়েছে?

কয়দিন যাবৎ নিরন্তর বৃষ্টি হইতেছে।

দক্ষিণ সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল।

বারবার ঠকাইতে চেষ্টা করিও না।

অকস্মাৎ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল।

আচমকা ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল।

তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিল।

পিতামাতার আদেশ সর্বথা পালন করিবে।

পুনর্বার (পুনরায়) একাজ করিও না।

আজকাল তোমার ভাব যেন ভাল দেখছি না।

দুঃখকষ্ট ক্রমশঃ সয়ে যাবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বিশেষণ তিন প্রকার :—(১) বিশেষ্যের বিশেষণ, (২) বিশেষণের বিশেষণ, (৩) ক্রিয়া বিশেষণ।

ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার বিশেষণ আছে, তাহাকে **বিধেয় বিশেষণ** বলে। বিধেয় বিশেষণ পরে বসে—

আমি মূর্খ, তাই তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম।

তিনি পরম দয়ালু।

[সংখ্যা ও পূরণবাচক বিশেষণ]

বাংলায় পূরণবাচক শব্দগুলি সবই সংস্কৃত শব্দ, কিন্তু মাসের তারিখ বুঝাইবার জন্য বাংলায় কতকগুলি নিজস্ব শব্দ ব্যবহৃত হয়।

সংখ্যাবাচক	পূরণবাচক	মাসের তারিখ
এক	প্রথম	পয়লা
দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
তিন	তৃতীয়	তেসরা
চার	চতুর্থ	চৌঠা
পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
ছয়	ষষ্ঠ	ছউই
সাত	সপ্তম	সাতই
আট	অষ্টম	আটই
নয়	নবম	নউই
দশ	দশম	দশই
এগার	একাদশ	এগারই
বার	দ্বাদশ	বারই
তের	ত্রয়োদশ	তেরই
চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
পনর	পঞ্চদশ	পোনেরই
ষোল	ষোড়শ	ষোলই
সতর	সপ্তদশ	সতরই

সংখ্যাবাচক	পুরণবাচক	মাসের তারিখ
আঠার	অষ্টাদশ	আঠারই
উনিশ	উনবিংশ, উনবিংশতিতম	উনিশে
বিশ	বিংশ, বিংশতিতম	বিশে
একুশ	একবিংশ	একুশে
বাইশ	দ্বাবিংশ	বাইশে
তেইশ	ত্রয়োবিংশ	তেইশে
ত্রিশ	ত্রিংশ	ত্রিশে, তিরিশে
চল্লিশ	চত্বারিংশ	—
	পঞ্চাশত্তম	

[বিশেষণের তারতম্য]

উৎকর্ষ, অপকর্ষ, অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে তুলনা বুঝাইবার জন্য 'তর' এবং বহুর মধ্যে তুলনা বুঝাইবার জন্য 'তম' যুক্ত পদের ব্যবহার সংস্কৃতে আছে। 'তরতমের ভাব'কেই বলে তারতম্য।

তর, তম সংস্কৃত শব্দেই যুক্ত হয়। বাংলা অসংস্কৃত শব্দে 'তর', 'তম' যোগ হয় না। খাঁটি বাংলায় তুলনা বুঝাইবার জন্য থেকে, চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়।

যদু অপেক্ষা মধু বুদ্ধিমান।
মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী।

সংস্কৃতে 'তর', 'তম' এবং 'ঈয়স' ও 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যোগ করিবার রীতি আছে। বাংলা ভাষায় এই সমস্ত প্রত্যয়ান্ত পদ ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া কতকগুলি শব্দ বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে জানিয়া রাখা উচিত।

বিশেষণ	তরযোগ	তমযোগ
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম
দ্রুত	দ্রুততর	দ্রুততম
গুরু	গুরুতর	গুরুতম
ক্ষিপ্র	ক্ষিপ্রতর	ক্ষিপ্রতম

বিশেষণ	তরযোগ	তমযোগ
তিক্ত	তিক্ততর	তিক্ততম
প্রিয়	প্রিয়তর	প্রিয়তম
বলবান	বলবত্তর	বলবত্তম
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তর	বুদ্ধিমত্তম
	ঈয়স্‌যোগে	**ইষ্ঠযোগে**
মহৎ	মহীয়ান্ (স্ত্রী-মহীয়সী)	মহিষ্ঠ
প্রিয়	প্রেয়ান্ (স্ত্রী-প্রেয়সী)	প্রেষ্ঠ
লঘু	লঘীয়ান্ (স্ত্রী-লঘীয়সী)	লঘিষ্ঠ
বহু	ভূয়ান্ (স্ত্রী-ভূয়সী)	ভূয়িষ্ঠ
গুরু	গরীয়ান্ (স্ত্রী-গরীয়সী)	গরিষ্ঠ
উরু	বরীয়ান্ (স্ত্রী-বরীয়সী)	বরিষ্ঠ
বলী	বলীযান্ (স্ত্রী-বলীয়সী)	বলিষ্ঠ
যুবা	কণীয়ান্ (স্ত্রী-কণীয়সী)	কনিষ্ঠ
বৃদ্ধ	বর্ষীয়ান্ (স্ত্রী-বর্ষীয়সী)	বর্ষিষ্ঠ
	জ্যায়ান্ (স্ত্রী-জ্যায়সী)	জ্যেষ্ঠ

সর্বনামের প্রকার-ভেদ

যে সকল শব্দ বিশেষ্য বা নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে **সর্বনাম** বলে।

মহিম খুব ভাল ছেলে, মহিমের পিতামাতা মহিমকে যাহা করিতে বলেন মহিম তাহাই করে। মহিম খুব মন দিয়া পড়াশুনা করে। এইজন্য মহিমকে সকলেই ভালবাসে।

এই বাক্যে 'মহিম' শব্দটি এতবার ব্যবহার করা হইয়াছে যে, ইহা শুনিতে ভাল লাগে না।

মহিম খুব ভাল ছেলে, **তাহার** পিতামাতা **তাহাকে** যাহা করিতে বলেন **সে** তাহা করে। **সে** খুব মন দিয়া পড়াশুনা করে, এইজন্য **তাহাকে** সকলেই ভালবাসে।

বাক্যটি এই ভাবে লিখিলে শুনিতে ভাল লাগে। এই দ্বিতীয় বাক্যটিতে তাহার, তাহাকে, সে, সে, তাহাকে এই শব্দগুলি যথাক্রমে 'মহিমের', 'মহিমকে', 'মহিম', 'মহিম', 'মহিমকে', এই বিশেষ্যপদ কয়টির পরিবর্তে বসিয়াছে। সর্বনাম পদের ব্যবহার করিয়া একই বিশেষ্যপদের ব্যবহার প্রয়োগ নিবারণ করা হয়।

সর্বনামের শ্রেণীবিভাগ :

১। **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম**—আমি, তুমি, সে, ইনি, তিনি প্রভৃতি ব্যক্তি বা পুরুষকে বুঝায় বলিয়া এইগুলিকে ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম বলে।

তিনি, তাঁহারা, ইঁহারা, এঁদের প্রভৃতি গৌরব বা সম্ভ্রম স্ফচনা করে। তুই, মুই, তোর প্রভৃতি দীনতা, তাচ্ছিল্য বা স্নেহ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। **নির্দেশক সর্বনাম :**—ইহা, উহা, কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে বুঝায় : সে, ইনি, উনি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। এইগুলিকে নির্দেশক সর্বনাম বলা হয়।

ইহা, ইনি দ্বারা নিকটস্থিত ব্যক্তি ও বস্তু বুঝায়—এইজন্য ইহাদিগকে নৈকট্যবাচক নির্দেশক সর্বনাম বলা হয় এবং উহা, উনি দ্বারা নিকটে অবস্থিত নয়, দূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি বুঝায় বলিয়া ইহাদিগকে দূরত্ববোধক নির্দেশক সর্বনাম বলা হয়।

৩। **অনির্দেশক সর্বনাম**—কে, কাহারা, কিছু, পরে, অন্যে প্রভৃতি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় না বলিয়া এইগুলিকে অনির্দেশক সর্বনাম বলে।

৪। **প্রশ্নসূচক সর্বনাম**—কে, কি প্রভৃতি সর্বনাম কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রশ্নস্থচক সর্বনাম বলে।

৫। **নিত্যসম্বন্ধী সর্বনাম**—'যে—সে', 'যিনি—তিনি', 'যাহাদের—তাহাদের' প্রভৃতি জোড়া শব্দ একই বাক্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের একটিকে ব্যবহার করিলে আর একটি আপনা হইতেই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া এইগুলিকে নিত্যসম্বন্ধী সর্বনাম বলে।

৬। **পরিমাণবাচক সর্বনাম**—এত, তত, যত, কত, এইগুলি বস্তুর পরিমাণ বুঝায় বলিয়া এইগুলিকে পরিমাণবাচক সর্বনাম বলে।

৭। **আত্মবাচক সর্বনাম**—নিজে, আপনি, স্বয়ং প্রভৃতি আত্মবাচক সর্বনাম।

সর্বনাম শব্দগুলির ব্যবহারিক রূপ মনে রাখা প্রয়োজন।

আমি

আমি	আমরা
আমাকে	আমাদিগকে
আমার	আমাদের, আমাদিগের

তুমি

তুমি	তোমরা
তোমাকে	তোমাদিগকে
তোমার	তোমাদের, তোমাদিগের

তুই

তুই	তোরা
তোকে	তোদিকে
তোর	তোদের

আপনি

আপনি	আপনারা
আপনাকে	আপনাদিগকে
আপনার	আপনাদের, আপনাদিগের

সে, তিনি

সে, তিনি	তাহারা, তাঁহারা
তাহাকে, তাঁহাকে	তাহাদিগকে, তাঁহাদিগকে
তাহার, তাঁহার	তাহাদের, তাহাদিগের তাঁহাদের, তাঁহাদিগের

এ, ইনি

এ, ইনি	ইহারা, এরা, ইঁহারা, এঁরা
ইহাকে, ইঁহাকে / একে, এঁকে	ইহাদিগকে, ইঁহাদিগকে / এ দিকে
এর, ইহার / এঁর, ইহার	এদের, ইহাদিগের / এঁদের, ইঁহাদের

যে, কে, যিনি প্রভৃতির এই প্রকার রূপ হইবে।

ক্রিয়া

যে পদ দ্বারা কোন কার্য করা বুঝায়, তাহাকে **ক্রিয়াপদ** বলে।

সে পড়িতেছে। আমি যাইব। তাহারা স্কুলে গিয়াছে। তুমি এখন ভাত খাও।—এই বাক্যগুলিতে পড়িতেছে, যাইব, গিয়াছে, খাও ক্রিয়াপদ।

ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করিলে যে মৌলিক অংশ পাওয়া যায়, যাহার আর ভাগ চলে না, তাহাকে **ধাতু** বলে। এই ধাতুর সহিত প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

[মৌলিক ধাতু]

বাংলায় সিদ্ধ ও সাধিত এই দুই ভাগে ধাতুসমূহকে ভাগ করা হইয়াছে। যে সমস্ত ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ, যেগুলিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, সেইগুলি **মৌলিক ধাতু** বা **সিদ্ধ ধাতু**।

চল্, নে, খা, কর্, যা এইগুলি **সিদ্ধ** বা **মৌলিক ধাতু**।

যে সমস্ত ধাতু বিশ্লেষণ করিলে অন্য একটি ধাতু এবং প্রত্যয় পাওয়া যায় সেগুলির নাম **সাধিত ধাতু**। সাধিত ধাতুর মধ্যে প্রযোজক ও নামধাতু প্রধান।

[প্রযোজক ধাতু]

ছেলেকে কাঁদাইতেছ কেন ?

তোমাকে সত্য কথা বলাইব।

কাঁদাইতেছ ও বলাইব **প্রযোজক ধাতু** এবং সাধিত ধাতু।

ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছ কেন ?

অনর্থক চোখ রাঙ্গাইয়া লাভ কি ?

ফোঁপাইয়া, রাঙ্গাইয়া **নামধাতু** এবং সাধিত ধাতু।

ধ্বন্যাত্মক ধাতু

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে প্রত্যয় যোগ করিয়া নামধাতু গঠন করা হয়।

জলটা টগবগিয়ে উঠেছে।

বুকটা ধড়ধড়িয়ে উঠলো কেন ?

টগবগিয়ে, ধড়ধড়িয়ে **ধ্বন্যাত্মক** ধাতুর উদাহরণ।

সিদ্ধ ও সাধিত দুই প্রকার ধাতু ছাড়া বাংলায় কর্ বা হ্ এই দুইটি ধাতুর সংযোগে অনেক ধাতু গঠিত হয়। ইহাকে **সংযোগ-মূলক ধাতু** বলে।

রাজী হয়, অগ্রসর হয়, গমন করা, শয়ন করা, সুখী করা, দুঃখী করা, মিন্ মিন্ করা প্রভৃতি সংযোগ-মূলক ধাতু।

[সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া]

ক্রিয়া দুই প্রকার, সমাপিকা ও অসমাপিকা।

যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হইয়াছে বুঝা যায়, অর্থাৎ যাহার পর আর কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

সূর্য উঠিয়াছে। ভোর হইয়াছে। কাক ডাকিতেছে।

এই বাক্যগুলির ক্রিয়াপদ সমাপিকা।

যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয় না, আরও কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

সে না খাইয়া স্কুলে গিয়াছে।

'সে না খাইয়া' পর্যন্ত বলিয়া যদি আর কিছু বলা না হয়, তাহা হইলে বাক্য সমাপ্ত হইবে না এবং আরও কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। 'খাইয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া।

'ইতে', 'ইয়া', 'ইলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার চিহ্ন।

খাইতে বসিয়া আর লজ্জা করিয়া লাভ কি ?
দৈ আনিতে বলিলাম, আনিলে না ?
আমি স্নান করিয়া ভাত খাইব।
দেখিয়া দেখিয়া এত বড় হইলাম।
ভোর হইলে সে রওনা হইবে।
সে আসিলে তুমি যাইবে।

[সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক ক্রিয়া]

গাছ হইতে ফুল পড়িতেছে। গরুগুলি ছুটিতেছে। তুমি চটিতেছ কেন ? সূর্য উঠিয়াছে। এই বাক্যগুলিতে পড়া, ছুটা, চটা, উঠা এই ধাতুগুলির কার্য কর্তাতেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইখানে কোনও কর্মপদের আকাঙ্ক্ষা নাই।

যে সকল ক্রিয়ার কোনও কর্ম নাই, তাহারা **অকর্মক ক্রিয়া**। অকর্মক ক্রিয়ায় বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিবার জন্য কর্মপদের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

কাঁদা, হাসা, উঠা, বসা, নাচা, ডুবা, ভাসা, মিলা, মিশা, থামা, ঢুলা, উড়া, কাঁপা, খেলা, ঘামা, জাগা, বাঁচা, মরা, শোওয়া, দৌড়ান, জিরান, ঘুমান, চেঁচান প্রভৃতি অকর্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়াপদের কর্ম থাকে, তাহা **সকর্মক ক্রিয়া**। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে যেখানে ক্রিয়ায় একটি কর্মপদে আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে ক্রিয়া সকর্মক হয়।

তুমি আমাকে ডাকিতেছ কেন ?
সে কিছু না খাইয়া চলিয়া গেল।
বাড়ীতে কাহাকেও দেখিলাম না।

এই বাক্যগুলিতে 'ডাকিতেছ', 'খাইয়া', 'দেখিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে 'কাহাকে ডাকিতেছ', 'কি না খাইয়া', 'কাহাকে দেখিলাম বা কি দেখিলাম' প্রভৃতি প্রশ্ন উঠে ; এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। সেইজন্য 'ডাকিতেছ', 'খাইয়া', 'দেখিলাম' প্রভৃতি ক্রিয়া সকর্মক এবং 'আমাকে', 'কিছু' এবং 'কাহাকেও' যথাক্রমে ইহাদের কর্ম।

যে সকল ক্রিয়াপদের দুইটি করিয়া কর্ম থাকে, তাহাদিগকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** বলে।

তুমি আমাকে এ কথা কখনও বল নাই।

শিক্ষক মহাশয় রমেশকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

প্রথম বাক্যটিতে 'বল নাই' ক্রিয়ার দুটি কর্ম—'আমাকে' ও 'কথা'; দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'জিজ্ঞাসা করিতেছেন' ক্রিয়ার দুটি কর্ম—'রমেশকে' ও 'প্রশ্ন'।

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার যে কর্মটি প্রধান তাহা মুখ্য কর্ম এবং যে কর্মটি অপ্রধান তাহা গৌণ কর্ম। বস্তুবাচক কর্মই মুখ্য কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্ম গৌণ কর্ম হইয়া থাকে।

[ধাত্বর্থক বা সমধাতুজ কর্ম]

অনেক সময় দেখা যায় অকর্মক ক্রিয়ারও একরকম কর্ম থাকে—এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত স্থলে অকর্মক ক্রিয়ার সমধাতুজ বিশেষ্য পদগুলি কর্মরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

অনর্থক কাষ্ঠ হাসি হাসিও না।

কত খেলাই খেলিতেছ!

খুব লম্বা এক ঘুম ঘুমাইলে।

'হাসি', 'খেলা', 'ঘুম' সমধাতুজ।

বাংলায় কোন কোন ক্রিয়াকে অকর্মক ও সকর্মক উভয় রূপেই ব্যবহার করা যায়।

অকর্মক—মেঘ ডাকিতেছে।

সকর্মক—মিছামিছি আমাকে ডাকিতেছ কেন?

অকর্মক—বইখানি বেশ কাটিতেছে।

সকর্মক—পোকায় বইখানি কাটিতেছে।

অকর্মক—নদী বহিয়া যাইতেছে।

সকর্মক—মোট বহিয়া সে সংসার চালায়।

অকর্মক—বাতের ব্যথায় পা কামড়ায়।

সকর্মক—কুকুরে তাহার পা কামড়াইয়াছে।

[যৌগিক ক্রিয়া]

'ইয়া' বা 'ইতে' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সহকারীরূপে অন্য একটি ক্রিয়া মিশিয়া যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যৌগিক ক্রিয়া দুইটি ক্রিয়ার মিলিত রূপ। যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ একটি অর্থ প্রকাশ করে এবং প্রথম অসমাপিকা ক্রিয়াটির অর্থই প্রধান হয়। বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার সংখ্যা অগণ্য।

জেগে থাকা	বকে যাওয়া	মেরে ফেলা
লেগে থাকা	বলে যাওয়া	ভেগে পড়া
ধরে থাকা	পড়ে যাওয়া	বাধিয়ে দেওয়া
শুয়ে থাকা	খেয়ে যাওয়া	বাজতে লাগা
মেরে আনা	কেড়ে নেওয়া	ফুরিয়ে আসা
বিষিয়ে ওঠা	দিয়ে যাওয়া	পেরে ওঠা
সেরে নেওয়া	চালিয়ে নেওয়া	রাখিয়া দেওয়া

করা বা হওয়া যোগ করিয়া অসংখ্য প্রকার মিশ্র যৌগিক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় এবং এইরূপ ক্রিয়ার ব্যবহার বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এইভাবে ক্রিয়াপদ গঠন করিবার প্রবণতা বাংলা ভাষায় এত বেশী যে, বিদেশী শব্দগুলির সাহায্যেও নূতন নূতন ক্রিয়াপদ সর্বদা গঠিত হইতেছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

কৈফিয়ৎ দাও, নইলে **বরখাস্ত হবে।**
ছেলেটার দিকে একটু **নজর রাখবেন।**
ফরমাস করুন, কি গাইব ?
জবরদস্তি করলে কোন কাজ হবে না।
হাওলাত করে টাকা এনে আপনাকে দিলাম।
সারাদিন **মেহনৎ করে হয়রান হয়েছি।**
আর নাম **জাহির করতে** হবে না।
সর্দারি করার অভ্যাস সব সময় ভাল নয়।
কেমন **জব্দ হয়েছ ?**
ওস্তাদী করো না। ওরা শুনছি **আপীল করবে।**

[ক্রিয়ার কাল]

ক্রিয়া যে সময়ে ঘটিতেছে, তাহার উপর ক্রিয়ার রূপ নির্ভর করে। একটি ক্রিয়া পূর্বেই ঘটিয়া যাইতে পারে, বর্তমান সময়ে ঘটিতে পারে এবং পরে অর্থাৎ ভবিষ্যতেও ঘটিতে পারে। ক্রিয়াটি কখন ঘটিতেছে তাহা বুঝাইবার জন্য ক্রিয়াপদে বিভিন্ন চিহ্ন বা বিভক্তি যোগ করা হয়।

সময়ানুসারে ক্রিয়ার কালকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়—

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

যে ক্রিয়া এখন ঘটিতেছে, তাহাকে বর্তমান কালের ক্রিয়া বলে। যথা :—

আমি ভাত খাই। ছেলেটি স্নান করে।

সে বই পড়িতেছে। গরু ঘাস খায়।

বর্তমান কালের তিনটি প্রকারভেদ আছে :—

(১) নিত্য বা সাধারণ বর্তমান।

(২) ঘটমান বর্তমান।

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান।

(১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান—যখন সাধারণভাবে কোন ক্রিয়া ঘটিযা থাকে, তখন তাহার নাম সাধারণ বর্তমান বা নিত্য বর্তমান। যথা :—

'পাখী সব করে রব।'

'কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান্।'

রাজা প্রজা পালন করেন।

কোন ঐতিহাসিক ঘটনা জানাইবার জন্যও নিত্য বর্তমান প্রযুক্ত হয়। যথা :—

বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেন।

হজরত মোহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন।

(২) ঘটমান বর্তমান—যে কাজ চলিতেছে, এখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, তাহা ঘটমান বর্তমান। যথা :—

বৃষ্টি পড়িতেছে। আমি এখন লিখিতেছি।

(৩) পুরাঘটিত বর্তমান—যে ক্রিয়ার কাজ অল্পক্ষণ পূর্বে ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য পুরাঘটিত বর্তমান ব্যবহৃত হয়। যথা :—

আজ তাহার চিঠি পাইয়াছি। সে শুইয়াছে।

যে ক্রিয়া পূর্বে হইয়া গিয়াছে তাহাকে অতীতকালের ক্রিয়া বলে। অতীত-কালের চারিটি প্রকারভেদ আছে :—

(১) নিত্য বা সাধারণ অতীত।
(২) নিত্যবৃত্ত অতীত।
(৩) ঘটমান অতীত।
(৪) পুরাঘটিত অতীত।

(১) সাধারণ বা নিত্য অতীত—সাধারণতঃ অতীত সময়ে যে কাজ হইয়াছে, তাহা সাধারণ বা নিত্য অতীত। এইরূপ অতীত বুঝাইতে 'ইল' প্রত্যয়যুক্ত সাধারণ অতীত ব্যবহৃত হয়। যথা :—

আমি বাড়ী ফিরিলাম। রাম বনগমন করিলেন।

(২) নিত্যবৃত্ত অতীত—যে কাজ অতীতে কিছুকাল নিয়মিতভাবে করা হইত বা যাহা করা একপ্রকার অভ্যাসের মতই ছিল, তাহা বুঝাইতে নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ হয়। যথা :—

দিদিমা প্রত্যহ নদীতে স্নান করিতেন।
তুমি রোজই কানমলা খাইতে।

(৩) ঘটমান অতীত—অতীতকালে যে ক্রিয়া চলিতেছিল, তাহা ঘটমান অতীত। যথা :—

রাজকন্যা চুল বাঁধিতেছিলেন।
'আপন মনে গাহিতেছিলাম গান।'

(৪) পুরাঘটিত অতীত—যে ব্যাপার অনেক পূর্বে ঘটিয়াছিল, তাহা পুরাঘটিত অতীত। যথা :—

আমাদের গ্রামে একবার ডাকাত পড়িয়াছিল।
সেবার বন্যায় সমস্ত দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল।

যে ক্রিয়া এখনও ঘটে নাই, পরে বা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহাকে ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়া বলে। ভবিষ্যৎকালের দুইটি প্রকারভেদ আছে :—

(১) সামান্য ভবিষ্যৎ।
(২) ঘটমান ভবিষ্যৎ।

(১) সামান্য ভবিষ্যৎ—যাহা এখনও পর্যন্ত হয় নাই ভবিষ্যতে হইবে,

তাহা সামান্য ভবিষ্যৎ। কাজটি পরে হইবে—অল্প পরেও হইতে পারে, অনেক পরেও হইতে পারে। যথা :—

জেলায় জেলায় কলেজ হইবে।

আর কখনও একাজ করিব না।

(২) ঘটমান ভবিষ্যৎ—ক্রিয়ার কার্য ভবিষ্যতে কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকিবে, এই অর্থে ঘটমান ভবিষ্যৎকালের ব্যবহার হয়। যথা :—

আমি খাইতে থাকিব। খোকা ঘুমাইতে থাকিবে।

[ক্রিয়ারূপ]

ক্রিয়া-বিভক্তি

কাল (অর্থাৎ বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ) ও পুরুষ (অর্থাৎ উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ) অনুসারে ক্রিয়া বা ধাতুর পরে যাহা যুক্ত হইয়া সমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাহার নাম **ক্রিয়া-বিভক্তি**।

'চলিল' এই ক্রিয়াপদে 'চল্' মূলধাতু বা ক্রিয়া, 'ইল' ক্রিয়া-বিভক্তি।

'চলিতেছে' এই ক্রিয়াপদে 'চল্' মূলধাতু, 'ইতেছে' ক্রিয়া-বিভক্তি। করিয়া, যাইতে, হইলে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের 'ইয়া', 'ইতে', 'ইলে' প্রভৃতিকেও ক্রিয়া-বিভক্তি বলা হয়।

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা ভেদে বাংলা ভাষায় ক্রিয়া-বিভক্তির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলা ভাষার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

		নিত্য বর্তমান	ঘটমান বর্তমান
উত্তম পুরুষ	আমি	—ই (করি)	—ইতেছি (করিতেছি)
মধ্যম পুরুষ	তুমি	—অ (কর)	—ইতেছ (করিতেছ)
	তুই	—ইস্ (করিস্)	—ইতেছিস্ (করিতেছিস্)
	আপনি	—এন্ (করেন)	—ইতেছেন (করিতেছেন)
প্রথম পুরুষ	সে	—এ (করে)	—ইতেছে (করিতেছে)
	তিনি	—এন্ (করেন)	—ইতেছেন (করিতেছেন)

পুরাঘটিত বর্ত্তমান

উত্তম পুরুষ	আমি	—ইয়াছি
মধ্যম পুরুষ	তুমি	—ইয়াছ
	তুই	—ইয়াছিস্
	আপনি	—ইয়াছেন
প্রথম পুরুষ	সে	—ইয়াছে
	তিনি	—ইয়াছেন

	সামান্য অতীত		ঘটমান অতীত	
উত্তম পুরুষ	আমি	—ইলাম	আমি	—ইতেছিলাম
মধ্যম পুরুষ	তুমি	—ইলে	তুমি	—ইতেছিলে
	তুই	—ইলি	তুই	—ইতেছিলি
	আপনি	—ইলেন	আপনি	—ইতেছিলেন
প্রথম পুরুষ	সে	—ল	সে	—ইতেছিল
	তিনি	—ইলেন	তিনি	—ইতেছিলেন

পুরাঘটিত অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত
—ইয়াছিলাম	—ইতাম
—ইয়াছিলে	—ইতে
—ইয়াছিলি	—ইতিস্
—ইয়াছিলেন	—ইতেন
—ইয়াছিল	—ইত
—ইয়াছিলেন	—ইতেন

সামান্য ভবিষ্যৎ	ঘটমান ভবিষ্যৎ
—ইব	—ইতে থাকিব
—ইবে	—ইতে থাকিবে
—ইবি	—ইতে থাকিবি
—ইবেন	—ইতে থাকিবেন
—ইবে	—ইতে থাকিবে
—ইবেন	—ইতে থাকিবেন

ধাতুরূপ

বাংলা যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা, তাহাদের পক্ষে বাংলা ধাতুরূপ দেখিয়া ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। বাংলায় প্রচলিত ধাতুগুলির ব্যবহার আমরা শৈশবকাল হইতেই লোকমুখে নিয়া ও নিজেরা ব্যবহার করিয়া জানিয়া বলিতে পারি। উত্তম পুরুষ, মধ্য... বা প্রথম পুরুষ প্রভৃতি কথা অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মনে খট্‌কা বাধাইতে পা... বলিয়া 'আমি', 'তুমি', 'তিনি' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়া কয়েকটি বিশেষ প্রচলিত ধাতুর রূপ নিম্নে দেওয়া হইল। ধাতুরূপ লিখিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান কালের তিনটি প্রকার—(১) নিত্য বর্তমান, (২) ঘটমান বর্তমান ও (৩) পুরাঘটিত বর্তমান। অতীত কালের চারিটি প্রকার—(১) সামান্য অতীত, (২) নিত্যবৃত্ত অতীত, (৩) ঘটমান অতীত ও (৪) পুরাঘটিত অতীত। ভবিষ্যৎকালের দুইটি প্রকার—(১) সামান্য ভবিষ্যৎ ও (২) ঘটমান ভবিষ্যৎ। নিম্নে উহাদের রূপ দেখান হইল।

চল্‌-ধাতু

বর্তমান কাল

নিত্য বর্তমান	ঘটমান বর্তমান	পুরাঘটিত বর্তমান
আমি চলি	আমি চলিতেছি	আমি চলিয়াছি
তুমি চল	তুমি চলিতেছ	তুমি চলিয়াছ
তুই চলিস্	তুই চলিতেছিস্	তুই চলিয়াছিস্
আপনি চলেন	আপনি চলিতেছেন	আপনি চলিয়াছেন
সে চলে	সে চলিতেছে	সে চলিয়াছে
তিনি চলেন	তিনি চলিতেছেন	তিনি চলিয়াছেন

অতীত কাল

সামান্য অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত	ঘটমান অতীত	পুরাঘটিত অতীত
আমি চলিলাম	চলিতাম	চলিতেছিলাম	চলিয়াছিলাম
তুমি চলিলে	চলিতে	চলিতেছিলে	চলিয়াছিলে
তুই চলিলি	চলিতিস্	চলিতেছিলি	চলিয়াছিলি
আপনি চলিলেন	চলিতেন	চলিতেছিলেন	চলিয়াছিলেন
সে চলিল	চলিত	চলিতেছিল	চলিয়াছিল
তিনি চলিলেন	চলিতেন	চলিতেছিলেন	চলিয়াছিলেন

ভবিষ্যৎ কাল

সামান্য ভবিষ্যৎ	ঘটমান ভবিষ্যৎ
আমি চলিব	চলিতে থাকিব
তুমি চলিবে	চলিতে থাকিবে
তুই চলিবি	চলিতে থাকিবি
আপনি চলিবেন	চলিতে থাকিবেন
সে চলিবে	চলিতে থাকিবে
আপনি চলিবেন	চলিতে থাকিবেন

খা-ধাতু

বর্তমান

নিত্য বর্তমান	ঘটমান বর্তমান	পুরাঘটিত বর্তমান
আমি খাই	আমি খাইতেছি	আমি খাইয়াছি
তুমি খাও	তুমি খাইতেছ	তুমি খাইয়াছ
তুই খাস্	তুই খাইতেছিস্	তুই খাইয়াছিস্
আপনি খান	আপনি খাইতেছেন	আপনি খাইয়াছেন
সে খায়	সে খাইতেছে	সে খাইয়াছে
তিনি খান	তিনি খাইতেছেন	তিনি খাইয়াছেন

অতীত

সামান্য অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত
আমি খাইলাম	আমি খাইতাম
তুমি খাইলে	তুমি খাইতে
তুই খাইলি	তুই খাইতিস্
আপনি খাইলেন	আপনি খাইতেন
সে খাইল	সে খাইত
তিনি খাইলেন	তিনি খাইতেন

পুরাঘটিত অতীত	**ঘটমান অতীত**
আমি খাইতেছিলাম	আমি খাইয়াছিলাম
তুমি খাইতেছিলে	তুমি খাইয়াছিলে
তুই খাইতেছিলি	তুই খাইয়াছিলি
আপনি খাইতেছিলেন	আপনি খাইয়াছিলেন
সে খাইতেছিল	সে খাইয়াছিল
তিনি খাইতেছিলেন	তিনি খাইয়াছিলেন

ভবিষ্যৎ

সামান্য ভবিষ্যৎ	**ঘটমান ভবিষ্যৎ**
আমি খাইব	আমি খাইতে থাকিব
তুমি খাইবে	তুমি খাইতে থাকিবে
তুই খাইবি	তুই খাইতে থাকিবি
আপনি খাইবেন	আপনি খাইতে থাকিবেন
সে খাইবে	সে খাইতে থাকিবে
তিনি খাইবেন	তিনি খাইতে থাকিবেন

শো-ধাতু

বর্তমান

নিত্য বর্তমান	**ঘটমান বর্তমান**	**পুরাঘটিত বর্তমান**
আমি শুই	শুইতেছি	শুইয়াছি
তুমি শোও	শুইতেছ	শুইয়াছ
তুই শুইস্	শুইতেছিস্	শুইয়াছিস্
আপনি শোন	শুইতেছেন	শুইয়াছেন
সে শোয়	শুইতেছে	শুইয়াছে
তিনি শোন	শুইতেছেন	শুইয়াছেন

সামান্য অতীত	ঘটমান অতীত	পুরাঘটিত অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত
আমি শুইলাম	শুইতেছিলাম	শুইয়াছিলাম	শুইতাম
তুমি শুইলে	শুইতেছিলে	শুইয়াছিলে	শুইতে
তুই শুইলি	শুইতেছিলি	শুইয়াছিলি	শুইতিস্
আপনি শুইলেন	শুইতেছিলেন	শুইয়াছিলেন	শুইতেন
সে শুইল	শুইতেছিল	শুয়ইাছিল	শুইত
তিনি শুইলেন	শুইতেছিলেন	শুইয়াছিলেন	শুইতেন

ভবিষ্যৎ

সামান্য ভবিষ্যৎ	ঘটমান ভবিষ্যৎ
আমি শুইব	শুইতে থাকিব
তুমি শুইবে	শুইতে থাকিবে
তুই শুইবি	শুইতে থাকিবি
আপনি শুইবেন	শুইতে থাকিবেন
সে শুইবে	শুইতে থাকিবে
তিনি শুইবেন	শুইতে থাকিবেন

হ-ধাতু (চলতি ভাষায়)

বর্ত্তমান

নিত্য বর্ত্তমান	ঘটমান বর্ত্তমান	পুরাঘটিত বর্ত্তমান
আমি হই	হ’চ্ছি	হ’য়েছি
তুমি হও	হ’চ্ছ	হ’য়েছ
তুই হস্	হ’চ্ছিস্	হ’য়েছিস্
আপনি হন	হ’চ্ছেন	হ’য়েছেন
সে হয়	হ’চ্ছে	হ’য়েছে
তিনি হন	হ’চ্ছেন	হ’য়েছেন

অতীত

সামান্য অতীত	ঘটমান অতীত	পুরাঘটিত অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত
আমি হ'লাম	হ'চ্ছিলাম	হ'য়েছিলাম	হ'তাম
তুমি হ'লে	হ'চ্ছিলে	হ'য়েছিলে	হ'তে
তুই হ'লি	হ'চ্ছিলি	হ'য়েছিলি	হ'তিস্
আপনি হ'লেন	হ'চ্ছিলেন	হ'য়েছিলেন	হ'তেন
সে হ'ল	হ'চ্ছিল	হ'য়েছিল	হ'ত
তিনি হ'লেন	হ'চ্ছিলেন	হ'য়েছিলেন	হ'তেন

ভবিষ্যৎ

সামান্য ভবিষ্যৎ	ঘটমান ভবিষ্যৎ
আমি হব	হ'তে থাকব
তুমি হবে	হ'তে থাকবে
তুই হবি	হ'তে থাকবি
আপনি হবেন	হ'তে থাকবেন
সে হবে	হ'তে থাকবে
তিনি হবেন	হ'তে থাকবেন

দে-ধাতু (চলিত ভাষায়)

বর্ত্তমান

নিত্য বর্ত্তমান	ঘটমান বর্ত্তমান	পুরাঘটিত বর্ত্তমান
আমি দেই	দিচ্ছি	দিয়েছি
তুমি দাও	দিচ্ছ	দিয়েছ
তুই দিস্	দিচ্ছিস্	দিয়েছিস্
আপনি দেন	দিচ্ছেন	দিয়েছেন
সে দেয়	দিচ্ছে	দিয়েছে
তিনি দেন	দিচ্ছেন	দিয়েছেন

অতীত

সামান্য অতীত	ঘটমান অতীত	পুরাঘটিত অতীত	নিত্যবৃত্ত অতী
আমি দিলাম	দিচ্ছিলাম	দিয়েছিলাম	দিতাম
তুমি দিলে	দিচ্ছেলে	দিয়েছিলে	দিতে
তুই দিলি	দিচ্ছিলি	দিয়েছিলি	দিতিস্
আপনি দিলেন	দিচ্ছিলেন	দিয়েছিলেন	দিতেন
সে দিল	দিচ্ছিল	দিয়েছিল	দিত
তিনি দিলেন	দিচ্ছিলেন	দিয়েছিলেন	দিতেন

ভবিষ্যৎ

সামান্য ভবিষ্যৎ	ঘটমান ভবিষ্যৎ
আমি দেব	দিতে থাক্‌ব
তুমি দেবে	দিতে থাক্‌বে
তুই দিবি	দিতে থাক্‌বি
আপনি দেবেন	দিতে থাক্‌বেন
সে দেবে	দিতে থাক্‌বে
তিনি দেবেন	দিতে থাক্‌বেন

ছো৷ ধাতু (চলিত ভাষায়)

বর্ত্তমান

নিত্য বর্ত্তমান	ঘটমান বর্ত্তমান	পুরাঘটিত বর্ত্তমান
আমি ছুঁই	ছুঁচ্ছি	ছুঁয়েছি
তুমি ছোঁও	ছুঁচ্ছ	ছুঁয়েছ
তুই ছুঁস্	ছুঁচ্ছিস্	ছুঁয়েছিস্
আপনি ছোঁন	ছুঁচ্ছেন	ছুঁয়েছেন
সে ছোঁয়	ছুঁচ্ছে	ছুঁয়েছে
তিনি ছোঁন	ছুঁচ্ছেন	ছুঁয়েছেন

সামান্য অতীত		ঘটমান অতীত	পুরাঘটিত অতীত	নিত্যবৃত্ত অতীত
আমি	ছুঁলাম	ছুঁচ্ছিলাম	ছুঁয়েছিলাম	ছুঁতাম
তুমি	ছুঁলে	ছুচ্ছিলে	ছুঁয়েছিলে	ছুঁতে
তুই	ছুঁলি	ছুঁচ্ছিলি	ছুঁয়েছিলি	ছুঁতিস্
আপনি	ছুঁলেন	ছুঁচ্ছিলেন	ছুঁয়েছিলেন	ছুঁতেন
সে	ছুঁলো	ছুঁচ্ছিল	ছুয়েছিল	ছুঁতো
তিনি	ছুঁলেন	ছুঁচ্ছিলেন	ছুঁয়েছিলেন	ছুঁতেন

ভবিষ্যৎ

সামান্য ভবিষ্যৎ		ঘটমান ভবিষ্যৎ
আমি	ছোঁব	ছুঁতে থাক্‌ব
তুমি	ছোঁবে	ছুঁতে থাক্‌বে
তুই	ছুঁবি	ছুঁতে থাক্‌বি
আপনি	ছোঁবেন	ছুঁতে থাক্‌বেন
সে	ছোঁবে	ছুঁতে থাক্‌বে
তিনি	ছোঁবেন	ছুঁতে থাক্‌বেন

অনুজ্ঞা প্রকারের দুইটি ভাগ আছে, সাধারণ অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা। উভয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য আছে।

কর্-ধাতু

সাধারণ অনুজ্ঞা—আমি করি, তুমি কর, তুই কর্, আপনি করুন।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—তুমি করিও, তুই করিবি, আপনি করিবেন, সে করুক, তিনি করুন।

সাধারণ অনুজ্ঞা—আমি খাই, তুমি খাও, তুই খা, আপনি খান, সে খাক, খাউক, তিনি খান, খাউন।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা—তুমি খাইও, খেয়ো, খাইবে
তুই খাস্, খাবি, খাইবি
আপনি খাবেন, খাইবেন।

শিখ্-ধাতু

সাধারণ অনুজ্ঞা	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
আমি শিখি (শিখিতে দেওয়া হউক)	
তুমি শেখো	তুমি শিখো
তুই শেখ	তুই শিখিস্
আপনি শিখুন	আপনি শিখবেন
সে শিখুক	
তিনি শিখুন	

[অব্যয়ের শ্রেণী বিভাগ ও বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ]

যে সকল পদের কোনও বিভক্তিতেই ব্যয় বা রূপান্তর হয় না, তাহাদিগকে **অব্যয়** বলে। সকল অবস্থাতেই অব্যয় একরূপ থাকে ; লিঙ্গ, বচন ও কারকে এ পদের কোনও পরিবর্তন হয় না এবং অব্যয় শব্দে কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় না।

কিন্তু বাংলায় 'হঠাৎ', 'অকস্মাৎ', 'দৈবাৎ', 'পশ্চাৎ' প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত পদ অব্যয় হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। 'না', 'হাঁ', 'আবার' প্রভৃতি শব্দও অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি পদও অনেক সময় বাক্য বা বাক্যাংশ অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্তও আছে। 'রাম রাম', 'দূর ছাই', 'মরে যাই', 'বলিহারি' প্রভৃতিকেও বাংলায় অব্যয় বলিয়া ধরা হয়।

অব্যয় শব্দ বহুপ্রকার, কয়েকটি প্রধান প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

(১) সংযোজক অব্যয়—যে সকল শব্দ একপদের সহিত অন্যপদের অথবা একবাক্যের সহিত অন্যবাক্যের সংযোগ সাধন করে, তাহাদিগকে সংযোজক অব্যয় বলে।

ডাল ও ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য।

অঙ্ক এবং ভূগোল দুইটি বিষয়েই যতীনের বড় ভয়।

ও, এবং, অথচ, সুতরাং, তবু, বরং ইত্যাদি সংযোজক অব্যয়।

(২) বিয়োজক অব্যয়--যে সকল অব্যয় শব্দ দুইটি পদ বা দুইটি বাক্যকে বিযুক্ত করে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহাদিগকে বিয়োজক অব্যয় বলে।

তুমি বা তোমার ছোট ভাই একজনকে যাইতে হইবে।

এখন হইতে মন দিয়া পড় নতুবা পরীক্ষার ফল ভাল হইবে না।

(৩) **সম্বোধন-সূচক অব্যয়**—যে সকল অব্যয় দ্বারা সম্বোধন সূচিত হয় অর্থাৎ ডাকিতে গেলে যে সমস্ত অব্যয় শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহাদিগকে সম্বোধন-সূচক অব্যয় বলে।

'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?'
'হে ধনিন্, বৃথা তুমি হয়েছ গর্বিত
বহুমূল্য পরিচ্ছদে হইয়া সজ্জিত।'

হে, ওহে, রে, ওরে, ওগো প্রভৃতি এই জাতীয় অব্যয়।

(৪) **প্রশ্ন-সূচক অব্যয়**—যে সকল অব্যয় প্রশ্ন, জিজ্ঞাসায় ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে প্রশ্ন-সূচক অব্যয় বলে।

তুমি কেমন আছ ?
কেন ঝগড়া করিতেছ ?,
পণ্ডিত মহাশয় আজ কি কলিকাতা যাইবেন ?

কি, কেন, কেমন প্রভৃতি এই জাতীয় অব্যয়।

(৫) **বিভক্তি-সূচক অব্যয়**—যে সকল অব্যয় দ্বারা বিভক্তি সূচিত হয়, তাহাদিগকে বিভক্তি-সূচক অব্যয় বলে।

ছেলেটি ছোট বোনের সহিত খেলা করিতেছে।
ধান হইতে চাল হয়।
কৃপণকে ধিক্।

দ্বারা, দিয়া, হইতে, থেকে, জন্য, অপেক্ষা প্রভৃতি অব্যয় শব্দের পরে বসিয়া বিভক্তির কাজ করে।

(৬) **বাক্যালঙ্কার-সূচক অব্যয়**—যে সকল অব্যয় বাক্যের শোভা বর্ধন করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহাদিগকে উপমা-সূচক বা বাক্যালঙ্কার-সূচক অব্যয় বলা হয়।

'ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর।'
'সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।'
'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।'

(৭) অনুকার-সূচক অব্যয়—যে সকল অব্যয় কোন বিশেষ ধ্বনি ব অবস্থার অনুকরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে অনুকার-সূচক অব্যয় বলে। এই প্রকার অব্যয়ে এক শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান'।

'মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং।'

(৮) মনোভাব-বাচক অব্যয়—যে সকল অব্যয় বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি, লজ্জা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করে, তাহাদিগকে মনোভাব-বাচক অব্যয় বলে।

ছি, তোমার এই কাজ!

ইস্, অনেকটা কেটে গেছে যে!

যাদু আমার, এইটুকু খেয়ে নাও।

হাঁ, হুঁ, আচ্ছা, যে আজ্ঞে প্রভৃতি অব্যয় সম্মতি বুঝায়।

না, আদপে না, কখনো না প্রভৃতি অসম্মতি বুঝায়।

ছি, ছি ছি, ধেৎ, দুত্তোর প্রভৃতি ঘৃণা ও বিরক্তি বুঝায়।

বাহবা, বেশ বেশ, বহুত আচ্ছা, বলিহারি, কেয়াবাৎ প্রভৃতি প্রশংসা বুঝায়।

বাবারে, মারে, হায় হায়, ইস্ প্রভৃতি দুঃখ ও ভয় বুঝায়।

আহা, আহা রে, আহা হা, সোনা আমার, মাণিক আমার প্রভৃতি দয়া ও দুঃখ বুঝায়।

(৯) নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়—একটি বাক্যে ব্যবহৃত একটি অব্যয় যখন আর একটির জন্য অপেক্ষা করে, অর্থাৎ একটি ব্যবহার করিলে আর একটি যখন আপনা হইতে আসিয়া পড়ে, নিত্যসম্বন্ধ-যুক্ত সেই দুইটি অব্যয়ের নাম নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়।

হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার।

যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

সমাস

সমাস অর্থ সংক্ষেপ।

একের অধিক পদকে একপদে পরিণত করার নাম সমাস। বাক্যকে শ্রুতিমধুর ও সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য সমাসের প্রয়োজন। অযথা শব্দবাহুল্যে ভাব আড়ষ্ট ও শ্রুতিকটু হয়। অনেক সময় একাধিক পদকে একপদে পরিণত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে ভাষা সরল হয় ও প্রকাশভঙ্গী হৃদয়গ্রাহী হয়।

সমাস দ্বারা যে শব্দ গঠিত হয় তাহাকে **সমস্ত** পদ বলে এবং সমাসের অন্তর্গত পদগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া বা পৃথক করিয়া দেখাইলে **সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য** হয়।

সমাস ছয় প্রকার :—

(১) দ্বন্দ্ব সমাস, (২) কর্মধারয়, (৩) তৎপুরুষ, (৪) বহুব্রীহি, (৫) দ্বিগু ও (৬) অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে দুইটি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ মিলিয়া একপদে পরিণত হয় কিন্তু প্রত্যেক পদের অর্থই প্রধানভাবে বুঝায়, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এই সমাসের ব্যাসবাক্যে ও, এবং প্রভৃতি অব্যয় ব্যবহার করিতে হয়।

নদ ও নদী = নদনদী | ইষ্ট ও অনিষ্ট = ইষ্টানিষ্ট
মাতা ও পিতা = মাতাপিতা | সৎ ও অসৎ = সদসৎ
শোক ও তাপ = শোকতাপ | লাভ ও অলাভ = লাভালাভ
খাদ্য ও অখাদ্য = খাদ্যাখাদ্য | হিত ও অহিত = হিতাহিত
পাপ ও পুণ্য = পাপপুণ্য | দেব ও অসুর = দেবাসুর
জায়া ও পতি = দম্পতি | গমন ও আগমন = গমনাগমন
গ্রাস এবং আচ্ছাদন = গ্রাসাচ্ছাদন | কেনা ও বেচা = কেনাবেচা
মেয়ে ও জামাই = মেয়েজামাই | হাট ও বাজার = হাটবাজার
কায়, মন এবং বাক্য = কায়মনোবাক্য | ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ = ধর্মার্থমোক্ষ

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর = ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর

শিবদুর্গার বরে ব্রাহ্মণের কষ্ট দূর হইল।

আমাদের দেশে **নদনদীর** অন্ত নাই, **বৃক্ষলতাই** বা কত প্রকার।

'**আমকাঁঠালের** বাগান দেব ছায়ায় যেয়ো।'

দেবদানবের যুদ্ধ **আকাশপাতাল** তোলপাড় করে তুলেছিল।

গানবাজনা শুনব কি, **মশামাছির** যে উপদ্রব!

দুটি **মুড়িমুড়কি** খেয়ে **চালচিঁড়ে** বেঁধে রওনা হও।

দুইটি ক্রিয়াপদের মিলনেও দ্বন্দ্ব সমাস হইয়া থাকে—

খাওয়াপরা, ভেবেচিন্তে, মেরেকেটে, কেঁদেকেটে, ধরেপাকড়ে প্রভৃতি এই জাতীয় সমাসের উদাহরণ।

কর্মধারয়

বিশেষণ পদের সহিত বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাহাকে কর্মধারয় সমাস বলা হয়। এই সমাসে বিশেষ্য পদের অর্থই প্রধান।

বিশেষণ + বিশেষ্য

মহান যে জন = মহাজন

সৎ যে জন = সজ্জন

নীল যে আকাশ = নীলাকাশ

কু যে আচার = কদাচার

কাল যে জাম = কালজাম

পোড়া যে মুখ = মুখপোড়া

মহান্ যে রাজা = মহারাজা

মহতী যে নদী = মহানদী

কু যে অন্ন = কদন্ন

নীল যে শাড়ী = নীলশাড়ী

ভাজা যে ছোলা = ছোলাভাজা

ভাজা যে চাল = চালভাজা

বিশেষ্য + বিশেষ্য

যিনি দাদা তিনিই বাবু = দাদাবাবু

যিনি পণ্ডিত তিনিই মহাশয় = পণ্ডিত-মহাশয়

যিনি গুরু তিনিই দেব = গুরুদেব

যিনি লাট তিনিই সাহেব = লাটসাহেব

যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি

যিনি পিতা তিনিই ঠাকুর = পিতাঠাকুর

যিনি মা তিনিই গোঁসাই = মাগোঁসাই

যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই পণ্ডিত = ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত

বিশেষণ + বিশেষণ

যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট — যে হৃষ্ট সেই পুষ্ট = হৃষ্টপুষ্ট
যে শক্ত সেই সমর্থ = শক্তসমর্থ — যে চালাক সেই চতুর = চালাকচতুর
প্রথমে দন্ত পরে অপহৃত = দন্তাপহৃত — অগ্রে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত
কিছু মিঠা কিছু কড়া = মিঠাকড়া

মহাজনগণ যে পথে গমন করেন, সাধারণ লোকের তাহাই অনুসরণ করা উচিত।

কদন্ন গ্রহণ শাস্ত্রে নিষেধ।

ছেলেটি যেমন **হৃষ্টপুষ্ট** তেমনি **শক্তসমর্থ**, তবে ততখানি **চালাক-চতুর** নয়।

কর্মধারয় সমাসে মধ্যপদের লোপ হইলে তাহাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** বলা হয়।

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন — হাসি মাখা মুখ = হাসিমুখ
পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন — দুধ মিশ্রিত সাগু = দুধসাগু
ঘরে থাকে যে জামাই = ঘরজামাই — আতপে শুখান ধানের চাল = আতপচাল
ছায়া প্রধান তরু = ছায়াতরু — প্রীতিপূর্ণ উপহার = প্রীতিউপহার
হাত দিয়া চালিত পাখা = হাতপাখা — ওলের আকৃতিবিশিষ্ট কপি = ওলকপি

এবার **চালকুমড়ার আমসন্দেশ** খাইলাম।

ভিক্ষান্নে আর কয় দিন চলে।

হাতপাখার হাওয়ায় বড় আরাম।

দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা চিরকাল **স্বর্ণাক্ষরে** লিখিত থাকিবে।

উপমিত কর্মধারয়

উপমা বা তুলনা বুঝাইতে উপমানের সহিত উপমেয়ের সমাসকে **উপমিত কর্মধারয়** সমাস বলে। যাহার সহিত কোন পদের তুলনা হয় তাহা উপমান আর যাহার সহিত ঐ উপমানের তুলনা হয় তাহা উপমেয়।

সিংহের ন্যায় নর = নরসিংহ — চরণ কমলের ন্যায় = চরণকমল
পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ

ভরত শ্রীরামের **চরণকমল** বন্দনা করিলেন।

গুরুদেবের **পাদপদ্মে** কোটি কোটি প্রণাম।

বাংলায় উপমান পূর্বে বসে

চাঁদের ন্যায় বদন—চাঁদবদন

পাল্কীর ন্যায় গাড়ী—পাল্কীগাড়ী

ফুলের মত বাবু—ফুলবাবু

ফুলের ন্যায় বাতাসা—ফুলবাতাসা

উপমান কর্মধারয়

উপমান পদের সহিত সাধারণ কর্মবাচক বিশেষণের সমাসকে **উপমান কর্মধারয়** সমাস বলে।

বকের ন্যায় ধার্মিক = বকধার্মিক শাঁখের মত আলু = শাঁখআলু

বজ্রের ন্যায় গম্ভীর = বজ্রগম্ভীর

রূপক কর্মধারয়

পরস্পরের অভেদ বুঝাইয়া উপমানের সহিত উপমেয়ের যে সমাস, তাহাকে **রূপক কর্মধারয়** সমাস বলে।

ক্রোধ রূপ অগ্নি = ক্রোধাগ্নি শোক রূপ অনল = শোকানল

আশা রূপ লতা = আশালতা সংসার রূপ সমুদ্র = সংসারসমুদ্র

হৃদয় রূপ পিঞ্জর = হৃদয়পিঞ্জর

তৎপুরুষ সমাস

দ্বিতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত পূর্বপদের সহিত পরপদের যে সমাস হয়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হয়। পূর্বপদের যে যে বিভক্তি লোপ পায়, সেই বিভক্তির নাম অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের নাম হয়।

গুরুর গৃহ = গুরুগৃহ

এখানে 'গুরুর' এই পদের ষষ্ঠী বিভক্তি সমাসের লোপ পাইয়াছে বলিয়া 'গুরুগৃহ' ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। প্রথমা বিভক্তি লোপ পাইলে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে কর্মধারয় সমাস নামে অভিহিত করা হয়। আসলে কর্মধারয়কেও একপ্রকার তৎপুরুষ বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ—তৎপুরুষ সমাস এই ছয় প্রকার।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ—পূর্বপদে কর্মকারকের বিভক্তি বা দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পাইলে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। আত্মাকে রক্ষা = আত্মরক্ষা, বধূকে বরণ = বধূবরণ, বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন, সাহায্যকে প্রাপ্ত = সাহায্যপ্রাপ্ত, গঙ্গাকে প্রাপ্তি = গঙ্গাপ্রাপ্তি, লোককে দেখান = লোক-দেখান। চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, মাস ব্যাপিয়া অশৌচ = মাসাশৌচ।

তোমার এই **ছেলেভুলানো** কথায় কি আমি ভুলি।

শরণাগত লোককে কখনও ত্যাগ করিতে নাই।

তৃতীয়া তৎপুরুষ—পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন লোপ পাইলে, তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

রোগের দ্বারা আক্রান্ত = রোগাক্রান্ত
শোকের দ্বারা আকুল = শোকাকুল
তৃণের দ্বারা আচ্ছন্ন = তৃণাচ্ছন্ন
জরার দ্বারা জীর্ণ = জরাজীর্ণ
জলের দ্বারা কাচা = জলকাচা
ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা
বজ্রের দ্বারা আহত = বজ্রাহত
বিদ্যার দ্বারা হীন—বিদ্যাহীন
অশ্রুর দ্বারা সিক্ত = অশ্রুসিক্ত
পদের দ্বারা দলিত = পদদলিত
বাক দ্বারা দত্তা = বাক্‌দত্তা
ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ = ভিক্ষালব্ধ
চোখের দ্বারা ইসারা = চোখইসারা
দাঁতের দ্বারা খিচানি = দাঁতখিচানি

এ আমার **মনগড়া** কথা নয়।

নেতাজীর দেশবাসিগণ সকলেই তাঁহার **গুণমুগ্ধ**।

তার **লোহাপেটা** শরীর, এইটুকুতে আর কি হবে।

চতুর্থী তৎপুরুষ—পূর্বপদে চতুর্থী বা সম্প্রদান কারকের বিভক্তি লোপ পাইলে, চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়।

যূপের জন্য কাষ্ঠ = যূপকাষ্ঠ
ধনের জন্য লোভ = ধনলোভ
পানের জন্য পাত্র = পানপাত্র
ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল
বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা
মালের জন্য গুদাম = মালগুদাম

অর্থ প্রয়োজন কিন্তু **অর্থলোভ** ভাল নয়।

বিয়েপাগলা বুড়ো যেভাবে খেপে উঠেছে তাতে কি যে হবে বলা যায় না।

পঞ্চমী তৎপুরুষ—পূর্বপদে পঞ্চমী বা অপাদান কারকের বিভক্তি লোপ পাইলে, পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়।

অগ্নি হইতে ভয় = অগ্নিভয়
পদ হইতে চ্যুত = পদচ্যুত
বিদেশ হইতে আগত = বিদেশাগত
বিলাত হইতে ফেরত = বিলাতফেরত
প্রাণ হইতে অধিক = প্রাণাধিক
স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট = স্বর্গভ্রষ্ট
আদি হইতে অন্ত = আদ্যন্ত
আগা হইতে গোড়া = আগাগোড়া
লোক হইতে নিন্দা—লোকনিন্দা
দল হইতে ছাড়া = দলছাড়া

পূর্বে **ধর্মভ্রষ্ট** লোককে **সমাজচ্যুত** করা হইত, কিন্তু এখন কেহই আর **লোকনিন্দা** গ্রাহ্য করে না।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ—পূর্বপদে ষষ্ঠী বা সম্বন্ধ বিভক্তি লোপ পাইলে, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।

বিশ্বের ঈশ্বর = বিশ্বেশ্বর
মাতার তুল্য = মাতৃতুল্য
রাজ্যের পাল = রাজ্যপাল
ধর্মের রাজ্য = ধর্মরাজ্য
পথের রাজা = রাজপথ
হংসের রাজা = রাজহংস
হংসীর ডিম = হংসডিম্ব
ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ
বিশ্বের মিত্র = বিশ্বামিত্র (বিশ্বমিত্র)
বৃহতের পতি = বৃহস্পতি
ভাইয়ের পো = ভাইপো
বোনের ঝি = বোনঝি
ঠাকুরের পো—ঠাকুরপো
পিতার তুল্য = পিতৃতুল্য

মাঝদরিয়ায় নৌকা ডুবিল।
রাজ্যপাল পৌরসভার বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন।

সপ্তমী তৎপুরুষ—পূর্বপদের সপ্তমী বা অধিকরণ কারকের বিভক্তি লোপ পাইলে, সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়।

দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা
ধ্যানে মগ্ন = ধ্যানমগ্ন
বচনে বাগীশ = বচনবাগীশ
বিশ্বে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত
রণে কুশল = রণকুশল
তীরে লগ্ন = তীরলগ্ন
লোকে বিশ্রুত = লোকবিশ্রুত
রাতে কানা = রাতকানা
বস্তায় পচা = বস্তাপচা
গায়ে সহা = গাসহা
গাছে পাকা = গাছপাকা

নিজের বাগান থাকলে তবেই না **গাছপাকা** আম পাওয়া সম্ভব।
তুমি কেবল **বচনবাগীশ**, কাজে কিছু নও।

এই প্রধান কয়েকটি তৎপুরুষ সমাস ছাড়া নঞ্ তৎপুরুষ, উপপদ তৎপুরুষ ও অলুক্ তৎপুরুষ সমাসের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

নঞ্ তৎপুরুষ—না, নয় প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করিতে নঞ্ এই অব্যয়ের সহিত যে সমাস হয়, তাহা নঞ্ তৎপুরুষ।

ন শিষ্ট = অশিষ্ট   ন সৎ = অসৎ
ন চেনা = অচেনা   ন অতি দূর = নাতিদূর
ন আবাদি = অনাবাদি   ন অভিজ্ঞ = অনভিজ্ঞ
সরকারী নয়—বেসরকারী   মানানের অভাব = বেমানান

উপপদ তৎপুরুষ—উপপদের সহিত কৃদন্তপদের সমাসকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলা হয়।

বনে চরে যে = বনচর   পঙ্কে জন্মে যাহা = পঙ্কজ
পাদ দ্বারা পান করে যে = পাদপ   তীর্থে বাস করে যে = তীর্থবাসী
বাস্তু হারাইয়াছে যাহারা = বাস্তুহারা   গাঁজা খায় যে = গাঁজাখোর

অলুক্ তৎপুরুষ—পূর্বপদের বিভক্তি যেখানে লোপ হয় সেখানে অলুক্ তৎপুরুষ হয়। অলুক্ অর্থ অলোপ।

হাতেকাটা, তেলেভাজা, কলেছাঁটা, পায়েচলা, বাপেতাড়ানো, মায়েখেদান প্রভৃতি অলুক্ তৃতীয়া তৎপুরুষ।

পেটেরদায়, মুড়িরচাল প্রভৃতি অলুক্ চতুর্থী তৎপুরুষ।

ঘানির তেল, কলের জল প্রভৃতি অলুক্ পঞ্চমী তৎপুরুষ।

ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগের মা, বাঘের দুধ, টাকার কুমীর প্রভৃতি অলুক্ ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

যুধিষ্ঠির, গায়েপড়া, হাতেখড়ি, ধারেবিক্রী প্রভৃতি অলুক্ সপ্তমী তৎপুরুষ।

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে কোন পদের অর্থ প্রধানভাবে না বুঝাইয়া অপর কোন পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায় তাহাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

পীত অম্বর যাহার = পীতাম্বর   দশ আনন যাহার = দশানন
সমান জাতি যাহার = সজাতি   সমান বয়স যাহার = সমবয়স্ক
চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার = চন্দ্রমুখী   রক্তবর্ণ যাহার = রক্তবর্ণ

বীণা পাণিতে যাহার = বীণাপাণি
অন্য বিষয়ে মন যাহার = অন্যমনস্ক
একদিকে গোঁ যাহার = একগুঁয়ে
এক দিকে রোখ যাহার = একরোখা
চিরুণীর মত দাঁত যাহার = চিরণদাঁতী
হায়া নাই যাহার = বেহায়া

বাংলাদেশ **নদীমাতৃক**।

তোমার মত **বেহায়া** লোকের ব্যবসা করা ভাল নয়।

বাঙালীর **ঘরমুখো** অপবাদ দূর করতে হবে।

দ্বিগু সমাস

যে সমাসে সমাহার অর্থাৎ অনেক বস্তুর একত্র সমাহার বুঝায় এবং পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হয় তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে।

পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী
পঞ্চনদের সমাহার = পঞ্চনদ
শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী
সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ
তিনফলের সমাহার = ত্রিফলা
চারি রাস্তার মিলন = চৌরাস্তা
তিন সীমানার সমাহার = ত্রিসীমানা
পাঁচ ফোড়নের সমাহার = পাঁচফোড়ন

একটু বয়স হইলে সপ্তাহে দুইদিন **ত্রিফলা** ব্যবহার করা উচিত।

চৌরাস্তার মোড়ে একটি দুয়ানী কুড়াইয়া পাইলাম।

অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয়ের পদ পূর্বে বসিয়া যে সমাস হয় তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্য শব্দ দিয়া ব্যাসবাক্য রচনা করিতে হয়। সমাসের পদ ভাঙিয়া ব্যাসবাক্য দেখান যায় না।

কণ্ঠ পর্যন্ত = আকণ্ঠ
জানু পর্যন্ত = আজানু
মূল পর্যন্ত = আমূল
বাল্য হইতে = আবাল্য
শৈশব হইতে = আশৈশব
পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত = আপাদমস্তক
ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত = আব্রাহ্মণচণ্ডাল
বাল হইতে বনিতা পর্যন্ত = আবালবৃদ্ধবনিতা

বনের সদৃশ = উপবন
দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ
ধ্বনির সদৃশ = প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের নিকট = উপকণ্ঠ
কূলের নিকট = উপকূল
দিনে দিনে = প্রতিদিন
ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ
অহে অহে = প্রত্যহ
সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া = যথাসাধ্য
বিধিকে অতিক্রম না করিয়া = যথাবিধি
বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন
ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ
বন্দোবস্তের অভাব = বেবন্দোবস্ত
আমিষের অভাব = নিরামিষ

যথাসাধ্য পরের উপকার করিবে, **প্রত্যহ** স্নান করিবে, **যথেচ্ছ** ভোজনে সংযত হইবে।

অনুশীলনী

১। তৎপুরুষ সমাস কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। ব্যাসবাক্য বল ও কোন্ সমাস উল্লেখ কর :—

ঢাকঢোল, বিদ্যাহীন, খাঁসাহেব, বাসনমাজা, কদাচার, মামরা, খাইখরচ, বস্তাপচা, ঋণমুক্ত, আপ্রাণ, কুমারবাহাদুর, বিয়েপাগলা, দম্পতি, শশব্যস্ত, বদ্ধাঞ্জলি, মিহিদানা।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলি একপদে পরিণত কর :—

সমান উদর যাহার, পত্নীর সহিত বর্তমান, হাজির নয় যে, জলে জন্মে যাহা, এলোকেশ যাহার, যশ হরণ করে যে, মনরূপ রথ, যুদ্ধ হইতে উত্তর, বিগত হইয়াছে অর্থ যাহা হইতে।

৪। রাজপুরুষ ও পুরুষরাজ—অর্থে পার্থক্য কি? ইহাদের কোন্‌টি কোন্ সমাস? চন্দ্রমুখ ও মুখচন্দ্র এই পদ দুইটি ব্যবহার করিয়া দুইটি বাক্য রচনা কর।

শব্দ-প্রকরণ

[শব্দ ও পদের পার্থক্য]

শব্দ ও পদের পার্থক্য প্রথমেই বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। একাধিক পদের সমষ্টি বাক্য। বাক্যে পদ ব্যবহার করা হয়—শব্দ বা ধাতু বিভক্তি যুক্ত হইলেই পদ হয়। বিভক্তিহীন পদই শব্দ। ক্রিয়া-বিভক্তিযুক্ত পদ হইতে ক্রিয়া-বিভক্তির চিহ্ন বাদ দিলে যেমন ধাতু পাওয়া যায় তেমনি পদ হইতে কারক-বিভক্তি তুলিয়া দিলে শব্দ পাওয়া যায়।

[বাংলা শব্দ সম্ভার]

বাংলায় প্রচলিত শব্দগুলি মোটামুটি চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) সংস্কৃত বা তৎসম

(২) সংস্কৃতজ বা তদ্ভব

(৩) দেশী

(৪) বিদেশী

সংস্কৃতজ বা তৎসম শব্দ—যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ কোনরূপ বিকারপ্রাপ্ত না হইয়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে সেইগুলি তৎসম শব্দ (তৎসম = সংস্কৃত সম)। লতা, বৃক্ষ, ফল, গমন, ভোজন, শয়ন, জয়, পরাজয়, চন্দ্র, সূর্য, লাভ, ক্ষতি, ভক্তি, মুক্তি, ধর্ম, কর্ম ইত্যাদি তৎসম শব্দ।

সংস্কৃতজ বা তদ্ভব শব্দ—যে শব্দগুলির মূল সংস্কৃত অথচ যেগুলি কালক্রমে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়া কতকগুলি নিয়মের শাসনে শাসিত হইয়া রূপান্তর লাভ করিয়াছে সেইগুলি তদ্ভব শব্দ। (তদ্ভব = তৎ অর্থাৎ সংস্কৃত ভব, সংস্কৃত হইতে জাত)।

সোণা (স্বর্ণ), হাত (হস্ত), মাথা (মস্তক), ঘর (গৃহ), ষাঁড় (ষণ্ড), কাণ (কর্ণ), কুমার (কুম্ভকার), বাজ (বজ্র), মিছা (মিথ্যা), খায় (খাদতি), শোনে (শৃণোতি), বসে (উপবিশতি)।

আর একপ্রকার শব্দ আছে তাহাদিগকে **অর্ধতৎসম** আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই শব্দগুলি মূল সংস্কৃত শব্দ হইতেই আসিয়াছে, কিন্তু অশিক্ষিত লোকের মুখে শৃঙ্খলাহীনভাবে ইহাদের সংস্কৃত উচ্চারণ বিকৃত হইয়া ও ভাঙিয়া একটা বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে।

পুরুত, গতর, কেষ্ট, নেমতন্ন, গিন্নী, বেরাহ্মণ, ছেরাদ্দ, কেত্তন প্রভৃতি অর্ধ-তৎসম শব্দ।

দেশী শব্দ—বাংলাদেশে আর্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিবার পূর্বে এই দেশে বহু অনার্য জাতি বাস করিত। তাহাদের ভাষা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। এই প্রাচীন অধিবাসীদের ভাষা হইতে কিছু কিছু শব্দ বাংলায় আসিয়াছে।

ঢেঁকি, কুলা, খোকা, খুকি, বাখারি, ঝাঁটা, ডিঙ্গি প্রভৃতি দেশী শব্দ।

বিদেশী শব্দ—বহু প্রাচীনকাল হইতেই যে সমস্ত জাতি নানা কার্যব্যপদেশে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তাহাদের সহিত স্বাভাবিক কারণে ভারতীয়গণের ভাবজীবনে ও কর্মজীবনে নানাপ্রকার আদান-প্রদান হইয়াছিল। ইহার ফলে বিদেশী ভাষার কতকগুলি শব্দ ভারতীয় ভাষাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলিকে এখনও বিদেশী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। কিন্তু অনেকগুলি শব্দ এদেশে বহুকাল লোকমুখে প্রচলিত থাকায় বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া এরূপভাবে বাংলার আপনার হইয়া গিয়াছে যে, ঐগুলিকে আর এখন বিদেশী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(ক) **প্রাচীন পারসিক**—মোজা, মুচি, পুঁথি ইত্যাদি।

(খ) **গ্রীক**—কোণ, সুড়ঙ্গ, দাম ইত্যাদি।

(গ) **তুর্কী**—বাবু, বাবা, কোর্মা, চাকু, দারোগা, লাশ, উজবুগ, বোঁচকা ইত্যাদি।

(ঘ) **পারসী**—জমি, জমা, দরবার, শিকার, কাগজ, কলম, হিসাব, নালিশ, আইন, নরম, সরম, বরফ, দোকান, গজল, আয়না, জামা, বাগিচা, শাল, শিশি, হাজার, পোলাও, কালিয়া, কামান, বন্দুক, বারুদ, উকিল, চশমা, হালুয়া, রুমাল, হুকা, মোকদ্দমা, দরখাস্ত, মোকাবিলা, হাজির ইত্যাদি।

(ঙ) **আরবী**—নমাজ, মওলবি, কোরাণ, (কুর-আন), হদীশ ইত্যাদি।

(চ) **পর্তুগীজ**—আনারস, সাবান, কাকাতুয়া, পেঁপে, পিস্তল, পাঁউরুটি, পেরেক, বৈয়াম, আচার, মাস্তুল, বোতাম, বালতি, চাবি, মিস্ত্রী, জানালা, বিস্তি ইত্যাদি।

(ছ) **ওলন্দাজ**—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ ইত্যাদি।

(জ) **ফরাসী**—কুপন, ফিরিঙ্গী, কার্তুজ, বুর্জোয়া, বুরুশ ইত্যাদি।

(ঝ) **ইংরাজী**—পকেট, কলেজ, ইস্কুল, বল, মাস্টার, ডাক্তার, হাসপাতাল, চেয়ার, টেবিল, পাশ, ফেল, রেল, স্টিমার, ফাউণ্টেন পেন, পেন্সিল, প্লেট, কলেরা ইত্যাদি।

(ঞ) **চীনা**—চা, চিনি, লুচি, গুলাচি ইত্যাদি।

(ট) **জাপানী**—রিক্সা, হারিকিরি ইত্যাদি।

(ঠ) **বর্মী**—ফুঙ্গি, লুঙ্গি, লামা, নাপ্পি ইত্যাদি।

(ড) **রাশিয়ান**—ভড্‌কা, বলশেবিক, সোভিয়েট ইত্যাদি।

(ঢ) **মালয়**—গুদাম, সাগু, চুরুট (সুলুট্টু) ইত্যাদি।

এই চারিটি প্রধান শ্রেণী ছাড়াও বাংলায় কয়েকটি মিশ্রশব্দ বা Hybrid word দেখিতে পাওয়া যায়।

বে (ফার্‌সী প্রত্যয়) হেড্‌ (ইংরাজী শব্দ) = বেহেড্‌।

গুরু (সংস্কৃত শব্দ) গিরি (ফার্‌সী প্রত্যয়) = গুরুগিরি।

[ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত]

ভাষায় অনেক সময় একই ধ্বনিযুক্ত শব্দ পর পর দুইবার প্রয়োগ করা হয়, ইহার ফলে অর্থের পরিবর্তন ঘটে, অনেক সময় নূতন অর্থও সূচিত হয়।

ঘরে ঘরে এখন ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা, **শিশি শিশি** ওষুধ খেয়ে সকলের কান মাথা **চন্‌ চন্‌** করছে, সকলেই **দুধ দুধ** করছে, কিন্তু **টাকা টাকা** করে দুধের সের, তাই **বাটী বাটী** বার্লি খাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

'ঘরে ঘরে' অর্থ প্রতি ঘরে, 'শিশি শিশি' ও 'বাটী বাটী' অর্থ অনেক শিশি ও অনেক বাটী, 'চন্‌ চন্‌' একপ্রকার কাল্পনিক শব্দ বুঝাইতেছে, 'দুধ দুধ' প্রবল আকাঙ্ক্ষা বুঝাইতেছে এবং 'টাকা টাকা' অর্থ এক টাকা করিয়া।

শব্দদ্বৈতের বিচিত্র ব্যবহার আমাদের বাংলা ভাষার অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ। কিন্তু অসংখ্য প্রকার শব্দদ্বৈতের বিভাগ করা বা কোন্‌ কোন্‌ অর্থে ইহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে তাহার বাঁধাবাঁধি কোন নিয়ম আবিষ্কার করা এক রকম অসম্ভব।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে :

(১) বহুত্ব অর্থাৎ বহুবচন বুঝাইবার জন্য :—

ঘরে ঘরে আজ উৎসব। **থালা থালা** ভাত আর **বাটী বাটী** ডাল সব উঠে গেল। **বড় বড়** বানরের **বড় বড়** লেজ। **নূতন নূতন** জামা গায়ে ছেলেমেয়েদের দল ছুটছে।

(২) সর্বদা লাগিয়া থাকা ও অবিরাম গতি বুঝাইবার জন্য :—

কাছে কাছে থাকবে। **পিছনে পিছনে** আসছ কেন ? সর্বদা **পাশে পাশে** চল।

(৩) তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুঝাইবার জন্য :—

তিন মাস বৃষ্টি নাই, **জল জল** করিয়া সারাদেশ চীৎকার করিতেছে। **ছেলে ছেলে** করিয়াই মায়ের মন সর্বদা অস্থির। **টাকা টাকা** করিয়াই ভদ্রলোক অবশেষে পাগল হইলেন।

(৪) 'ঈষৎ' বা কিছু কম বুঝাইবার জন্য :—

শরীরটা **জ্বর জ্বর** করছে। জামাটা **ভিজে ভিজে** লাগছে। আজ কেমন যেন **শীত শীত** ভাব। একটু **মেঘ মেঘ** করেছে কিনা, কেমন যেন **ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা** বোধ হচ্ছে।

(৫) নকল খেলা বা অনুকরণ বুঝাইবার জন্য :—

ছেলেমেয়েরা **চোর চোর** খেলছে। মেয়েরা সারা দুপুর ধরে **বিয়ে বিয়ে** খেলছিল।

(৬) 'প্রত্যেক' এই অর্থ বুঝাইবার জন্য :—

বছর বছর সে অসুখে ভোগে। **দ্বারে দ্বারে** ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতেছে। **জন্মে জন্মে** যেন এই দেশেই আসি।

(৭) উপক্রম বা ক্রিয়ার পূর্বকালীন অবস্থা বুঝাইবার জন্য :—

বাতিটা **নিবু নিবু** হয়েছে। অনেকক্ষণ থেকেই **যাব যাব** করছি। ছেলেটির একেবারে **যায় যায়** অবস্থা। ঘরটি একেবারে **পড় পড়** হয়েছে। নৌকাখানা যে একেবারে **ডুবু ডুবু**।

(৮) আরও কিছু (অনির্দিষ্ট) বুঝাইবার জন্য :—

জলটল খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে, **ভাতটাত** বা **লুচিফুচি** দরকার নাই।

(৯) 'প্রভৃতি' বুঝাইবার জন্য :—

'লয়ে **রশারশি** করি **কশাকশি পোঁটলা পুঁটলি** বাঁধি।'

উদাহরণ যতই বাড়ান হউক না কেন, বাংলা শব্দদ্বৈতের অর্থপ্রকাশের যে বৈচিত্র্য আছে তাহার অন্ত পাওয়া যাইবে না।

গঠনের দিক হইতে অবশ্য কয়েকটি ভাগে শব্দদ্বৈতগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

(ক) প্রকৃত শব্দদ্বৈত—পরপদটি অবিকল পূর্বপদের ন্যায়।

আমতা আমতা, কাঁদ কাঁদ, পায় পায়, গরম গরম, পেটে পেটে, তলে তলে ইত্যাদি।

(খ) দ্বিরুক্ত অনুচর শব্দ—পরপদটি সামান্য বিকৃত হয়:

মোটা সোটা, মেরে ধরে, কেঁদে কেটে, বাসন কোসন, দহরম মহরম।

(গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত—

কট কট, ঝন ঝন, খাঁ খাঁ, মস মস, ধূ ধূ, গুট গুট।

(ক) প্রকৃত বা বিশুদ্ধ শব্দদ্বৈত

পথে পথে	হাড়ে হাড়ে	বস্তা বস্তা	হাঁড়ি হাঁড়ি
হাতে হাতে	মুঠো মুঠো	ঝুড়ি ঝুড়ি	ধামা ধামা
কাঁড়ি কাঁড়ি	কড়া কড়া	চোখা চোখা	দিনে দিনে
গাড়ী গাড়ী	চড়া চড়া	লম্বা লম্বা	মাসে মাসে
বছর বছর	কথায় কথায়	তলে তলে	পেটে পেটে
ঘণ্টায় ঘণ্টায়	ভালোয় ভালোয়	মুখে মুখে	চোখে চোখে
মাথায় মাথায়	কানে কানে	কাঁচা কাঁচা	হাসি হাসি
গলায় গলায়	মানে মানে	ভাসা ভাসা	ভাগ্যে ভাগ্যে
কাঁদ কাঁদ	শীত শীত	কাঠে কাঠে	টাট্‌কা টাট্‌কা

(খ) অনুচর শব্দ

অসুখ বিসুখ	ছেলে পিলে	জল টল	রস কস
কট মট	জড় সড়	পয়সা টয়সা	বাসন কোসন
চেটে পুটে	চেঁছে পুঁছে	কেঁদে কেটে	লুটে পুটে
মোটা সোটা	গোল গাল	চোট পাট	নাদুস নুদুস
মেখে চুখে	খেয়ে দেয়ে	গাল গল্প	চেয়ে চিন্তে

দিয়ে থুয়ে	কুড়িয়ে বাড়িয়ে	ফিট্ ফাট	ছড়া ছড়ি
গিন্নি বান্নি	চাষা ভুষো	ঘটি বাটি	মাথা মুণ্ডু
অলি গলি	আশপাশ	ধুমধাম	আছাড়ি পিছাড়ি
ঘর দোর	আশা ভরসা	কাঠ খড়	আপদ বিপদ
হাঁক ডাক	উঁকি ঝুঁকি	ছাই ভস্ম	পাহাড় পর্বত
বস বাস	মাল মসলা	সৈন্য সামন্ত	চালাক চতুর
পাঁজি পুঁথি	ক্রিয়া কর্ম	কড়া ক্রান্তি	দুঃখ কষ্ট
সুখ শান্তি	খড় কুটা	ধন দৌলত	হাট বাজার
কাঙাল গরীব	গল্প গুজব	কূল কিনারা	বাকী বকেয়া
ঠাকুর দেবতা	বৃষ্টি বাদল	সাধন ভজন	তর্ক বিতর্ক

(গ) ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত

বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ যত অধিক, অন্য কোন ভাষাতে তত নহে। এই সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া মনোভাব যেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা যায়, অন্য কোনও শব্দের সাহায্যে তেমন করা যায় না।

কন কন, টন টন, দপ দপ, কট কট, চিন চিন, খচ খচ, ঝন ঝন, ঝিন ঝিন, দগ দগ, প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দযুগল শরীরের নানাস্থানে ব্যথা-বেদনার কথা প্রকাশ করে। এইরূপ হাসির যে বহু প্রকারভেদ আছে তাহাও ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈতের সাহায্যে প্রকাশ পায়—হো হো, হি হি, হা হা, খিল খিল, খল খল, ফিক্ ফিক্ এক একটি বিশেষ হাসির রূপকে প্রকাশ করে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির বিশেষ প্রয়োগ আমাদের সুপরিচিত। আমরা জানি—চন্দনের ফোঁটা কপালে শুকাইয়া **চড়চড়** করে, বুকে শ্লেষ্মা জমিলে গলা **ঘড় ঘড়** করে। ভূতের ভয়ে গা **ছম ছম** করে। বিপদে ভয়ে বুক **ঢিপ ঢিপ** করে। ছেলেমেয়ের অসুখে মায়ের প্রাণ **ধুক ধুক** করে। আকাশে তারা **মিট মিট** করে। ঘরে প্রদীপ **টিম টিম** করে। বিয়েবাড়ী লোকজনে **গম গম** করে। পেট **ভুট ভাট** করে। পড়ো বাড়ী **খাঁ খাঁ** করে। বিশাল মাঠ **ধু ধু** করে। বর্ষায় খালবিল জলে **থৈ থৈ** করে। মন মাঝে মাঝে **হু হু** করে। গরমে প্রাণ **আই ঢাই** করে। ঘুমে চোখ **ঢুলু ঢুলু** করে। রাগে সর্বশরীর **রী রী** করে।

কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিম্নে দেওয়া হইল।

কচ কচ, কট কট, কন কন, কপ কপ, কচা কচ, কপা কপ, কল কল, কিট কিট, কিড়ি মিড়ি, কিল বিল, কুট, কুট, কুড় মুড়, কিচির মিচির, ক্যাচর ক্যাচর, কঁ্যাট কঁ্যাট।

খচ খচ, খচা খচ, খড় খড়, খট খট, খক খক, খাঁ খাঁ, খুঁত খুঁত, খুট খুট, খিট খিট।

গপ গপ, গম গম, গড় গড়, গপা গপ, গুর গুর, গুজ গুজ, গুট গুট, গুরু গুরু, গিস গিস, গিজ গিজ, গজ গজ।

ঘ্যোাৎ ঘ্যোাৎ, ঘ্যান ঘ্যান, ঘড় ঘড়, ঘট ঘট, ঘিন ঘিন।

চট পট, চক চক, চপ চপ, চড় চড়, চিট চিট, চিন চিন, চুল বুল, চুঁই চুঁই।

ছট ফট, ছল ছল, ছঁ্যাৎ ছঁ্যাৎ, ছম ছম, ছপ ছপ।

জম জম, জল জল, জপ জপ।

ঝণ ঝণ, ঝম ঝম, ঝর ঝর, ছল মল, ঝিম-ঝিম, ঝুন ঝুন, ঝুমুর ঝুমুর।

টকা টক, টক টক, টস টস, টগ বগ, টল টল, টিক টিক, টিম টিম, টুপ টাপ।

ঠক ঠক, ঠুক ঠুক, ঠুন ঠুন।

ঢক ঢক, ঢুক ঢুক ঢু ঢু, ঢি ঢি, ঢিপ ঢিপ।

তড় তড়, তুল তুল, তুক তুক।

থক থক, থম থম, থুক থুক, থৈ থৈ।

দগ দগ, দপ দপ, দর দর, দুম দাম, দুরু দুরু।

ধক ধক, ধিক ধিক, ধুক ধুক, ধর ফড়, ধু ধু, ধেই ধেই।

নড় নড়, নিড় বিড়, নিস পিস।

পট পট, পত পত, প্যান প্যান।

ফর ফর, ফিস ফিস, ফ্যা ফ্যা, ফ্যাল ফ্যাল, ফুস ফুস, ফিট ফাট।

বক বক, বিড় বিড়।

ভক ভক, ভন ভন, ভড় ভড়, ভুর ভুর, ভুস ভুস, ভোঁ ভোঁ, ভ্যা ভ্যা।

মস মস, মর মর।

লক লক, লিক লিক।

হন হন, হু হু, হুস হুস, হৈ হৈ, হিস হিস।

ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ কয়েকটি দেওয়া হইল।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছ কি? **চট পট** কাজ সেরে নাও, কিন্তু **তড় বড়** করো না। ওদিকে ওরা **হন হন** করে ইস্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল। **হুস হুস** করে ট্রেন এসে পড়বে। ওদের সঙ্গে যেতে না পারলে **হৈ হৈ** পড়ে যাবে।

রাতদিন কী এত **গুজ গুজ ফুস ফুস** করছ? হাতটা আমার কেবল **নিস্‌পিস্‌** করছে। ইচ্ছে করছে একটা **লক লকে** বেত দিয়ে **সপাসপ** ঘা কতক বসিয়ে দিই।

পাগলীটা আপন মনে খানিকটা **বিড় বিড়** করে **ঢক ঢক** করে অনেকটা জল খেয়ে নিল; তারপরেই **খক খক** করে কাশি আরম্ভ হল। **পট পট** করে হাতের চুড়ি ক'গাছা ভেঙ্গে ফেলেই **ধেই ধেই** করে নাচতে লাগল। ভয়ে আমাদের বুক **ঢিপ ঢিপ** করছিল।

কানটা **কট কট** করছে। মাথাটা **টন টন** করছে। গলার ভিতরটা আবার **সুড়সুড়** করছে। পা দু'টো **ঝিম ঝিম** করছে। এখন কি তোমার **ট্যাস ট্যাস** কথা বলার সময়? এখন যাও, দেখছ না কি রকম **ছট ফট** করছি। পেটটাও আবার **ভুট ভাট** আরম্ভ করেছে।

কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

কুটকুটে কম্বল, কটকটে ব্যাঙ, কুড়মুড়ে মুড়ি, করকরে টাকা, ক্যাটকেটে কথা, খটখটে ঘর, খসখসে গা, খিটখিটে মেজাজ, গনগনে আগুন, ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঘুসঘুসে জ্বর, চনচনে রোদ, চটচটে আটা, ছিপছিপে চেহারা, ঝকঝকে পোষাক, ঝরঝরে ভাত, টুকটুকে বৌ, ডিগ্‌ডিগে গড়ন, ড্যাবডেবে চোখ, তকতকে ঘর, থকথকে কাদা, থমথমে মেঘ, থুত্থুড়ে বুড়ো, ধবধবে জামা, নড়বড়ে দাঁত, পিটপিটে স্বভাব, প্যাঁটপেঁটে রঙ, ফুটফুটে ছেলে, ফুরফুরে হাওয়া, ফিনফিনে ধুতি, মিটমিটে শয়তান, মিশমিশে আঁধার, ম্যাজমেজে ভাব, রগরগে ঝাল, লিকলিকে বেত, হলহলে জামা।

অনুশীলনী

১। খুঁতখুঁতে, খিটখিটে, ধবধবে, টুকটুকে, দগদগে এই কয়টি শব্দের পর বিশেষ্য বসাইয়া বাক্য রচনা কর।

২। বাক্য রচনা করিয়া অর্থের পার্থক্য নির্দেশ কর।

গট গট, থুপ থুপ, হন হন, খুট খুট, ধাঁ ধাঁ।

[কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়]

শব্দের পরে প্রত্যয় যোগ করিয়া ও ধাতুর পরে প্রত্যয় যোগ করিয়া বাংলায় অনেক নূতন নূতন শব্দ গঠিত হয়। ধাতুর পরে যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ করিয়া শব্দ গঠন করা হয়, সেগুলিকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। শব্দের পরে যে সমস্ত প্রত্যয় যোগ হয়, তাহাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। বাংলা ভাষায় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়-যুক্ত বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। আবার বাংলার নিজস্ব কতকগুলি কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগেও নিত্য নূতন শব্দ সৃষ্ট হইতেছে।

ধাতুর উত্তর তব্য, অনীয়, য প্রভৃতি প্রত্যয়কে কৃৎ প্রত্যয় বলে। 'চলন্ত' ট্রেন হইতে নামিবার চেষ্টা করিও না। এই বাক্যে 'চলন্ত' কথাটির অর্থ 'যাহা চলিতেছে'। চল্ এই ধাতুটির সহিত অন্ত এই কৃৎ প্রত্যয় যোগ করিয়া 'চলন্ত' এই পদটি নিষ্পন্ন হইতেছে। কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে এইভাবে অনেক নূতন নূতন শব্দ গঠিত হয়। 'করা উচিত' এই অর্থে কৃ ধাতুর উত্তর তব্য বা অনীয় প্রত্যয় যোগ করিয়া 'কর্তব্য' বা 'করণীয়' পদটি সাধিত হয়। এইভাবে কৃৎ প্রত্যয় যোগে বাংলা ভাষায় অসংখ্য শব্দের সৃষ্টি হইতেছে। এই কৃৎ প্রত্যয়ের কতকগুলি সংস্কৃত, কতকগুলি বাংলা। উভয় প্রকার কৃদন্ত শব্দই আমরা সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি।

কৃদন্ত পদ তিনভাবে গঠিত হয় :—

(১) ধাতুর পরে প্রত্যয় যোগ করিয়া—কৃ + তব্য = কর্তব্য।

(২) উপসর্গের পরে ধাতু ও তাহার পর প্রত্যয় যোগ করিয়া—সম্—কৃ + ক্ত = সংস্কৃত।

(৩) শব্দের পরে ধাতু ও তাহার পর প্রত্যয় যোগ করিয়া—রস—জ্ঞা + ক = রসজ্ঞ।

[সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়]

তব্য ও অনীয়

কৃ + তব্য = কর্তব্য	দা + তব্য = দাতব্য	গম্ + তব্য = গন্তব্য
মন্ + তব্য = মন্তব্য	ভূ + তব্য = ভবিতব্য	হন্ + তব্য = হন্তব্য
বচ্ + তব্য = বক্তব্য	দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য	গ্রহ্ + তব্য = গ্রহিতব্য
পা + অনীয় = পানীয়	কৃ + অনীয় = করণীয়	বৃ + অনীয় = বরণীয়
দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়	স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়	শুচ্ + অনীয় = শোচনীয়

য

দা + য = দেয় গম্ + য = গম্য পা + য = পেয় সহ্ + য = সহ্য
গ্রহ্ + য = গ্রাহ্য রম্ + য = রম্য কৃ + য = কার্য হস্ + য = হাস্য

ত (ক্ত)

গম্ + ত = গত স্থা + ত = স্থিত মৃ + ত = মৃত ভূ + ত = ভূত
কৃ + ত = কৃত শ্রু + ত = শ্রুত দৃষ্ + ত = দৃষ্ট হন্ + ত = হত
নী + ত = নীত বচ্ + ত = উক্ত দন্‌ষ্ + ত = দষ্ট রন্‌জ্ + ত = রক্ত

তি (ক্তি)

মন্ + তি = মতি গম্ + তি = গতি খ্যা + তি = খ্যাতি স্থা + তি = স্থিতি
ভজ্ + তি = ভক্তি মুচ্ + তি = মুক্তি সৃজ্ + তি = সৃষ্টি বচ্ + তি = উক্তি
বুধ্ + তি = বুদ্ধি বৃধ্ + তি = বৃদ্ধি কৃষ্ + তি = কৃষ্টি শ্রু + তি = শ্রুতি

তৃ (তৃচ্)

দা + তৃ = দাতৃ কৃ + তৃ = কর্তৃ নী + তৃ = নেতৃ ক্রী + তৃ = ক্রেতৃ
ভুজ্ + তৃ = ভর্তৃ গ্রহ + তৃ = গ্রহিতৃ বি + ধা + তৃ = বিধাতৃ যুধ্ + তৃ = যোদ্ধৃ

প্রথমবার একবচনে পুংলিঙ্গে এইগুলি দাতা, কর্তা, নেতা, ক্রেতা, ভোক্তা, গ্রহীতা, বিধাতা, যোদ্ধা এইরূপ হইবে।

অন (অনট্)

দা + অন = দান পা + অন = পান শী + অন = শয়ন চি + অন = চয়ন
গম্ + অন = গমন ভুজ্ + অন = ভবন শ্রু + অন = শ্রবণ গৈ + অন = গান
স্মৃ + অন = স্মরণ স্না + অন = স্নান দৃশ্ + অন = দর্শন সিচ্ + অন = সেচন

অক

পচ্ + অক = পাচক গৈ + অক = গায়ক নৈ + অক = নায়ক
সাধ্ + অক = সাধক লিখ্ + অক = লেখক রক্ষ্ + অক = রক্ষক
দৃশ্ + অক = দর্শক তৃ + অক = তারক হন্ + অক = ঘাতক
বহ্ + অক = বাহক জন্ + অক = জনক পালি + অক = পালক

আন (শানচ্)

আস্ + আন = আসীন শী + আন = শয়ান বৃধ্ + আন = বর্ধমান
কম্প্ + আন = কম্পমান ঘূর্ণ + আন = ঘূর্ণমান
শব্দায় + আন = শব্দায়মান দণ্ডায় + আন = দণ্ডায়মান

[খাঁটি বাংলা কৃৎ প্রত্যয়]

ই

হাস্ + ই = হাসি   মার্ + ই = মারি   হাঁচ্ + ই = হাঁচি   কাশ্ + ই = কাশি
ডুব্ + ই = ডুবি   চুর্ + ই = চুরি   ঝাঁপ্ + ই = ঝাঁপি   ফাঁস + ই = ফাঁসি

আ

নাচ্ + আ = নাচা   কাঁদ্ + আ = কাঁদা   চল্ + আ = চলা   শু + আ = শোয়া
(এইগুলি বিশেষ্য)

বাঁধ্ + আ = বাঁধা   কাট্ + আ = কাটা   শুন্ + আ = শোনা   পাক্ + আ = পাকা
(এইগুলি বিশেষণ)

অন, আন, উন, উনি

নাচ্ + অন = নাচন   চল্ + অন = চলন   মিল্ + অন = মিলন
ঝাড়্ + অন = ঝাড়ন   দেখ্ + আন = দেখান   বেল্ + উন = বেলুন
চাল্ + উনি = চালুনি   ছাঁ + উনি = ছাঁউনি   চির্ + উনি = চিরুনি
চাহ্ + উনি = চাহুনি   রাঁধ্ + উনি = রাঁধুনি   গাঁথ্ + উনি = গাঁথুনি

অন্ত

জীব্ + অন্ত = জীবন্ত   পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত   ঘুম + অন্ত = ঘু:
জী + অন্ত = জীয়ন্ত   ফুট্ + অন্ত = ফুটন্ত   উড়্ + অন্ত = উড়ন্ত
বাড় + অন্ত = বাড়ন্ত

না

খেল্ + না = খেলনা   ঝর্ + না = ঝরণা   বাজ্ + না = বাজনা
রাঁধ্ + না = রান্না   ঢাক্ + না = ঢাকনা   দোল্ + না = দোলনা

তি, তা, আই

কম্ + তি = কম্‌তি   বাড়্ + তি = বাড়তি   উঠ্ + তি = উঠ্‌তি
পড়্ + তা = পড়তা   লড়্ + আই = লড়াই   ঢাল্ + আই = ঢালাই

ইয়ে, উয়া, উক, আরি

বল্ + ইয়ে = বলিয়ে   গাহ্ + ইয়ে = গাইয়ে   বাজ + ইয়ে = বাজিয়ে
নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে   পড়্ + উয়া = পড়ুয়া   মিশ্ + উক = মিশুক
নিন্দ্ + উক = নিন্দুক   ডুব্ + আরি = ডুবারি, ডুবুরি   ধুন্ + আরি = ধুনারি, ধুনুরি

নি, আনি

জ্বালা + আনি = জ্বালানি   নিড়্ + আনি = নিড়ানি   বেড়্ + আনি = বেড়ানি

[সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত শব্দ]

অ, ই, আয়ন, এয়, (ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণায়ন, ষ্ণেয়)—এই প্রত্যয়গুলি অপত্যার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মনুর অপত্য = মানব   দনুর অপত্য = দানব   পাণ্ডুর অপত্য = পাণ্ডব
ভৃগুর অপত্য = ভার্গব   কুরুর অপত্য = কৌরব   পৃথার অপত্য = পার্থ
যদুর অপত্য = যাদব   রঘুর অপত্য = রাঘব   কশ্যপের অপত্য = কাশ্যপ
ভরতের অপত্য = ভারত   পুত্রের পুত্র = পৌত্র   দুহিতার পুত্র = দৌহিত্র
চণকের অপত্য = চাণক্য   অদিতির অপত্য = আদিত্য   দিতির অপত্য = দৈত্য
দশরথের পুত্র = দাশরথি   রাবণের অপত্য = রাবণি   সুমিত্রার অপত্য = সৌমিত্রি
কুন্তীর পুত্র = কৌন্তেয়   বিমাতার পুত্র = বৈমাত্রেয়   ভগ্নীর পুত্র = ভাগিনেয়

ভক্ত বা উপাসক অর্থে অ (ষ্ণ, ষ্ণ্য)

বিষ্ণুর ভক্ত = বৈষ্ণব   শক্তির ভক্ত = শাক্ত   শিবের ভক্ত = শৈব
বুদ্ধের ভক্ত = বৌদ্ধ   ব্রহ্মের ভক্ত = ব্রাহ্ম   জিনের ভক্ত = জৈন
সূর্যের ভক্ত = সৌর   গণপতির ভক্ত = গাণপত্য   স্ত্রীর ভক্ত = স্ত্রৈণ

অস্ত্যর্থে অর্থাৎ আছে এই অর্থে মতু, বতু, ইন্, ময়, লু, আলু, শ, ইল

শ্রী আছে যাহার – শ্রীমান   গুণ আছে যাহার = গুণবান
আয়ু আছে যাহার = আয়ুষ্মান   রস আছে যাহাতে = রসালো
দয়া আছে যাহার = দয়ালু   রোম আছে যাহার = রোমশ
পঙ্ক আছে যাহাতে = পঙ্কিল   মহিমা আছে যাহাতে = মহিমময়

কার্য বা জীবিকা অর্থে তা, অ, য, ইক (তা, ত্ব, ষ্ণ, ষ্ণিক)

নেতার কার্য = নেতৃত্ব   শিক্ষকের কার্য = শিক্ষকতা   চোরের কার্য = চৌর্য
সারথির কার্য = সারথ্য   তাম্বুল বিক্রয় জীবিকা যাহার = তাম্বুলিক

গুণ বা ভাব অর্থে ইন্, বিন্, ত্ব, তা

গুণ আছে যাহার = গুণী
মেধা আছে যাহার = মেধাবী
ধন আছে যাহার = ধনী
জ্ঞান আছে যাহার = জ্ঞানী
সুখ আছে যাহার = সুখী
দুঃখ আছে যাহার = দুঃখী
যশ আছে যাহার = যশস্বী
মায়া আছে যাহার = মায়াবী
স্রোত আছে যাহার = স্রোতস্বিনী
নীলের ভাব = নীলিমা
মধুরের ভাব = মাধুর্য, মধুরিমা, মাধুরিমা
কিশোরের ভাব = কৈশোর
দাসের ভাব = দাসত্ব
পশুর ভাব = পশুত্ব
যুবকের ভাব = যৌবন
বৃদ্ধের ভাব = বার্দ্ধক্য

উৎপন্ন জাত অর্থে ইত, ইক

পুলক যুক্ত যাহাতে = পুলকিত
কলঙ্ক যুক্ত যাহাতে = কলঙ্কিত
মাসে মাসে উৎপন্ন = মাসিক
পুষ্প জন্মিয়াছে যাহাতে = পুষ্পিত

সাদৃশ্য বা স্থানীয় অর্থে বৎ

পিতার মত = পিতৃবৎ
মাতার মত = মাতৃবৎ
ভ্রাতার মত = ভ্রাতৃবৎ
পিতার স্থানীয় = পিতৃস্থানীয়
মাতার স্থানীয় = মাতৃস্থানীয়
ভ্রাতার সদৃশ = ভ্রাতৃস্থানীয়

কিঞ্চিৎ ন্যূন অর্থে কল্প

মৃত হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন = মৃতকল্প
ইন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন = ইন্দ্রকল্প
পিতা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন = পিতৃকল্প
ঋষি হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন = ঋষিকল্প

সম্বন্ধীয় অর্থে ইক, ইয়, ইন

শরীর সম্বন্ধীয় = শারীরিক
নগর সম্বন্ধীয় = নাগরিক
বিদেশ সম্বন্ধীয় = বৈদেশিক
তর্ক সম্বন্ধীয় = তার্কিক
দর্শন সম্বন্ধীয় = দার্শনিক
বেদ সম্বন্ধীয় = বৈদিক
নীতি সম্বন্ধীয় = নৈতিক
মনস্ সম্বন্ধীয় = মানসিক
ইহলোক সম্বন্ধীয় = ইহলৌকিক
পরলোক সম্বন্ধীয় = পারলৌকিক
দেশ সম্বন্ধীয় = দেশীয়
জল সম্বন্ধীয় = জলীয়
বাষ্প সম্বন্ধীয় = বাষ্পীয়
শাস্ত্র সম্বন্ধীয় = শাস্ত্রীয়
স্বর্গ সম্বন্ধীয় = স্বর্গীয়
রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় = রাষ্ট্রীয়
রাজ সম্বন্ধীয় = রাজকীয়
বিষয় সম্বন্ধীয় = বৈষয়িক
সর্বজন সম্বন্ধীয় = সর্বজনীন, সার্বজনীন, সার্বজনিক।

অভূত তদ্ভাব অর্থে চ্বি

যাহা এক ছিল না এখন এক হইয়াছে = একীভূত
যাহা লঘু নহে তাহাকে লঘু করা = লঘুকরণ
যে নিরস্ত্র নহে তাহাকে নিরস্ত্র করা = নিরস্ত্রীকরণ
যাহা একত্র ছিল না এখন একত্র হইয়াছে = একত্রীভূত
যাহা ভস্ম ছিল না এখন ভস্ম হইয়াছে = ভস্মীভূত
যাহা বশ ছিল না এখন বশ হইয়াছে = বশীভূত

ক্রিয়া-বিশেষণ অর্থে তস্, থা, ধা, দা

ক্রমে ক্রমে = ক্রমশঃ	সর্ব সময়ে = সর্বদা	এক সময়ে = একদা
প্রথম প্রথম = প্রথমতঃ	শত ভাগে = শতধা	দুই ভাবে = দ্বিধা
বহু ভাগে = বহুধা	সর্ব প্রকারে = সর্বথা	অন্য প্রকারে = অন্যথা
যে প্রকারে = যথা	সেই প্রকারে = তথা	তিন ভাগে = ত্রিধা

[বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়]

জীবিকা, কার্য বা ভাব অর্থে ই, ঈ, মি, গিরি, পনা প্রভৃতি

সাহেবের ভাব = সাহেবি	ডাক্তারের ব্যবসা = ডাক্তারি
উকিলের ব্যবসা = ওকালতি	বড়র ভাব = বড়াই
বামুনের ভাব = বামনাই	চালাকের ভাব = চালাকি
ঢাক বাজান জীবিকা যাহার = ঢাকী	ঢোল বাজান জীবিকা যাহার = ঢুলী
ভিক্ষা করা জীবিকা যাহার = ভিখারী	কাঁসার কাজ করে যে = কাঁসারি
শাঁখার কাজ করে যে = শাঁখারি	কুঁড়ের ভাব = কুঁড়েমি
ছেলের ভাব = ছেলেমি	বুড়োর ভাব = বুড়োমি
পাকার ভাব = পাকামি	ফাজিলের ভাব = ফাজলামি
পাগলের ভাব = পাগলামি	জ্যাঠার ভাব = জ্যাঠামি
গিন্নীর ভাব = গিন্নীপনা	দুরন্তের ভাব = দুরন্তপনা

বেহায়ার ভাব = বেহায়াপনা

আগত, উৎপন্ন, নির্মিত, জাত, নিপুণ, অর্থে ই, আই, আ প্রভৃতি

পাটনায় উৎপন্ন = পাটনাই   পাবনায় উৎপন্ন = পাবনাই
ঢাকায় উৎপন্ন = ঢাকাই   বিলাতে উৎপন্ন = বিলাতী
পাঞ্জাবে উৎপন্ন = পাঞ্জাবী   জাপানে নির্মিত = জাপানী
হিসাবে নিপুণ = হিসাবী   সেতারে নিপুণ = সেতারি
আলাপে নিপুণ = আলাপী   চীন হইতে আগত = চীনা
কাবুলে প্রস্তুত = কাবুলী   মহিষ হইতে উৎপন্ন = ভঁয়সা

আদর অর্থে আই

কানু + আই = কানাই   মাধব + আই = মাধাই   বলদেব + আই = বলাই

অস্তি অর্থাৎ আছে এই অর্থে ল

দাঁত আছে যাহার = দাঁতাল   লাঠি আছে যাহার = লাঠিয়াল ; লেঠেল
জোর আছে যাহার = জোরাল   শাঁস আছে যাহার = শাঁসাল
সার আছে যাহার = সারাল   ধার আছে যাহার = ধারাল
জাঁক আছে যাহার = জাঁকাল   জমক আছে যাহার = জমকাল
ঝাঁঝ আছে যাহার = ঝাঁঝাল   দুধ আছে যাহার = দুধাল

সম্বন্ধীয় অর্থে উয়া, ও, এ প্রভৃতি

গাছ সম্বন্ধীয় = গেছো   ধান সম্বন্ধীয় = ধেনো   বন সম্বন্ধীয় = বুনো
ঘর সম্বন্ধীয় = ঘরোয়া   বাঘ সম্বন্ধীয় = বাঘা   বাঁদর সম্বন্ধীয় = বাঁদুরে

তুল্য ও ঈষৎ অর্থে আনা, টে

ঈষৎ রোগা = রোগাটে   ঈষৎ ধোঁয়াযুক্ত = ধোঁয়াটে ঈষৎ ঘোলা = ঘোলাটে
তামার মত = তামাটে   ক্ষেপার মত = ক্ষেপাটে   জলের মত = জলপানা

বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ ঃ

আন, ওয়ান

বাগ আছে যাহাতে = বাগান   গাড়ী চালায় যে = গাড়োয়ান

অনা, আনা, আনী

বাবুর ভাব = বাবুয়ানা   বিবির ভাব = বিবিয়ানা   হিন্দুর ভাব = হিন্দুয়ানী
গরীবের ভাব = গরীবানা   সাহেবের ভাব = সাহেবিয়ানা

খানা

ছাপার স্থান = ছাপাখানা। মুদীর দোকান = মুদীখানা। বসার স্থান = বৈঠকখানা।
নহবৎ বাজে যেখানে = নহবৎখানা।
গোসল (স্নান) করা হয় যেখানে = গোসলখানা।

খোর

গুলি খায় যে = গুলিখোর
গাঁজা খায় যে = গাঁজাখোর
আফিম খায় যে = আফিংখোর
ঘুষ খায় যে = ঘুষখোর

কর, গর

যে সওদা করে = সওদাগর
যে কারু করে = কারিকর, কারিগর

গিরি

মুটিয়ার কাজ = মুটিয়াগিরি
কেরাণীর কাজ = কেরাণীগিরি
দারোগার কাজ = দারোগাগিরি
বাবুর কাজ = বাবুগিরি
গোয়েন্দার কাজ = গোয়েন্দাগিরি
গুরুর কাজ বা ব্যবসা = গুরুগিরি

চা, চি, দান, দানী

ছোট ডেক = ডেকচি
ছোট নল = নলিচা
ছোট চামচ = চামচা
ধুনার আধার = ধুনচি
ছোট ব্যাঙ = বেঙাচি
নস্যের আধার = নস্যদানী
পিক ফেলিবার পাত্র = পিকদান
নিমকের আধার = নিমকদান

দার

জমি আছে যাহার = জমিদার
বাজায় যে = বাজনদার
ভাগ আছে যাহার = ভাগীদার
অংশ আছে যাহাতে = অংশীদার
মজা আছে যাহাতে = মজাদার
বুটি আছে যাহাতে = বুটিদার
জিল্লা আছে যাহাতে = জিল্লাদার
চটক আছে যাহাতে = চটকদার
চৌকি দেয় যে = চৌকিদার
চড়ে যে = চড়নদার

সই

টেঁকার যোগ্য = টেকসই
মানানের যোগ্য = মানানসই
পছন্দের উপযুক্ত = পছন্দসই
প্রমাণের উপযুক্ত = প্রমাণসই

তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে পদ-পরিবর্তন

সংস্কৃত শব্দে **সংস্কৃত প্রত্যয়** ব্যবহার করিতে হইবে।

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অগ্নি	আগ্নেয়	অধ্যয়ন	অধীত
অবধান	অবহিত	অণু	আণবিক
অনুরাগ	অনুরক্ত	অভ্যাস	অভ্যস্ত
অরণ্য	আরণ্য	অকস্মাৎ	আকস্মিক
অনুভব	অনুভূত	অংশ	আংশিক
আঘাত	আহত	আদি	আদ্য
আরোহণ	আরূঢ়	আশ্বাস	আশ্বস্ত
আহ্বান	আহূত	ইতিহাস	ঐতিহাসিক
ঈশ্বর	ঐশ্বরিক	উদ্যম	উদ্যত
উন্মাদ	উন্মত্ত	উপনিবেশ	ঔপনিবেশিক
ঋষি	আর্ষ	কায়	কায়িক
গ্রহণ	গৃহীত	গিরি	গৈরিক
গ্রাম	গ্রাম্য	গ্রাস	গ্রস্ত
চন্দ্র	চান্দ্র	জটা	জটিল
জন্তু	জান্তব	জগত	জাগতিক
জ্ঞান	জ্ঞেয়	ত্যাগ	ত্যক্ত
দর্শন	দার্শনিক	দম্পতি	দাম্পত্য
দিন	দৈনিক	নগর	নাগরিক
নক্ষত্র	নাক্ষত্রিক	নাশ	নষ্ট
নিশা	নৈশ	নীতি	নৈতিক
পশু	পাশব	পঙ্ক	পঙ্কিল
পরলোক	পারলৌকিক	পঞ্চবর্ষ	পঞ্চবার্ষিক
পিতা	পৈতৃক	প্রসঙ্গ	প্রাসঙ্গিক
প্রাচী	প্রাচ্য	প্রতীচি	প্রতীচ্য
প্রমাণ	প্রামাণ্য	প্রশ্ন	পৃষ্ট
বধ	হত	বন	বন্য

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
বস্তু	বাস্তব	বরণ	বৃত
বায়ু	বায়বীয়	বিদ্যুৎ	বৈদ্যুতিক
বিধি	বৈধ	ব্যবহার	ব্যবহারিক
ব্যাঘাত	ব্যাহত	বিপদ	বিপন্ন
বিমান	বৈমানিক	বিষ্ণু	বৈষ্ণব
বিষাদ	বিষণ্ণ	বুদ্ধ	বৌদ্ধ
ভয়	ভীত	ভোগ	ভোগ্য
ভোজন	ভোজ্য, ভুক্ত	ভূগোল	ভৌগোলিক
মন	মানসিক	মুখ	মৌখিক
মোহ	মুগ্ধ, মূঢ়	লাভ	লব্ধ
লোভ	লুব্ধ	শয়ন	শায়িত
শরৎ	শারদ, শারদীয়	সময়	সাময়িক
সমুদ্র	সামুদ্রিক	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
স্পর্শ	স্পৃষ্ট	স্নেহ	স্নিগ্ধ
হর্ষ	হৃষ্ট	হেম	হৈম

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আদর	আদুরে	খেয়াল	খেয়ালী
গাঁ	গেঁয়ো	গাছ	গেছো
কাবুল	কাবুলি	কাজ	কেজো
ঘর	ঘরোয়া	জল	জোলো
ঝগড়া	ঝগড়াটে	তেজ	তেজী
দরদ	দরদী	ভাত	ভেতো
বন	বুনো	ভূত	ভুতুড়ে
পাথর	পাথুরে	মাঠ	মেঠো
মাটি	মেটে	মেয়ে	মেয়েলি
বেগুন	বেগুনি	পেট	পেটুক
পুষ্টি	পোষ্টাই	হিংসা	হিংসুটে

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
সোনা	সোনালি	রঙ	রংদার
লাজ	লাজুক	সর্বনাশ	সর্বনেশে

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য

সংস্কৃত প্রত্যয় সাহায্যে

অধিক	আধিক্য	অলস	আলস্য
অতিশয়	আতিশয্য	অনুকূল	আনুকূল্য
এক	ঐক্য	ঋজু	আর্জব
কপট	কাপট্য	করুণ	কারুণ্য
কিশোর	কৈশোর	কুমার	কৌমার্য
কুলীন	কৌলিন্য	কৃপণ	কার্পণ্য
কৃশ	কার্শ্য	গম্ভীর	গাম্ভীর্য
গুরু	গৌরব	উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ
চঞ্চল	চাঞ্চল্য	চতুর	চাতুর্য
তরল	তারল্য	দরিদ্র	দারিদ্র্য
দীন	দৈন্য	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য
নব	নবত্ব	নবীন	নবীনতা
লাল	লালিমা	দৃঢ়	দৃঢ়তা, দার্ঢ্য
প্রচুর	প্রাচুর্য	বীর	বীর্য
বিচিত্র	বৈচিত্র্য	মহৎ	মহিমা, মহত্ত্ব
ললিত	লালিত্য	লঘু	লঘিমা
হ্রস্ব	হ্রাস	শিথিল	শৈথিল্য
শূর	শৌর্য	স্বাদু	স্বাদ

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় সাহায্যে

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
কুঁড়ে	কুঁড়েমি	গরীব	গরীবানা
মাতাল	মাতলামি	পাকা	পাকামি
বেহায়া	বেহায়াপনা	ইতর	ইতরামি
ধূর্ত	ধূর্তামি	দুরন্ত	দুরন্তপনা
ভণ্ড	ভণ্ডামি	চালাক	চালাকি
ন্যাকা	ন্যাকামি	পাগল	পাগলামি

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত ধাতু ও প্রত্যয়গুলি যোগ করিয়া শব্দ গঠন কর :—

হন্ + ঘঞ্, হন্ + ত, বৃৎ + শানচ্, বৃধ্ + শানচ্, মুচ্ + তি, স্মৃ + অনীয়, স্মৃ + তব্য, দহ্ + ত, স্পৃশ্ + ঘঞ্।

২। নিম্নের শব্দগুলি কিভাবে গঠিত হইয়াছে লিখ :—

রাঁধুনি, পাওনা, চোরাই, কাটারি, টনটনানি।

৩। নিম্নের বাক্যাংশগুলির পরিবর্তে একটি করিয়া শব্দ বসাও :—

বাজার হইতে ফিরিয়াছে যাহা, শয়ন করা যায় যাহাতে, যাহা ফুরায় না, যাহা দেওয়া উচিত, যাহা দেওয়া যায় না, জল দান করে যে, সব জানে যে, পূজা করে যে, যাহা দেখা উচিত, যাহা দেওয়া উচিত, অগ্রে জন্মিয়াছে যে, পরে জন্মিয়াছে যে, যাহা জ্বালান যায়, যাহা চিন্তা করা যায় না, যাহা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

৪। নিম্নলিখিত বিশেষণগুলিকে বিশেষ্য পদে পরিবর্তিত কর :—

আবৃত, চালাক, মাতাল, বিরত, নষ্ট, শান্ত, অবসন্ন, পরাভূত, নিহত, চতুর, কৃপণ, পাগল, আরূঢ়।

৫। নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে পরিবর্তিত কর :—

প্রমাদ, লোভ, কাবুল, ঝগড়া, চন্দ্র, সূর্য, স্নেহ, মোহ, বিস্তার, সমাজ, ঢাকা, পরিবার, বিষয়, মেয়ে।

৬। এক কথায় কি হইবে লিখ :—

মহিষ হইতে উৎপন্ন, পাড়াগাঁ হইতে আগত, দালালের কাজ, রাবণের পুত্র, হিঁদুর ভাব, সারথির কাজ, ঘটকের কাজ, বাজনা বাজাইয়া জীবিকা নির্বাহ করে যে।

উপসর্গ

যে সকল অব্যয় ক্রিয়াবাচক শব্দের পূর্বে বসিয়া উহার বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে উপসর্গ বলে। বাংলায় তিন প্রকার উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) সংস্কৃত, (খ) বাংলা ও (গ) বিদেশী।

[সংস্কৃত উপসর্গ]

প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ। এই কুড়িটি সংস্কৃত উপসর্গ সংস্কৃত ধাতুর পূর্বে বসিয়া ক্রিয়াপদের অর্থের নানারূপ পরিবর্তন ঘটায়।

'হৃ' ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হওয়াতে বিভিন্ন অর্থবোধক কত নূতন পদ গঠিত হইয়াছে তাহা দেখা যাইতে পারে :—

প্রহার (আঘাত), সংহার (হত্যা), আহার (ভোজন), বিহার (ভ্রমণ), উপহার (উপঢৌকন), পরিহার (ত্যাগ), উদ্ধার (রক্ষা), ব্যবহার (আচরণ), প্রত্যাহার (ফিরাইয়া লওয়া)। এইরূপ 'দা' ধাতুর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ বসাইয়া আমরা বিভিন্ন শব্দ পাই—আদান (গ্রহণ করা), প্রদান (দান করা), উপাদান (উপকরণ), প্রতিদান (পরিবর্তে অন্য বস্তু গ্রহণ)। অনেক সময় দুইটি বা তিনটি উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বসিয়া শব্দ গঠন করিয়া থাকে।— অভিনিবেশ (অভি + নি), উপনিবেশ (উপ + নি), প্রত্যাদেশ (প্রতি + আ), অধ্যবসায় (অধি + অব), দুরপনেয় (দুর + অপ), দুরভিসন্ধি (দুর্ + অভি + সম)।

বিভিন্ন উপসর্গের দ্বারা বিভিন্ন অর্থবিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ কয়েকটি দেওয়া হইতেছে।

কৃ-ধাতু

লোকটির **আকৃতি** যেমন কুৎসিৎ, তাহার **প্রকৃতিও** সেইরূপ ক্রূর।

রোগী **বিকারের** ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল।

কাহারও **উপকার** করিবার শক্তি ভগবান দেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও **অপকারও** করিব না।

এবার রবীন্দ্রনাথের **প্রতিকৃতিতে** মাল্যদান করা হইবে।

তোমার **দুষ্কৃতির** অন্ত নাই, তুমি **নিষ্কৃতি** পাইবে কিসে তাহা ভাবিতেছ কি?

নিজের **অধিকার** বজায় রাখিবার জন্য আজকাল সকলেই সচেষ্ট।

শাসক যদি উদাসীন হন তবে অত্যাচারের **প্রতিকার** করিবে কে?

পিতামাতার **আজ্ঞা** প্রত্যেক সন্তানেরই পালন করা উচিত।

অধ্যয়ন করিয়া, বহুদর্শন করিয়া খানিকটা অভিজ্ঞতা জন্মে কিন্তু যথার্থ **প্রজ্ঞা** লাভ করা যায় না।

তোমার চেয়ে যে ছোট, তাহাকে কখনও **অবজ্ঞা** করিও না।

প্রতিজ্ঞা করিলে উহা রক্ষা করিতে হয়।

মাথায় আঘাত পাইয়া তিনি **সংজ্ঞা** হারাইয়াছিলেন।

বিজ্ঞানের চর্চা আধুনিক যুগে খুব ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রহ্-ধাতু

অধ্যয়নে আধুনিক বিদ্যার্থিগণের **আগ্রহ** হ্রাস পাইয়াছে।

যুদ্ধবিগ্রহে অধিকাংশ লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, লাভবান হয় দু' চারজন।

সারা বৎসরের খাদ্য **সংগ্রহ** করিয়া রাখা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে।

কৃত্রিম **উপগ্রহ** লইয়া আজকাল বেশ হৈ-চৈ পড়িয়াছে।

অনুগ্রহ করিয়া আমার বক্তব্যটি ধীরভাবে শুনুন।

নী-ধাতু

বিনয় মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ।

শুভ **পরিণয়ের** নিমন্ত্রণ ত পাইলাম, কিন্তু যাওয়া হইবে কিনা বলিতে পারিতেছি না।

অনেক **অনুনয়** করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না।

অভিনয় দেখিলাম কিন্তু ভাল লাগিল না।

পল্লী-**উন্নয়ন** ব্যতীত দেশের উন্নতি অসম্ভব।

উপনয়ন দ্বিজাতির একটি সংস্কার।

গম্-ধাতু

পূর্বের কত **দুর্গম** পথ আজকাল **সুগম** হইয়াছে।

বিগত দিনের জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ কি?

বরানুগমনের সময় স্থির হইয়াছে সন্ধ্যা ছয়টা।

যার প্রবেশ-**নির্গমের** কোন জ্ঞান নাই তাহার অভিনয় করা সাজে না।

এখন **প্রগতির** যুগ, তোমার মনোভাব বর্জন করাই উচিত।

বদ্-ধাতু

অনেকদিন তোমার **সংবাদ** পাই নাই।

মিছামিছি গায়ে পড়িয়া **বিবাদ** করিয়া লাভ কি?

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সভায় বিস্তর **প্রতিবাদ** উঠিল।

মেঘদূতের বাংলা **অনুবাদের** মধ্যে কাহারটি ভাল হইয়াছে জান কি?

মিথ্যা **অপবাদ** দেওয়া একশ্রেণীর লোকের অভ্যাস।

সংস্কৃত উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠন দেখান হইতেছে।

প্র—প্রভেদ, প্রস্থান, প্রগাঢ়, প্রধান, প্রশংসা, প্রচণ্ড, প্রস্ফুটিত, প্রগতি, প্রণাম, প্রচলন।

বসন্তের **প্রকোপ** কলিকাতায় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

নিজের **প্রশংসা** সকলেই শুনিতে চায়।

প্রবীণের সঙ্গে নবীনের মতভেদ চিরকালই থাকে।

পরা—পরাকাষ্ঠা, পরাঙ্মুখ, পরাজয়, পরাভব, পরামর্শ, পরাক্রম।

যুদ্ধে জয়-**পরাজয়** আছেই।

কর্তব্যে **পরাঙ্মুখ** হওয়া অমানুষের লক্ষণ।

অপ—অপদার্থ, অপকর্ম, অপকৃষ্ট, অপমৃত্যু, অপমান, অপহরণ।

অপব্যয় করিও না, অভাব হইবে না।

মান-**অপমান** যিনি সমান দেখেন, তিনিই সাধু।

সম—সম্পর্ক, সম্মুখ, সমুচিত, সঙ্কল্প, সম্ভাষণ, সম্মেলন, সমবেদনা।

সঙ্কল্প-সাধনে অগ্রসর হও।

তোমার **সমুচিত** শাস্তি হইয়াছে।

নি—নিষেধ, নিষ্ঠুর, নিক্ষেপ, নিকৃষ্ট, নিবৃত্তি, নিবেদন, নিদারুণ।

আমার **নিবেদন** শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হইল।

কাহারও **নিষেধ** না শুনিয়া ছেলেটি নিজের বুদ্ধিতেই বিপদ ডাকিয়া

অব—অবসর, অবকাশ, অবগত, অবনত, অবহেলা অবগুণ্ঠন, অবতরণ।

কর্তব্যে **অবহেলা** করিতে নাই।

দীর্ঘ **অবকাশ** কিভাবে কাটাইব ভাবিয়া পাইতেছি না।

অনু—অনুচর, অনুগ্রহ, অনুকম্পা, অনুকরণ, অনুমতি, অনুষ্ঠান, অনুমান, অনুশীলন, অনুবাদ, অনুক্ষণ, অনুকরণ, অনুশাসন।

কেবল **অনুমানের** উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিতে নাই।

তোমার প্রস্তাব সকলের **অনুমোদন** লাভ করিয়াছে।

নির্—নির্ভীক, নিরক্ষর, নিরাশ্রয়, নির্ণয়, নির্বাক, নির্বংশ, নির্গুণ।

নিরক্ষরকে জ্ঞান দান, **নিরাশ্রয়কে** আশ্রয় দান মহতের লক্ষণ।

দুর্—দুর্ভিক্ষ, দুর্বল, দুর্গতি, দুশ্চিন্তা, দুরদৃষ্ট, দুশ্চরিত্র।

দুর্দিন সকলের জীবনেই আসে, **দুশ্চিন্তা** করিয়া লাভ নাই।

অভি—অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, অভীষ্ট, অভিভাষণ, অভিনন্দন, অভিশাপ, অভিযান, অভিসম্পাত, অভিষেক।

কি **অভিপ্রায়** লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন বুঝিতে পারা গেল না।

চন্দ্রগ্রহে মানুষের **অভিযান** সফল হইবে কি ?

বি—বিখ্যাত, বিস্তৃত, বিক্রয়, বিচার, বিজ্ঞাপন, বিবর্ণ, বিগর্হিত।

রৌদ্রের উত্তাপে ও পরিশ্রমে তাহার মুখখানি **বিবর্ণ** হইয়া গিয়াছে।

বর্তমান যুগে **বিজ্ঞাপন** না দিলে কোন জিনিষই চলে না।

অধি—অধ্যক্ষ, অধ্যবসায়, অধ্যায়, অধিবেশন, অধিকার, অধিত্যকা, অধিরোহণ।

সভার **অধিবেশনে** খুব বেশী লোক উপস্থিত হইতে পারিল না বলিয়া সভা স্থগিত রহিল।

নিজের **অধিকার** কেহ সহজে ছাড়িতে চায় না।

সু—সুলভ, সুগম, সুদূর, সুহৃদ, সুজলা, সুফলা।

যে **সুযোগের** সদ্ব্যবহার করিতে পারে না, তাহার উন্নতি হওয়া কঠিন।

উৎ—উদ্বাস্তু, উৎসর্গ, উৎক্ষিপ্ত, উৎপীড়ন, উৎপত্তি, উদ্বেগ, উদ্ভূত, উচ্চারণ, উদ্যম, উৎকর্ষ।

উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা।

পরহিতে যিনি জীবন **উৎসর্গ** করেন, এমন সাধুর সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

অতি—অতিভোজন, অতিপ্রাকৃত, অত্যাবশ্যক, অত্যাচার, অতিরিক্ত, অতিশয়।

অতিভোজন স্বাস্থ্যের প্রতিকূল।

অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় অসহায় নরনারী কাহার নিকট আবেদন জানাইবে ?

প্রতি—প্রতিঘাত, প্রতিরোধ, প্রতিক্রিয়া, প্রতিবিধান, প্রতিপালন, প্রতিশ্রুতি, প্রত্যুত্তর।

যাহা ঘটিল, তাহা এইখানেই শেষ হইল না, বহুদূর ও বহুদিন ইহার **প্রতিক্রিয়া** চলিতে থাকিবে।

শেষ পর্যন্ত তিনি **প্রতিশ্রুতি** রক্ষা করিতে পারিলেন না।

পরি—পরিণাম, পরিপন্থী, পরিতৃপ্ত, পরিবর্জন, পরিস্থিতি, পরিতুষ্ট, পরিষ্কার, পরিত্যাগ, পরিগণিত।

নিরাশ্রয় ও শরণাগতকে **পরিত্যাগ** করিতে নাই।

পরিস্থিতি এমন জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, **পরিণাম** কি হইবে বলা যায় না।

অপি—অপিধান, অপিনদ্ধ, অপিনিহিতি।

(বাংলায় শব্দগুলির ব্যবহার নাই)

উপ—উপবাস, উপাসনা, উপহার, উপকরণ, উপনয়ন, উপন্যাস, উপঢৌকন, উপজীবিকা, উপচার, উপদেশ, উপযাচক, উপনিবেশ।

রোগীর অবস্থা ভাল নয়, আজ আবার কয়েকটি নূতন **উপসর্গ** দেখা গিয়াছে।

সেজদি তিনখানি 'ভারতের নারী' **উপহার** পাইয়াছেন।

আ—আচরণ, আকর্ষণ, আরাধনা, আচ্ছাদন, আদেশ, আগমন, আহার, আধার, আদান, আকুল, আকুঞ্চিত, আবেদন, আকণ্ঠ।

তোমাদের এই **আচরণ** সমর্থন করা যায় না।

আকণ্ঠ ভোজন করিয়াছি, আর স্থান নাই।

(খ) বাংলা উপসর্গ

অ, আ—অভাব, মন্দ ও নিন্দিত অর্থে।

অবেলা, অপয়া, অদিন, আকাট, অজানা, অখুশী, অচেনা, অনামা, অথই, আগাছা, আকাঁড়া, আলুনী, আধোয়া, আছোলা, আচালা, আঘাটা।

অদিনে যাত্রা করতে নেই, **অবেলায়** যেতে নেই।

তোমার মত **অপয়া** আর দেখিনি।

আমার সখের বাগানটি **আগাছায়** ভ'রে গিয়েছে।

আঘাটায় নাইতে গেলে কেন ?

অনা—অভাব, অশুভ অর্থে।

অনাদায়, অনামুখো, অনাসৃষ্টি।

তোমার মুখে যত সব **অনাসৃষ্টি** কথা।

অনামুখোরা বলে কি? কী ওরা চায়?

নি—নাই অর্থে।

নিঝুম, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ।

ছেলেটি কবে থেকে **নিখোঁজ** হয়েছে?

নিঝুম রাত, বড় ভয় করছে।

ভর—পূর্ণ অর্থে।

ভরপেট, ভরদিন, ভরসাঁজ, ভরপুর।

এমন **ভরপেট** রসগোল্লা খাওয়া অনেকদিন হয় নি।

হা—নাই অর্থে।

হাভাত, হাঘর, হাপুত।

হাঘরের ঘর হ'ল, **হাভাতের** ভাত হ'ল।

(গ) বিদেশী উপসর্গ

কতকগুলি আরবী, ফার্সী উপসর্গযুক্ত শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়; কয়েকটি ইংরেজি শব্দও বাংলায় উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়।

বে—বেআক্কেল, বেকার, বেসুর, বেচাল, বেআইন, বেকায়দা, বেগতিক, বেমালুম, বেরসিক, বেবন্দোবস্ত, বেনামী, বেহাত, বেজার, বেহেড্, বেইজ্জত, বেইমান, বেওয়ারিশ, বেকসুর, বেকায়দা, বেদখল, বেপরোয়া, বেহায়া, বেফাঁস।

বেগতিক দেখলেই অধিকাংশ লোক সরে পড়ে।

বেকায়দায় পড়ে গিয়ে হাতটি ভেঙ্গে গেল।

না—নাহক, নাছোড়, নাচার, নাবালক।

গর—গরমিল, গরহজম, গরহাজির, গরহিসাবী।

দর—দরকচা, (দরকাঁচা) দরখাস্ত, দরদালান, দরদস্তর।

বদ—বদমেজাজ, বদরাগ, বদহজম, বদখেয়াল, বদমাইস।

নিম—নিমরাজি, নিমখুন।

ফি—ফিরোজ, ফিহাত, ফিবছর, ফিসন।

হর—হরদিন, হররোজ।

ইংরেজি **হাফ, ফুল** ও **হেড** বাংলায় বহুলভাবে উপসর্গরূপে ব্যবহার করা হয়।

হাফ-সার্ট, হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-স্কুল, হাফ-টিকিট, হাফ-মোজা, হাফ-হাতা, হাফ-গিনি, হাফ-ইয়ার্লি, হাফ-পে।

ফুল-প্যাণ্ট, ফুল-মোজা, ফুল-হাতা, ফুল-সার্ট, ফুল-পে।

হেড-মাষ্টার, হেড-পণ্ডিত, হেড-ক্লার্ক, হেড-আপিস, হেড-কনষ্টেবল, হেড-মিস্ত্রী।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উপসর্গযুক্ত পদগুলি দেখাইয়া কোথায় কি অর্থে উপসর্গের প্রয়োগ হইয়াছে বল:—

(ক) ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।

(খ) নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান সাধুর ধর্ম।

(গ) তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।

(ঘ) তোমার এ নাছোড়বান্দা ভাব কেন?

(ঙ) তোমার ভাইয়ের মত বদমেজাজী লোক আমার চোখে পড়ে নি।

২। চারিটি সংস্কৃত উপসর্গ ও চারিটি বাংলা উপসর্গযুক্ত পদ দ্বারা বাক্য রচনা কর।

৩। গ্রহ্ ও ভূ ধাতুর পূর্বে উপসর্গ বসাইয়া কয়টি শব্দ গঠন করিতে পার, লিখ এবং শব্দগুলির অর্থ বল।

[নির্দেশক ও অনির্দেশক প্রত্যয়]

বস্তু নির্দেশ করিবার জন্য টা, টি, টে, গাছি, গাছা, খানি, খানা, খান প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যয়গুলির প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তাহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

টা ও **টি** দুইটিই নির্দেশক প্রত্যয়—বড় জিনিষ বুঝাইবার জন্য **টি** ব্যবহৃত হয় না। অনাদর, তাচ্ছিল্য বা অশ্রদ্ধার ভাব বুঝাইবার জন্য **টা** ব্যবহার করা হয়।

বাঁদরটা এই রোদে গেল কোথায় ?

চোর**টাকে** ধরতে পারা গেল না।

পক্ষান্তরে **টি** বক্তার স্নেহ ও আদর বুঝায়।

মেয়ে**টির** গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

আমাদের ছেলে**টি**, নাচে যেন ঠাকুর**টি**।

তুলনীয়—ওদের ছেলেটা, খায় যেন এতটা, নাচে যেন হাতীটা। **টে** প্রত্যয়ের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই, স্বরসঙ্গতির প্রভাবে অনেক সময় **টি টে** হইয়া যায়।

একটি পয়সা, দুটো টাকা, তিনটে আম।

সর্বনাম পদের উত্তর **টি** বা **টা** যুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়। কয়েকটি—কয়েকটা ; যেটি—যেটা ; যতটি—যতটা ; যেমনটি—যেমনটা ; এতটি—এতটা ; এটি—এটা ; কয়টি—কয়টা।

টি, টা-এর মতন **খানি, খানা**তেও অনুরূপ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

খানি, খানা বা খান সংস্কৃত খণ্ড শব্দ হইতে উৎপন্ন।

আধখানা রুটি অর্থ রুটির অর্ধেক অংশ।

চারখানা মাছ অর্থ মাছের চারটি টুকরা।

বইখানা, মুখখানি, পাঁচখানা, চারখানি, চেহারাখানা, বাগানখানা।

সারা দিন রোদে ঘুরে ঘুরে রাধাবিলাস বাবুর **মুখখানি** শুকিয়ে গিয়েছে। দিন রাত পাখার নীচে বসে বসে সুজনবাবু **চেহারাখানা** বেশ বাগিয়েছেন।

গাছি, গাছা, গাছ—যে সমস্ত জিনিষ দীর্ঘ অথচ দৈর্ঘ্যের অনুপাতে স্থূলত্ব কম সেই সব জিনিষের সঙ্গে গাছি, গাছা যোগ করা হয়।

লাঠিগাছা, মালাগাছি, পাঁচ-সাতগাছি লিকলিকে সরু ডাটা, ছ গাছা ক'রে বারগাছা চুড়ি।

ছবিগাছা, মেয়েগাছি, কলমগাছি—এইরূপ ব্যবহার বাংলায় অচল। অভগ্ন অর্থাৎ অখণ্ড জিনিষ বুঝাইতে **গোটা** ব্যবহৃত হয়।

গোটা কাঁঠাল, গোটা তরমুজ, গোটা চারেক আম, গোটা দশেক পান্তুয়া।

টু, টুকু, টুকুন, টুক—ক্ষুদ্র বা সামান্য অংশ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। চারসের চালের ভাত ভাতটুকু নয়, পাঁচসেরী হাড়ির দৈ দৈটুকু নয়।

জলটুকুও পেটে থাকছে না।

আধভরিটেক জর্দা রোজ খেলে অম্বলের আর দোষ কি ?

রোদটুকু বেশ মিষ্টি লাগছে।

ক্ষীরটুকু খেয়ে ফেলুন।

অনির্দেশক প্রত্যয় (ইংরাজি A and An-এর মত) বাংলায় তেমন কিছু নাই। 'এক' শব্দটি অনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ করে মাত্র।

এক রকম, এক পেয়ালা।

পাঁচটি টাকা দরকার—টি অনির্দেশক।

তোমার দেওয়া টাকা পাঁচটি খরচ হইয়া গিয়াছে। টি নির্দেশক 'জন' শব্দটিও অনির্দেশকভাবে ব্যবহৃত হয়। তিনজন লোক, সাতজন চোর।

বাক্য-প্রকরণ

[বাক্যের প্রকারভেদ]

অর্থের দিক হইতে বাক্যের শ্রেণীবিভাগ করা যায়, আবার গঠনের দিক হইতেও বাক্যকে কয়েকটি বিশেষ প্রকারে ভাগ করা যায়।

অর্থের দিক হইতে বাক্যের সচরাচর প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ :—

(১) **নির্দেশাত্মক**—কোনও কথা সাধারণভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়।

সুতরাং এই প্রকার বাক্যের মধ্যে আবার দুইটি শ্রেণী দেখা যায় : (ক) অস্ত্যর্থক ও (খ) নাস্ত্যর্থক।

অস্ত্যর্থক—দয়া পরম ধর্ম।

নাস্ত্যর্থক—দয়ার ন্যায় ধর্ম আর নাই।

(২) **প্রশ্নাত্মক**—কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

তুমি কি কাল বাড়ী গিয়াছিলে ?

তাহারা কি খাইয়াছে ?

(৩) **ইচ্ছাত্মক**—ইচ্ছা, আশীর্বাদ প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়।

তুমি দীর্ঘজীবন লাভ কর।

দশের ও দেশের মঙ্গল হোক।

(৪) **অনুজ্ঞাত্মক**—কোন আদেশ বা অনুরোধ এই শ্রেণীর বাক্যে প্রকাশিত হয়।

এখন সভা ভঙ্গ হোক।

তুমি এখন বাড়ী যাও।

আপনারা কাল আসিবেন।

(৫) **কার্যকারণাত্মক**—একটি ঘটনা বা কার্য অন্য একটি ঘটনা বা কার্যের উপর যদি নির্ভর করে, তবে এই শ্রেণীর বাক্য গঠিত হয়।

"যদি বর্ষে আগনে, রাজা যান মাগনে
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।"

(৬) **আবেগাত্মক**—ভয়, বিনয় প্রভৃতি মনোভাব এই শ্রেণীর বাক্যে প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড!

কি রমণীয় প্রভাত!

বাক্যের অর্থের কোন পরিবর্তন না করিয়া নির্দেশাত্মক বাক্যকে প্রশ্নবোধক বাক্যে, এবং অস্ত্যর্থক বাক্যকে নাস্ত্যর্থক বাক্যে পরিবর্তনের নাম বাক্যের রূপান্তর-সাধন।

[বাক্যান্তরীকরণ]

নির্দেশাত্মক হইতে প্রশ্নবোধক

নির্দেশাত্মক—খাঁটি ঘি আজকাল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নবোধক—খাঁটি ঘি আজকাল কোথায়ই বা পাওয়া যায়?

নির্দেশাত্মক—পৃথিবী গোল।

প্রশ্নবোধক—পৃথিবী কি গোল নয়?

নির্দেশাত্মক—'পথের পাঁচালী' এ বৎসরের সেরা ছবি।

প্রশ্নবোধক—'পথের পাঁচালী' কি এ বৎসরের সেরা ছবি নহে?

অনুজ্ঞাত্মক বা আবেগাত্মক হইতে নির্দেশাত্মক

অনুজ্ঞাত্মক—তুমি এখন পড়িতে বস।

নির্দেশাত্মক—আমি আদেশ করিতেছি তুমি এখন পড়িতে বস।

অথবা, তোমাকে এখন পড়িতে বসিতে আমি আদেশ করিতেছি।

আবেগাত্মক—কী মনোরম সূর্যাস্তের দৃশ্য!

নির্দেশাত্মক—সূর্যাস্তের দৃশ্যটি বড়ই মনোরম।

অস্ত্যর্থক হইতে নাস্ত্যর্থক

অস্ত্যর্থক—তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।

নাস্ত্যর্থক—তুমি ছাড়া কেহ আমার সঙ্গে যাইবে না।

অস্ত্যর্থক—তোমাকে এখন ঘুমাইতে হইবে।

নাস্ত্যর্থক—তোমার এখন না ঘুমাইলে চলিবে না।

অস্ত্যর্থক—আমাদের বাড়ীর সম্মুখে একটি বাগান আছে।

নাস্ত্যর্থক—আমাদের বাড়ীর সম্মুখে যে বাগান নাই তা নয়।

অস্ত্যর্থক—তোমার সম্বন্ধে আমি সর্বদাই চিন্তা করি।

নাস্ত্যর্থক—তোমার সম্বন্ধে যে আমি সর্বদা চিন্তা করি না তা নয়।

অস্ত্যর্থক—নিজের আহার সম্বন্ধে রামবাবু সচেতন।

নাস্ত্যর্থক—নিজের আহার সম্বন্ধে রামবাবু অচেতন নহেন।

গঠনের দিক হইতে আবার বাক্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সরল, জটিল ও যৌগিক। অর্থের কোন তারতম্য না করিয়া এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্যশ্রেণীতে পরিবর্তিত করা যায়। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

সরল হইতে জটিল

সরল—আমি তাহার নাম জানি না।

জটিল—তাহার নাম কি তাহা আমি জানি না।

সরল—মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না।

জটিল—যে মিথ্যা কথা বলে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না।

সরল—পাপী লোকেরা সর্বদা মানসিক অশান্তি ভোগ করে।

জটিল—যাহারা পাপী লোক তাহারা সর্বদা অশান্তি ভোগ করে।

সরল—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

জটিল—আমার যতদূর সাধ্য আমি ততদূর চেষ্টা করিব।

সরল—শরণাগত-রক্ষণ সাধুর ধর্ম।

জটিল—যাহারা শরণাগত তাহাদিগকে রক্ষা করা সাধুর ধর্ম।

সরল হইতে যৌগিক

সরল—রান্না করিবার জন্য কাঠ আন।

যৌগিক—রান্না করিতে হইবে, কাঠ আন।

সরল—আমি তোমাদের গ্রামে গিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

যৌগিক—আমি তোমাদের গ্রামে গেলাম ও ফিরিয়া আসিলাম।

সরল—দরিদ্র হইলেও তাঁহার মন ছোট নয়।

যৌগিক—তিনি দরিদ্র কিন্তু তাঁহার মন ছোট নয়।

সরল—সে অসুস্থ বলিয়া পরীক্ষা দিতে পারিল না।

যৌগিক—সে অসুস্থ ছিল, সেইজন্য পরীক্ষা দিতে পারিল না।

সরল—সত্য কথা বলাতে তোমাকে কিছু বলিলাম না।

যৌগিক—তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, এইজন্য তোমাকে কিছু বলিলাম না।

জটিল হইতে সরল

জটিল—তুমি যে পুরস্কার পাইয়াছ এ কথা শুনিয়াছি।

সরল—তোমার পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনিয়াছি।

জটিল—যে মিথ্যা কথা বলে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না।

সরল—মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না।

জটিল—যাঁহারা বিনয়ী তাঁহারা কটুকথা বলেন না।

সরল—বিনয়ী লোকেরা কটুকথা বলেন না।

জটিল—তুমি যে ঘরে বসিয়া থাক, উহা এত অন্ধকার কেন?

সরল—তোমার বসিবার ঘর এত অন্ধকার কেন?

জটিল—যে ভদ্রলোকটি গাড়ী চাপা পড়িয়াছিলেন, তিনি এখন ভাল হইয়াছেন।

সরল—গাড়ীচাপা-পড়া ভদ্রলোকটি এখন ভাল হইয়াছেন।

জটিল হইতে যৌগিক

জটিল—যখন বড় হইবে তখন সব কথা বুঝিতে পারিবে।

যৌগিক—বড় হও, সব কথা বুঝিতে পারিবে।

জটিল—যদিও সে মূর্খ, তবুও তাহার অহঙ্কার কম নয়।

যৌগিক—সে মূর্খ কিন্তু তাহার অহঙ্কার কম নয়।

জটিল—যদি সত্য কথা বল, তবে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

যৌগিক—সত্য কথা বল, তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

জটিল—সেদিন যে বইখানি হারাইয়াছিলাম, আজ তাহা পাইয়াছি।

যৌগিক—সেদিন এই বইখানি হারাইয়াছিলাম, আজ ইহা পাইয়াছি।

জটিল—যদি বড়বাজার হইতে মাল কেন, তবে ভাল লাভ হইবে।

যৌগিক—বড়বাজার হইতে মাল কেন, ভাল লাভ হইবে।

যৌগিক হইতে সরল

যৌগিক—দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইলেন এবং কয়েকদিন মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

সরল—দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

যৌগিক—এখনই বাহির হও, নতুবা সময়মত উপস্থিত হইতে পারিবে না।

সরল—এখনই বাহির না হইলে সময়মত উপস্থিত হইতে পারিবে না।

যৌগিক—আমি পারি নাই কিন্তু তুমি পারিবে।

সরল—আমি না পারিলেও তুমি পারিবে।

যৌগিক—এখন হইতে সাবধান হও, নতুবা শক্ত অসুখ দেখা দিবে।

সরল—এখন হইতে সাবধান না হইলে শক্ত অসুখ দেখা দিবে।

যৌগিক—ছেলেটি অনেক পড়াশুনা করিয়াছিল, কিন্তু পাশ করিতে পারে নাই।

সরল—ছেলেটি অনেক পড়াশুনা করিয়াও পাশ করিতে পারে নাই।

যৌগিক হইতে জটিল

যৌগিক—আমার অর্থ নাই, এজন্য আমি দুঃখিত নই।

জটিল—যদিও আমার অর্থ নাই তথাপি আমি দুঃখিত নই।

যৌগিক—সময়ে কাজ করি নাই, অতএব এখন দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

জটিল—যখন সময়ে কাজ করি নাই, তখন দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

যৌগিক—সে সারাজীবন খাটিয়া গেল, তবু দারিদ্র্য দূর হইল না।

জটিল—যদিও সে সারাজীবন খাটিয়া গেল, তবু দারিদ্র্য দূর হইল না।

যৌগিক—বাবু না খেয়ে কাছারি চলিয়া গেলেন, তথাপি মা উঠিলেন না।

জটিল—যদিও বাবু না খেয়ে কাছারি চলিয়া গেলেন, তথাপি মা উঠিলেন না।

যৌগিক—এখন অপব্যয় কর, ভবিষ্যতে কষ্টে পড়িবে।

জটিল—যদি এখন অপব্যয় কর, ভবিষ্যতে কষ্টে পড়িবে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে **জটিল** বাক্যে পরিণত কর :—

(১) সুশীলবাবুর বাসা আমি চিনি।
(২) এই নূতন দোকানখানার মালিককে আমরা চিনি না।
(৩) যত্ন বিনা রত্ন লাভ হয় না।
(৪) গৃহহীন, অভিভাবকহীন বালকটির প্রতি সদয় হও।
(৫) অসৎকে ঘৃণা কর।
(৬) অহঙ্কারীকে কেহ ভালবাসে না।
(৭) তোমার শরীরে বল নাই কিন্তু মনে বল আছে।
(৮) কথা শুন, নচেৎ আমি তোমাকে কিছুই দিব না।
(৯) তিনি দরিদ্র বটে, কিন্তু তাঁহার মন উচ্চ।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে **যৌগিক** বাক্যে পরিবর্তন কর :—

(১) যদিও তিনি ধনী, তথাপি তাঁহার অহঙ্কার নাই।
(২) তাহার গান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিলাম।
(৩) যদি কথা না শুন, আমি তোমাকে শাস্তি দিব।
(৪) তুমি আমার বন্ধু বলিয়া তোমাকে কিছু বলিলাম না।
(৫) যখন সাবধান হই নাই, তখন ফল ভুগিতেই হইবে।
(৬) বড় হইতে হইলে আগে ছোট হও।
(৭) লোকটি কৃপণ বলিয়া সকলেই তাহার নিন্দা করে।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে **সরল** বাক্যে পরিবর্তিত কর :—

(১) সে আমার বন্ধু, সেইজন্য তাহাকে স্নেহ করি।
(২) পিতামাতা আমাকে ভালবাসেন কারণ আমি কখনও তাঁহাদের অবাধ্য হই না।
(৩) আর কিছু টাকা দাও, নতুবা চালাইব কি করিয়া?
(৪) লোকটি দেখিতে মোটা বটে, কিন্তু গায়ে বিশেষ বল নাই।
(৫) আমার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলিয়াছি।
(৬) যাহারা কুকর্ম করে, তাহারা তাহার ফলভোগ করে।
(৭) যখন বিপদ আসিবে, তখন আমার পাশে দাঁড়াইও।
(৮) আমি যে সেওড়াফুলি যাইতেছি তাহা তোমাকে কে বলিল?

(৯) যদিও আমরা দরিদ্র তথাপি আমরা দুঃখী নই।

(১০) তোমরা আমার উপকার করিয়াছ, সেজন্য চিরদিন তোমাদের নিকট ঋণী থাকিব।

[বাচ্য ও বাচ্য-পরিবর্তন]

ক্রিয়া যাহাকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া কার্য সম্পাদিত করে সেই অনুসারে ক্রিয়ার রূপে ভেদ দেখা যায়; ক্রিয়ার এইপ্রকার রূপভেদের নাম বাচ্য।

বাচ্য চার প্রকার—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য।

কর্তৃবাচ্য ঃ যে বাচ্যে ক্রিয়া কর্তার সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হয়, তাহাকে কর্তৃবাচ্য বলে। কর্তৃবাচ্যে কর্তার অর্থই প্রধানরূপে প্রতীত হয়।

আমরা খাইয়াছি। শিশির পড়িতেছে। তাহারা চাঁদ দেখিতেছে।—এই বাক্যগুলির ক্রিয়াপদ কর্তৃবাচ্য।

কর্মবাচ্য ঃ যে বাচ্যে ক্রিয়া কর্মের সহিত প্রধানভাবে অন্বিত হয়, তাহাকে কর্মবাচ্য বলে। কর্মবাচ্যে কর্মের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীত হয়।

সকর্মক ধাতুই কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হয়। কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা ও কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

গ্রামবাসিগণ কর্তৃক দস্যু ধৃত হইয়াছে। বালক দ্বারা চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে।

ভাববাচ্য ঃ যে বাচ্যে ভাব অর্থাৎ ক্রিয়ার অর্থই প্রধান, তাহা ভাববাচ্য। ভাববাচ্যের ক্রিয়াপদটি সব সময় প্রথম পুরুষের হইয়া থাকে। ভাববাচ্যের ক্রিয়া 'হ' ধাতু হইতে জাত অকর্মক ক্রিয়া।

তাঁহার খাওয়া হইয়াছে। আমার যাওয়া হইবে না। তোমায় এখন পড়িতে হইবে।

ভাববাচ্যে কর্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, কখনও দ্বিতীয়া বিভক্তিও হইয়া থাকে। আমাকে যাইতে হইবে। তোমাকে যাইতে হইবে।

কর্মকর্তৃবাচ্য ঃ কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মটিকেই কর্তার মত দেখায়। এখানে ক্রিয়াপদটির রূপ কর্তৃবাচ্যের রূপ, কিন্তু ক্রিয়ার অন্বয় কর্মের সহিত। অর্থাৎ কর্তার সাহায্য ছাড়াই এখানে কর্ম সম্পাদিত হয়।

ঘণ্টা বাজে। জামা ছেঁড়ে। বাঁশ ভাঙ্গে। ছেলেটিকে রোগা দেখায়। ফল পাকে।

বাচ্যপরিবর্তন বা বাচ্যান্তরীকরণের অর্থ এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যের বাক্যে পরিবর্তন করা। কেবল ক্রিয়াপদটি পরিবর্তন করিলে চলে না, সমস্ত বাক্যটিরই পরিবর্তিত রূপ লিখিতে হয়।

এই কয়টি পরিবর্তন হইতে পারে :

(১) কর্তৃবাচ্য হইতে কর্মবাচ্যে পরিবর্তন
(২) কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিবর্তন
(৩) কর্মবাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন
(৪) ভাববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন।

(১) **কর্তৃবাচ্য**—আমি বইখানি পাঠ করিয়াছি।
কর্মবাচ্য—আমাকর্তৃক (আমাদ্বারা) বইখানি পঠিত হইয়াছে।
কর্তৃবাচ্য—তিনি কখনই এই কার্য সম্পাদন করেন নাই।
কর্মবাচ্য—তৎকর্তৃক (তাঁহাদ্বারা) কখনই এই কার্য সম্পাদিত হয় নাই।
কর্তৃবাচ্য—আমি আকাশে চাঁদ দেখিয়াছি।
কর্মবাচ্য—আমাকর্তৃক আকাশে চাঁদ দৃষ্ট হইয়াছে।
আমাদ্বারা আকাশে চাঁদ দেখা হইয়াছে।

(২) **কর্তৃবাচ্য**—আপনি কি এখন যাইবেন ?
ভাববাচ্য—আপনার কি এখন যাওয়া হইবে ?
কর্তৃবাচ্য—আমি এখন শুইতে যাইব।
ভাববাচ্য—এখন আমাকে শুইতে যাইতে হইবে।
কর্তৃবাচ্য—প্রত্যহ আহারের পর তুমি শুইতে যাইবে।
ভাববাচ্য—প্রত্যহ আহারের পর তোমায় শুইতে যাইতে হইবে।

(৩) **কর্মবাচ্য**—রাবণ রাম কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।
কর্তৃবাচ্য—রাম রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন।
কর্মবাচ্য—শিক্ষক মহাশয় ছাত্রগণের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন।
কর্তৃবাচ্য—ছাত্রগণ শিক্ষক মহাশয়কে অভিনন্দন করিয়াছিল।
কর্মবাচ্য—দরিদ্রগণ ধনীদের দ্বারা অনেক সময় উৎপীড়িত হয়।
কর্তৃবাচ্য—ধনীরা দরিদ্রগণকে অমেক সময় উৎপীড়ন করেন।

(৪) **ভাববাচ্য**—রাত্রিতে আমার কিছু খাওয়া হইবে না।
কর্তৃবাচ্য—রাত্রিতে আমি কিছু খাইব না।
ভাববাচ্য—আপনার কোন্ বাসায় থাকা হয়?
কর্তৃবাচ্য—আপনি কোন্ বাসায় থাকেন?
ভাববাচ্য—তোমার আজ বৃষ্টিতে বাহির হওয়া হইবে না।
কর্তৃবাচ্য—তুমি আজ বৃষ্টিতে বাহির হইবে না।

[শব্দ ও বাক্যাংশের বিশেষ অর্থে প্রয়োগ]

[বিশেষ্য পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ]

মাথা

(১) তোমার দেখছি অঙ্কে খুব ভাল **মাথা**।
(২) চক্রবর্তী মশাই আমাদের গ্রামের **মাথা**।
(৩) হঠাৎ রাগের **মাথায়** কোন কাজ করা উচিত নয়।
(৪) দিদিমা আদর দিয়ে নাতিটির **মাথা** খেয়েছেন।
(৫) তোমার আচরণে আমাদের সকলের **মাথা** হেঁট হয়েছে।
(৬) একটু উপকার করেই ভেবো না একেবারে **মাথা** কিনে ফেলেছ।

গা

(১) কোনও কাজেই **গা** করছ না কেন?
(২) **গা** ঢাকা দেওয়া ছাড়া তার আর উপায় কি?
(৩) সে ভয়ানক দিনের কথা মনে করলে এখনও **গায়ে** কাঁটা দেয়।
(৪) **গায়ে** ফুঁ দিয়ে বেড়ান যাদের অভ্যাস, তাদের উপর কি এত বড় কাজের ভার দেওয়া যায়?
(৫) সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে ষোলজন ডাকাত একসঙ্গে **গা** ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মুখ

(১) ছেলের **মুখ** চেয়ে এতদিন কোনরকমে বুড়ী বেঁচে ছিল।
(২) **মুখ** নাড়া সহ্য করবো না, **মুখ** সামলে কথা কইবে।
(৩) ভগবান যদি **মুখ** রাখেন তবেই এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।
(৪) তোমার **মুখ** ভার দেখছি কেন?
(৫) তোমাদের **মুখে** ফুলচন্দন পড়ুক।

চোখ

(১) এখনও তোমার **চোখ** ফুটল না ?

(২) তোমার **চোখ** রাঙানি সহ্য করবো না।

(৩) গয়লার **চোখের** চামড়া নেই, যে হারে দুধে জল দিচ্ছে।

(৪) মাঝে মাঝে **চোখের** দেখা যেন পাই।

(৫) **চোখের** মাথা খেয়েছ বুঝি ? ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

(৬) মনকে **চোখ** ঠেরে কিছুই লাভ হয় না।

হাত

(১) **হাত** খরচের টাকা নাই, মাসের শেষে কোথায় **হাত** পাতবো ?

(২) দশজন লোককে **হাত** করতে যে পারে, সেইতো ভোট পায়।

(৩) একবার **হাতে** পেলে মজা বুঝিয়ে ছাড়ব।

(৪) ডাক্তারিতে **হাত** যশই হ'ল বড় কথা।

(৫) **হাতে** কলমে কাজ না করলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

বুক

(১) ভয় কি ? সাহসে **বুক** বাঁধ।

(২) **বুক** ঠুকে তো দাঁড়ালে, কিন্তু ওর সঙ্গে পারবে কি ?

(৩) বিপদে পরের জন্য এমন **বুক** পেতে দেওয়া আর দেখি নি।

(৪) **বুক** ফাটে তবু মুখ ফুটে না।

বিশেষণ পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কড়া—কড়া কথা, কড়া ওষুধ, কড়া আঁচ, কড়া হুকুম, কড়া পাহারা, কড়া মেজাজ, কড়া পাক, কড়া রোদ, কড়া শাসন।

কাঁচা—কাঁচা বয়স, কাঁচা রাস্তা, কাঁচা গাঁথুনি, কাঁচা রং, কাঁচা কাজ, কাঁচা খাতা, কাঁচা পয়সা, কাঁচা ঘুম, কাঁচা দুধ, কাঁচা ছেলে, কাঁচা মাল।

পাকা—পাকা চোর, পাকা কথা, পাকা দেখা, পাকা খাতা, পাকা সোনা, পাকা দলিল, পাকা ঘুঁটি, পাকা মাথা, পাকা হাড়।

ভাঙ্গা—ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা মন, ভাঙ্গা টাকা, ভাঙ্গা বুক, ভাঙ্গা আসর, ভাঙ্গা হাট, ভাঙ্গা শরীর।

সাদা—সাদা কাগজ, সাদা রং, সাদা চোখ, সাদা কথা, সাদা মন, সাদা মাথা।

মোটা—মোটা গলা, মোটা বুদ্ধি, মোটা কাজ, মোটা বেতন, মোটা ভাত, মোটা টাকা।

বড়—বড় বৌ, বড় বাড়ী, বড় মন, বড় ঘর, বড় নজর, বড় দিন, বড় কুটুম, বড় বিদ্যা, বড় সরিক, বড় বাবু, বড় সাহেব।

ছোট—ছোট মন, ছোট নজর, ছোট লোক, ছোট আদালত, ছোট কাজ, ছোট সাহেব, ছোট জাত।

খোলা—খোলা মন, খোলা কথা, খোলা হাওয়া, খোলা ঘর, খোলা চুল, খোলা রাস্তা।

পোড়া—পোড়া কাঠ, পোড়া কপাল, পোড়া মুখ, পোড়া চোখ, পোড়া ভাগ্য, পোড়া বিধি।

উচ্চ—উচ্চ মূল্য, উচ্চ মন, উচ্চ নজর, উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ কণ্ঠ, উচ্চ বেতন, উচ্চ ধ্বনি, উচ্চ হৃদয়।

নরম—নরম কথা, নরম গলা, নরম মেজাজ, নরম বাজার, নরম মুড়ি, নরম স্বর, নরম মাছ, নরম বিছানা।

বাঁকা—বাঁকা সীঁথি, বাঁকা লাঠি, বাঁকা কথা, বাঁকা বুদ্ধি, বাঁকা চাহনি, বাঁকা শ্যাম।

একই ক্রিয়াপদের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

লাগা—(১) জামায় কালির দাগ লেগেছে। (২) কাজে মন লাগছে না। (৩) সারাদিনই ছেলেটার পিছনে লেগে আছ দেখছি। (৪) কাপড়ে খোঁচা লেগেছে। (৫) এই কথাটি মনে লাগছে না। (৬) নৌকা ঘাটে লাগল বুঝি? (৭) আগুন লেগেছে কোন্ পাড়ায়? (৮) মুখে শেষ পর্যন্ত চুণকালি লাগল তো? (৯) ভাঙ্গা মন জোড়া লাগে না। (১০) চুল টানছ কেন? লাগছে যে।

উঠা—(১) উঠ শিশু মুখ ধোও। (২) যা খাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গেই তা উঠে যাচ্ছে। (৩) তোমরা আবার নতুন বাসায় উঠে এলে কবে? (৪) এতসব জিনিস পেয়েও বরকর্তার মন উঠল না। (৫) সরস্বতীপূজায় কত টাকা চাঁদা

উঠল? (৬) এ রংটা বোধহয় শেষ পর্যন্ত উঠে যাবে। (৭) তোমার নিশ্চয়ই চোখ উঠেছে। (৮) হাই উঠছে, ঘুম পেয়েছে। (৯) বর্ষা এসে পড়ল, কিন্তু বাজারে পটল উঠছে না কেন?

কাটা—(১) রোগীর এখন তখন অবস্থা, দিন কাটে তো রাত কাটে না। (২) কলেজে ঢুকবার আগে তো বাবলুর এমন তেড়ি কাটা দেখিনি। (৩) ফাঁড়া বোধহয় কাটল। (৪) চিমটি কাটছ কেন? (৫) কোন বই এবার তেমন কাটবে না। (৬) গান গাইলে বটে, কিন্তু তিনবার তাল কাটল। (৭) ধারেও কাটে, ভারেও কাটে। (৮) ধান কাটা এখন শেষ হয়েছে। (৯) জামা পোকায় কেটেছে।

পড়া—(১) অনেকক্ষণ থেকেই জল পড়ছে। (২) তোমাদের বাইরের ঘরটি তো পড়েই আছে, ঐখানে লাইব্রেরীটা বসালে হয় না? (৩) এবার শীত পড়ছে না কেন? (৪) কাটারির ধারটা একেবারে পড়ে গিয়েছে। (৫) এই বয়সেই মাথায় এমন টাক পড়ল কেন? (৭) জিনিসপত্রের দাম না পড়লে মধ্যবিত্তের বাঁচা দায়। (৭) দুর্জনের পাল্লায় পড়ে দুর্দশার একশেষ হ'ল।

রাখা—(১) ধামাটা এখানে রাখলে কে? (২) ছেলেটা বেঁচে থাকলে বাপের নাম রাখবে তা বলে দিচ্চি। (৩) সামান্য অনুরোধটা আশা করি রাখবেন। (৪) গরীবকে প্রাণে মারবেন না, পায়ে রাখবেন। (৫) ছেলেটি কারও কথা গ্রাহ্য করে না, কারও তোয়াক্কা রাখে না।

আসা—(১) অনেকদিনই মনে করি, কিন্তু আসা হয়ে ওঠে না। (২) লিখতে বসলে একটা কথাও মনে আসে না। (৩) দোকানটি কেমন হয়েছে, দু'পয়সা আসছে তো? (৪) ঝড় আসছে আর বাইরে থেকো না। (৫) বিপদ কখনও একা আসে না।

করা—(১) অসুখ করেছে খবর পেয়ে ডাক্তারবাবু গাড়ী করে এলেন। (২) মাসীমা মুখ গম্ভীর করে বসেছিলেন। (৩) ডাক্তারবাবু বললেন যে, তিন দাগ ওষুধেই তিনি ভাল করে দেবেন। (৪) ইচ্ছা করে সাঁতার কাটি, কিন্তু ভয় করে। (৫) হাট বাজার করব, না ছেলে মানুষ করব, ভেবে পাই না।

খাওয়া—(১) পান তামাক না খেয়েই ভাদুড়ী মশাই উঠলেন যে! (২) কথায় কথায় ধমক খেলে কি আনন্দের সঙ্গে কাজ করা যায়? (৩) ঘুষ

খাওয়া তার বহুদিনের অভ্যাস, এখন ছাড়া শক্ত। (৪) রোগী খাবি খাচ্ছে। (৫) অনেক নুন খেয়েছ, তোমার একাজ করা সঙ্গত হয় নাই। (৬) সামান্য চাকরিটা পাঁচজনে মিলেই খেলে! (৭) সংসারে সবাই হাবুডুবু খাচ্ছে, তুই একজন যা আরামে আছে।

ছাড়া—(১) এই বদ অভ্যাসটা ছাড়। (২) জ্বর ছেড়েছে, আর ভয় নেই। (৩) গলা ছেড়ে গান গাইতে পার না কেন? (৪) জনতা এক্সপ্রেস ঠিক ক'টায় ছাড়ে বল দেখি। (৫) এখন তোমায় ছাড়া হবে না। (৬) নাড়ী ছাড়ছে, এখন হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি? (৭) ছেড়ে কথা কইবার লোকই তিনি কিনা! (৮) মদ ছাড়তে না পারলে শেষ পর্যন্ত চাকরি ছাড়তে হবে।

চলা—(১) এখন বাড়ী চল, অনেক হয়েছে। (২) ঘড়িটার দম ফুরিয়েছে, তাই চলছে না। (৩) ছবিটা তো বেশ চলল! (৪) চিরকাল কি সমান চলে? (৫) এ রকম বাঁদরামি এখানে চলবে না। (৬) গানটাই এখন তা হলে চলুক। (৭) ওষুধটা আরও কয়েক সপ্তাহ চলবে। (৮) সৎপথে চল, যা হয় হবে। (৯) বাবা তো চললেন, এখন আমাদের উপায় কি হবে?

দেওয়া—(১) আমাকে কয়েক দিনের ছুটি দিবেন কি? (২) মূলতানী গরু অনেক দুধ দেয়। (৩) এই খবরটি দিয়ে আসবে। (৪) জানলা দাও, ঘরে মশা আসছে। (৫) তারা পরীক্ষা দিতে গেল। (৬) টাকাগুলি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল। (৭) পরের ছেলেকে ভাতকাপড় দিয়ে মানুষ করতে কয়জন পারে? (৮) সেই থেকে কড়া নাড়ছি, কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না। (৯) চিঠিগুলি ডাকে দিয়ে এস।

যাওয়া—(১) দেশে যাও, এখানে থাকলে শরীর মোটেই ভাল যাবে না। (২) ছেলেটা একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে দেখতে পাও না? (৩) মাস গেল, বছর গেল কিন্তু তিনি আর ঘরে ফিরলেন না। (৪) যা মুখে আসে তাই বলে যাচ্ছে। (৫) এ টাকায় সাত দিনও যাবে না মনে হচ্ছে।

লওয়া, নেওয়া—(১) আরও ভাত নাও, ঝোল নাও। (২) ভগবান, অপরাধ নিও না। (৩) এবার দেখে নেব কত ধানে কত চাল। (৪) বাড়ী-ঘর, চাষবাস, উপার্জনের সব পথই গেল, আর কি নিয়ে পাকিস্তানে পড়ে থাকা! (৫) গোবিন্দবাবু প্রতি রবিবার জোলাপ নিতে ভোলেন না।

ধরা—(১) আগামী রবিবারে আমরা মাছ ধরতে যাব। (২) এ

বইখানার যা দাম ধরা হয়েছে তাতে খরচ উঠে লাভ হবে বলে মনে হয় না। (৩) ভাল কথা শুনবে কেন? ওকে যে ভূতে ধরেছে। (৪) ছোড়দাকে ধরে এবার ক্লাবে খেলার ব্যবস্থা করেছি। (৫) সোজা পথ ধরে চল। (৬) দুধটা ধরে গেছে, টের পাচ্ছ না? (৭) চোরদায়ে ধরা পড়েছি নাকি?

বাঁধা—(১) সবাই দল বেঁধে কোন্‌দিকে যাত্রা করছ? (২) সাহসে বুক বাঁধ, ভয় কি? (৩) ট্রাম এ রাস্তার মোড়ে নিশ্চয়ই বাঁধবে। (৪) বিছানাটা বাঁধতে পারলে না? (৫) কমবেশী নাই, সকলেরই বাঁধা বরাদ্দ। (৬) ওসব বাঁধা বুলি অনেক শুনেছি।

দেখা—(১) তার মুখ দেখলেও পাপ হয়। (২) দেখ তো আকাশে মেঘ আছে কিনা। (৩) ডাক্তার দেখছেন, কিন্তু অসুখ ছাড়ছে না। (৪) চেহারা দেখে বোঝা যায় না যে, ইনি এতবড় একজন ধনী। (৫) ঢের দেখেছি, আর দেখতে চাই না। (৬) আমিও দেখে নেব, এর শোধ তুলবো।

থাকা—(১) গাঁয়ে এখন আর কেউ থাকতে চায় না। (২) যা বললাম তা যেন মনে থাকে। (৩) যা অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানও থাকবে না, প্রাণও থাকবে না। (৪) বাজে কথা এখন থাক, কাজের কথা বল। (৫) রাত থাকতেই বেরিয়ে পড়া চাই।

তোলা—(১) ফুল তুলতে তোমরা কে কে যাবে আমার সঙ্গে চল। (২) হাত দু'টি মাথার উপর তোল। (৩) বাক্সটা দোতলায় তুলতে পারবে কি? (৪) এবার বেশী চাঁদা তোলা গেল না। (৫) ছেলেটা আবার হাই তুলছে কেন? (৬) যা খাচ্ছে মেয়েটি সব তুলে ফেলছে।

টানা—(১) জামাটা টানছ কেন? (২) একটু টেনে চলতে হবে, টাকা তো ফুরিয়ে আসছে। (৩) নিজের ভাইয়ের দিকে টেনে কথা সকলেই বলে। (৪) রাতদিন বসে বসে বিড়ি টানছে, ছেলেটার হ'ল কি?

ডাকা—(১) তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকতে হবে। (২) ভগবানকে এক-মনে ডাকলে ফল পাবেই। (৩) আজ গঙ্গায় বান ডাকবে। (৪) চৌধুরী মশায়ের নাক ডাকছে, মনে হয় যেন মেঘ ডাকছে।

বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ

১। **অকাল কুষ্মাণ্ড**—(কোনো কাজের নয়, অপদার্থ)—মুখুজ্জে মশায়ের ছেলেটি একেবারে অকাল কুষ্মাণ্ড।

২। **অগস্ত্য যাত্রা**—(চিরকালের জন্য যাওয়া)—বায়নায় টাকা নিয়ে লোকটা আর এলো না তো—অগস্ত্য যাত্রা করেছে নাকি ?

৩। **অন্ধের যষ্ঠি**—(একমাত্র অবলম্বন) বিধবার আর কেউ নেই—ঐ ছেলেটিই অন্ধের যষ্ঠি।

৪। **অরণ্যে রোদন**—(বৃথা আবেদন) উত্তেজনার সময় হিতকথা বলা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কি ?

৫। **আক্কেল সেলামী**—(বোকামির দণ্ড) তার মতো অপদার্থের ওপর নির্ভর করে আমাকে আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছে।

৬। **আষাঢ়ে গল্প**—(অসম্ভব কাহিনী) নিজের দোষ ঢাকবার জন্য তুমি যে আষাঢ়ে গল্প কাঁদলে হে।

৭। **উত্তম মধ্যম**—(প্রহার) এরকম বদমায়েসকে কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম দেওয়াই উচিত।

৮। **উভয় সঙ্কট**—(দুই দিকেই বিপদ) জমিদারকে তুষ্ট করেন, না প্রজাদের ঠাণ্ডা করেন, নায়েব মশায়ের উভয় সঙ্কট হ'ল।

৯। **একাদশে বৃহস্পতি**—(প্রভূত সৌভাগ্য) ব্যবসাতেও লাভ হ'ল, ছেলেরও মোটা মাইনের চাকরি হ'ল—হরিবাবুর দেখছি একাদশে বৃহস্পতি।

১০। **কলুর বলদ**—(বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ না করে খেটে যাওয়া) আমরা হচ্ছি কলুর বলদ, যেমন চালাও তেমনি চলি।

১১। **কাঁচা পয়সা**—(অর্থ) ব্যাটা চাষা, চাকরিতে কাঁচা পয়সার মুখ দেখে মাথা খারাপ হয়েছে।

১২। **কান পাতলা**—(কোন কথা শুনে বিচার না করে তাইতে বিশ্বাসী) রামবাবু এদিকে দিলদরাজ কিন্তু বড়ো কানপাতলা, তার উপর লাগাবার লোকের অভাব তো নেই।

১৩। **কূপমণ্ডূক**—(বৃহৎ পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য সংকীর্ণচেতা) সমুদ্রযাত্রা বন্ধ হওয়ায় মধ্যযুগের বাঙালী কূপমণ্ডূক হয়ে পড়েছিল।

১৪। **কেঁচেগণ্ডূষ**—(আবার সুরু থেকে আরম্ভ) দেবনাগরী হরফ ভুলেই গিয়েছিলাম, বুড়ো বয়সে এখন কেঁচেগণ্ডূষ করতে হচ্ছে।

১৫। **গড্ডলিকা প্রবাহ**—(ভেড়ার মতো গতানুগতিকতার বশবর্তী) বাঙালী আজ স্বাধীন চিন্তায় অক্ষম, গড্ডলিকা প্রবাহের মতো পরানুগামী।

১৬। **তীর্থের কাক**—(প্রতীক্ষারত) একটু জলের জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে আছি।

১৭। **ধর্মের ষাঁড়**—(নিষ্কর্মা) শিবুদা তো ধর্মের ষাঁড়ের মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

১৮। **গোবর গণেশ**—(অপদার্থ) শ্যামবাবু করিৎকর্মা, কিন্তু তাঁর ছেলেটি তো গোবর গণেশ।

১৯। **গৌরচন্দ্রিকা**—(ভূমিকা) আর গৌরচন্দ্রিকা করতে হবে না, যা বলবার আছে সংক্ষেপে বলে ফেল।

২০। **বাস্তু ঘুঘু**—(মতলববাজ) নিমাইবাবুকে চেনো নি, একটি আসল বাস্তু ঘুঘু।

২১। **চাঁদের হাট**—(সৌন্দর্যের সমাবেশ) সাতভাই আর একটি বোন গাছের নীচে যেন চাঁদের হাট বসিয়ে দিয়েছে।

২২। **চিনির বলদ**—(যাহা ভোগ করা যায় না এমন জিনিসের ভারবাহী) ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী চিনির বলদ ছাড়া আর কি, টাকা গোনাই সার।

২৩। **চোরা বালি**—(অলক্ষ্য বিপদ) জীবনের পথে কত যে চোরাবালি আছে।

২৪। **ডান হাতের কাজ**—(আহার) বিয়ে পরে দেখো, এখন ডান হাতেব কাজটা সেরে নাও।

২৫। **ডুমুরের ফুল**—(দুর্লক্ষ্য) আর যে তোমায় দেখতেই পাই না, ডুমুরের ফুল হয়ে উঠল যে।

২৬। **ঢাকের বাঁয়া**—(যে কোনো লোকের প্রতি কাজে বা কথায় সায় দেয়) তুমি তো তার ঢাকের বাঁয়া হয়ে আছ।

২৭। **দক্ষযজ্ঞ**—(লণ্ডভণ্ড ব্যাপার) পাগলা হাতী ছুটে মেলাটাকে একেবারে দক্ষযজ্ঞ করে তুলল।

২৮। **দুষ্টা সরস্বতী**—(দুষ্ট বুদ্ধি) তার মাথায় দুষ্টা সরস্বতী ভর করেছে।

২৯। **ননীর পুতুল**—(আদরে লালিত, কষ্ট সহিতে অক্ষম) তোমার ঠাকুমা তোমাকে ননীর পুতুল করে মানুষ করেছেন, একটু আঁচ লাগলে গলে যাবে।

৩০। পায়া ভারি—(দেমাক) দু'পয়সা হয়ে আজকাল ভজহরির পায়া ভারি হয়েছে।

৩১। পুকুর চুরি—(অবিশ্বাস্য রকমের চুরি) পাঁচ বিঘে জমির ধান—তুমি যে পুকুর চুরি করেছ।

৩২। পোয়া বারো—(খুব সুবিধা) জমিদার তো শহরে গেছে, নায়েবের এখন পোয়া বারো।

৩৩। বকধার্মিক—(ধর্মের আবরণে শঠ) বকধার্মিক মোড়ল বারোয়ারীর ঘরের নামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপ করে নিলে।

৩৪। বালির বাঁধ—(অস্থায়ী) 'বড়র পিরীতি বালীর বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥'

৩৫। ব্যাঙের আধুলি—(অল্পবিত্তের সামান্য ও একমাত্র সম্পত্তির গর্ব) পাশ-করা ছেলেটি হারাধনের ব্যাঙের আধুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩৬। ব্যাঙের সর্দি—(গা সওয়া হওয়ায় দুঃখবোধের অভাব) সারাদিন মাঠে কাজ করি আর এইটুকু রোদে যেতে কষ্ট হবে! ব্যাঙের আবার সর্দি।

৩৭। ভরাডুবি—(সর্বনাশ) ব্যবসা চলছিল মন্দ নয়, তবে ভরাডুবি হয়ে গেল।

৩৮। ভুষণ্ডী কাক—(প্রাচীন ব্যক্তি) আমি আর এসব ব্যাপার জানি না, আমি কি এ যুগের লোক, আমি হচ্ছি ভুষণ্ডী কাক।

৩৯। শিরে সংক্রান্তি—(অবিলম্বে প্রয়োজন) শিরে সংক্রান্তি করে এসে বলছ আজই চাল না হলে চলবে না।

৪০। সাক্ষী গোপাল—(নামমাত্র কর্তা) ছেলেরাই যা করবার করে, আমি তো সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে আছি।

৪১। সোনায় সোহাগা—(যোগ্য সংযোগ) এমন গাইয়ে, তার সঙ্গে ভাল বাজিয়ে পাওয়া গেলে তো সোনায় সোহাগা।

৪২। স্বখাত সলিল—(নিজকৃত বিপদ) 'আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।'

৪৩। হাত টান—(চুরির অভ্যাস) নতুন চাকরটার একটু হাতটান আছে।

৪৪। হাতের পাঁচ—(অতিরিক্ত নিশ্চিত পাওনা) ব্যবসায় চেষ্টা কর, তাছাড়া হাতের পাঁচ জমিজমা তো আছেই।

৪৫। **রাবণের চিতা**—(অনির্বাণ জ্বালা) বঙ্গবিচ্ছেদের পর বাঙালীর বুকে যেন রাবণের চিতা জ্বলছে।

৪৬। **শাঁখের করাত**—(উভয়ত বিপদ বা ক্ষতি) দুর্দান্ত ভাইপোটি যদুবাবুর শাঁখের করাত হয়েছে—রাখলেও বিপদ তাড়িয়ে দিলেও বিপদ।

৪৭। **শাপে বর**—(মন্দ অভিপ্রায়ে ভালো ফল) জ্বর হওয়ায় শাপে বর হ'ল, এখন কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ।

৪৮। **শিবরাত্রির সলতে**—(একমাত্র সম্বল) ঐ ছেলেটি মিত্তির বংশের শিবরাত্রির সলতে।

৪৯। **শ্মশান বৈরাগ্য**—(সাময়িক বৈরাগ্যের ভাব) ছেলেদের ব্যাপার দেখে মধুবাবুর শ্মশান বৈরাগ্য এসে গেল।

৫০। **সোনার পাথর বাটি**—(অসম্ভব বিষয়) এ যুগে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সোনার পাথর বাটি। [অনুরূপ 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব']

৫১। **ঠোঁট কাটা**—(স্পষ্ট বক্তা) লোকটা কী রকম ঠোঁট কাটা—কিছু রেখে ঢেকে বললে না।

৫২। **গোড়ায় গলদ**—(মূলেই ভুল) তুমি যদু নও সিধু,—আমার গোড়ায় গলদ হয়েছে। [অনুরূপ—'বিসমিল্লায় গলদ']

৫৩। **রাঘব বোয়াল**—(সর্বগ্রাসী বড়ো লোক) সুরেনবাবু একটি রাঘব বোয়াল, কত সম্পত্তি যে লুট করেছেন তার ঠিকঠিকানা নেই।

৫৪। **বাঘের দুধ**—(দুষ্প্রাপ্য জিনিস) তুমি একবার বললে পয়সা পেলেই আমি বাঘের দুধ এনে দিতে পারি।

৫৫। **গোকুলের ষাঁড়**—(নিষ্কর্মা) ছেলে ক'টি গোকুলের ষাঁড়, খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়।

৫৬। **আদায় কাঁচকলায়**—(বিরুদ্ধ ভাব) তাতে আমাতে আদায় কাঁচকলায় হযে আছে।

৫৭। **রাহুর দশা**—(ক্ষতির সময়) ব্যবসায় ক্ষতি হ'ল, জমিজমা ভেসে গেল—তার দেখছি রাহুর দশা চলেছে। [অনুরূপ 'শনির দশা']

৫৮। **সুখের পায়রা**—(সুখ মাত্র সার) অনেক বন্ধুই সুখের পায়রা, দুঃখের দিনে দেখা দেয় না।

৫৯। **মাটির মানুষ**—(শান্ত প্রকৃতি) বিধুবাবু মাটির মানুষ, কোন ঝঞ্ঝাটে থাকতে চান না।

৬০। **জিলিপির প্যাঁচ**—(কুটিলতা) তোমার মনে মনে যে জিলিপির প্যাঁচ দেখছি।

৬১। **কথার কথা**—(গুরুত্বহীন উক্তি) ও একটা কথার কথা—ওটা ধরে বসে থাকলে চলে না।

৬২। **মগের মুল্লুক**—(অরাজক রাজ্য) এত দাম নিয়ে এই জিনিস দেবে —এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছ?

৬৩। **চোখের বালি**—(বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন) তুমি আমার চোখের বালি, তাই এত জ্বালাও।

৬৪। **মাছের মা**—(বহুজনের বা বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন) অমন দু'চারটে গেল আর এল—মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক।

৬৫। **আমড়া কাঠের ঢেঁকি**—(অপদার্থ) ছেলেটি একটি আমড়া কাঠের ঢেঁকি।

৬৬। **তুলসী বনের বাঘ**—(ভণ্ড ধার্মিক) নায়েব মশায়ের মুখে রাধাকৃষ্ণ, কিন্তু আসলে উনি তুলসী বনের বাঘ।

৬৭। **উপুড় হস্ত**—(দেওয়া) খালি নিয়েই যাচ্ছ, এবার কিছু উপুড় হস্ত কর।

৬৮। **কালনেমির লঙ্কা ভাগ**—(কোনো কিছু পাওয়ার আগেই সে সম্পর্কে চিন্তা) বাগানের এখন কোথায় কি? আর তুমি মনে মনে লঙ্কাভাগ করছ।

৬৯। **তাসের ঘর**—(অপলকা) তোমার এ পরিকল্পনা তাসের ঘর, দু'দিন পরে ভেঙে যাবে।

৭০। **বুদ্ধির ঢেঁকী**—(বুদ্ধিহীন) 'হুকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকী।'

৭১। **গভীর জলের মাছ**—(সাধারণের আয়ত্তের অতীত) ঐ সব ব্যবসাদার গভীর জলের মাছ, ওদের ধরা-ছোঁওয়া শক্ত।

৭২। **শেয়াল রাজা**—(ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে বড়ো) এই বনগাঁয়ে রামধন শর্মাই শেয়াল রাজা। [অনুরূপ 'শেওড়াতলার চক্রবর্তী']

৭৩। **অষ্টরম্ভা**—(কিছুমাত্র না) কথা বলছ লম্বা লম্বা, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।

৭৪। **বাড়া ভাতে ছাই**—(প্রায় লাভের অবস্থায় ক্ষতি) আড়তদার

চাল কিনে চড়া মুনাফা করবে ভেবেছিল, কিন্তু সরকারি রেশনব্যবস্থা তার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে গেল।

৭৫। **পাথরে পাঁচ কিল**—(সৌভাগ্যসূচক অবস্থা) এ মকদ্দমায় যদি জিতি তো পাথরে পাঁচ কিল।

৭৬। **ভাঁড়ে মা ভবানী**—(শূন্যগর্ভ অবস্থা) এখন অনেক জমিদার বংশের বাইরের ঠাট ঠিক আছে, কিন্তু ভাঁড়ে মা ভবানী।

৭৭। **বুকের পাটা**—(সাহস) ছেলেটার বুকের পাটা দেখেছ।

৭৮। **মাথার ঠাকুর**—(পূজ্য) তুমি যদি একাজ করতে পার, তাহলে তোমাকে মাথার ঠাকুর করে রাখব।

৭৯। **ভূতের বেগার**—(প্রতিদানহীন খাটুনি) সারাদিন ভূতের ব্যাগার খাটতে খাটতে প্রাণ গেল।

৮০। **আকাশ কুসুম**—(অসম্ভব আশা) লাখ টাকা তার কাছে আকাশ কুসুম।

৮১। **তালপাতার সেপাই**—(অত্যন্ত রোগা) ছেলেটি বিদ্বান্ বটে, কিন্তু যেন তালপাতার সেপাই।

৮২। **সাপের পাঁচ পা**—(অতিরিক্ত প্রশ্রয়) যা খুশি তাই করবে—সাপের পাঁচ পা দেখেছ না কি ?

৮৩। **হাতযশ**—(সুখ্যাতি) কলেরা কেসে নন্দ ডাক্তারের বেশ হাতযশ আছে।

৮৪। **আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ**—(দরিদ্র অবস্থা থেকে অত্যন্ত ধনী) তেলের কল করে ভজহরির আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

৮৫। **শাঁকের করাত**—(উভয়ের ক্ষতিকারক) কুপুত্র শাঁখের করাত, ছাড়াও যায় না, রাখলেও বিপদ।

৮৬। **আকাশ পাতাল**—(সুদূর পার্থক্য) তোমাতে আর অতে আকাশ পাতাল তফাৎ। (বিস্তৃত পরিসর) প্রশ্ন শুনে সে আকাশ পাতাল ভাবতে সুরু করল।

৮৭। **যক্ষের ধন**—(ব্যয় না করিয়া রক্ষিত সম্পত্তি), রামহরি পুকুরের মাছগুলোকে যক্ষের ধনের মতো আগলে আছে।

৮৮। **বিড়াল তপস্বী**—(ভণ্ড ধার্মিক) সব দুষ্কর্মের মূল তুমি এখন বিড়ালতপস্বী সেজে বসে আছ।

৮৯। **সাতপাঁচ**—(সব দিক) আমি তো আর সাত পাঁচ ভেবে একথা বলিনি।

৯০। **দা-কুমড়ো**—(অত্যন্ত বিরুদ্ধতা) আজকাল উকিলে উকিলে দা-কুমড়ো সম্পর্ক।

৯১। **কাষ্ঠহাসি**—(মনে দুঃখ অথচ মুখে মৃদু হাসি) সরকার মশাই কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'তা আর মন্দ কি ?'

৯২। **হ-য-ব-র-ল**—(এলোমেলো) সে কী সব হ-য-ব-র-ল বলে গেল।

৯৩। **নেই আঁকড়া**—(জেদী, নাছোড়বান্দা) সে নেই আঁকড়া হয়ে টাকা ধার চাইলে।

৯৪। **তালকানা**—(ভালো করে যে দেখে না ; সাধারণ বোধশক্তি হীন) সে এমন তালকানা, কাকে কী বলবে খেয়াল করলে না।

৯৫। **ভিজে বেড়াল**—(আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দুষ্ট) সারাদিন দুষ্টুমি করে এখন ভিজে বেড়ালটি সেজে বসে আছ।

৯৬। **পুঁটি মাছের প্রাণ**—(অল্পশক্তি সম্পন্ন) আমাদের পুঁটি মাছের প্রাণ, অত কি আর সহ্য হয়।

৯৭। **ঝাঁকের কই**—(দলের একজন) শহর থেকে গ্রামে ফিরে চাষীটি ঝাঁকের কই ঝাঁকে ভিড়ল।

৯৮। **বিদুরের ক্ষুদ**—(অল্পমাত্র কিন্তু প্রীতির সহিত প্রদত্ত বস্তু) কী আর দিতে পারব, বিদুরের ক্ষুদ এই যা আছে।

৯৯। **আঠার মাসে বছর**—(দীর্ঘসূত্রতা) তার তো আঠারো মাসে বছর—কাজটা কবে শেষ করবে কে বলতে পারে।

১০০। **মিছরির ছুরি**—(বাহ্যতঃ মিষ্ট প্রকৃতপক্ষে কটুবাক্য)—আহা, কথা নয় তো মিছরির ছুরি, বুকে একেবারে বিঁধে যায়।

১০১। **হাতে খড়ি**—(প্রথম শিক্ষা) এ বিদ্যায় তার কাছে আমার হাতে খড়ি।

১০২। **ক-অক্ষর গোমাংস**—(একেবারে অক্ষর-পরিচয় হীন) অনেক ব্যবসায়ী ক-অক্ষর গোমাংস, কিন্তু ব্যবসায় বেশ দড়।

১০৩। **আক্কেল গুড়ুম**—(বিস্ময়ে হতবাক) এই ব্যাপার দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

[প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগ্‌ধারা]

অতি চালাকের গলায় দড়ি—বেশী চালাকি করিয়া অন্যকে ঠকাইতে গেলে অনেক সময় নিজেকেই ঠকিতে হয়।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—বেশী বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়। বাড়াবাড়ি দেখিলেই মনে সন্দেহ হয়, ভিতরে কিছু মতলব আছে।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট—বেশী লোভ করিতে নাই, বেশী লোভ করিলে যাহা আকাঙ্ক্ষিত তাহা পাওয়া যায়ই না, অনেক সময় যাহা আছে তাহাও হারাইতে হয়।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট—কাজের ভার দুই-একজনের উপর থাকিলেই তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; কিন্তু কর্মকর্তার সংখ্যা যদি অধিক হইয়া পড়ে, তবে প্রায়ই কাজ পণ্ড হয়।

অনভ্যাসের কোঁটা কপাল চড়চড় করে—হঠাৎ উন্নততর জীবন যাপন করিতে গেলে অনভ্যস্ত জীবনযাত্রায় সুখ পাওয়া যায় না।

কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালে পাজী—কার্যসাধনের সময় সাধাসাধির অন্ত নাই, কিন্তু কাজ শেষ হইলে তখন আর পূর্বের কথা মনে থাকে না।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—কেউ মানতে চায় না, অথচ নেতৃত্ব করিবার লোভ আছে।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—গুণীর আদর তাঁহার নিজের দেশে বা নিজের গ্রামে নিজের পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে খুব কম হয়।

চাচা আপন বাঁচা——আগে নিজে রক্ষা পাও তারপর অন্য কথা।

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী—কেবলমাত্র উপদেশের দ্বারা পাপীর মত পরিবর্তন হয় না।

দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ—একই উদ্দেশ্য-সাধনে সকলে মিলিয়া কাজ করিলে, কার্যে সফলতা লাভ করিতে না পারিলেও লজ্জার কারণ হয় না।

দশের লাঠি একের বোঝা—একজনের পক্ষে যাহা খুবই কঠিন, সকলে মিলিয়া করিলে তাহা খুবই সহজ বলিয়া মনে হয়।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে—চেষ্টা করিয়াও সত্য গোপন করা যায় না; হঠাৎ একদিন সত্য প্রকাশ হইয়া পড়ে।

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা, হাঁটতে না জানলে উঠানের দোষ—নিজের দোষে কাজ পণ্ড হয়, কিন্তু অপমানের ভয়ে নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বাঁচিতে চায়।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়—মন্দ উপায়ে যে ধন অর্জিত হইয়াছে, তাহা নিরুপদ্রবে ভোগ করা যায় না।

পেটে খেলে পিঠে সয়—লাভের প্রত্যাশা থাকিলে অনেক কিছুই সহ্য করা যায়।

মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফারসী পড়ে তাঁতী—বড় বড় লোক যে কাজ করিতে পারিল না, সেই কাজ করিবার জন্য সাধারণ লোক চেষ্টা করে এবং অকৃতকার্য হইয়া অপদস্থ হয়। "হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।"

গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল—কার্যসিদ্ধি হইবার বহু পূর্ব হইতেই আনন্দে আত্মহারা হওয়া, কার্যসিদ্ধি যে নাও হইতে পারে সে চিন্তা না করা।

যত গর্জে তত বর্ষে না—কাজের আড়ম্বরটা প্রথমে অতিরিক্ত হইলে আশানুরূপ ফললাভ হয় না এবং কাজটা প্রায়ই সুসমাপ্ত হয় না।

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা—যাহাকে পছন্দ হয় না, তাহার প্রত্যেক কার্যে একটা-না-একটা কাল্পনিক দোষ বাহির করা হয়।

যার জ্বালা সেই জানে—ভুক্তভোগী না হইলে দুঃখের যথার্থ স্বরূপ অন্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।

যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ—খাটিয়া মরে একজন, আর তার ফল ভোগ করে অন্যে।

যার লাঠি তার মাটি—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল—যেমন উৎকট রোগ, তেমনি ভয়ঙ্কর তার ঔষধ। যেমন আঘাত তেমনি প্রতিঘাত।

রথ দেখা ও কলা বেচা, এক ঢিলে দুই পাখী মারা—প্রধান একটি কাজ বা উদ্দেশ্যসাধন করিতে করিতে যেখানে প্রসঙ্গক্রমে একসঙ্গে দুইটি কাজ সিদ্ধ হইয়া যায়।

পান্তা ভাতে ঘি—যাহার সঙ্গে যাহার সামঞ্জস্য নাই, যেখানে যাহা খাটে না, সেখানে তাহা খাটাইতে যাওয়া।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন—যদি জবাবদিহি না করিতে হয়, তবে পরের টাকা খরচ করিতে বাধে না।

বিসমিল্লায় গলদ—গোড়ায় গলদ। আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রথম দিকেই ভুল।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল—দুর্জনের সঙ্গীর অভাব হয় না। ইহারা পরস্পরকে সমর্থন করে, কিন্তু ইহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সবুরে মেওয়া ফলে—কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ফললাভের আশা করিতে নাই, অপেক্ষা করিতে হয়, যথাসময়ে ফল পাওয়া যাইবে।

মুখে মধু পেটে বিষ—কথায় সহৃদয়তার অভাব নাই, কিন্তু মনে মনে সর্বনাশের চেষ্টা।

সস্তার তিন অবস্থা—লাভের প্রত্যাশায় খুব সস্তায় জিনিষ কিনিলে অবশেষে পস্তাইতে হয়, জিনিষ প্রায়ই খারাপ থাকে।

অনুশীলনী

১। কাঁচা ও মুখ এই দুইটি শব্দের প্রত্যেকটির চারিটি করিয়া রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ অবলম্বন করিয়া সর্বসমেত আটটি বাক্য রচনা কর। (C. U. 1940)

২। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশগুলির সাহায্যে বাক্য গঠন কর :—

(ক) কথার কথা, মুখ রাখা, জলে ফেলা, আকাশ থেকে পড়া, অরণ্যে রোদন, বালির বাঁধ, চোখের বালি, ভরাডুবি হওয়া। (S. F. 1954)

(খ) শিমুল ফুল, বর্ণচোরা, সুখের পায়রা, রাহুর দশা, জিলিপির প্যাঁচ। (S. F. 1953)

৩। একপদে পরিণত কর :—

যাহার মমতা নাই, যিনি শত্রুকে বধ করিয়াছেন, যাহা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই, যাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, যাহার ভাতের অভাব আছে, যাহা উড়িয়া যাইতেছে, খেলায় যে পটু, কাঠের দ্বারা নির্মিত, পা হইতে মাথা পর্যন্ত, বাস্তববোধের অভাব। (C. U. 1947)

৪। নেচে ওঠা, মন ওঠা, রব ওঠা, রক্ত ওঠা।

বিশিষ্ট অর্থে এই ক্রিয়াপদগুলির ব্যবহার দেখাইয়া বাক্য রচনা কর।

বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার

আমরা যখন কথা বলি, তখন ঝড়ের মতন এক নিঃশ্বাসে গড় গড় করিয়া কথা বলিয়া যাই না ; কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস লইবার জন্য থামিতে হয়। কখনও একটু কম থামি, কখনও বেশী থামি। কথা বলার এই ভঙ্গীটি আমরা লিখিত ভাষায় যখন ফুটাইয়া তুলি, তখন আমরা নানারূপ বিরাম-চিহ্ন ব্যবহার করি। বাঙলায় এই চিহ্নগুলিকে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন, ড্যাস, হাইফেন, ব্রাকেট বা বন্ধনী, ইত্যাদি বলা হয়। বলাবাহুল্য পূর্বে বাংলায় গদ্যে পূর্ণচ্ছেদ বা বিরাম বুঝাইবার জন্য এক দাঁড়ি ও কবিতায় দুই দাঁড়ি ব্যবহার করা হইত। অন্যান্য বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার সম্বন্ধে আধুনিক বাঙলা ভাষা ইংরাজী ভাষার নিকট ঋণী।

সচরাচর ব্যবহৃত কয়েক প্রকার বিরাম-চিহ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

পাদচ্ছেদ বা কমা (,)

পড়িবার সময় বাক্যের মধ্যে যেখানে অল্প বিরামের আবশ্যক হয়, সেখানে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

(ক) কয়েকটি বিশেষ্য পদ পর পর ব্যবহার করিলে কমা-চিহ্ন দিতে হয়। গম, ধান, পাট—এই তিনটি পাকিস্তানের প্রধান কৃষিজাত সম্পদ।

(খ) অনেকগুলি বিশেষণ পদ একসঙ্গে থাকিলে কমা দিতে হয়। তিনি সরল, অমায়িক, ধর্মপ্রাণ ও আশ্রিতবৎসল।

(গ) অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশকে অনেকে কমা-চিহ্ন দিয়া বিভক্ত করিয়া থাকেন।

তুমি বড় লোক হইয়া, আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছ।

(ঘ) বাক্যে কর্তার পরেই যদি সমাপিকা ক্রিয়া না বসিয়া একটু দূরে বসে, তবে কর্তৃপদের পর অনেকেই কমা-চিহ্ন ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী।

(ঙ) জটিল ও যৌগিক বাক্যে প্রত্যেক অংশটিই কমা-চিহ্নের দ্বারা বিভক্ত করা উচিত।

ছেলেটি তাড়াতাড়ি ভাল হইয়া উঠিবে কিনা, ডাক্তারবাবু আজই তাহা বলিতে পারিতেছেন না।

ভাল করিয়া পড়াশুনা কর, পিতামাতার বাধ্য হও, সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর—এই আমার শেষ অনুরোধ।

(চ) সম্বোধন পদের পরে কমা-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

ভাই সাহেব, আপনার চিঠি পাইলাম।

মহাশয়, আমার বিনীত নিবেদন এই যে……

অর্ধচ্ছেদ বা সেমিকোলন (;)

কমা অপেক্ষা যেখানে একটু বেশী থামিতে হয়, সেখানে সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত একটি বাক্যাংশ শেষ হইলেই ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

তোমার চিঠি পাইযাছি ; কিন্তু আমার অবস্থা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না।

পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি (।)

বাক্যের সমাপ্তি হইলে পূর্ণ বিরাম বুঝাইবার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। কণ্ঠস্বরকে এখানে একেবারে নিবৃত্ত করিয়া দিতে হয়।

পদ্যে, বিশেষতঃ পয়ারে প্রথম ছত্রের পর এক দাঁড়ি ও দ্বিতীয় ছত্রের শেষে দুই দাঁড়ি দেওয়ার রীতি পূর্বে প্রচলিত ছিল।

আমি সবই বুঝিলাম , এত বন্ধু থাকিতে কেহই যে সাহায্য করিল না, এই দুঃখ আমার চিরদিন থাকিবে। কি আর বলিব, সবই আমার ভাগ্য।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান॥

প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

কে, কোথায়, কি, কেন, প্রভৃতি পদ দ্বারা যখন বাক্যে প্রশ্ন করা বুঝায়, তখন বাক্যের শেষে এই চিহ্নটি দেখিলেই সমগ্র বাক্যটি প্রশ্নের সুরে পড়িতে হইবে। ইহাকে জিজ্ঞাসা-চিহ্নও বলে।

তোমার বাড়ী কোথায় ?

তাহার বইখানি কে লইয়াছিল ?

তোমার স্কুলের ছুটি কবে হইবে ?

বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!)

ভয়, হর্ষ, বিষাদ ও বিস্ময় প্রভৃতি মনের আবেগ বুঝাইবার জন্য এই চিহ্নের ব্যবহার করিতে হয়।

ও! কি ভীষণ দৃশ্য! ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড!

ড্যাশ (—)

বাক্যের মধ্যে একটি বিষয় বলিতে বলিতে অন্য বিষয়ের অবতারণা করিতে হইলে, অথবা বাক্যে একটু বেশী জোর দিতে হইলে, এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"মান্যের সম্মান, পূজ্যের পূজা—অবশ্য কর্তব্য।"

কোলন-ড্যাশ (:—)

দৃষ্টান্ত দিতে হইলে এই চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। পদ পাঁচ প্রকার :—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

উদ্ধরণ চিহ্ন (" ")

অন্যের কথা অবিকল উদ্ধৃত করিতে হইলে এই চিহ্ন ব্যবহার কবিতে হয়।

সকলে একসঙ্গে চেঁচাইতে লাগিল—"আগুন, বেরিয়ে আয।"

মাস্টার মহাশয় প্রথমেই আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাল স্কুলে আস নাই কেন?"

লনী

১। নিম্নলিখিত অংশগুলি যথাস্থানে উপযুক্ত বিরাম-চিহ্ন বসাইয়া পুনরায় লিখ :—

(ক) বৎস আর বিলম্ব করিও না আর্যপুত্র যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা যত নিষ্ঠুর হউক না কেন ত্বরায় বল তুমি কিছু সংকোচ করিও না তোমার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে আমারই কপাল ভাঙিয়াছে কি হইয়াছে বল আর বিলম্ব করিও না বলি আর্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই

(খ) তিনি কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন পরে.ভাবিলেন রাজাদের মন মুহূর্তে পরিবর্তিত হইবার কথাই বটে কিন্তু যত দোষ আমার ভাগ্যের আমার ভাগ্যে সুখ নাই দোষ দিব কাহাকে বিধাতা

ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহা খণ্ডনীয় নহে আবার ভাবিলেন আগন্তুক ব্যক্তি সম্পূর্ণ অপরিচিত তাহার কোন স্বার্থ আছে কিনা জানি না

(গ) হে পিতৃব্য তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে
রাঘবের দাস তুমি কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা তাত কহ তা দাসেরে
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় হে রক্ষোরথি ভুলিলে কেমনে
কে তুমি জনম তব কোন্ মহাকুলে
কেবা সে অধম রাম স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ কাননে
যায় সে কি কভু প্রভু পঙ্কিল সলিলে
শৈবাল দলের ধাম

(ঘ) কিরে রহমৎ কবে এলি কাল সন্ধ্যাবেলা আমি কিছু ব্যস্ত আছি আজ তুমি যাও খোঁকীকে একবার দেখিতে পাইব না না এই আঙ্গুর খোঁকীর জন্য আনিয়াছিলাম তাহাকে দিবেন পয়সা নাও বাবু আমি ত সওদা করিতে আসি নাই

ব্যাকরণের পারাশষ্ট

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ	আরম্ভ	শেষ
অধম	উত্তম	আর্দ্র	শুষ্ক
অল্প	অধিক	আরোহণ	অবরোহণ
অনুরাগ	বিরাগ	আবির্ভাব	তিরোভাব
অনুলোম	বিলোম	আবৃত	অনাবৃত
অলস	পরিশ্রমী	আবিল	অনাবিল
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	আশা	নিরাশা

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
অন্তর	বাহির	আস্তিক	নাস্তিক
অন্ধকার	আলোক	আসল	নকল
অপকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট	অনুগ্রহ	নিগ্রহ
অর্পণ	গ্রহণ	আস্থা	অনাস্থা
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	আহার	অনাহার
অর্থ	অনর্থ	আকুঞ্চন	প্রসারণ
অলীক	সত্য	আত্মীয়	অনাত্মীয়
অবনত	উন্নত	আপন	পর
অধিত্যকা	উপত্যকা	ইতর	ভদ্র
অনুকূল	প্রতিকূল	ইচ্ছা	অনিচ্ছা
আগমন	গমন	ইষ্ট	অনিষ্ট
আবাহন	বিসর্জন	ইহকাল	পরকাল
আদান	প্রদান	ইহলোক	পরলোক
আদি	অন্ত	উচিত	অনুচিত
আয়	ব্যয়	উচ্চ	নীচ
উগ্র	সৌম্য	গুণ	দোষ
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	গুরু	লঘু
উত্থান	পতন	গুপ্ত	ব্যক্ত
উদয়	অস্ত	গ্রহণ	বর্জন
উন্নতি	অবনতি	গ্রাম্য	বন্য
উন্মীলন	নিমীলন	গোপন	প্রকাশ
উপচয়	অপচয়	ঘন	তরল
উপকার	অপকার	ঘাত	প্রতিঘাত
উপস্থিত	অনুপস্থিত	ঘৃণা	শ্রদ্ধা
ঊর্ধ্বগ	নিম্নগ	চঞ্চল	স্থির
উষ্ণ	শীতল	চেতন	জড়, অচেতন
ঋজু	বক্র	জন্ম	মৃত্যু
ঐক্য	অনৈক্য	জাগরণ	নিদ্রা
ঐহিক	পারত্রিক	জ্বলন্ত	নির্বাপিত

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
কোমল	কঠিন	তরুণ	বৃদ্ধ
কুটিল	সরল	তিরস্কার	পুরস্কার
কুৎসিৎ	সুন্দর	তিক্ত	মধুর
কুৎসা	প্রশংসা	তস্কর	সাধু
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন	তিমির	আলোক
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	দক্ষিণ	বাম
কৃত্রিম	স্বাভাবিক, খাঁটি	দাতা	গ্রহীতা
ক্রয়	বিক্রয়	দীর্ঘ	হ্রস্ব
কৃশ	স্থূল	দুরন্ত	শান্ত
ক্রোধ	প্রীতি, ক্ষমা	দুর্লভ	সুলভ
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	দুষ্কৃতি	সুকৃতি
গরল	অমৃত	দুর্বল	সবল
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	দৃঢ়	শিথিল
দেনা	পাওনা	বাদী	বিবাদী, প্রতিবাদী
ধনী	দরিদ্র, নির্ধন	বিনীত	দুর্বিনীত
নিন্দা	স্তুতি	বিপথ	সুপথ
নিরাকার	সাকার	বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
নির্মল	পঙ্কিল	ব্যর্থ	সার্থক
নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট	ভূত	ভবিষ্যৎ
শ্বাস	প্রশ্বাস	ভদ্র	ইতর
পাপ	পুণ্য	মিলন	বিরহ
পুরোভাগ	পশ্চাদ্ভাগ	মুখ্য	গৌণ
প্রকৃতি	বিকৃতি	মৃদু	উগ্র, তীব্র
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	শ্রম	বিশ্রাম
প্রতিযোগী	সহযোগী	সন্ধি	বিগ্রহ
প্রবল	দুর্বল	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
প্রভু	ভৃত্য	স্মৃতি	বিস্মৃতি
প্রবীণ	নবীন	সমষ্টি	ব্যষ্টি
প্রসন্ন	বিষণ্ণ	স্থাবর	জঙ্গম, অস্থাবর

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
প্রাচীন	নবীন, অর্বাচীন	সুস্পষ্ট	অস্পষ্ট
বন্ধন	মুক্তি	হর্ষ	বিষাদ
বন্ধু	শত্রু	হ্রাস	বৃদ্ধি
বিধি	নিষেধ	হৃদ্য	ঘৃণ্য
বেশী	কম, অল্প	হরণ	পূরণ

ভিন্নার্থক শব্দ

একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হয়। প্রসঙ্গ অনুসারে একই শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ শব্দের ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

অর্থ—তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। (টাকাকড়ি)

কবিতাটির অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। (মানে)

ছেলেটির এই প্রকার আচরণের অর্থ বুঝিতে পারিলে কি?
(উদ্দেশ্য, রহস্য)

অঙ্ক—আমার অঙ্কে মাথা নাই। (গণিত)

পাঁচ অঙ্কের নাটক বড় হয়, অভিনয়ে অনেক সময় লাগে।
(নাটকের অংশ)

মাতা সকল সন্তানকেই অঙ্কে স্থান দিতে প্রস্তুত। (ক্রোড়)

উত্তর—চুপ করিয়া আছ কেন? উত্তর দাও। (জবাব)

ভারতের উত্তরে হিমালয়। (দিক বিশেষ)

উত্তরকালে এই বালকই দেশবরেণ্য হইয়াছিল। (পরবর্তী, ভবিষ্যৎ)

কথা—রামায়ণের কথা শুনিলে না কেন? উহাতে অনেক শিখিবার ছিল। (গল্প)

শেষ পর্যন্ত আমার কথা রাখিলে না! (অনুরোধ)

যেখানে যাই সর্বত্রই এক কথা, চালের দাম কবে পড়িবে? (প্রসঙ্গ)

তোমার সঙ্গে কথা আছে। (পরামর্শ)

বাপে ব্যাটায় কথা নাই। (সদ্ভাব)

ভরা গঙ্গা সাঁতরে পার হওয়া—একি সহজ কথা! (ব্যাপার)

গুণ—আগুনের গুণ উত্তাপ। (বিশিষ্ট ধর্ম)
মেয়েটির কোন গুণ নাই। (উৎকর্ষ)
ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত। (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ)
"বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার তিনগুণ।" (অঙ্কের গুণ)

চাল—চালের দাম কমিতেছে না। (চাউল)
চালে খড় নাই। (ঘরের উপর আচ্ছাদন)
চাল চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে। (প্রতিমার পিছনের চিত্র)
বনেদি চাল এবার সকলেরই ছাড়তে হবে। (ব্যবহার)
এক চালে বাজী মাৎ। (ফন্দি, দাবা খেলার কৌশল)

ছল—"অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল।" (কপট)
ঠাট্টাচ্ছলেও তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। (প্রসঙ্গ)
দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। (কারণ)
'ছল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছু পানে।' (ছলনা)
কথায় কথায় ছল ধরা তার অভ্যাস। (দোষ)

জাল—জালে এবার বড় বড় রুই কাৎলা ধরা পড়েছে। (ফাঁদ)
জাল নোট চালাইতে গিয়াই সে ধরা পড়িল (মেকি)
ইন্দ্রজালে সকলেই মুগ্ধ হইল। (ছল)

জোর—জোর যার মুলুক তার। (শক্তি)
তোমার যে বড় জোর গলা। (তীব্র)
জোর করিয়া কাহারও উপর নিজের মত চাপাইতে নাই। (জবরদস্তি)

তত্ত্ব—সৃষ্টিতত্ত্ব বড়ই জটিল। (মতবাদ)
তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট সংসার মায়া মাত্র। (ব্রহ্ম)
অনেকদিন তোমাদের কোন তত্ত্ব-তল্লাস নাই। (সংবাদ)
এবার পূজার তত্ত্ব ভালভাবে করিতে না পারায় মেয়ের মা মনমরা হইয়া রহিলেন। (উপঢৌকন)

তন্ত্র—তন্ত্রের জন্ম বোধ হয় বাংলাদেশেই। (শাস্ত্রবিশেষ)
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু আমলাতন্ত্রের শাসন এখনও বলবৎ আছে। (শাসন-পদ্ধতি)
পরতন্ত্র হওয়াই পরাধীনতা। (অধীন)

তাল—ভাদ্রমাসে তাল পাকে। (ফলবিশেষ)

কেবল গান গাহিলেই হয় না, তাল জ্ঞান থাকা দরকার।

(সঙ্গীতের সময়-পরিমাণ বোধ)

তাল ঠুকে তো এলে? ওর সঙ্গে পারবে কি? (বাহুতে করতলাঘাত)

তাল-বেতালের নাচ আরম্ভ হ'ল দেখছি। (অপদেবতা)

দল—"যাত্রীদল ফিরে আসে, সাঙ্গ হ'ল মেলা।" (সমূহ)

"ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?" (পাপড়ি)

"তরুণ দল, চলরে চল্"। (সম্প্রদায়)

ধারা—কোন্ আইনের কোন্ ধারায় গ্রেপ্তার করা হ'ল জানতে পারি কি?

(আইনের বিধান)

তোমরা কেমন ধারার লোক, কথা বুঝতে পার না! (স্বভাব)

এই স্কুলের এই ধারা, পরীক্ষা দিলেই প্রমোশন। (রীতি)

পদ্মা গঙ্গারই একটি ধারা। (প্রবাহ)

বর্ষার বারিধারায় নদ-নদীগুলি স্ফীত হইয়া উঠে। (বর্ষণ)

নাম—তোমার নাম কি? (আখ্যা, পরিচয়)

নামে রুচি, জীবে দয়া, ভক্তি ভগবানে। (ইষ্টদেবতার নাম)

করলে তো এত, কিন্তু নাম হ'ল কি? (খ্যাতি)

নামমাত্র খেয়েই উঠে পড়লে যে! (সামান্য)

পক্ষ—বরপক্ষের ব্যবহারে কন্যাপক্ষ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। (দল)

ঘরে যার তৃতীয় পক্ষ, তার শান্তি কোথায়? (তৃতীয় বিবাহের পত্নী)

হঠাৎ দাদা মশায়ের পক্ষাঘাত দেখা দিল। (ব্যাধিবিশেষ)

এটা কোন্ পক্ষ, রাত্রির আকাশ দেখেও বুঝতে পারছ না কেন? (মাসার্ধ)

রাবণের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নপক্ষ হইয়াও জটায়ু রাবণকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। (পাখা)

পূর্ব—বাংলার পূর্বে আসাম। (দিকবিশেষ)

আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষগণের চেয়ে সুখী? (বিগত)

পূর্বে দেশে এত সমস্যা ছিল না, সেইজন্য সুখ না থাকিলেও শান্তি ছিল।

(প্রাচীনকাল)

পূর্বের সঙ্গে পশ্চিম মিলিবে কবে? (প্রাচ্যদেশ)

তোমার না পূর্বাহ্নে আসিবার কথা ছিল? (অংশ বা ভাগ)

বর্ণ—ছেলেটির বর্ণ-পরিচয় হয় নাই। (অক্ষর)
তেমন গৌর বর্ণ বাংলাদেশে বেশী দেখা যায় না। (গায়ের রং)
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণবিভাগ বৈদিক যুগেই হইয়াছিল। (জাতি)

বিধি—বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়। (ঈশ্বর, নিয়তি)
এই কাজের এই বিধি। (নিয়ম, রীতি)
সমস্ত বিধিমতে সম্পন্ন হইয়াছে। (শাস্ত্র)
ভারতীয় দণ্ডবিধি তাঁহার পড়া আছে। (বিধান, আইন)

ভাব—বেশ আছে তারা, এই আড়ি, এই ভাব। (সম্প্রীতি)
তোমার ভাব বুঝি না, কি করতে চাও? (অভিপ্রায়)
'সোনার তরী' কবিতাটির ভাব বুঝিতে পারিলে কি? (মর্ম, অর্থ)
নাম-সংকীর্তনে যোগ দিলেই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন।
(উন্মাদনা)

ভার—পৃথিবী পাপের ভার আর কত সইবে? (বোঝা)
ধারে কাটে, ভারেও কাটে। (গুরুত্ব)
সারাদিনই মুখ ভার করে বসে রইলে কেন? (বিষণ্ণ)
সামান্য বেতনে আজকাল গৃহস্থের ভদ্রভাবে চলা ভার। (কঠিন)
তোমার উপর এ কাজের ভার দেওয়া উচিত হয় নাই। (দায়িত্ব)

মাথা—আপনি হলেন গ্রামের মাথা, আপনি দেখবেন না তো কে দেখবে?
(প্রধান)

মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও যা প্রয়োজন তা উপার্জন করা যায় না।
(অঙ্গবিশেষ)

বাজে বকছ কেন? তোমার কথার মাথা নাই। (অর্থের সঙ্গতি)
সব বিষয়েই ছেলেটির বেশ মাথা খেলে। (বুদ্ধি)

মুখ—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। (প্রত্যঙ্গ)
মুখে মধু, মনে বিষ। (বাক্য)
সোজা দক্ষিণ মুখে সে ছুটতে লাগল। (দিক্)
এখনও সরে পড়, নইলে মুখ থাকবে না। (মর্যাদা)
ননদের মুখের ভয় নতুন বৌকে করতে হয় বৈকি। (তিরস্কার)

যোগ—তাঁহারা নৌকাযোগে নদী পার হইলেন। (সাহায্য)

তোমার কথার সহিত কার্যের যোগ কোথায়? (মিল)

দুইএর সঙ্গে তিন যোগ করিলে পাঁচ হয়। (অঙ্কের সমষ্টি)

এবারও অর্ধোদয় যোগ আছে। (বিশেষ পর্ব)

যোগবল পরম বল, ইহার দ্বারা অনেক অভাবনীয় কার্য ঘটান যায়। (চিত্তবৃত্তি-নিরোধের শক্তি)

রস—লেবুর রস নিয়মিত খাইলে অনেক অসুখ সারে। (নির্যাস)

সাহিত্য-সমালোচকের রসজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। (কাব্যের প্রীতিকর বস্তু)

রস পরিপাক না পেলে কবিরাজ মশাই কখনও অন্নপথ্য দিবেন না। (শরীরের ধাতুবিশেষ)

রাগ—অনর্থক রাগ কর কেন? (ক্রোধ)

রাগ-রাগিণীর জ্ঞান নাই, ওস্তাদী গান গাইতে এসেছেন! (সঙ্গীতে স্বরবিন্যাসের স্তর)

পূর্বাকাশ নবারুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। (রং)

রূপ—'রূপে মুগ্ধ কে নয়?' (সৌন্দর্য)

'বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?' (মূর্তি)

এরূপ ব্যবহার আমি প্রত্যাশা করি নাই। (প্রকার)

ভিক্ষুকের রূপ ধরিয়া দারোগা বাবু মেলার ভিড়ে মিশিয়া গেলেন। (সজ্জা)

লোক—কত লোক প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করে আর তুমি শীতের ভয়ে কাতর হচ্ছ! (জন)

তিন লোকে—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে তাঁর মত বীর আর কেহ ছিল না। (স্থান)

ইহলোক তো দেখলাম, এবার পরলোকে কি হয় দেখব। (পৃথিবী)

তাঁর নিজের কিছুই করতে হয় না, মাইনে-করা লোক আছে। (ভৃত্য)

সার—সমস্ত উপদেশের সার হইতেছে সংযম। (মূল বিষয়)

জমিতে সার না দিলে ফসল ভাল হয় না। (উর্বরতা-সাধক বস্তু)

এই সার কথা বলছি, তোমার এখানে থাকা পোষাবে না। (আসল)

যা লিখেছ সব বাজে কথা, লেখায় সার কিছু নাই। (যথার্থ বস্তু)

সন্ধি—যুদ্ধ শেষ হ'লে সন্ধি হয়। (যুদ্ধ-বিরতি)

সন্ধিস্থানে গুরুতর আঘাত, অজ্ঞান হওয়া অসম্ভব নয়। (শরীরের অস্থির মিলন-স্থান)

বিসর্গ-সন্ধি ব্যঞ্জন-সন্ধির অন্তর্গত। (বর্ণের মিলন)

সুর—সুর ও অসুর চিরকালই আছে। (দেবতা)

হালকা সুরের গান আমি ভালবাসি না। (সঙ্গীতের ধ্বনি)

তোমার নাকি সুরের কান্না ভাল লাগে না। (কণ্ঠস্বর)

সুর বদলাচ্ছ কেন? মতলব ধরা পড়েছে বুঝি? (উদ্দেশ্য)

সূত্র—ব্যাকরণের সূত্রগুলি এখন আর কেউ মুখস্থ করে না। (স্বল্পাক্ষর বাক্য)

কার্পাস সূত্রের বস্ত্রও দানে চলে। (সূতা)

এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পারা গেল না। (সঙ্কেত)

সমোচ্চারিত বা প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

অনু—পশ্চাৎ।

অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ।

অন্ন—ভাত।

অন্য—অপর।

অনিল—বায়ু।

অনীল—যাহা নীল নয়।

অন্নপুষ্ট—খাদ্যদ্রব্যে পুষ্ট।

অন্যপুষ্ট—কোকিল।

অশন—ভোজন।

অসন—নিক্ষেপ।

অপচয়—ক্ষতি।

অবচয়—চয়ন।

অসিত—কৃষ্ণ।

অশিত—ভক্ষিত।

অসক্ত—অনাসক্ত।

অশক্ত—অসমর্থ।

আপন—নিজের।

আপণ—দোকান।

আভাষ—ভূমিকা।

আভাস—ইঙ্গিত।

আহুতি—হোম।

আহূতি—আহ্বান।

আদি—মূল।

আধি—মনঃকষ্ট।

আবরণ—আচ্ছাদন।

আভরণ—অলঙ্কার।

উদ্যত—প্রবৃত্ত।

উদ্ধত—দুর্বিনীত।

উপাদান—মূল উপকরণ।

উপাধান—বালিশ।

ওষধি—একবার ফল দিয়া যে গাছ মরিয়া যায়।

ঔষধি—রোগ-নিবারক দ্রব্য।

অবদান—সৎকর্ম।
অবধান—মনোযোগ।
অবিহিত—অনুচিত।
অভিহিত—কথিত।
অর্ঘ—মূল্য।
অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ।
অবিরাম—অবিরত।
অভিরাম—সুন্দর।
কৃতি—যত্ন।
কৃতী—পণ্ডিত।
কৃত্তিবাস—মহাদেব ;
রামায়ণ-রচয়িতা কবি।
কীর্তিবাস—যশস্বী।
গিরিশ—মহাদেব।
গিরীশ—হিমালয়, মহাদেব।
চির—দীর্ঘকাল।
চীর—ছিন্নবস্ত্র।
জড়—অনড়।
জ্বর—রোগ।
তত্ত্ব—সত্য, জ্ঞান।
তথ্য—সংবাদ।
তরণী—নৌকা।
তরুণী—কিশোরী, নবীনা।
দার—পত্নী।
দ্বার—দরজা।
দ্বিপ—হস্তী।
দীপ—প্রদীপ।
দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূতল।
পরস্ব—পরধন।
পরশ্ব—আগামী দিনের পরদিন।

কোটি—সংখ্যা।
কটি—কোমর।
কুল—বংশ।
কূল—নদীর তীর।
কুট—পর্বত, দুর্গ।
কূট—কপট, জটিল।
কুজন—মন্দ লোক।
কূজন—পক্ষীর রব।
কৃত—সম্পন্ন।
ক্রীত—কেনা।
কৃত্য—কার্য।
কৃত্ত—ছিন্ন।
কোন—কিছু।
কোণ—বিদিক।
গোলক—বর্তুল।
গোলোক—বিষ্ণুর বাসস্থান
চ্যুত—ভ্রষ্ট।
চূত—আম্র
জালা—বড় মাটির পাত্র।
জ্বালা—যন্ত্রণা, অগ্নিশিখা।
ধরা—পৃথিবী।
ধড়া—কটিবাস।
নিশীথ—মধ্যরাত্রি।
নিশিত—শাণিত।
নীর—জল।
নীড়—পাখীর বাসা
দেবত্ব—দেবতার ভাব।
দেবত্র—দেবোদ্দেশে দত্ত।

প্রকার—ভেদ, রূপ।
প্রাকার—প্রাচীর।
বিত্ত—ধন।
বৃত্ত—গোলাকার।
বঙ্গ—দেশ বিশেষ।
ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ।
বলি—উপহার।
বলী—বলবান।
বিস্মিত—চমৎকৃত।
বিস্মৃত—ভুলিয়া যাওয়া।
যাম—প্রহর।
জাম—ফলবিশেষ।
যতি—মুনি।
জ্যোতি—দীপ্তি।
লক্ষণ—চিহ্ন।
লক্ষ্মণ—রামানুজ।
শঙ্কর—মহাদেব।
সঙ্কর—মিশ্র।
শিকার—মৃগযা।
স্বীকার—অঙ্গীকার।
দিন—দিবস।
দীন—দরিদ্র।
দূত—চর।
দ্যূত—পাশাখেলা।
শ্রবণ—কর্ণ, শোনা।
স্রবণ—ক্ষরণ।
শব—মৃতদেহ।
সব—সমস্ত।
শম—শান্তি।
সম—তুল্য।
ধনী—ধনবান।
ধ্বনি—রব।
নিরশন—অনাহার।
নিরসন—মীমাংসা, দূর করা।
পুরুষ—কঠোর।
পরুষ—নর।
প্রসাদ—অনুগ্রহ।
প্রাসাদ—অট্টালিকা।
বান—বন্যা।
বাণ—শর।
বিনা—ব্যতীত।
বীণা—বাদ্যযন্ত্র।
বসন—বস্ত্র।
ব্যসন—বিলাস।
বাণী—বাক্য।
বানি—সেকরার মজুরি।
মুখ—বদন।
মূক—বাক্যহীন।
যজ্ঞ—হোম।
যোগ্য—উপযুক্ত।
লক্ষ—সংখ্যা।
লক্ষ্য—উদ্দেশ্য।
শিকড়—গাছের মূল।
শীকর—জলকণা।
সাক্ষর—অক্ষর-জ্ঞান বিশিষ্ট।
স্বাক্ষর—দস্তখত।
শ্মশ্রু—দাড়ি।
শ্বশ্রূ—শাশুড়ী।
শান্ত—ধীর।
সান্ত—অসীম।

শরণ—আশ্রয়।
স্মরণ—চিন্তা, মনে রাখা।
শুক্ল—সাদা।
শুল্ক—কর।
শূর—বীর।
সুর—দেবতা।
সূর—সূর্য।
শীত—শীতকাল।
সিত—সাদা।
সুত—পুত্র।
সূত—সারথি।
সর্গ—অধ্যায়।
স্বর্গ—দেবলোক।
শয্যা—বিছানা।
সজ্জা—বেশভূষা।
শুচি—পবিত্র।
সূচী—ছুঁচ, তালিকা।
শারদা—দুর্গা।
সারদা—সরস্বতী।
শর—বাণ।
স্বর—শব্দ।
স্মর—কামদেব।
সরঃ—সরোবর।
সত্ত্ব—গুণ বিশেষ।
স্বত্ব—অধিকার।
সহিত—সঙ্গে।
স্বহিত—নিজের কল্যাণ

একই শব্দের বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ

অন্ধ—(বিশেষ্য)—অন্ধকে দয়া কর।
(বিশেষণ)—অন্ধ ভিক্ষুকটিকে ভিক্ষা দাও।

অন্যায়—(বিশেষ্য)—শক্তি থাকিতেও যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না সে অপরাধী।
(বিশেষণ)—তুমি অন্যায় কথা কহিতেছ কেন ?

উপর—(বিশেষ্য)—যারা চিরকাল উপরেই থাকল, যারা কখনও নীচে নামল না, তারা দুঃখীর দুঃখ কি করে বুঝবে ?
(বিশেষণ)—তোমরা হ'চ্ছ উপর তলার মানুষ।
(ক্রিয়াবিশেষণ)—উপর উপর কেবল ভুল করেই যাচ্ছি।
(বিশেষণের বিশেষণ)—তোমার মত উপর চালাকের কাজ নয়।

কর্তব্য—(বিশেষ্য)—আমার কি কর্তব্য উপদেশ করুন।
(বিশেষণ)—যে কর্তব্য কর্মে অবহেলা করে, সে পরিণামে কষ্ট পায়।

গুরু—(বিশেষ্য)—গুরুর আদেশ সর্বদা পালনীয়।

(বিশেষণ)—গুরু ভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।

ঘোর—(বিশেষ্য)—তাহার ঘুমের ঘোর এখনও কাটে নাই।

(বিশেষণ)—সম্মুখে ঘোর বিপদ।

জোর—(বিশেষ্য)—গায়ের জোরে সব কাজ করা যায় না।

(বিশেষণ)—হঠাৎ জোর তলব কেন ?

ঠিক—(বিশেষ্য)—আমার মাথার ঠিক নাই।

(বিশেষণ)—ঠিক খবর বল, মিথ্যা বলো না।

(ক্রি-বিশেষণ)—ঠিক করে বলবে, কোন কথা গোপন করবে না।

দুষ্ট—(বিশেষ্য)—দুষ্টের দমন না হইলে সমাজে বাস করা যাইবে না।

(বিশেষণ)—দুষ্ট লোকের সংসর্গ ত্যাগ কর।

দরিদ্র—(বিশেষ্য)—দরিদ্রের বন্ধু কেহ নয়।

(বিশেষণ)—দরিদ্র অবস্থা হইতে তিনি কেবল পরিশ্রমের বলেই উন্নতি করিলেন।

পশ্চাৎ—(বিশেষ্য)—পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা আসিল।

(বিশেষণ)—তাহারা পশ্চাৎ দিকে লুকাইয়া ছিল।

(ক্রি-বিণ)—উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছ কেন ?

(অব্যয়)—এখন হইবে না, পশ্চাৎ তোমার কথা শুনিব।

ভাল—(বিশেষ্য)—ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'ভালোর দিকেই দেখা যাচ্ছে।'

(বিশেষণ)—ভাল বই, ভাল কলম সকলেই চায়।

(ক্রিয়া)—ভগবান আপনার ভাল করুন।

(অব্যয়)—ভালোরে ভাল ! আমি আবার কখন্ একথা বলেছি !

বড়—(বিশেষ্য)—'বড়'র পীরিতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।'

(বিশেষণ)—আজকাল বড় লোক সকলেই।

(ক্রি-বিশেষণ)—গোবিন্দ, তুই বড় বকিস্।

সাধ—(বিশেষ্য)—মনে কতই সাধ ছিল।

(ক্রিয়া)—আমার সঙ্গে বাদ সেধে লাভ কি ?

তার—(বিশেষ্য)—অনেক দিন খবর নাই, তার করতে হবে।
(সর্বনাম)—তার অনেক টাকা আছে।
(ক্রিয়া)—'তনয়ে তার তারিণী।'

বাঁধা—(বিশেষণ)—বাঁধা বেতনে আর কয়দিন চলে?
(ক্রিয়া)—বিপদে ভীত হইও না, সাহসে বুক বাঁধ।

ভাজা—(বিশেষ্য)—ডালের সঙ্গে ভাজা দরকার।
(বিশেষণ)—ভাজা মাছগুলি কোথায় রাখিয়াছ?

মূর্খ—(বিশেষ্য)—মূর্খের অশেষ দোষ।
(বিশেষণ)—মূর্খ পুত্র পরম শত্রু।

যে—(সর্বনাম)—যে পরিশ্রম করিতে পারে সে কৃতকার্য হয়।
(বিশেষণ)—তুমি যে কথা বলিয়াছ তাহা বড়ই অন্যায় হইয়াছে।
(অব্যয়)—তুমি যে বলিয়াছিলে বাড়ী যাইবে না তাহা আমি শুনি নাই।

রৌদ্র—(বিশেষ্য)—ফাল্গুনমাস হইতেই রৌদ্র প্রখর হয়।
(বিশেষণ)—রৌদ্র রসের বর্ণনা মধুসূদন ব্যতীত অন্য কাহারও কাব্যে বিশেষ দেখা যায় না।

সত্য—(বিশেষ্য)—সত্য, ত্যাগ ও ক্ষমা এই তিনটি সাধুর লক্ষণ।
(বিশেষণ)—সত্য কথা বল, ভয় নাই।

সাধু—(বিশেষ্য)—সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গ ধর্মজীবনে উন্নতির সূচনা করে।
(বিশেষণ)—তাঁহার সাধু ব্যবহারে সকলেই সুখী হইল।

ঘষা—(বিশেষণ)—পকেট হইতে শৈলেনবাবু একটি ঘষা আধুলি বাহির করিলেন।
(ক্রিয়া)—বড় লোকের সঙ্গে গা ঘষা তাহার অভ্যাস।
(বিশেষ্য) মাথা-ঘষা আজকাল বিশেষ কেহ ব্যবহার করে না।

গরম—(বিশেষণ)—অনর্থক মাথা গরম করিয়া লাভ কি?
(বিশেষ্য)—মাঘ মাসেই বেশ গরম পড়িয়াছে।

উক্তি-পরিবর্তন

বাক্যে দুই প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি।

বক্তার কথা অবিকল বক্তার ভাষাতে বিবৃত করিলে প্রত্যক্ষ উক্তি হয় এবং বক্তার কথা অন্যে বিবৃত করিলে পরোক্ষ উক্তি হয়।

উক্তি-পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

বক্তার কথা যখন অবিকল উদ্ধৃত করিতে হয়, তখন সেই কথাগুলি উদ্ধরণ-চিহ্নের " " মধ্যে থাকে। কিন্তু পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ-চিহ্ন উঠিয়া যায় এবং পরোক্ষ উক্তি আরম্ভ করিবার ঠিক পূর্বে 'যে' এই অব্যয়টি ব্যবহার করিতে হয়।

রাম বলিল, "আমি খাইব না।"

রাম বলিল যে, সে খাইবে না।

এই উদাহরণটিতে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম ও ক্রিয়া পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে সময়-নির্দেশক শব্দগুলি অর্থাৎ 'আগামীকাল', 'গতকাল', 'এখন' প্রভৃতি শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে 'পরদিন', 'পূর্বদিন', 'তখন' প্রভৃতি হয়।

যদু মধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আগামীকাল স্কুলে যাবি ?"

যদু মধুকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে পরদিন স্কুলে যাইবে কি না।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে যদি কোনও আবেগ-প্রকাশক অব্যয় থাকে, তবে পরোক্ষ উক্তিতে সেই আবেগের ভাবটি অন্য কথায় প্রকাশ করিতে হয়।

তিনি ছেলেটিকে বলিলেন 'খবরদার, ফের যদি চুরি করিস্ তবে পুলিশ ডাকব।'

তিনি ছেলেটিকে শাসাইয়া সাবধান করিলেন যে, পুনরায় চুরি করিলে তিনি পুলিশ ডাকিবেন।

উক্তি-পরিবর্তনের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

(ক) কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বলিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?"

পরোক্ষ—কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পথিক বলিয়া সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সে পথ হারাইয়াছে কিনা।

(খ) শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমিও না হয় চার টাকাই দেব—টাকা আগে না প্রাণ আগে ? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আনগে।"

পরোক্ষ—শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, তিনিও না হয় চার টাকাই দিবেন, টাকা আগে না প্রাণ আগে! তিনি (রামলালকে) আদেশ করিলেন যে, সে যেন চামারটাকে ডেকে আনে।

(গ) নবীন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমার সব কথা আড়াল থেকে

শুনেছেন ? যদি শুনে থাকেন তাতে ক্ষতি নেই, কেননা এসব কথা আমি নিজেই একদিন আপনাকে বলতুম।"

পরোক্ষ—নবীন জানিতে চাহিল যে, তিনি তাহার সব কথা আড়াল থেকে (হইতে) শুনিয়াছেন কিনা। যদি তিনি শুনিয়া থাকেন তাহাতে ক্ষতি হয় নাই, কেননা ও সব কথা সে নিজেই একদিন তাঁহাকে বলিত।

(ঘ) রাম শ্যামকে বলিল, "তুমি কি নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া এখন আসিয়াছ ? তুমি রুগ্ন, এখনও অতি দুর্বল, নদীর ধারে এই সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার অসুখ করিবে। আজ বাড়ী ফিরিয়া যাও।"

পরোক্ষ—রাম শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে কিনা। সে রুগ্ন, তখনও অতি দুর্বল। নদীর ধারে সেই সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার অসুখ করিবে। (রাম) সেদিন তাহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিল।

(ঙ) প্রতাপ বলিলেন, "ভাই, আজ পরাজয়ের দিন নহে, আজ বিজয়ের দিন। যেন আমরা পূর্বের শক্রতা বিস্মৃত হই। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া স্বদেশ রক্ষা করিব, বিদেশী শক্রকে ভয় করিব না।"

পরোক্ষ—প্রতাপ (শক্রকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া) বলিলেন যে, সেদিন পরাজয়ের দিন নহে, সেদিন বিজয়ের দিন। (তিনি অনুরোধ করিলেন) যেন তাঁহারা পূর্বের শক্রতা বিস্মৃত হন। ভাইযে ভাইয়ে মিলিয়া তাঁহারা স্বদেশ রক্ষা করিবেন, বিদেশী শক্রকে ভয় করিবেন না।

(চ) বিপিন ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন, "বৌঠানের ভাইকে নিয়ে আজ কি কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ ? আজ বৌঠান আমাকে না হ'ক দশটা বাজে কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।"

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে বলিলেন, "বৌঠান কাজের কথা কবে বলেন, আজকেই কি শুধু বাজে কথা শুনিয়েছেন।"

বিপিন বলিলেন—"আজ তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। কবে তোমার এই স্বভাব যাবে ?"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয়। আমি মা, আমার কোলে ছেলেপিলে আছে, মাথার উপর ভগবান আছেন।"

পরোক্ষ—বিপিন ক্রোধভরে জানিতে চাহিলেন, কেন বৌঠানের ভাইকে লইয়া সেদিন (হেমাঙ্গিনী) একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়া আছেন। তিনি

জানাইলেন সেদিন বৌঠান তাঁহাকে না হ'ক দশটা বাজে কথা শুনাইয়া দিয়াছেন।

হেমাঙ্গিনী শ্রান্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন যে, বৌঠান কাজের কথা কখনও বলেন না। বাজে কথা শুধু সেই দিনই নয়, অন্য দিনও শুনাইয়াছেন।

বিপিন বলিলেন যে, বৌঠান অন্ততঃ সেদিন ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি জানিতে চাহিলেন তাঁহার (হেমাঙ্গিনীর) এই স্বভাব কবে যাইবে।

হেমাঙ্গিনী উত্তর দিলেন যে, তাঁহার স্বভাব মরণ হইলে তবে যাইবে, তাহার আগে নয়। তিনি মা, তাঁহার কোলে ছেলেপিলে আছে, মাথার উপরে ভগবান আছেন।

(ছ) সাহেব—দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবেন ?

রঙ্গরাজ—দিবেন না। তাই বলিতে আমায় পাঠাইয়াছেন।

সাহেব—আর তোমরা ?

রঙ্গরাজ—আমরা কারা ?

সাহেব—দেবী চৌধুরাণীর দল ?

রঙ্গরাজ—আমরা ধরা দিব না।

সাহেব—আমি দলশুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

পরোক্ষ—সাহেব রঙ্গরাজকে দেবী চৌধুরাণী ধরা দিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে রঙ্গরাজ উত্তর করিল যে, তিনি ধরা দিবেন না এবং জানাইল যে, সেই কথা বলিতে তিনি (দেবী চৌধুরাণী) তাহাকে (রঙ্গরাজকে) পাঠাইয়াছেন। সাহেব পুনরায় তাহারা কি করিবে জানিতে চাহিলে রঙ্গরাজ, তাহারা বলিতে সাহেব কাহাদিগকে বুঝাইতে চান জানিতে চাহিল। সাহেব বলিলেন, দেবী চৌধুরাণীর দল। তখন রঙ্গরাজ জানাইল যে, তাহারা ধরা দিবে না। ইহাতে সাহেব বলিলেন যে, তিনি দলশুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছেন।

(জ) চাণক্য। বন্ধু, ডেকে আন।

কাত্যায়ন। কাকে ?

চাণক্য। ঐ ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন। সে কি ?

চাণক্য। যাও ভাই।

পরোক্ষ—চাণক্য কাত্যায়নকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কাত্যায়ন কাহাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে জিজ্ঞাসা

করিলে, চাণক্য বলিলেন, ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে। কাত্যায়ন এই কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, চাণক্য কাত্যায়নকে ভাই বলিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

(ঝ) কণ্ব কহিলেন, "না বৎসে, ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব সে পর্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না।"

পরোক্ষ—কণ্ব তাহাকে বৎসে বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার কথায় অসম্মতি জানাইলেন। তিনি অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, তাহাদের বিবাহ হয় নাই বলিয়া তাহাদের সে পর্যন্ত যাওয়া ভাল দেখাইবে না।

(ঞ) কাদম্বিনী কেষ্টকে কহিলেন, "আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না। যাও, পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসো গে—বলি, ফুলেল তেল টেল মাখা অভ্যাস নেই ত?"

পরোক্ষ—কাদম্বিনী কেষ্টকে আর মায়া কান্না কাঁদিতে নিষেধ করিয়া পুকুর হইতে ডুব দিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন এবং বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার ফুলেল তেল টেল মাখার অভ্যাস আছে কি না।

(ট) রামচরণ বলিল, "আরে ছাই! আমি কি জানতাম আগে ইস্কুল কার নাম? আজ না শুনলাম ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে ইস্কুল বলে।"

পরোক্ষ—রামচরণ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল যে, সে আগে ইস্কুল কাহার নাম তাহা জানিত না। সেই দিনই সে শুনিল যে, ইঞ্জিরি (ইংরাজি) পড়ার পাঠশালাকে ইস্কুল বলে।

উক্তিপূরণ

বাক্যের মধ্যে একটি বা একাধিক পদ যদি অনুক্ত থাকে, তবে তাহা পূরণ করার নাম অনুক্তপূরণ বা উক্তিপূরণ। অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উপযুক্ত পদ-নির্বাচনই ইহার একমাত্র শিখিবার জিনিষ।

(ক) তখন ক্ষীণচন্দ্র — যায় যায়। চারিদিকে — হইয়া আসিতেছে — সাড়াশব্দ নাই। —প্রাঙ্গণে চারিদিকের ভিত্তির — পড়িয়াছে। ক্রমে সেটুকুও — গেল।

পূরণার্থ পদ ঃ—অস্ত, আঁধার, কোথায়ও, গৃহের, ছায়া, মিলাইয়া।

(খ) তখন — করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। — করিয়াও যাওয়া হইল না।

— খেদ — রাখিলাম। পরদিন তাঁহারা শাসাইলেন, "এক — শীত — না; জানিয়া রাখ, তুমি — বুনো —, আমরা তেমনই — — ।"

পূরণার্থ পদঃ—ঝমঝম, যাই যাই, মনের, মনে, মাঘে, পালায়, যেমন, ওল, বাঘা, তেঁতুল।

(গ) সায়ংকালে জলধিতটের—নিরীক্ষণ করিতে করিতে — অপূর্ব — পূর্ণ হয়। সময় — দিয়া চলিয়া — তাহা — জানিতে পারি না।

পূরণার্থ পদঃ—শোভা, হৃদয়, আনন্দে, কোথা, যায়, আমরা।

(ঘ) তোমার — পালন করিতে আমি কবে — হইয়াছি? তুমি আমার প্রতি যে সকল — আনয়ন করিয়াছ, তাহা সর্বৈব —। তুমি আমাকে — রূপে জানিয়াও যে এরূপ — ধারণা করিতে পারিয়াছ, ইহা বড়ই — বিষয়।

পূরণার্থ পদঃ আদেশ, পশ্চাৎপদ, অভিযোগ, মিথ্যা, বিশেষ, অন্যায়, দুঃখের।

(ঙ) সাধু — চলিতে — এ পৃথিবীতে — সময়ে নিন্দা — হইতে হয় এবং—রূপ কষ্টে — হয়। যাঁহারা মানুষ — ভগবানকে — ভয় করেন, তাঁহারা — আমাদিগের মধ্যে পাগল — পরিচিত হন।

পূরণার্থ পদঃ—পথে, গেলে, অনেক, ভাজন, নানা, পড়িতে, অপেক্ষা, অধিক, প্রায়ই, বলিয়া।

(চ) তাহার কথার উপর তুমি — স্থাপন করিলে কেন? সে চিরকাল — ভঙ্গ করিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর এরূপ কাজের ভার দেওয়া — হয় নাই। এখন যদি শেষ মুহূর্তে তাহাকে না — যায়, তবে বল, কাহাকে দিয়া সমাধা করিব? এইভাবে একজন — প্রকৃতির লোকের কথায় নির্ভর করিয়া তুমি — কাজ করিয়াছ।

পূরণার্থ পদঃ—আস্থা, বিশ্বাস, উচিত, পাওয়া, চঞ্চল, কাঁচা।

(ছ) অসময়ে — বপন করিলে শস্য ভাল হয় না। ভাল ছেলেকে — না দিলে তাহার পড়ায় উৎসাহ হয় না। বিনয় মানুষের —। অভাবে লোকের — নষ্ট হয়। ক্রোধ মানুষের প্রধান —। পলাশ ফুল দেখিতে — কিন্তু — না থাকাতে কেহ তাহার — করে না।

পূরণার্থ পদঃ—বীজ, পারিতোষিক, ভূষণ, স্বভাব, শত্রু, সুন্দর, গন্ধ, আদর।

(জ) সে যতই ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল আমি — তাহাকে মিষ্ট কথা —

লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই — শান্ত করিতে পারিলাম না। বারংবার — করিয়াও যখন বিফল হইলাম, আমিও রাগিয়া উঠিলাম। আশ্চর্যের — এই যে, আমার রাগ দেখিয়া সে — পাইল, তাহার সুর নামিয়া গেল।

পূরণার্থ পদ ঃ—ততই, বলিতে, তাহাকে, চেষ্টা, বিষয়, ভয়।

(ঝ) প্রাকৃতিক — আমাকে মুগ্ধ করিল। বাঙ্গালীর কেবল মাঠ দেখা —। ছোট পাহাড় দেখিয়া — হইল। চারিদিকে — দেখিতে লাগিলাম। পরে — বোধ হওয়ায় এক — খণ্ডের উপর বসিয়া খানিক — করিলাম। যখন — ফিরিলাম, তখন — উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে — বাজিতেছে।

পূরণার্থ পদ ঃ—সৌন্দর্য, অভ্যাস, আনন্দ, পাহাড়, ক্লান্ত, শিলা, বিশ্রাম, তাঁবুতে, সন্ধ্যা, শাখ।

(ঞ) আমি কাল সকালে তোমার — দেখা করিব। তুমি অতি — বাড়ী আসিবে, — আমার বৃথা পরিশ্রম — সময় নষ্ট —। তাহার চাল — বেশ সাদা —। ডাল — ভাত খায়। সমুদ্রের জল — কিন্তু গঙ্গার জল —।

পূরণার্থ পদ ঃ—সঙ্গে, অবশ্য, নতুবা, ও, হইবে, চলন, সিধে, ও, নীল, ঘোলা।

(ট) সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াই ময়ূরের —, অশ্বের —, গজের —, সিংহব্যাঘ্রের —, কোকিলের — এবং — স্বন্‌স্বন্‌ ইত্যাদি শুনিতে পাইলাম।

পূরণার্থ পদ ঃ—কেকা, হ্রেষা, বৃংহিত, গর্জন, কুহু, বাতাসের।

(ঠ) রাম — প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে — শাসন ও — নির্বিশেষে প্রজা — করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন — স্বল্প — সমস্ত কোশল—সর্বত্র সর্বপ্রকার — পরিপূর্ণ — উঠিল।

পূরণার্থ পদ ঃ—রাজপদে, রাজ্য, অপত্য, পালন, গুণে, দিনেই, রাজ্যের, সমৃদ্ধিতে, হইয়া।

অশুদ্ধি-সংশোধন

অশুদ্ধি-সংশোধন ব্যাকরণ শিক্ষার শেষ সোপান। শিক্ষার্থীর পক্ষে কিছু লিখিতে গেলেই ভাষায় নানাপ্রকার ভুল হয়। বানানের ভুল এই সমস্ত ভুলের

মধ্যে সর্বপ্রধান। লিঙ্গঘটিত ভুল, সমাস বা প্রত্যয়ঘটিত ভুল প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাকরণগত ভুল ছাড়াও ভাষা ব্যবহারে রীতিবিরুদ্ধ প্রয়োগ প্রভৃতি আরও কতগুলি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত পদ বা শব্দ শিষ্টপ্রয়োগ-সম্মত এবং বহুপ্রচলিত, সেগুলি ব্যাকরণ অনুসারে ভুল হইলেও শিষ্ট প্রয়োগসিদ্ধ বলিয়াই চলিতেছে।

নিম্নে কয়েকপ্রকার ভুলের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

বানান ঘটিত অশুদ্ধি

হ্রস্ব ই-কার ও দীর্ঘ ঈ-কার ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অতিত	অতীত	স্বাধিন	স্বাধীন
নিচ	নীচ	নিতি	নীতি
রিতি	রীতি	প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা
দির্ঘ	দীর্ঘ	দাশরথী	দাশরথি
মিমাংসা	মীমাংসা	জিবীকা	জীবিকা
ভাগিরথি	ভাগীরথী	সারথী	সারথি
দধিচি	দধীচি	বিকির্ণ	বিকীর্ণ
বিকীরণ	বিকিরণ	শির্ষ	শীর্ষ
পরিক্ষা	পরীক্ষা	কির্তী	কীর্তি
পৃথীবি	পৃথিবী	কিরিট	কিরীট
নিশিথ	নিশীথ	নিরিহ	নিরীহ
হৃষিকেশ	হৃষীকেশ	কালীদাস	কালিদাস
আশীষ	আশিস	কুটীল	কুটিল
আশির্বাদ	আশীর্বাদ	ব্যতিত	ব্যতীত
শারিরীক	শারীরিক	বাল্মিকি	বাল্মীকি
বিভিষিকা	বিভীষিকা	সমিচীন	সমীচীন
পিপিলিকা	পিপীলিকা	নিপিড়িত	নিপীড়িত
কৃষিজীবি	কৃষিজীবী	উন্মিলিত	উন্মীলিত

উ-কার ও ঊ-কার ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনুকুল	অনুকূল	দুর্গা	দুর্গা
কৌতুহল	কৌতূহল	কৌতুক	কৌতুক
ময়ুর	ময়ূর	বধু	বধূ
ভুল	ভুল	স্থুল	স্থূল
অকুল	অকূল	পুণ্য	পুণ্য
পুর্ণ	পূর্ণ	তুল্য	তুল্য
সমুহ	সমূহ	লঘুকরণ	লঘূকরণ
মধুসুদন	মধুসূদন	প্রত্যুষ	প্রত্যূষ
উনবিংশ	ঊনবিংশ	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
শুকর	শূকর	নুপুর	নূপুর
জাগরুক	জাগরূক	স্ফুর্তি	স্ফূর্তি
অদ্ভুত	অদ্ভুত	বিদুষী	বিদুষী
চ্যুত	চ্যুত	উদ্ভুত	উদ্ভূত
উধ্ব	ঊর্ধ্ব	মুহুর্ত	মুহূর্ত
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু	সিন্দুর	সিন্দূর

ন ও ণ ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনি	মণি	গুন	গুণ
নিমন্ত্রন	নিমন্ত্রণ	লাবন্য	লাবণ্য
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ	দর্শণ	দর্শন
বনিক	বণিক	বানিজ্য	বাণিজ্য
চিক্কন	চিক্কণ	কঙ্কন	কঙ্কণ
কল্যান	কল্যাণ	গৃহিনী	গৃহিণী
মৃনাল	মৃণাল	শোনিত	শোণিত
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ	ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ
পুন্য	পুণ্য	বহ্নি	বহ্নি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ	অগ্রনী	অগ্রণী
বর্ষন	বর্ষণ	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
অপরাহ্ন	অপরাহ্ন	সায়াহ্ন	সায়াহ্ন
মৃণ্ময়	মৃন্ময়	গগণ	গগন
ফাল্গুণ	ফাল্গুন	ফেণ	ফেন
মূর্দ্ধণ্য	মূর্দ্ধন্য	হিরন্ময়	হিরণ্ময়
যান্মাসিক	যাণ্মাসিক	সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ

শ, ষ ও স ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রসংশা	প্রশংসা	দুস্কর	দুষ্কর
অভিসেক	অভিষেক	বিসুদ্ধ	বিশুদ্ধ
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	পুস্প	পুষ্প
অভিলাস	অভিলাষ	বহিস্কার	বহিষ্কার
অভিভাসন	অভিভাষণ	বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি
সম্ভাসণ	সম্ভাষণ	সুসুপ্তি	সুষুপ্তি
পুরষ্কার	পুরস্কার	সুসমা	সুষমা
বিসাদ	বিষাদ	ধ্বংশ	ধ্বংস
আবিস্কার	আবিষ্কার	তিরষ্কার	তিরস্কার
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ	আসাঢ়	আষাঢ়
সংষ্কৃত	সংস্কৃত	পরিস্ফুট	পরিস্ফুট
ভূমিষাৎ	ভূমিসাৎ	শষ্য	শস্য
পিতৃস্বষা	পিতৃস্বসা	বিমর্শ	বিমর্ষ
শুশ্রূসা	শুশ্রূষা	কল্যানীয়াষু	কল্যাণীয়

এইগুলি ব্যতীত খ ও ক্ষ-এর প্রয়োগে ভুল হয়। র, ড়, ও ঢ়-এর প্রয়োগেও ভুল অনেক সময়েই দেখা যায়। উচ্চারণে গোলমাল থাকে বলিয়া ট ও ঠ-এর প্রয়োগে অনেক ভুল থাকে। ব্য স্থানে ব্যা এবং ব্য-ঘটিত ভুলও দেখা যায়। এই প্রকার ভুলের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	কামাক্ষা	কামাখ্যা
পুঙ্খানুপুঙ্ক্ষ	পুঙ্খানুপুঙ্খ	কাপর	কাপড়
পরশী	পড়শী	জড়ায়ু	জরায়ু
গড়ুর	গরুড়	আষাড়	আষাঢ়
মাকরসা	মাকড়সা	প্রৌড়	প্রৌঢ়
হটাৎ	হঠাৎ	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
কোষ্টি	কোষ্ঠি	জ্যেষ্ট	জ্যেষ্ঠ
যথেষ্ঠ	যথেষ্ট	ব্যাথা	ব্যথা
ব্যায়	ব্যয়	ব্যাবস্থা	ব্যবস্থা
ব্যাবহার	ব্যবহার	ব্যাতীত	ব্যতীত
ব্যাবসায়	ব্যবসায়	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
ব্যঘাত	ব্যাঘাত	ব্যয়াম	ব্যায়াম
কাষ্ট	কাষ্ঠ	কাট	কাঠ

বাংলায় ব-ফলার উচ্চারণ প্রায়ই হয় না। সেইজন্য লিখিবার সময় ব-ফলা ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এইগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় আবার যেখানে ব-ফলা নাই সেখানেও ভুল করিয়া ব-ফলা যোগ করা হয়।

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
সাস্থ্য	স্বাস্থ্য	পার্শ	পার্শ্ব
সতন্ত্র	স্বতন্ত্র	দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
জ্বলন্ত	জলন্ত	সান্তনা	সান্ত্বনা
স্বার্থক	সার্থক	কজ্জ্বল	কজ্জল
স্বরস্বতী	সরস্বতী	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উজ্জল	উজ্জ্বল	সচ্ছল	স্বচ্ছল

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্বত্ব, সত্ত্ব, সত্তা এই তিনটি বানান অনেকেরই ভুল হয়। এই শব্দ তিনটির বানান ও ইহাদের ব্যবহার প্রত্যেকেরই জানিয়া লওয়া প্রয়োজন।

দ্রুত উচ্চারণে অনেকেই কতকগুলি ভুল করিয়া থাকে। লিখিবার সময়

এই উচ্চারণ-ভুল হইতে কতগুলি বানান-ভুল ঘটিয়া থাকে। এইগুলির দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্যান্ত	অত্যন্ত	অনাটন	অনটন
অত্যাধিক	অত্যধিক	অদ্ব্যৈত	অদ্বৈত
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	আর্দ	আর্দ্র
আমাবস্যা	অমাবস্যা	অভ্যস্থ	অভ্যস্ত
উচিৎ	উচিত	উত্ত্যুঙ্গ	উত্তুঙ্গ
উত্যক্ত	উত্ত্যক্ত	অন্তহিত	অন্তর্হিত
কুৎসিৎ	কুৎসিত	জাম্মুবান	জাম্ববান
গিরিশ্চন্দ্র	গিরিশচন্দ্র	ব্রহ্মোত্তর	ব্রহ্মত্র
দেবোত্তর	দেবত্র	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	সাক্ষ্যাৎ	সাক্ষাৎ
সামিগ্রী	সামগ্রী	মুখস্ত	মুখস্থ
বিদ্যান	বিদ্বান	যুগ্য	যোগ্য
নেয্য	ন্যায্য	সাহার্য	সাহায্য
মঞ্জুরী	মঞ্জরী (রি)	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
সন্মুখ	সম্মুখ	গর্ধব	গর্দভ
ব্যাক্তি	ব্যক্তি	পিচাশ	পিশাচ
অপগণ্ড	অপোগণ্ড	গৃহীতা	গ্রহীতা
শ্মশ্মান	শ্মশান	জাজ্জ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান

সন্ধি ও সমাস ঘটিত বর্ণাশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্যান্ত	অত্যন্ত	অত্যাধিক	অত্যধিক
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী	সম্বাদ	সংবাদ
বশম্বদ	বশংবদ	যদ্যাপি	যদ্যপি
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান	ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী
পশ্বাধম	পশ্বধম	জাগ্রতবস্থা	জাগ্রদবস্থা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু	পৃথকান্ন	পৃথগন্ন
পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়	রক্ষরাজ	রক্ষোরাজ
অধগতি	অধোগতি	নভতল	নভস্তল
কতকাংশ	কতক অংশ	এমতাবস্থা	এমত অবস্থা
আপনাআপন	আপন আপন	শিরোপরি	শির-উপরি
বয়াধিক	বয়োধিক	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
জ্যোতিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র	মনহর	মনোহর
দুরাবস্থা	দুরবস্থা	যশরাশি	যশোরাশি
স্রোতবেগ	স্রোতোবেগ	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
শিরপীড়া	শিরঃপীড়া	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
মনযোগ	মনোযোগ	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
শিরমণি	শিরোমণি	ইহাপেক্ষা	ইহা অপেক্ষা
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	হস্তীদন্ত	হস্তিদন্ত
আইনানুসারে	আইন অনুসারে	কালিমাতা	কালীমাতা
নদিতট	নদীতট	কালীদাস	কালিদাস
কালিপদ	কালীপদ	পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক
গুণীগণ	গুণিগণ	প্রাণীহত্যা	প্রাণিহত্যা
স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র	অধিবাসীগণ	অধিবাসিগণ
প্রণয়ীযুগল	প্রণয়িযুগল	মহিমাময়	মহিমময়
মহিমাবর	মহিমবর	যুবাগণ	যুবগণ
সুন্দরিগণ	সুন্দরীগণ	দাসিপুত্র	দাসীপুত্র
রোগীসেবা	রোগিসেবা	চণ্ডীদাস	চণ্ডিদাস
কু-অর্থ	কদর্থ	কু-অন্ন	কদন্ন
নিরোগী	নীরোগ	নিরপরাধী	নিরপরাধ
নির্ধনী	নির্ধন	মহারাজা	মহারাজ
রাজদিগের	রাজাদিগের	পাখিগুলি	পাখীগুলি
সানন্দিত	আনন্দিত	সাপরাধী	অপরাধী
সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
ভগবানদত্ত	ভগবদ্দত্ত	সপ্রণামপূর্বক	প্রণামপূর্বক

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
যোদ্ধাগণ	যোদ্ধৃগণ	পিতাহীন	পিতৃহীন
পিতৃঠাকুর	পিতাঠাকুর	মহদুপকার	মহোপকার
ক্রেতাগণ	ক্রেতৃগণ	ছাগীদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ
বিধর্মী	বিধর্মা	সক্ষম	ক্ষম, সমর্থ
সবিনয়পূর্বক	সবিনয়, বিনয়পূর্বক	সলজ্জিত	সলজ্জ, লজ্জিত
সশঙ্কিত	সশঙ্ক, শঙ্কিত	সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
নিশ্চিন্তিত	নিশ্চিন্ত	অল্পজ্ঞানী	অল্পজ্ঞান
সাবধানপূর্বক	সাবধানে, অবধানপূর্বক	নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার
ত্রৈবার্ষিক	ত্রৈবর্ষিক, ত্রিবার্ষিক	ফণীভূষণ	ফণিভূষণ
সবিতাদেব	সবিতৃদেব	দেবীদাস	দেবিদাস
স্বামীভক্তি	স্বামিভক্তি	সাবধানী	সাবধান
সন্ন্যাসী-প্রদত্ত	সন্ন্যাসি-প্রদত্ত	পত্নিপ্রেম	পত্নীপ্রেম

লিঙ্গ ঘটিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপ্সরী	অপ্সরা	রজকিনী	রজকী
গায়কী	গায়িকা	উলঙ্গী	উলঙ্গিনী
সুকেশিনী	সুকেশা	ননদিনী	ননদ
প্রস্তরময়মূর্ত্তি	প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি	ওজস্বীভাষা	ওজস্বিনী ভাষা
এতাদৃশরচনা	এতাদৃশী রচনা	সুজলা সুফলা	সুজলা সুফলা
মুখরা স্ত্রীলোক	মুখরা স্ত্রী	বঙ্গদেশ	বঙ্গভূমি
উর্বরা দেশ	উর্বর দেশ	বিধবা স্ত্রীলোক	বিধবা স্ত্রী
তাদৃশী গরিমা	তাদৃশ গরিমা	অদ্বিতীয়া মহিমা	অদ্বিতীয় মহিমা
বিদুষী রমণীগণ	বিদুষী রমণীরা	সুন্দরী মহিলাবর্গ	সুন্দরী মহিলারা
অর্থকরী ব্যবসায়	অর্থকর ব্যবসায়	শারদীয় পূর্ণিমা	শারদীয়া পূর্ণিমা
সুন্দরী চন্দ্রমা	সুন্দর চন্দ্রমা	মনোহারিণী বাক্য	মনোহর বাক্য, মনোহারিণী বাণী
শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ			শস্যশ্যামল ভারতবর্ষ, শস্যশ্যামলা ভারতভূমি

প্রত্যয় ঘটিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন	সৌহৃদ্যতা	সৌহার্দ্য, সৌহৃদ্য
অসহ্যনীয়	অসহ্য, অসহনীয়	আধিক্যতা	আধিক্য
আলস্যতা	আলস্য	প্রফুল্লিত	প্রফুল্ল
মাধুর্যতা	মাধুর্য, মধুরতা	বপিত	উপ্ত
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা	বাহ্যিক	বাহ্য
ভাগ্যমান	ভাগ্যবান	আবশ্যকীয়	আবশ্যক
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	গ্রাহ্যণীয়	গ্রাহ্য, গ্রহণীয়
একত্রিত	একত্র	সুরভিত	সুরভি
ঐক্যতা	ঐক্য, একতা	জ্ঞাতার্থে	জ্ঞানার্থে
চাঞ্চল্যতা	চাঞ্চল্য, চঞ্চলতা	মনমুগ্ধকর	মনোমোহকর
নিঃশেষিত	নিঃশেষ	সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য, আয়ত্ত
গৌরবত্ব	গৌরব, গুরুতা, গুরুত্ব	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রমশালী
ধৈর্যতা	ধৈর্য, ধীরতা	রক্তিমতা	রক্তিমা
প্রসারতা	প্রসার	আরক্তিম	আরক্ত
বিশুদ্ধতা	বিশুদ্ধি	পূজ্যাস্পদ	পূজ্য, পূজাস্পদ
বুদ্ধিমানতা	বুদ্ধিমত্তা	নিন্দুক	নিন্দক
বৈরতা	বৈর, বৈরিতা	নির্দোষিতা	নির্দোষতা
মান্যনীয়	মান্য, মাননীয়	চোষ্য	চূষ্য
কম্পবান	কম্পমান	সিঞ্চন	সেচন
দোষণীয়	দূষণীয়	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা
সহ্যাতীত	সহনাতীত	বিবরিত	বিবৃত
ইচ্ছিত	ইষ্ট	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ
অজানিত	অজ্ঞাত	সততা	সত্তা, সাধুতা
প্রবর্ত্ত	প্রবৃত্ত	সার্বজনীন	সর্বজনীন
দায়গ্রস্থ	দায়গ্রস্ত	মনান্তর	মতান্তর
প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীন বৃক্ষ	আগত কল্য	আগামী কল্য
আরোগ্য হওয়া	আরোগ হওয়া, আরোগ্য লাভ করা	সন্তোষ হওয়া	সন্তুষ্ট হওয়া

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আশ্চর্য হওয়া	আশ্চর্যান্বিত হওয়া	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত, অধীন
বালকবৃন্দেরা	বালকেরা, বালকবৃন্দ	পক্ষিগণেরা	পক্ষিগণ
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	কেবলমাত্র	কেবল, মাত্র
সমতুল্য	সম, তুল্য	কাপড় পড়া	কাপড় পরা
ঘোড়ায় চরা	ঘোড়ায় চড়া	বই পরা	বই পড়া
পরিয়া যাওয়া	পড়িয়া যাওয়া	গরুবধ	গোহত্যা, গরুমারা
শবপোড়ান	শবদাহ, মড়াপোড়ান	ভাতবস্ত্র	অন্নবস্ত্র, ভাতকাপড়
পাকাকেশ	পক্ককেশ, পাকাচুল	বৃক্ষরাজিসমূহ	বৃক্ষরাজি, বৃক্ষসমূহ
ঘরনির্মাণ	গৃহনির্মাণ, ঘরতৈরী	নিজস্ব ধন	নিজস্ব, নিজধন
সমুদয় পক্ষিগুলি	পক্ষীসমুদয়, পাখীগুলি	সাক্ষী দেওয়া	সাক্ষ্য দেওয়া

অশুদ্ধ—ধনী কি নির্ধনী নগরবাসীগণ মাত্রই তাহার অত্যাচারে সদাসর্বদা সশঙ্কিত থাকিত। সবিনয় পূর্বক নিবেদন এই যে আপনার ঔষদ ব্যভার করিয়া আমি আরাম হইয়াছি। নিরোগী এবং নিশ্চিন্তাহীন ব্যক্তিগণ দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে সমর্থ হন। আমাদের শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে তাহার হৃদয়াকাশে কারণ্যতার উৎস ঝরিতে লাগিল। আগতকল্য কালীদাস সভার মহতী অধিবেশনের পর জ্ঞানমান লোকেরা অকারণে কাহারও মানের লাঘবতা করেন না এ বিষয় প্রমাণ করিবেন।

শুদ্ধ—ধনী কি নির্ধন নগরবাসীমাত্রই তাহার অত্যাচারে সর্বদা শঙ্কিত থাকিত। সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনার ঔষধ ব্যবহার করিয়া আমি আরাম পাইয়াছি। নীরোগ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তিগণ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হন। আমাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া (দর্শনে) তাহার হৃদয়ভূমিতে কারুণ্যের বীজ উপ্ত হইল। আগামী কল্য কালিদাস মহতী সভার অধিবেশনের পর জ্ঞানবান লোকেরা অকারণে কাহারও মানের লাঘব করেন না এ বিষয় প্রমাণিত করিবেন।

অশুদ্ধ—উত্তর স্পষ্ট হওয়া আবশ্যকীয়। তিনি রূপে কুবের, গুণে রতিপতি ও ঐশ্বর্যে বৃহস্পতির সমতুল্য ছিলেন এবং পুরুষ বচন প্রযুক্ত প্রাণান্তে অন্যের মনোপীড়া উৎপত্তি করেন নাই। সদেশী যুগের শ্রেষ্ঠ নেতা সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ভবসঙ্কর এই হালে মারা গেছেন। ঋণগ্রস্থ হওয়ায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। দুরাবস্থার বিষয় চিন্তা

করিতে করিতে তাহার মুখের উজ্জ্বল হাসি বিলোপ সাধন হইয়াছে ; নির্দোষী বলিয়া এখনও তাহার দুর্ণাম রটে নাই, তথাপি সে সশঙ্কিত চিত্তে দিন যাপিত করিতেছে।

শুদ্ধ—উত্তর স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। তিনি রূপে রতিপতি, ঐশ্বর্যে কুবের ও গুণে বৃহস্পতির তুল্য ছিলেন এবং পরুষবচন প্রয়োগে প্রাণান্তে অন্যের মনঃপীড়া উৎপত্তি করেন নাই। স্বদেশীযুগের শ্রেষ্ঠ নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ভবশঙ্কর এই বৎসর মারা গিয়াছেন। ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মুখের উজ্জ্বল হাসি বিলুপ্ত হইয়াছে। সে নির্দোষ বলিয়া এখনও তাহার দুর্ণাম রটে নাই, তথাপি সে শঙ্কিতচিত্তে দিন যাপন করিতেছে।

অশুদ্ধ—আমরা পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর বক্ষ হইতে বাঙলার দিগন্ত চওড়া শষ্যষ্যামল প্রান্তর দেখিয়া ভীষণ আনন্দিত হইলাম। কিন্তু শীঘ্র মধ্যে জলধী-জালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, আমরা কুলে অবতরণ করিলাম। জগবন্ধু-বাবুকে পীড়িত দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। তখন রোগি প্রলাপ জপ করিতেছিল। পীড়িতাবস্থায় ঋণগ্রস্থ হইয়া এই মাননীয় ব্যক্তিকে সম্পত্যি আবদ্ধ রাখিতে হইবে।

শুদ্ধ—আমরা পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বক্ষ হইতে বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত শস্যশ্যামল প্রান্তর দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কিন্তু অনতিবিলম্বে জলদজালে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, আমরা কূলে অবতরণ করিলাম। জগদ্বন্ধুবাবুকে পীড়িত দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। তখন রোগী প্রলাপ বকিতেছিল। পীড়িতাবস্থায় ঋণগ্রস্ত হইয়া এই মাননীয় ব্যক্তিকে সম্পত্তি আবদ্ধ (বন্ধক) রাখিতে হইবে।

অশুদ্ধ—অত্যাধিক অধ্যয়নের ফলে বালকটি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। গিরিশ্চচন্দ্র সেই নিশিথকালে সেখানে উপস্থিত। তাঁহার শুশ্রুষাগুণে মুমুর্ষু বালক মুহূর্তের মধ্যে আরোগ্য হইল। এই সংবাদে আমি আনন্দসাগরে পুলকিত হইলাম ও তাহার সদয়পূর্ণ ব্যবহারে কৃতার্থ হইয়া অবশেষে ধন্যবাদ দিলাম।

শুদ্ধ—অত্যধিক অধ্যয়নের ফলে বালকটি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। গিরিশচন্দ্র সেই নিশীথকালে সেখানে উপস্থিত। তাঁহার শুশ্রূষাগুণে মুমূর্ষু

বালক মুহূর্তের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিল। এই সংবাদে আমি আনন্দসাগরে ভাসমান হইলাম ও তাহার সদয় ব্যবহারে কৃতার্থ হইয়া অবশেষে ধন্যবাদ দিলাম।

অশুদ্ধ—দুরাবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মুখের উজ্জল হাসি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইলে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। তুমি মৌন হইয়া আছ কেন, আমি তো তোমাকে অপমান করি নাই। ঋণগ্রস্থ হওয়ায় প্রচুর সম্পত্যিসমূহ উচ্ছন্ন গিয়াছে।

শুদ্ধ—দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মুখের উজ্জ্বল হাসি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইলে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। তুমি মৌনী হইয়া আছ কেন? আমি তো তোমাকে অপমান করি নাই। ঋণগ্রস্ত হওয়ায় প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি উৎসন্ন গিয়াছে।

অশুদ্ধ—বয়জেষ্ঠ গুরুজন সমূহ এবং স্বজাতির উচ্চবর্ণ পদস্থদিগের প্রতি হতাদর আমাদিগের অবনতির প্রক্রিষ্ট কারণ, বিদ্দেষবুদ্ধি ছাড়িয়া স্বসম্প্রদায়-ভুক্ত মনিষীগণের সম্মান করিতে শেখ। সজাতির অনুষ্ঠিত জ্ঞানধরমের অনুশীলন কর—দেখিবে উন্নতি করায়ত্ব হইয়াছে।

শুদ্ধ—বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন এবং স্বজাতির উচ্চ পদস্থগণের প্রতি অনাদর আমাদিগের অবনতির প্রকৃষ্ট কারণ। বিদ্বেষবুদ্ধি ছাড়িয়া স্বসম্প্রদায়ভুক্ত মনীষিগণের সম্মান করিতে শেখ। স্বজাতির অনুষ্ঠিত জ্ঞানধর্মের অনুশীলন কর—দেখিবে উন্নতি করায়ত্ত হইয়াছে।

অশুদ্ধ—আমি কৃষিজীবি লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া অবগত হইয়াছি, তাহারা জমিদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে সম্মত নহে। দারিদ্রই তাহার কারণ; তাহারা বলে প্রবল জমিদার কোপিত হইলে তাহাদের আর ভদ্রস্থতা থাকিবে না; সদাসর্বদাই সশঙ্কিত হইয়া বাস করিতে হইবে।

শুদ্ধ—আমি কৃষিজীবী লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইয়াছি তাহারা জমিদারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত নহে। দারিদ্র্যই তাহার কারণ; তাহারা বলে—প্রবল জমিদার কুপিত হইলে তাহাদের আর ভদ্রতা থাকিবে না, সর্বদাই শঙ্কিত হইয়া বাস করিতে হইবে।

অশুদ্ধ—নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মড়াদাহ দেখিতে লাগিলাম, চিতার ধোয়ায় সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ আঁধার করে তুলেছিল যে আমাদের নিশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল। আমরা নদীর সৈকতে দাঁড়াইয়া জীবনের নাশ্বর্য্য ও ক্ষণভাঙ্গুর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলাম।

শুদ্ধ—নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা শবদাহ দেখিতে লাগিলাম, চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত স্থানটা সমাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছিল যে, আমাদের নিঃশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল। আমরা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া জীবনের নশ্বরতা ও ক্ষণভঙ্গুরতার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

অশুদ্ধ—বাংলা দেশের সকল পল্লীগুলিই অদ্যাপিও জঙ্গলাকীর্ণ, পানায় দীঘি পুষ্করিণী পূর্ণ, ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর করাল কবলে দলে দলে লোক সকল পতিত হইতেছে, তাহাদের গৃহ পুলকহীন, গোধন হাড্ডিসার, ভাগাড়মুখী অথচ নাছোড়বান্দা ভূম্যাধিকারীর রাজস্ব কড়া কান্তিতে দেওয়া চাই। দেশের দুরাবস্থা অবর্ণয়িতব্য।

শুদ্ধ—বাংলাদেশের পল্লীগুলি অদ্যাপি জঙ্গলাকীর্ণ, পানায় দীঘি পুষ্করিণী পূর্ণ, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর করাল কবলে দলে দলে লোকসকল পতিত হইতেছে। তাহাদের গৃহ আনন্দহীন, গোধন অস্থিচর্মসার, ভাগাড় অভিমুখী অথচ নাছোড়বান্দা ভূম্যধিকারীর রাজস্ব কড়া ক্রান্তিতে দেওয়া চাই। দেশের দুরবস্থা অবর্ণনীয়।

অশুদ্ধ—ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বহুকাল পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য সচেষ্টিত আছেন, কিন্তু তথাপি উহা নিঃস্বংশয়ে নির্ণয় হয় নাই। ইতিপূর্বে পৃথিবীর সমুদয় সভ্যজাতি এই বিষয়ে অনুশীলন করিতে প্রবর্তিত হইয়াছেন, কেহই কৃতকার্যতা হইতে পারেন নাই।

শুদ্ধ—ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বহুকাল পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য সচেষ্ট আছেন, তথাপি উহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। ইতঃপূর্বে পৃথিবীর সমুদয় সভ্যজাতি এই বিষয়ে অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

অশুদ্ধ—মনমোহনবাবু মাতৃশ্রাদ্ধে বিস্তর ব্যয় বাহুল্যতা করিয়াছেন। চৈব্য, চোষ্য, লেজ্য, পেয় সকল প্রকার ববস্তাই অতি পরিপাটী হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করিয়া পরম পরিতোষ হইয়াছিলেন।

শুদ্ধ—মনোমোহনবাবু মাতৃশ্রাদ্ধে বিস্তর ব্যয় বাহুল্য করিয়াছেন। চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সকল প্রকার ব্যবস্থাই পরিপাটি হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আকণ্ঠ ভোজন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

অশুদ্ধ—কৃষকদের সর্বদা যত্নে সেইবার অসহ্য ধান হইয়াছিল। তদ্দারা জমিদারের ঋণ পরিশোধ হইয়া তাহারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ

হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ দুরাদৃষ্ট বশত বিলাসের গহ্বরে উত্থিত হইয়া স্বীয় উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করিয়াছিল।

শুদ্ধ—কৃষকদের সর্বদা যত্নে সেবার আশাতীত ধান হইয়াছিল। তদ্দ্বারা জমিদারের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ দুরদৃষ্টবশতঃ বিলাসের ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল।

অশুদ্ধ—দেশে অর্থের অত্যাধিক অনাটন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ নাই। গৃহস্ত ঋণের দায়ে বিপৎগ্রস্থ। ধনী নির্ধনী প্রায় সমানাবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্দিষ্ট বেতন ভোগীদের অবস্তা কথঞ্চিৎ ভাল। তাহাদেরও বাড়ির আত্মিয় সজনকে সাহায্য করিতে হয়। এই অর্থ সঙ্কট হইতে মুক্ত পাওয়ার উপায় কি? উত্তরের জন্য আমরা প্রধানত দেশের বিদ্দান গণের মুখোপেক্ষী হইয়া আছি।

শুদ্ধ—দেশে অর্থের অত্যধিক অনটন। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ নাই। গৃহস্থ ঋণের দায়ে বিপদগ্রস্ত। ধনী নির্ধন প্রায় সমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগীদের অবস্থা কথঞ্চিৎ ভাল। তাহাদেরও বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করিতে হয়। এই অর্থসঙ্কট হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় কি? উত্তরের জন্য আমরা প্রধানতঃ দেশের বিদ্বানদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া আছি।

———

ছন্দ

ভাষার মধ্যে নিয়মিত ধ্বনি-বিন্যাসের প্রণালীর নাম ছন্দ।

এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে পদ্য ও গদ্য উভয়েরই ছন্দ আছে। গদ্যই হোক বা পদ্যই হোক, উচ্চারণ করিবার সময় কোন খানে না থামিয়া কেহ সবগুলি অক্ষর একটানা উচ্চারণ করে না। সাধারণতঃ কোনও আবৃত্তি বা বক্তৃতা মনোযোগ দিয়া শুনিলে লক্ষ্য করা যায় কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যার অক্ষরের পর একটু থামিতে হইতেছে। এই বিরামস্থানকে বলা হয় যতি। ছন্দ আসলে যতিযুক্ত পদ-বিন্যাস।

সকল ভাষাতেই ছন্দ আছে, তবে বিভিন্ন ভাষায় ছন্দ বিভিন্ন প্রকৃতির। বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ছন্দ একেবারে বাহিরের জিনিষ নয়। কাব্যের ভাব ও রস অনেকখানিই নির্ভর করে ছন্দের উপর। নির্দিষ্ট অক্ষরের পর যে থামিতে হয়, তাহার ফলে একটি শ্রুতিসুখকর তরঙ্গভঙ্গী অনুভব করা যায়। এই তরঙ্গভঙ্গীর তাল আমাদের মনে দোলা দেয় এবং কাব্যের মধ্যে আপনা হইতেই একটি আবেগ সঞ্চারিত হয়। অর্থের অতিরিক্ত একটি আনন্দ-বেদনার আভাস আমাদের মনে ছন্দের সাহায্যেই সঞ্চারিত হয়।

মামাদের মামুদপুরে
প্রতিদিন রাতদুপুরে
ছিদেম ঢুলি ঢোল বাজাত
টাক ডুমাডুম্ ডুম্।
বাজনার বেজায় চোটে
ছেলেরা আঁৎকে উঠে
কোন্ দেশে যে যায় পালিয়ে
পাড়াপড়শীর ঘুম।

এই ধরণের ছন্দে হালকা ভাব, হাস্য-পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে কিন্তু গভীর, গম্ভীর বা করুণ ভাব প্রকাশে এই প্রকার ছন্দের উপযোগিতা নাই।

আর-একটি উদাহরণ দিয়া বিষয়টি বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হ'ল সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর পরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

এই পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠ করিবার সময় এই বিশেষ ছন্দের তরঙ্গ আমাদের মনে একটি অনির্বচনীয় বিষাদের ভাব সঞ্চারিত করে। এই কবিতাংশের অর্থ কি তাহা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিবার আগেই ছন্দের বিশেষ তালটি আমাদের মনে একটা বিষাদ ও হতাশার ভাব সৃষ্টি করে। সুতরাং এই কথা বলা ভুল হইবে না যে, ছন্দ কেবল কবিতাকে শ্রুতিমধুর বা সুখপাঠ্যই করে না, ছন্দ কবিতার অর্থবোধে ও রসগ্রহণে আমাদের সাহায্য করে।

বাংলা ছন্দ আলোচনায় কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ সর্বদাই ব্যবহার করিতে হয়। এই শব্দগুলির সংজ্ঞা জানিয়া লওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পড়িবার সময় বা কথা বলিবার সময় যেখানে থামিতে হয়, সেই বিরামস্থলকে যতি বলে তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিরামের স্থায়িত্ব কতখানি সেই অনুসারে যতিকে অর্ধ-যতি ও পূর্ণযতি এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। কবিতার একটি চরণের শেষে পূর্ণ যতি দেওয়া হয়।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

উপরের চারিটি চরণে প্রতি আট অক্ষরের পর একটু থামিতে হয়, এখানে যে যতি পড়ে তাহার নাম অর্ধযতি।

বিরামের স্থায়িত্ব অনুসারে চরণের অংশকে বা একটি শব্দসমষ্টিকে আরও ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। লঘুযতি ও উপযতি দ্বারা নিরূপিত পংক্তি-বিভাগকে পর্ব ও পর্বাঙ্গ বলে।

বাংলা ছন্দের মূল দ্রষ্টব্য পর্ব, পর্বগুলির মাপ সমান হয়—ইহাই বাংলা ছন্দের মূল কথা। প্রত্যেকটি চরণ সমান আয়তনের পর্ব লইয়া গঠিত হয়।

এক একটি ধ্বনি উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে মাত্রা বলা হয়। মাত্রা অর্থ সময়ের পরিমাণ। স্বরধ্বনিরই মাত্রা আছে। ব্যঞ্জনধ্বনির মাত্রা নাই। বাংলা কবিতায় কোন্ অক্ষরে বা ধ্বনিতে কত মাত্রা হইবে তাহার নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম নাই। ছন্দের রীতি অনুসারে মাত্রা ঠিক করিতে হয়। বাংলা ছন্দ আলোচনায় এই মূল কথাটি মনে রাখিতে হইবে। সংস্কৃতে যেমন হ্রস্বস্বর একমাত্রা, দীর্ঘস্বর দুই মাত্রা—বাংলায় তেমন কোন নিয়ম নাই।

বাংলা কবিতায় পূর্বে ছন্দের খুব বৈবিত্র্য ছিল না। বাংলার সর্বাপেক্ষা বহুল-প্রচলিত ছন্দের নাম পয়ার। পয়ারের প্রতি চরণে চৌদ্দটি অক্ষর, দুই চরণ পর পর মিলিয়া হয় শ্লোক। এই রকম মিলযুক্ত রাশি রাশি শ্লোক পর পর মিলিয়া বড় বড় কাব্য, মহাকাব্য রচনা করা হইত।

পয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহার টানা সুর। এই টানা সুরই পযারের প্রাণ। পয়ারের চৌদ্দটি অক্ষর লইয়া যে একটি চরণ তাহা বাঙ্গালীর স্বাভাবিক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাপে গঠিত। সেইজন্য কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র হইতে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই পয়ারের চৌদ্দটি অক্ষর গ্রহণ করিযাছেন। এই পয়ারের মধ্যে বীর, করুণ, হাস্য প্রভৃতি সমস্ত রসই সুন্দর-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পয়ারের আলোচনা করা হইতেছে।

লক্ষণ সহ বিভিন্ন প্রকার পয়ারের আলোচনা করা হইতেছে।

পয়ার ঃ পয়ারের প্রতি চরণের চৌদ্দটি অক্ষরের মধ্যে আট অক্ষরের পর সামান্য বিরাম এবং চৌদ্দ অক্ষরের পরে বেশী বিরাম। দুইটি চরণ শেষ হইয়া গেলে ছেদ। ছেদ অর্থ ভাবও এইখানে শেষ হইল। পয়ারের দুই চরণের শেষে মিল থাকে। সংস্কৃতে ইহাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলা হয়।

পাখী সব করে রব রাত্তি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥

তরল পয়ার ঃ পয়ারের প্রতি চরণে চতুর্থ অক্ষরে ও অষ্টম অক্ষরে যদি মিল থাকে তবে তাহাকে তরল পয়ার বলা হয়। চরণের শেষের মিলতো আছেই, আবার এই অতিরিক্ত মিলের জন্য এই প্রকার কবিতা অতিশয় শ্রুতি-সুখকর ও মধুর হয়।

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥

মালঝাঁপ ঃ পয়ারের প্রতি চরণের চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে মিল থাকিলে মালঝাঁপ হয়।

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে
ধরি বাণ খরশান হান হান হাঁকে।

পর্যায়সম পয়ার ঃ প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে যখন মিল হয়, তখন পয়ারকে পর্যায়সম পয়ার বলা হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই প্রকার পয়ার বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মা আমার স্নেহময়ী করুণারূপিণী
এ জগতে কোথা আছে তুলনা তোমার ?
স্নেহের মূরতিরূপে আছ গো জননী
অনুপম স্নেহ তব অনন্ত অপার।

অথবা,

যেয়ো না রজনী, আজি লয়ে তারাদলে
গেলে তুমি, দয়াময়ি ; এ পরাণ যাবে
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

মধ্যসম পয়ার ঃ প্রথম ও চতুর্থ এবং মাঝখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল থাকিলে, পয়ারকে মধ্যসম পয়ার বলা হয়।

প্রভাত হইলে নিশি হাতে লয়ে থালা
পূরিত উদ্যান যার সুরসাল ফলে
ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে
ধনশালী কোন এক বণিকের বালা।

অমিত্রাক্ষর ঃ প্রতি চরণের শেষে যেখানে মিল থাকে না, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলে। মধুসূদন পয়ার হইতেই এই নূতন ছন্দের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী Blank Verse-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মিল না-থাকাই এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য

নয়। পয়ারের নির্দিষ্ট মাত্রার পর যতিপাতের যে নিয়ম ছিল, মধুসূদন যতিপাতের সেই প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চার, ছয়, আট বা দশমাত্রা পরে যতি স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি পংক্তির শেষে পূর্ণ যতির আবশ্যকতা উপেক্ষিত হইয়া ভাব যেখানে স্বাভাবিক ভাবে শেষ হইয়াছে সেইখানেই পূর্ণ যতি পড়িয়াছে। এই জন্যই বর্তমানে এই ছন্দটির নাম দেওয়া হইয়াছে—অমিল প্রবহমান পয়ার।

অমিল প্রবহমান পয়ার—এখানে ছন্দের অনুরোধে ভাব চলে না, ভাবের অনুরোধেই ছন্দের যতি নিরূপিত হয়।

একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে। দুরন্ত চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব কৌতুকে
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।

রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতি ও ছেদের স্বাধীনতাটি মানিয়া লইয়া একটি **মিলযুক্ত প্রবহমান পয়ার** ব্যবহার করিয়াছেন।

* * ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশ দেশান্তরে; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দম স্বাধীন; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী মাঝে বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপ কাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান
কর্ম অনুরত, সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।

সুবিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র মিলহীন একপ্রকার মুক্তক ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা অভিনয়ের পক্ষে খুবই উপযোগী। এই ভাঙ্গা

অমিত্রাক্ষর 'গৈরিশছন্দ' নামে পরিচিত। ইহার প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যা সমান নয়।

ছল নহি আমি, অতি ছল তুমি
মুক্তকণ্ঠে করি হে স্বীকার।
ছলে চাহ ভুলাইতে—
ছলে কহ আশ্রিতে ত্যজিতে—
চতুরের চূড়ামণি তুমি।

ত্রিপদী বাংলার আর-একটি বহুপরিচিত ছন্দ। ত্রিপদীর প্রতি চরণে তিনটি পর্ব। দুই চরণের শেষে মিল থাকে। ত্রিপদীর আবার দুই ভাগ—লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

লঘু ত্রিপদী

(১) সৌভাগ্যের দ্বার খোলা অনিবার
আছে সকলের তরে
উদ্যোগী যে জন কর্ম পরায়ণ
প্রবেশিতে সেই পারে।

মাত্রাসংখ্যা ৬+৬+৮

(২) তরণী ধরিয়া ঝাঁকে রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে
দাও দাও দাও
সিন্ধু ফেনোচ্ছল ছলে কোটি উর্ধ্ব করে বলে
দাও দাও দাও।

মাত্রাসংখ্যা ৮+৮+৬

দীর্ঘ ত্রিপদী : দীর্ঘ ত্রিপদীর মাত্রাবিন্যাস ৮+৮+১০ অর্থাৎ প্রতি চরণে ২৬।

(১) মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।

(২) কৈলাসে অম্বরময় তারা সূর্য সমুদয়
ক্ষণকালে নিবিল সকল।
তমশ্ছন্ন দিগাকাশ কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ কণ্ঠের গরল॥

লঘু চৌপদী ঃ লঘু চৌপদীর মাত্রাবিন্যাস ৮+৮+৮+৬ অর্থাৎ প্রতি চরণে ৩০। চরণে ৪টি করিয়া পর্ব।

অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পল ভর
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।

৬+৬+৬+৫ অর্থাৎ প্রতি চরণে ২৩টি অক্ষর লইয়াও এক প্রকার লঘু চৌপদী আছে।

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে

বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বাংলা ছন্দের ভাগ

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের কাব্যসাধনায় তিনি বাংলা কবিতায় বহু বিচিত্র ছন্দের উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিয়াছেন। এতকাল বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য ছিল না। বাংলা ছন্দের ভাগ বা বিচার-বিশ্লেষণ এখন আর পুরাতন ধারায় করা চলে না। বাংলা ভাষা-শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে সাহিত্য-অধ্যয়নের সকল স্তরেই বাংলা ছন্দ পাঠ্য হইয়াছে। সুখের বিষয় বাংলা ছন্দের আলোচনায় এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত হইতেছে। ছন্দশাস্ত্র আসলে একটি বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র। সুতরাং ছন্দের আলোচনাও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই হওয়া উচিত।

বাংলা ছন্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে—

(১) **তানপ্রধান বা সংকোচ-প্রধান বা যৌগিক ছন্দ**

(২) **ধ্বনিপ্রধান বা বিস্তার-প্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ**

(৩) **বলপ্রধান বা স্বরাঘাত-প্রধান বা লৌকিক ছন্দ**

[তানপ্রধান ছন্দ]

তানপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানে অক্ষরের হ্রস্বদীর্ঘের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় না, পর্ব বা পংক্তির টান দ্বারাই এই ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে সংকুচিত করিয়া ইচ্ছামত ব্যবহার করা যাইতে পারে। যুক্তাক্ষর একেবারেই নাই এই রকম একটি চরণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, বহু যুক্তাক্ষরযুক্ত একটি চরণ উচ্চারণ করিতেও ঠিক ততটুকুই সময় লাগে। ইহাই এই ছন্দের স্থিতিস্থাপকতা। একটি হ্রস্ব স্বর তুলিয়া দিয়া সেখানে একটি যুক্তাক্ষর বসাইলেও ছন্দের কোন হানি হয় না। রবীন্দ্রনাথ ইহারই নাম দিয়াছেন ছন্দের 'শোষণ-শক্তি'।

পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে

এই চরণে একটিও যুক্তাক্ষর নাই। কিন্তু এই চরণটি উচ্চারণ করিতে যে পরিমাণ সময় লাগে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই

সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস—

এই পাঁচটি যুক্তাক্ষরযুক্ত চরণটি উচ্চারণ করা যায়। অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের সংখ্যা অধিক বলিয়া ইহার মাত্রা সংখ্যা বাড়িয়া যায় নাই। পয়ার, ত্রিপদী, অমিত্রাক্ষর প্রভৃতি তানপ্রধান ছন্দেরই প্রকার ভেদ।

ছন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার **পদ্ধতি** দেওয়া হইতেছে।

প্রথমে পূর্ণযতি, অর্ধযতি দেখাইতে হইবে। পর্ব ও পর্বাঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেখাইতে হইবে। দরকার হইলে যুক্তাক্ষরকে আলাদা করিতে হইবে।

তানপ্রধান ছন্দের বিশ্লেষণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে :—

(ক) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান্‌ ॥

মহা ভার : তের কথা | অমৃত স : মান।
কাশীরাম : দাস ভণে | শুনে পুণ্য : বান্‌ ॥

(খ) দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে
সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে।
দুন্‌দুভি : বেজে ওঠে | ডিম্ ডিম্ : রবে |
সাঁওতাল : পল্‌লীতে | উৎসব : হবে |

(গ) তরী হতে : অবতরি | চলিলেন : মহেশ্বরী |
ভবানন্দ : ভবনের : পানে |
নৌকা বাঁধি : বটতলে | ঈশ্বরী পা : টনী চলে |
পিছে পিছে : সজল ন : য়ানে |

৮ + ৮ + ১০ = ২৬ ; ইহা দীর্ঘ ত্রিপদী

(ঘ) বৃটিশের : রণবাদ্য | বাজিল : অমনি |
কাঁপাইয়া : রণস্থল।
কাঁপাইয়া : গঙ্গাজল।
কাঁপাইয়া : আম্রবন | উঠিল : সে ধ্বনি |

চার চরণের স্তবক, মাত্রাসংখ্যা প্রথম ও চতুর্থ চরণে ১৪ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে ৮।

(ঙ) তুমিও আইস দেবী | তুমি মধুকরী
কল্পনা | কবির চিত্ত ফুল বন মধু
লয়ে | রচ মধুচক্র | গৌড় জন যাহে |
আনন্দে করিবে পান | সুধা নিরবধি ||

পর্বাঙ্গগুলি দেখান হয় নাই ; শেষ পংক্তির পর্বাঙ্গ-ভাগ এইরূপ হইবে—
আনন্দে : করিবে : পান | সুধা : নির : বধি

(চ) আশার ছলনে ভুলি | কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে |
জীবন প্রবাহ বহি | কাল সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে |
দিন : দিন : আয়ু : হীন | হীন : বল : দিন : দিন
তবু এ : আশার : নেশা
ছুটিল না : একি : দায় |

[ধ্বনিপ্রধান ছন্দ]

এই ছন্দে প্রত্যেক পর্বে মাত্রার সংখ্যা নির্দিষ্ট বলিয়া ইহার আর-এক নাম মাত্রাবৃত্ত। যুগ্মধ্বনিগুলি বিস্তার লাভ করিয়া দুই মাত্রা হয় বলিয়া ইহাকে বিস্তারপ্রধান ছন্দও বলা হয়। সংস্কৃতে হ্রস্বস্বরকে এক মাত্রা ও দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা ধরা হয়। সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলায় কিছু কিছু সঙ্গীত-জাতীয় কবিতা রচিত হইয়াছে।

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি
পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চির সারথি তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি

কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলা ধ্বনিপ্রধান ছন্দকে মাত্রাসংখ্যা অনুসারে ভাগ করা হয়।

৪, ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ব এই ছন্দে ব্যবহৃত হয়।

৪ মাত্রার পর্ব :—

ঝরণা | ঝরণা | সুন্ দরী | ঝরণা !
তরলিত | চন্ দ্রিকা | চন দন্ | বরণা !
অঞ্ চল | সিঞ্ চিত | গৈ রিক | স্বর্ণে
গিরি মল্ | লিকা দোলে | কুন্ তলে | কর্ণে
তনু ভরি | যৌবন | তাপ সী অ | পর্ণা

'ঝরণা'র 'ণা' দুই মাত্রা; 'গৈরিক' এবং 'যৌবন'-এর 'গৈ' এবং 'যৌ' দুই মাত্রা।

৫ মাত্রার পর্ব :—

ডেকেছে আজি | এসেছি আজি | হে মোর লীলা | গুরু
শীতের রাতে | তোমার সাথে | কী খেলা হবে | স্থরু

৬ মাত্রার পর্ব :—

বাঘের সঙ্ গে | যুদ্ধ করিয়া | আমরা বাঁচিয়া | আছি
আমরা হেথায় | নাগেরে খেলাই | নাগেরি মাথায় | নাচি

মন্বন্ তরে | মরিনি আমরা | মারী নিয়ে ঘর | করি
বিধির বিধানে | বাঁচিয়া গিয়াছি | অমৃতের টীকা | পরি।

৭ মাত্রার পর্ব :—

থাঁচার পাখী ছিল | সোনার খাঁচাটিতে ॥
বনের পাখী ছিল | বনে
একদা কী করিয়া | মিলন হল দোঁহে ॥
কী ছিল বিধাতার | মনে।

[বলপ্রধান বা স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ]

এই ছন্দে প্রতি পর্বের প্রথমে একটি প্রবল বল বা শ্বাসাঘাত পড়ে। বাংলায় বহুকাল হইতেই এই ছন্দে গ্রাম্য ছড়া রচিত হইয়াছিল। ইহাকে ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দও বলে। এই ছন্দে পূর্বে কেবল লঘু বা হালকা বিষয়ই রচিত হইত, কিন্তু বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরবর্তী কবিগণের দ্বারা এই ছন্দের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে এবং বহু বিষয় ও ভাব এই ছন্দে রচিত হইতেছে।

মনে রাখিতে হইবে এই ছন্দের শেষ পর্বটি অপূর্ণ থাকে।

(১) ছু’টবো আমি | সর’ল প্রাণে।
প’র্ণ কুটীর | হ’তে
ধ’ান নাচালো | ম’াঠের হাওয়ায়
ছু’টব আলি | পথে।

(২) এ’পার গঙ্গা | ও’পার গঙ্গা | ম’ধ্যিখানে | চ’র
ত’ারি মধ্যে | ব’সে আছে | শি’ব সদা | গ’র
এ’ক কন্যা | র’াধেন বাড়েন | এ’ক কন্যা | খ’ান
এ’ক কন্যা | র’াগ করে | ব’াপের বাড়ী | য’ান।

(৩) র’াত পোহালো | ফ’র্সা হল | ফু’টল কত | ফু’ল
কঁ’াপিয়ে পাখা | নী’ল পতাকা | জু’টল অলি | কু’ল
পূ’ব’ ভাগে | নবী’ন রাগে | উ’ঠল দিবা | ক’র
অ’রুণ বরণ | ত’রুণ তপন | দে’খতে মনো | হ’র।

(৪) ব'াড়ীর মধ্যে | স'ব চেয়ে যে | ছো'টো
খা'বার বেলায় | কে উ' ডাকে না | ত'াকে
সব' চেয়ে যে | শে'ষে এসে | ছি'ল
ত'ারি খাওয়া | ঘু'চেছে সব | আ'গে

(৫) হ'য়ত আমার | এ' পথে আর | হ'বে নাকো | আ'সা
দুধা'রে যাই | রো'পণ করে | বু'কের ভাল | বা'সা

(৬) কাজ'লা দীঘির | পদ্ম' ফুলে | যায়' দেখা তার | প'দ্ম মুখ
খে'লে বেড়ায় | ড'াকাত মেয়ে | ব'নে লয়ে | বা'ঘ ভালুক
ঝ'ড়ের সাথে | নৃ'ত্যে মাতে | বে'দের সাথে | সা'প না চায়

সনেট বা চতুর্দশপদী

তানপ্রধান ছন্দে রচিত ১৪টি চরণে গঠিত কবিতার নাম চতুর্দশপদী। ইহার ইংরাজী নাম সনেট। মধুসূদন এই রীতির প্রথম প্রবর্তন করেন। সনেট প্রথম রচিত হয় ইটালীতে চতুর্দশ শতাব্দীতে। ইটালী হইতে ইউরোপের নানা দেশে নানা ভাষায় সনেট রচিত হইতে থাকে। ইংরেজী সাহিত্যে সেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স, সুইনবার্ণ প্রভৃতি কবি উৎকৃষ্ট সনেট-লেখক। ইটালীয় সনেটের দুইটি অংশ—প্রথম আট পংক্তি লইয়া অষ্টক—উহার মিল কখখক, কখখক। শেষের ছয় পংক্তির মিলে স্বাধীনতা আছে। মিলের বিভিন্ন রীতি বিভিন্ন কবি ব্যবহার করিয়াছেন। মধুসূদন খাঁটি ইটালীয় সনেটও লিখিয়াছেন আবার সেক্সপীরিয় রীতিতেও সনেট রচনা করিয়াছেন।

ইটালীয় রীতিতে লেখা মধুসূদনের সনেট :—

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে······ক
কালিদহে। বসি বামা শতদলদলে······খ
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে······খ
মনোহরা) বাম করে সাপটি হেলনে।······ক
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে······ক
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে·········খ

বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।………খ
কার না ভোলেরে মন এ হেন ছলনে!……ক
কবিতা পঙ্কজ রবি শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমি! যশঃ সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে?
বঙ্গহৃদ হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী।

আবার, মধুসূদনের লিখিত 'কাশীরাম দাস' নামক সনেটটি সেক্সপীয়ারের রীতির :—

চন্দ্রচুড় জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি সংস্কৃত হ্রদে রাখিলা তেমতি ;
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে নরকুলধন!)
সগর বংশের যথা সাধিলা মুকুতি
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেই রূপে ভাষাপথ খননি স্ববলে,
ভারত রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

রবীন্দ্রনাথের সনেটে বা চতুর্দশপদী কবিতায় পর পর দুই চরণের শেষাক্ষরে মিলও দেখিতে পাওয়া যায়।

দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর

হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব :—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এই জগতের হৃদয় স্পন্দন।

———

অলঙ্কার

অলঙ্কার-প্রয়োগ রচনার সৌন্দর্যবৃদ্ধির একটি কৌশল।

আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি তাহা কেবল নিত্যকার প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্যই নয়। যেমন তেমন করিয়া বা কোন প্রকারে মনের ভাবটি প্রকাশ করাতেই মানুষের তৃপ্তি হয় না। মানুষ সুন্দরের পূজারী; সেইজন্যই সে যাহা বলিতে চায় তাহা সাধ্যমত সুন্দর করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, তাহার বক্তব্য বিষয়কে তাহার শিল্পীমনের সাহায্যে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে। এই আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই আমরা দেখি যে, কাব্যে নাটকে—সাহিত্যের সকল বিভাগেই ভাবপ্রকাশের রীতিটি ও ভাষাটি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাষার সাহায্যেই কতপ্রকার সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাহিত্যে রসসৃষ্টির পক্ষে, চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবার পক্ষে ভাষার মনোহারিত্ব একটি প্রধান অবলম্বন। ভাষার বিভিন্ন অলঙ্কার—অর্থাৎ ভাষার সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য কত বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা করা যাইতে পারে—সেই সমস্ত প্রয়াসের একটা বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ বহুশত বৎসর পূর্বে আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ করিয়াছিলেন এবং বহু শতাব্দীর আলোচনার ফলে আমাদের দেশে এই বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই শাস্ত্রের নাম অলঙ্কার শাস্ত্র। অলঙ্কার অর্থ ভূষণ। কাব্যের বা সাহিত্যের অলঙ্কার বলিতে বুঝিতে হইবে সেই গুণকে, যাহা শব্দের বা অর্থের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত একটা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে।

অলঙ্কার দুই প্রকার—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। যে অলঙ্কার শব্দের ধ্বনির সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে, যে সৌন্দর্য শব্দের ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তাহা শব্দালঙ্কার এবং অর্থকে আশ্রয় করিয়া যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় তাহা অর্থালঙ্কার।

অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ—এই তিনটিই প্রধান শব্দালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার

[অনুপ্রাস]

একই প্রকার ধ্বনির (স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি) পুনঃ পুনঃ বিন্যাস দ্বারা অনুপ্রাস অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়।

(ক) একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে।

(খ) পিককুল কলকল চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল চললো বনে।

(গ) কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুণ গুণ
মদন দিল গুণ ধনুকছলে
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধু মুদিত বন ভারত ভুলে।

(ঘ) কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি।

(ঙ) গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

(চ) সপ্তকোটি-কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে।

[যমক]

একই শব্দ দুই বার দুইটি ভিন্ন অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হইলে যমক অলঙ্কার হয়।

(ক) আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
(আনা = এক আনা ; ক্রয় করা)

(খ) ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।
(ভারত = কবি ভারতচন্দ্র ; ভারতবর্ষ)

(গ) যত কাঁদে বাছা বলি সর সর
আমি অভাগিনী বলি সর সর। (সর = দুধের সর ; সরিয়া যাও)

(ঘ) আট পণে আধসের কিনিয়াছি চিনি
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।
(চিনি = শর্করা ; চিনিতে পারি)

(ঙ) ঘন ঘনাকারে ধুলা উড়িল আকাশে। (ঘন = নিবিড় ; মেঘ)

(চ) দুহিতা আনিয়া যদি না দেহ
এখনি আমি ত্যজিব দেহ। (দেহ = দাও ; শরীর)

[শ্লেষ]

একটি শব্দ একবার ব্যবহৃত হইল কিন্তু ঐ একটি শব্দই বিভিন্ন অর্থ বুঝাইল। এই প্রকার হইলে শ্লেষ অলঙ্কার হয়।

(ক) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।

গুপ্ত অর্থ কৌলিক উপাধি, অন্য অর্থ লুক্কায়িত।
প্রভাকর অর্থ 'সংবাদ প্রভাকর' নামক পত্রিকা, অন্য অর্থ সূর্য।

(খ) মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
মধু অর্থ কবি মধুসূদন, অন্য অর্থ মকরন্দ।

(গ) গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

গোত্র অর্থ বংশ, অন্য অর্থ পর্বত।
মুখবংশ অর্থ মুখোপাধ্যায় বংশ, অন্য অর্থ প্রধান বংশ।
বন্দ্যবংশ অর্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, অন্য অর্থ পূজনীয় বংশ।
পিতামহ অর্থ ঠাকুরদাদা, অন্য অর্থ ব্রহ্মা।
বাম অর্থ বিরূপ, অন্য অর্থ মহাদেব।
কুকথায় অর্থ খারাপ কথা বা গালিগালাজে, অন্য অর্থ সংসারের কথায়।
কণ্ঠভরা বিষ অর্থ অপ্রিয়ভাষী, অন্য অর্থ নীলকণ্ঠ মহাদেব।
দ্বন্দ্ব অর্থ কলহ, অন্য অর্থ মিলন।

অর্থালঙ্কার

[উপমা]

দুইটি সমান ধর্মবিশিষ্ট বিভিন্ন বস্তুর সাদৃশ্যকথনের দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিলে উপমা অলঙ্কার হয়।

যে বস্তুকে উপমা বা তুলনা দেওয়া হয়, তাহা উপমেয়।

যাহার সহিত উপমা বা তুলনা দেওয়া হয়, তাহা উপমান।

সমান ধর্ম অর্থ যে গুণ উপমেয় ও উপমান উভয় বস্তুতেই আছে।

যথা, সম, ন্যায় প্রভৃতি সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

উপমা অলঙ্কারে এই চারিটি জিনিষ থাকিবে—উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম ও সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

(ক) গঙ্গা সম সুনির্মল তোমার চরণ জল
পান করিনু শিশুকাল হতে।

(খ) সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে আহা তারারত্ন যথা।

(গ) আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত রশ্মিসম।
দাও বিঁধে দাও বাসনা-সঘন এ কালো নয়নে মম।

(ঘ) শুকাইল অশ্রুবিন্দু যথা
শিশির নীরের বিন্দু শতদলদলে
উদয়-অচলে ভানু দিলে দরশন।

(ঙ) বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

একটি উপমেয়কে যখন অনেকগুলি উপমানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন মালোপমা অলঙ্কার হয়।

মলিনবদনা দেবী হায়রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্তমণি ;
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে ।

[রূপক]

উপমেয় ও উপমানের অভেদ-কল্পনাকে রূপক অলঙ্কার বলে।

এই অলঙ্কারে উপমানের অর্থ ই সাধারণতঃ প্রবল হইয়া থাকে।

(ক) মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

(খ) কি কুক্ষণে
পাবকশিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈমগৃহে।

(গ) অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী—
একটি স্বপ্ন-মুগ্ধ সজল নয়নে
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে
চারিদিকে চিরযামিনী।

(ঘ) শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু ; অশ্রু-বারিধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।

[উৎপ্রেক্ষা]

উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদরূপে সংশয় ঘটিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। উৎপ্রেক্ষায় উপমেয়কে উপমানরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয় বা বিতর্ক করা হয়।

'যেন', 'বুঝি' প্রভৃতি বিতর্কবাচক শব্দ থাকিলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলে, এবং সংশয়বাচক শব্দ না থাকিলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়।

(ক) রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে ; যেন তরু তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ। দূরে প্রবাহিনী
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি চলিছে সাগরে
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখকাহিনী।

(খ) ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি
পাণ্ডব শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি।

(গ) সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল
যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।

সংশয়বাচক শব্দ না থাকিলে যে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয় তাহার উদাহরণ :—

এসেছে বরষা এসেছে নবীন বরষা
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা
দুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা
গীতময় তরুলতিকা।

[অতিশয়োক্তি]

উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। এখানে উপমেয় ও উপমানে অভেদ সিদ্ধান্ত আছেই।

(ক) দাসীর এ তৃষ্ণা তোষ সুধাবরিষণে।

(খ) কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ?

(গ) মানস-কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে ?

(ঘ) উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর।

(ঙ) সকলে কাঁদি বলে—দারুণ রাহু
এমন চাঁদেরও হানে !

[সমাসোক্তি]

নির্জীব পদার্থে সজীব পদার্থের ক্রিয়া বা ব্যবহার আরোপ করিলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। উভয় পদার্থের সমান কার্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ হওয়া প্রয়োজন।

(ক) নয়নে তব হে রাক্ষসপুরী
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি।
ভূতলে পড়িয়া হায়, রতন-মুকুট
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি
তোমার ! উঠগো শোক পরিহরি, সতি।

(খ) হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল
তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

(গ) বসুন্ধরা দিবসের কর্ম অবসানে
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে।

(ঘ) চাহিয়া ঈর্ষার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।

[প্রতিবস্তূপমা]

প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমান পৃথক পৃথক দুইটি বাক্য থাকে, উহাদের সাধারণ ধর্ম এক হইয়াও ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। 'সম', 'যথা' প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দ থাকে না।

(ক) একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হতে নৈরাশে
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজ সাপের নিশ্বাসে।

(খ) মোগল শিখের রণে
মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে
দংশন-ক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ সনে।

[অপহ্নুতি]

উপমেয়কে গোপন করিয়া উপমানকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়।

আলুথালু কেশপাশ আলুথালু নীলবাস
কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ন।
আমি তো না নারী বলি শ্যামল জলদাবলী
নারীরূপে উঠেছে উপরে।

ঐ দৃষ্টি দৃষ্টি নয় সৌদামিনী সুনিশ্চয়
চপলতা হেরে ভয় করে।
বলিছে সে হায় হায় বিলাপ না বলি তায়
প্রলয়ের বজ্র বোধ হয়,
ঐ অশ্রু অশ্রু নয় সৃষ্টিনাশী বৃষ্টি হয়
বুঝি বিনাশিল সমুদয়।

[নিশ্চয়]

নিশ্চয় অলঙ্কারে উপমানকে প্রতিষেধ করিয়া উপমেয়কে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখান হয়। নিশ্চয় অলঙ্কার অপহ্নুতির বিপরীত। অপহ্নুতিতে উপমান উজ্জ্বলতর, নিশ্চয়ে উপমেয় উজ্জ্বলতর।

(ক) বদনমণ্ডল ইহা সরসিজ নয়,
নয়নযুগল, এ যে নহে কুবলয়।
পরিমল নয়, এ যে নিশ্বাস পবন
বৃথা মধুকর হেথা করিছ ভ্রমণ।

(খ) এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত
এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম-রঞ্জিত
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।

[সন্দেহ]

উপমেয় ও উপমান উভয় ক্ষেত্রেই সন্দেহ থাকিলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। এই সন্দেহ কবিকল্পনার।

(ক) সোনার হাতে সোনার চুড়ি
কে কার অলঙ্কার!

(খ) বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিংবা ভবের ভবানী
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।

(গ) দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল।

[অর্থান্তরন্যাস]

কোনও সাধারণ তত্ত্বকে কোন বিশেষ উদাহরণ দ্বারা অথবা বিশেষ বিষয়কে সাধারণ তত্ত্ব দ্বারা সমর্থন করিলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়।

(ক) কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ ?

এখানে দীর্ঘপথ দেখিয়া পান্থের ক্ষান্ত হওয়া একটি বিশেষ বিষয়, পরবর্তী ছত্রে একটি সাধারণ তত্ত্বের উল্লেখ।

(খ) একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন !

বর্ধমান যাওয়া বিশেষ বিষয়, যত্নদ্বারা রত্নলাভ সাধারণ বিষয় বা তত্ত্ব ; সাধারণের দ্বারা বিশেষ সমর্থিত হইতেছে।

(গ) চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

এখানে চিরসুখীর অন্যের বেদনা অনুভব সাধারণ বিষয়, বিষের বেদনা অনুভবের বিশেষ বিষয় দ্বারা ইহা সমর্থন করা হইতেছে।

[ব্যাজস্তুতি]

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়।

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা—

তব হে জনম অতি বিপুলে
ভুবন-বিদিত অজের কুলে
জনক-দুহিতা বিবাহ করি
তাহাতে ভাসালে যশের তরী।

নিন্দার পাত্রটি এখানে রামচন্দ্র কিন্তু কথায় তাঁহার গুণগানই করা হইতেছে মনে হয়। রামচন্দ্রের পিতামহ বিশ্ববিখ্যাত মহারাজ অজ। জনক-দুহিতা সীতাকে বিবাহ করিয়া তিনি যশোলাভ করিয়াছেন। নিন্দাপক্ষে অর্থ হইল— রামচন্দ্র অজের কুলে অর্থাৎ ছাগবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জনক-দুহিতা অর্থাৎ ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া যথেষ্ট অপযশের ভাগী হইয়াছেন।

নিন্দাচ্ছলে স্তুতি—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।

স্বামী অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং ভয়ানক সিদ্ধিখোর। এমন স্বামী—যাহার কোন গুণ নাই তাহার কপালে আগুন লাগুক। কিন্তু ইহার আসল অর্থ প্রশংসা—স্বামী অমর, ত্রিকাল ব্যাপিয়া তিনি বিদ্যমান এবং তিনি সর্বসিদ্ধির অধিপতি। তিনি ত্রিগুণাতীত এবং তাঁহার তৃতীয় নয়নে বহ্নি দীপ্তি পাইতেছে।

[স্বভাবোক্তি]

কোনও বিষয়ের রূপগুণের যথার্থ বর্ণনার দ্বারা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিতে পারিলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়। সৌন্দর্য-মাধুর্যের যথাযথ বর্ণনাই এখানে প্রধান—অন্য কোনও অলঙ্কার এখানে থাকে না।

(ক) কপোত-দম্পতি

বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চুচুম্বনের অবসর কালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

(খ) একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা
এপারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

(গ) নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি।
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলা গেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল, নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।

ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ লিখন ও সার-সংক্ষেপ

[ভাবসম্প্রসারণের কয়েকটি আদর্শ]

(১) রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধূমধাম
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম,
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।

জগন্নাথের রথ পথে বাহির হইয়াছে। পথে আজ লোক ধরে না। বিরাট জনতা, বিচিত্র নরনারীর সমাবেশ আজ পথকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। ভক্তগণ প্রণাম করিতেছে—পথ ভাবিতেছে, তাহারই উপর যখন নরনারী প্রণত হইতেছে তখন এ প্রণাম তাহারই উদ্দেশ্যে। এ প্রণতি তাহারই প্রাপ্য। এই কথা চিন্তা করিয়া পথ মনে মনে কৌতুক বোধ করিতেছে। রথ মনে করিতেছে, জটলা যখন তাহারই সম্মুখে তখন এ প্রণামও তাহারই উদ্দেশ্যে। রথস্থিত মূর্তি মনে করিতেছে—সহস্র ভক্তের প্রণাম আর কাহারও প্রাপ্য নয়—এ প্রণাম সকলে তাহারই উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছে। সুতরাং ইহা কেবল তাহারই প্রাপ্য। কিন্তু ভক্ত হৃদয়ের আকুলতা যিনি অদৃশ্যে থাকিয়া অনুভব করিতেছেন, তিনি জানেন—ভক্তের এই শ্রদ্ধানিবেদন কাহার উদ্দেশ্যে। সকল প্রণাম, সকল শ্রদ্ধা, সকল আকুতি রূপের মধ্য দিয়া যে রূপাতীতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইতেছে—তাহা তিনি জানেন। তাই ভক্তগণের এই প্রণাম তিনি গ্রহণ করিতেছেন। পথ, রথ ও মূর্তি নিজেদের উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া নিজেদের দেবতার আসনে বসাইয়া মাঝখান হইতে ভক্তের শ্রদ্ধায় যে ভাগ বসাইতেছে তাহা ভাবিয়া অন্তর্যামী মনে মনে কৌতুক বোধ করিতেছেন। বাহিরের আড়ম্বর যত বড়ই হোক, তাহা বাহিরের জিনিষ, অন্তরের নয়। উপায় ও উদ্দেশ্য এক নয়। সোপানশ্রেণী বাহিয়া দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। সিঁড়ি দিয়া না উঠিলে দেবতার কাছে যাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেকটি সিঁড়িই যদি দাবী করিয়া বসে—দেবতার সম্মান তাহারই প্রাপ্য—তবে ইহার চেয়ে হাস্যকর আর কি হইতে পারে?

(২) দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাবো কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

এই ছত্র কয়টিতে কবির একটি উপলব্ধি প্রকাশিত হইয়াছে। দেবতাদের প্রতি মানুষের যে ভক্তি তাহা পার্থিব মানবীয় প্রেম হইতে পৃথক নয়। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন, "যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।" যে আপনার প্রেমাস্পদের প্রতি অনুরাগ আপনার অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে না, সে হতভাগ্য ভগবানের প্রেমকে উপলব্ধি করিতে পারিবে কেমন করিয়া ? মানুষ তাহার ভালোবাসার পাত্রকে ভালবাসিয়া তাহার মধ্য দিয়াই ভগবৎ প্রেমের আস্বাদ লাভ করে। মা যখন আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, ক্ষুদ্র মানব-শিশুটিকে বেষ্টন করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করে। "প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধু আপনার স্বার্থ ত্যাগ করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে। তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে সীমাতীত, লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করা যায়।" যে ফুল আমরা দেবতার চরণে উপহার দিই, সেই ফুল দিয়াই আমরা প্রিয়জনকে সম্বর্ধনা জানাই। একই বস্তু মানুষের উপহারে ও দেবতার সেবায় আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। এইভাবে দেবতায় ভক্তি ও মানবপ্রীতির মধ্যে কবি একটি সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কবি বলিতে চান যে, অধ্যাত্ম প্রেম বা ভবগৎভক্তি জীবনের একটি সঙ্কীর্ণ ভাববিহার মাত্র নহে। সমগ্র জীবনের মধ্যে অন্তরধর্মকে সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া না তুলিলে ভগবৎভক্তি লাভ করা যায় না।

(৩) দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

দণ্ড শাস্তিদাতার অত্যাচার নয়। মানুষের সমাজে যে অন্যায় সংঘটিত হয়, তাহার প্রতিবিধানের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দণ্ডদানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর নির্যাতন এই দণ্ডদানের উদ্দেশ্য নয়, পাপ যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, দুষ্কৃতকারীর যাহাতে চরিত্রের সংশোধন হয় তাহাই বিচারকের লক্ষ্য

হওয়া উচিত। সুতরাং বিচারক এক হস্তে যখন দণ্ডিতের উপর শাস্তির গুরুভার চাপাইয়া দিবেন, অন্যহস্তে তখন তাঁহাকে আপন চক্ষু হইতে মানুষের প্রতি সমবেদনার অশ্রু মুছিতে হইবে।

মানবের প্রতি প্রীতি না থাকিলে বিচারকের বিচার কঠোর নির্যাতন হইয়া উঠে। পাপের প্রতি ঘৃণাই বিচারের উদ্দেশ্য, বিচারক যদি অপরাধীকে অবজ্ঞা করেন, তবে সে বিচারের উদ্দেশ্য নষ্ট হয়। পাপীকে যখন বিচারক পাপ হইতে ভিন্ন করিয়া দেখেন, তখন তাঁহার চিত্ত পাপের শাস্তিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিত মানবের প্রতি সমবেদনায় কাতর হইয়া পড়ে, তখনই বিচার সার্থক হইয়া উঠে।

(৪) প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে, 'ভাল আছ ভাই?'

উচ্চ হোক্, নীচ হোক্, দরিদ্র হোক্ উদারচরিত্র ব্যক্তি কাহাকেও উপেক্ষা করেন না বা তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। সকলের সহিত সমান ব্যবহারেই তাঁহার ঔদার্যের পরিচয়। সংসারে সকলেই সমান অবস্থা, সমান পদ, সমান গুণ লাভ করিতে পারে না। সংসারে এমন ব্যক্তিও আছে, যে অখ্যাত, অজ্ঞাত, যার পরিচয় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর—যার অবস্থা অতিশয় দীন, এই কারণে সংসারের এক কোণে সে সকলের অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহার সহিত কথা কহিতে সকলেই ঘৃণা ও লজ্জা বোধ করে, সকলের ধিক্কারে তাহার জীবন ব্যর্থতায় ভরিয়া ওঠে। কিন্তু সেই মানুষকেই মানুষ মনে করিয়া, তাহার সকল দীনতা, তুচ্ছতা অবহেলা করিয়া, তাহাকে আপন করিয়া লইয়া, যিনি তাহার সহিত সদালাপ ও সদ্ব্যবহার করেন তিনি উদার, তিনি মহৎ। প্রাচীরের একাংশে যে নামহীন, পরিচয়হীন ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে, ফুলের জগতে তাহার আদর নাই—ফুলের আসরে তাহার স্থান নাই—অবহেলার তিক্ত ধিক্কারে তাহার জীবন ম্লান। যেখানে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, যেখানে কেহ তাহার দিকে তাকায় না, সেখানেও সে সূর্যের করুণা হইতে বঞ্চিত নয়। প্রতি প্রভাতে সূর্যের সোনার আলোক অকৃপণভাবে, অজস্রভাবে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া যাইতেছে। উদারচরিত্র ব্যক্তির এই লক্ষণ। দানে

তাহার কার্পণ্য নাই, বিচার নাই। পৃথিবীর কেহ তাহার উপেক্ষার নয়—অনাদরের নয়, সকল জগৎ তাহার আপন—তাহার আত্মীয়।

(৫) কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
"ভাই বলে ডাকো যদি, দেবো গলা টিপে!"
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন শিখা বলে, "এসো মোর দাদা।"

মাটির প্রদীপের চেয়ে কেরোসিন-শিখার আলো হয়তো সামান্য একটু উজ্জ্বল, কিন্তু এই উজ্জ্বলতার জন্যই সে তাহার সমশ্রেণী প্রদীপের সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চায় না। আত্মীয়তার কথা প্রকাশ পাইলে তাহার আভিজাত্য নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় সে প্রদীপকে ভয় দেখায়—কোন প্রকারে যেন সম্বন্ধের কথা বাহির হইয়া না পড়ে। কিন্তু আকাশের চাঁদ, যাহার সঙ্গে কেরোসিন-শিখার কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই, তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিবার জন্য সে লালায়িত হইয়া উঠে।

এই সুন্দর ছত্রকয়টির মধ্য দিয়া সাধারণ সংসারী মানুষের চরিত্রগত একটা দুর্বলতা চমৎকারভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। নিজের নিতান্ত নিকটআত্মীয় যদি দরিদ্র হয়, সামাজিক পদমর্যাদায় যদি ছোট হয়, তবে এক ধরণের লোক তাহার সহিত মেলামেশা এমন কি সম্বন্ধ স্বীকার করাকেই অপমানজনক বলিয়া মনে করে। আবার এই লোকই অনাত্মীয় বড় লোকের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। যাহার সহিত কোন সম্পর্কই নাই, সে যেহেতু বড় লোক, তাহার সহিত একটা কাল্পনিক সম্বন্ধ গড়িয়া লইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভের চেষ্টা করে।

(৬) যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে ;
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

আমাদের দেশে জনগণের একটা বৃহৎ অংশ বহুকাল যাবৎ মনুষ্যত্বের সকল অধিকার হারাইয়া বসিয়া আছে। সমাজে যাহারা একটু উঁচুতে আছে তাহারা নানাপ্রকারে ইহাদিগকে ছোট করিয়া রাখিতে চায়। ইহারা সমাজে অবজ্ঞাত। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই—জ্ঞানলাভ করিবার সামান্য সুযোগও ইহারা পায় না। ইহারা

চিরকাল নিজেরা অর্ধাহারে, অনাহারে কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া সমাজের তথাকথিত উচ্চস্তরের লোকদের সেবা করিয়া আসিতেছে। সমাজে ইহাদের স্থান সকলের নীচে।

যাহারা নীচে আছে তাহাদের এই অনুন্নত অবস্থার জন্যই সামগ্রিক-ভাবে সমাজের অবনতি ঘটিতেছে। সমাজের ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তবে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? ইহাদিগকে নীচে রাখার ফলে সমাজের জীবনাদর্শ সংকুচিত হইয়াছে, অশিক্ষার কুফল সমগ্র সমাজ ছাইয়া ফেলিয়াছে, কুসংস্কার ও জড়তা সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। সমাজের এই সামগ্রিক অবনতি রোধ করিতে হইলে যাহারা নীচে আছে তাহাদের বড় করিবার জন্য প্রয়াস করিতে হইবে। সমাজের এক অংশ বড় হইবে আর এক বৃহৎ অংশ ধূলায় লুটাইবে—দেহের সমস্ত রক্ত কেবল মুখে আসিয়া সঞ্চিত হইবে আর দেহের অন্যান্য অংশ রক্তাভাবে ক্ষীণ হইবে—প্রকৃতি এ অসঙ্গতি সহ্য করে না। যাহারা নীচে আছে তাহাদিগকে তুলিলেই সমাজ বড় হইবে—যাহারা পিছনে আছে তাহাদিগকে টানিয়া লইলেই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হইবে।

(৭) শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রাখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

শৈবাল বিরাট দীঘির এক কোণে থাকে। তাহাতে যেটুকু শিশির জমে তাহা দীঘির জলরাশির তুলনায় অতি সামান্য। সেই এক বিন্দু শিশিরে দীঘির জলরাশির অতি সামান্যই পরিবর্তন হয়। শৈবাল যদি সগর্বে মাথা তুলিয়া সে দীঘিকে এক ফোঁটা শিশির দিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করে তাহা হইলে তাহার অহমিকাই প্রকাশ পায় এবং যে দীঘির তুলনায় তাহার জলের অল্পতা জানে তাহার নিকট সে হাস্যাস্পদ হয়।

পৃথিবীতে এমন লোকের অভাব নাই যাহারা ঐ শৈবালের মতোই অতি তুচ্ছ কাজ করিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে। যে কোন রকম দানই উপেক্ষণীয় নয় বটে কিন্তু সামান্য দানের সহিত যদি দানের দম্ভ মিশিয়া থাকে তাহা হইলে সেই দানের গৌরব নষ্ট হইয়া যায়। তাহার সঙ্গে তাহার হাস্যকরত্ব সকলের গোচরীভূত হইয়া যায়। সামান্য কাজ করিয়া ক্ষুদ্রের দম্ভ তাহার ক্ষুদ্রত্বই

প্রকাশ করে। বৃহৎ পরিবেশ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের অভাবই তাহার অসার দম্ভের কারণ।

(৮) মহাভারতে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্মেই কর্মের চরম সমাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্য, বীর্য, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরব সংগীত বাজিয়া উঠিতেছে। রামায়ণেও তাহাই, পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, করায়ত্ত সিদ্ধি স্খলিত হইয়া পড়ে—সকলেরই পরিণামে পরিত্যাগ। অথচ এই ত্যাগে দুঃখে নিষ্ফলতাতেই কর্মের মহত্ত্ব ও পৌরুষের প্রভাব রজতগিরির ন্যায় উজ্জ্বল ও অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষ কর্মকে কোনোদিন উপেক্ষা করে নাই আবার তাহাকে কোনো দিন সকলের উপরে স্থানও দেয় নাই। মহাভারত ও রামায়ণের মধ্যে আমরা কর্মের সুবিপুল আয়োজন দেখিতে পাই। একদিকে কুরুক্ষেত্র অপরদিকে লঙ্কাকাণ্ড। দুইটি বৃহৎ ব্যাপারের জন্য কত প্রস্তুতি! কিন্তু পরিণামে কী হইল? কুরুক্ষেত্র মহাসমরে জয়লাভ করিবার পর পঞ্চপাণ্ডব রাজ্য ত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হইলেন। যে সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য রাম রাক্ষসবংশকে নির্মূল করিলেন, সেই সীতাকে তিনি লোকরঞ্জনের জন্য বিসর্জন দিলেন। সমস্ত কর্মসংঘাতকে ছাপাইয়া একটা বৈরাগ্যের সুর যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। কর্ম যে চরম জিনিষ নয়, এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে এই বোধটিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু বৈরাগ্যের এই সুরটি থাকাসত্ত্বেও কর্মকে কোথাও অগৌরবের বিষয় বলা হয় নাই। বরং ইহাতে কর্মের গরিমা আরও বাড়িয়াছে। শুদ্ধ মাত্র নিষ্ক্রিয়তা ভারতবর্ষের আদর্শ নয়। কর্মের মধ্য দিয়া পৌরুষের প্রকাশ হইতে পারে। নিছক কর্মের মধ্যে উন্মাদনা থাকিতে পারে বটে কিন্তু তাহা সত্য সামগ্রী নয়। কর্মকে বৈরাগ্যের সহিত যুক্ত করিলেই কর্মের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। প্রবল আসক্তির সঙ্গে কর্ম করিলে তাহার ফল সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু ত্যাগের সহিত জড়িত হইলেই কর্মের গৌরব।

যে পুরুষ ত্যাগ ও দুঃখকে বরণ করিয়া কর্মব্রত সাধন করিতে অগ্রসর হন—কর্মফল অপেক্ষা সাধনাই যাঁহার জীবনের মুলমন্ত্র, তাঁহার জীবনেই পৌরুষের যথার্থ প্রকাশ হয়—তাঁহার জীবন যুগপৎ কর্ম ও বৈরাগ্যের জয় ঘোষণা করে।

(৯) যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে রাখে তারে সবে।

মানুষ অমর নয়। যেভাবেই সে জীবনযাপন করুক না কেন, একদিন তাহাকে এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। মানুষ তাহার এই সীমাবদ্ধ জীবনে আত্মোদরপূরণের জন্য বা স্বকীয় স্বার্থ সাধনের জন্য যাহা কিছু করিয়াছে তাহা তাহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু সৎকর্মে, লোকের উপকার করিয়া বা লোকের মনে আনন্দ দান করিবার জন্য মানুষ যদি কিছু করে, তবে তাহা তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায় না। ভবিষ্যতের মানুষ কৃতজ্ঞতার বশে সেই উপকার মনে রাখে। কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যাঁহারা বিবিধ উপায়ে পরের সেবা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের কীর্তির মধ্য দিয়া বাঁচিয়া থাকেন। স্বকীয় স্বার্থের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া যায়।

(১০) বক্তা ও লেখক এক জাতীয় জীব নন, ইহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন তিনি শ্রোতার মন জবর দখল করেন; অপর পক্ষে লেখক পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না, লেখক পাঠকের অবসরের সাথী।

বক্তা ও লেখক উভয়ে স্থূলভাবে দেখিতে গেলে এক জাতীয় জীব হইলেও আসলে দুইজনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয়ে যে রীতি অবলম্বন করেন তাহাও বিভিন্ন। বক্তা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত শ্রোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে চান; লেখক পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করেন। উভয়েই মনে করেন শ্রোতা বা পাঠকের হৃদয় অধিকার করাই

উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বক্তা অবলম্বন করেন একপ্রকার পদ্ধতি এবং লেখক অবলম্বন করেন অন্যপ্রকার পদ্ধতি। বক্তার উদ্দেশ্য বাগ্মিতার দ্বারা শ্রোতার মন মুগ্ধ করিয়া তখন তখনই তাহার চিত্ত আকৃষ্ট করা। সেইজন্য বক্তাকে তাঁহার ভাষণের মধ্যে হৃদয়াবেগ সঞ্চার করিয়া বাগ্মিতা ও আবেগের অবিরাম আতিশয্যে শ্রোতার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতে হয়। বক্তাকে থামিলে চলে না। বক্তা তাঁহার সাফল্য লাভ করেন শ্রোতৃমণ্ডলীর হর্ষধ্বনি বা করতালির মধ্য দিয়া। বক্তাকে সাময়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়া জনচিত্ত দখল করিতে হয়। কিন্তু লেখকের রীতি সম্পূর্ণ আলাদা। পাঠকের চিত্তকে ধীরে ধীরে অধিকার করাই লেখকের উদ্দেশ্য। এইজন্য তিনি অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত পাঠকের চিত্তে তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তৃত করিতে থাকেন। বক্তা যে পদ্ধতিতে কাজ করেন লেখকের পক্ষে সে পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে না। লেখকের উদ্দিষ্ট যে পাঠক সমাজ তাহা সম্মুখে উপস্থিত থাকে না। পাঠকের অবসর সময়ে লেখক তাহার সাথী হন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার রচনা-কৌশলের মধ্য দিয়া পাঠকের অন্তরে তাঁহার বক্তব্য পৌঁছাইয়া দেন। লেখক যদি বক্তার মত জোর করিয়া পাঠকের চিত্ত দখল করিতে অগ্রসর হন তবে তাঁহার ব্যর্থতা সুনিশ্চিত।

[ভাবার্থ লিখনের কয়েকটি আদর্শ]

(১)

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ, শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব ফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,

নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে,
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

বর্তমান যুগের ক্ষুদ্রতায় ব্যথিত হইয়া কবি প্রাচীন ভারতের আদর্শগুলি স্মরণ করিয়াছেন। ভারতের রাজা সময় আসিলে তাঁহার রাজবেশ ত্যাগ করিয়া রাজ্য ঐশ্বর্য উপেক্ষা করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন—স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যের এ দৃষ্টান্ত অন্য কোন দেশের নরপতি দেখাইতে পারেন নাই। ক্ষত্রিয়ের রণনীতির উদারতা ভারতবর্ষে এত উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল যে, ভারতীয় বীর রণজয়ের মুহূর্তেও অস্ত্র সংবরণ করিয়া শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছে। ভারতের কর্মী নিরাসক্ত হইয়া ফলাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া কর্মের সাধনা করিয়াছে। নিষ্কামকর্মী কর্মফল ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া কর্মযোগের যে আদর্শ ভারতে স্থাপন করিয়াছে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। ভারতের গৃহস্থ আত্মকেন্দ্রিক হইয়া নিজের সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে নাই, তাহার আতিথ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে আত্মীয়স্বজন সকলের মধ্যে। ভারতে ঐশ্বর্যের মধ্যে অহংকার ছিল না, দারিদ্র্যের মধ্যে হীনতা ছিল না; ধনী তাহার ঐশ্বর্যের সার্থকতা খুঁজিয়াছে সমাজের কল্যাণে, সমাজের সেবায়। দরিদ্র তাহার অনাসক্তির দ্বারা তাহার দারিদ্র্যকে কেবল সহনীয়ই করে নাই, গৌরবান্বিতও করিয়াছে। ভারতবর্ষ এই শিক্ষাই দিয়াছে যে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায়, সকল কর্মে ভগবানকে সর্বসাক্ষীরূপে সম্মুখে রাখিয়া সংসার-জীবন যাপন করাই বিধি।

(২) তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে ঘেরা সহস্র কুটীরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়া বট মূলে,
গঙ্গার পাষাণ ঘাট দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্য কল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গ জননী,
আপন সহস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে। এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোন কাজে।

নাহি জান সে বারতা। তুমি শুধু মাগো
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগো
মলয় বীজন করি। রয়েছ মা ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্য ভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাট শোভা সীমন্ত রতন
তোমার গৌরব তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।

কবি বঙ্গজননীর কল্যাণী মাতৃমূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন। যে মা সন্তানকে পালন করিতে জানেন না, স্নেহে ও সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দিয়াই যাঁহার তৃপ্তি, কোন অভাবেই যাঁহার কল্যাণী মূর্তি একটুও ম্লান হয় না, কবি সেই অনন্ত ক্ষমাময়ী মমতাময়ী মাতৃমূর্তিকে প্রণাম জানাইতেছেন। বাংলার শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, ছায়ানিবিড় পল্লীতে, নদীর তীরে ও বটের ছায়ায় বঙ্গজননীর যে মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহা নিরলস কর্মপরায়ণা কল্যাণময়ী মূর্তি। হাসিমুখে তিনি সন্তানের সকল কাজ করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু বঙ্গজননীর যাহারা সন্তান—যাহাদের জন্য মাতা এই উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন তাহারা কি মানুষের মত মানুষ? এই পৃথিবীতে তাহাদের স্থান নাই—তাহারা সকলের নীচে, সকলের পিছনে। বৃহৎ বিশ্বব্যাপারে তাহাদের কোন হাত নাই, বিশ্বের জীবনস্রোত, কর্মস্রোত যেখানে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে সেখানে তাহাদের ডাক পড়ে না। বহির্বিশ্বের জীবন-চাঞ্চল্য হইতে দূরে গৃহকোণে মুখ গুঁজিয়া দৈন্য-ক্লিষ্ট প্রাণ কোন রকমে তাহারা বাঁচাইয়া রাখে। জননীর ঐশ্বর্যের কোন অভাব ছিল না কিন্তু অপদার্থ সন্তানেরা মাতৃ অঙ্গের অলঙ্কারগুলি একটি একটি করিয়া খুলিয়া নিয়া বিদেশী বণিকের নিকট বাঁধা রাখিয়াছে। মাতার ধনরত্ন, শস্যসম্পদ, স্বাধীনতা সবকিছুই অকর্মণ্য সন্তানের দল বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেবাপরায়ণা জননী এত বড় দুঃখের কথাও ভুলিয়া আছেন। যাহারা তাঁহাকে এত দুঃখ দিয়াছে, তাহাদেরই সেবায় তিনি সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। স্নেহসর্বস্ব এই মাতৃহৃদয়ের তুলনা নাই, আত্মবিলোপ-পরায়ণা বঙ্গজননীর বন্দনা করিতে কবির চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেছে।

(৩) খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানা শোনা
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনা গোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব কত সর্বনাশ
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস।
রক্ত প্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা
উঠে কত হলাহল উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে কেবা জানে নাম
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে
কেহ যায় ঘরে কেহ আসে ঘর হতে।

বিশ্ব জুড়িয়া যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, কত রক্তপাত, কত বিপ্লব চলিতেছে। নবীনের আবির্ভাবে পুরাতন ভাবধারার বিলোপ ঘটিতেছে। কত রাজ্য-রাজা, কত সিংহাসন-সাম্রাজ্য, ইতিহাসের এক এক অঙ্কে উঠিতেছে, পড়িতেছে—কত পতন-অভ্যুদয়, কত ভাঙ্গা-গড়া অবিরাম চলিতেছে। কিন্তু নব নব যুগের এই ভাঙ্গা-গড়া নগরকে যতখানি প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে গ্রামকে ততখানি পারে নাই। বাহিরের জগতে আন্দোলনের অন্ত নাই। নূতন যুগের জয়গানে নগর অপূর্ব আশা-উদ্দীপনায় মুখরিত। কিন্তু গ্রামে সেই চিরাচরিত জীবনযাত্রা একভাবেই চলিয়াছে। মাঝি খেয়া নৌকা পারাপার করিতেছে, কৃষক ক্ষেত্রে হল চালনা করিতেছে। ত্বরা নাই, ব্যস্ততা নাই, সংশয়-সন্দেহ নাই। গ্রামবাসীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপর নগরের এই কলকোলাহল বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

(৪) চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,

ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি ;
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি,
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান
হে কাশী ! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

শিবজটা-বিহারিণী গঙ্গাকে কঠোর তপস্যা করিয়া ভগীরথ মর্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন, ইহাতে সগরবংশের মুক্তি সাধিত হইয়াছিল,—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল পবিত্র হইয়াছিল। মহাকবি বেদব্যাস-রচিত সংস্কৃত মহাভারত জনসাধারণের দুর্বোধ্য ছিল। যাহারা সংস্কৃত ভাষা জানিত না, তাহারা এই মহাকাব্যের রসাস্বাদন করিতে না পারিয়া অন্তরে গভীর দুঃখবোধ করিত। কাশীরাম দাস বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃত মহাভারতের রসপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়া দিলেন—কাশীদাসী মহাভারতের মধ্যে বঙ্গবাসী এই সুপ্রাচীন মহাকাব্যের রসধারার সন্ধান পাইল—তাহাদের রসতৃষ্ণা মিটিল। এইজন্য বঙ্গবাসী চিরদিন কাশীরামের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে। লোকহিতের জন্য এই অমৃত পরিবেশন করিয়া কাশীরাম যথেষ্ট পুণ্যার্জন করিয়াছেন ও শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি লাভ করিয়াছেন।

(৫) বিদায়, সিন্ধু ! আসি,
প্রবাস-বন্ধু, লীলাছন্দের নীলানন্দের রাশি।
ফুরালো জীবনে নয়নোৎসব লহরীপুঞ্জ গোণা
সন্ধ্যা-প্রভাতে তোমার নান্দী বন্দনাগান শোনা

তোমার কেশর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভয়ে ফুরাইল ছেলে খেলা,
ফুরালো বালুকা-মন্দির-গড়া আনমনে সারা বেলা।
হেরিব না হায় তোমায় ফণায় নিশীথে মণির দ্যুতি,
মহানীলিমায় ইন্দ্রিয়াতীত লভিব না অনুভূতি।
হেরিব না আর পুলিন-মাতার স্নেহের অঙ্ক 'পরে
উর্মিমালার ফেনিল মূর্ছা শ্রান্তি-হরণ তরে।
লভিব না আর প্রীতির শঙ্খ শুক্তির উপহার।
ফুরালো অবাধ প্রাণের প্রসার মুক্তির অধিকার।

সমুদ্রতীরে কিছুকাল প্রবাস-জীবন যাপন করিয়া কবি সমুদ্রের নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন। আজ কবির কেবল স্মরণ হইতেছে সমুদ্র কত ভাবেই না কবিকে আনন্দ দিত, কি বিচিত্র ভাবেই না কবির মন পূর্ণ করিয়া চলিত। কল্লোলিত মহাসমুদ্রের অবিরাম কলসংগীত, অশ্রান্ত তরঙ্গ-গর্জন, সিন্ধুতটে বালুকা লইয়া সারাবেলা ধরিয়া খেলা কবির মন ভরিয়া রাখিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে তরঙ্গের চূড়ায় যে দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিত, অসীম উদার নীলসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া যে অনন্তের আভাষ কবি অন্তরে অনুভব করিতেন, সৈকতভূমিতে অঙ্গ এলাইয়া দিয়া তরঙ্গের ধ্বনি শুনিতে শুনিতে যেভাবে তিনি দেহ-মনের ক্লান্তি দূর করিতেন—সে-সব দৃশ্য ও সে-সব ভাব ছাড়িয়া আজ তিনি সমুদ্রের নিকট বিদায় লইতেছেন।

(৬) বুদ্ধদেবের সময়ে যদি সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকত, তাহলে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা, চাল-চলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটখাট ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ-তাপ-ক্লান্তি-ভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক বলে গণ্য করা যায়, তাহলে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের, ইংরাজিতে যাকে বলে পারসপেক্‌টিভ্‌। যে জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্য মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। অথচ, এমন সব মানুষ আছেন যারা শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার

করে থাকেন। যে-গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরা যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে সেটা সাধারণ মানুষ, তাকে ডাঙ্গায় তুলে মাছ কোটার মতন বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ ক'রে আনন্দ পেয়ে থাকেন তখন দামী জিনিসের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘকাল ধরে অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে আসতে হয়েছে। সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মত এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দখল করলে, সেটা কি সহ্য করা যাবে?

যাহারা সাধারণ মানুষ, খায়-দায় ঘুমায়, কাজ-কর্ম করে, তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি খবর জানিলে তাহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের অস্তিত্ব ঐ প্রাত্যহিক সীমার গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পৃথিবীতে আর একপ্রকার লোক আবির্ভূত হন তাঁহারা ক্ষণজন্মা, তাঁহারা অসাধারণ। বিশেষ দেশ ও কালে আবির্ভূত হইলেও তাঁহারা সর্বকালের, তাঁহাদের মহত্ত্ব ক্ষণিক ও স্থানিক নয়। সুতরাং মহাপুরুষকে, অসাধারণ লোককে বিচার করিতে হইলে কেবল প্রাত্যহিক জীবনের তথ্যপুঞ্জ সংগ্রহ করিলে চলিবে না—বিশেষ কালের কোনও একটি বিশেষ আদর্শের মাপকাঠিতে তাঁহাদের বিচার করা যায় না, কারণ মহাপুরুষের অসাধারণত্বটুকু কালোত্তীর্ণ বস্তু। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আমরা যদি খবরের কাগজ ও সিনেমার মধ্য দিয়া তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি সংবাদ পাইতাম তবে সেই সমস্ত তুচ্ছ অবান্তর তথ্য বুদ্ধদেবের মহত্ত্বকে আবৃত করিয়া রাখিত। অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ভারে সত্য বিকৃত হইয়া পড়ে। বিশ্লেষণ করিয়া মহামানবের অসাধারণত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যিনি প্রকৃত শিল্পী তিনি তথ্যগুলির পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিয়া, অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিককে বাদ দিয়া যে চিত্র অঙ্কিত করেন তাহাতেই মানুষের মহত্ত্ব ধরা পড়ে।

(৭) দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা,
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে,—'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায়?
ধরণী নরের পদতলে।'

জ্ঞানী বলে,—কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয় ;
এ জীবন প্রতীক্ষাকাতর ।'
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারঙ্গে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক শেখর ।'
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি বরেণ্য ভূমান !'
কবি বলে, 'তুমি শোভাময় ।'
গৃহী আমি,—'জীবনযুদ্ধে ডাকি যে কাতর'—
দয়াময় হও হে সদয় ।'

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে, সুখ, দুঃখ ও ভগবান্ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত ও বিশ্বাস। সকল শ্রেণীর লোকের ধারণা একরকম নয়। এই অভিমতবৈচিত্র্য একান্তই স্বাভাবিক। দুঃখ, বিপদ্, অশান্তির মধ্য দিয়া যাহার জীবন কাটিতেছে তাহার পক্ষে পরম মঙ্গলময় কোন শক্তির অস্তিত্ব বিশ্বাস করা কঠিন ; সে মনে করে একটা নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী শক্তির ইঙ্গিতে পৃথিবী চলিতেছে। যে সুখী, দুঃখের যে কোনও দিন মুখ দেখে নাই, সে মনে করে সুখের মতন এত সহজ, এত সুলভ বস্তু জগতে আর কি আছে ! যাহারা জ্ঞান-পথের পথিক তাহাদের অনুসন্ধিৎসা লইয়া চরম সত্য-আবিষ্কারের জন্য তাহারা প্রতীক্ষা করিতেছে। যাহারা ভক্তিমার্গের লোক তাহারা পৃথিবীর সবকিছুই ভগবানের লীলা বলিয়া উপলব্ধি করে এবং সেই পরমসুন্দর লীলাময়ের লীলারস উপভোগ করিতে চায়। ঋষির নিকট ভগবান নিত্য, জগতের আর সবই অনিত্য ; কবির নিকট তিনি সুন্দর। কিন্তু সাধারণ গৃহী লোক, জীবন-সংগ্রামে যে রাত্রিদিন লিপ্ত রহিয়াছে সে কোন তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করে না, সে দুঃখ-বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য সোজাসুজিভাবে কেবল ভগবানের করুণা ভিক্ষা করে।

(৮) একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন, আর্ট করে কি পেট ভরবে? এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষাচর্চার যেমন দুটো দিক্ আছে—একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক্ আর একটি অর্থ-লাভের দিক্, তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক্ আছে—একটা আনন্দ

দেয় আর একটা অর্থ দেয়। এই দুইটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিসগুলিকে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ করে দেয়।

শিল্পশিক্ষার অভাব যে শুধু আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর করে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসস্রষ্টাদের সৃষ্ট সম্পদ থেকেও আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমাদের চোখ তৈরি হয়নি তাই দেশের অতীত গৌরব যে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তা এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অবজ্ঞাত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার আসবার প্রয়োজন হলো সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে।

শিল্পচর্চায় অন্ন-সমস্যার সমাধান হয় না, শিল্পচর্চা একটা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মানসিক বিলাস, এই কথা বলিয়া একদল লোক শিল্পচর্চার বিরোধী মতবাদ প্রচার করেন। প্রত্যেক জিনিসেরই দুইটি দিক্—একটি আনন্দের দিক্ আর একটি প্রয়োজনের দিক্। যে শিল্পচর্চায় অর্থাগম হয় তাহার নাম কারুশিল্প আর যে শিল্প আমাদের সংকীর্ণ চিত্তকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয় তাহা চারুশিল্প। একটি আমাদের অর্থাগমের ব্যবস্থা করিযা দিয়া জীবন-সংগ্রাম সহজ করে, আর একটি আমাদের রুচিবোধকে উন্নত করিয়া সুন্দর জিনিস হইতে আনন্দ গ্রহণের অধিকার বাড়াইয়া তোলে।

চারুশিল্প-চর্চায় কি লাভ ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, শিল্পচর্চা আমাদের রসবোধ পুষ্ট করে, সৌন্দর্য-অনুভবের জন্য ইন্দ্রিয় ও মনের যে শিক্ষা প্রয়োজন তাহা আমাদের দান করে। এই অনুশীলনের অভাবে আমাদের এমনই দুরবস্থা হইয়াছিল যে, অজন্তা-ইলোরার শিল্পের আমরা মর্ম গ্রহণ করিতে পাই নাই। স্বদেশের শিল্পের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম তখনই যখন বিদেশী শিল্প-সমালোচকগণ এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। চারুশিল্পের অনুশীলন যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে

করিতাম তবে আমরা এত বুদ্ধিভ্রষ্ট হইতাম না, নিজের দেশের শিল্পের রহস্য বুঝিবার জন্য অন্য দেশের দ্বারস্থ হইতে হইত না।

(৯) শত সহস্র বৎসরের মহারণ্য অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগ-যুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষাররত্ন মুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মত। চারিদিকের জগৎ নূতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারিদিকের বিরাট্ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশঃ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এমনি করে মানুষই এই চির নবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে উঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে।—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়।

প্রকৃতি চির-নবীন, পৃথিবী চির-উজ্জ্বল, কিন্তু মানুষের সৃষ্টি অল্পদিনের মধ্যেই পুরাতন ও জরাজীর্ণ হইয়া যায়। ইহার কারণ মানুষের আপন অহঙ্কার ও স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা সৃষ্ট জগৎ বাহিরের বৃহত্তর জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতার জন্যই তাহা বৃহত্তর প্রবাহের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিতে পারে না। প্রবহমান নদীস্রোতের কোন অংশ যদি মূল জলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে চারিধারে ভূমিবেষ্টিত পল্বলকুণ্ডে পরিণত করে তবে সেই স্রোতোহীন বদ্ধজল অবিলম্বেই দূষিত হইয়া পড়ে। মানুষের জীবন সম্বন্ধেও তাহাই। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ, বৃহত্তর পৃথিবীর জীবনধারার সহিত যোগ আমাদের

নবীনতা রক্ষা করে, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই আমরা অতি সত্বর বৃদ্ধ ও পুরাতন হইয়া পড়ি।

(১০) সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক হাতে গড়েনি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ বিদেশী ভাষা ও বিদেশী সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুনো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডুক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়—সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক না কেন। এবং এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, জাতি মনে যতই বড় হোক না কেন, তার মনের একটা বিশেষ রকম সংকীর্ণতা আছে, এবং মনের ঘরের দেওয়াল ভাঙ্গবার জন্য বিদেশী মনের ধাক্কা চাই। বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা বিদেশী মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ-হিংসাও প্রশ্রয় পায়। সুতরাং বিদেশী সাহিত্যের চর্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে; আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তিলাভ করতে হলে আমাদের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও কোন দেশভেদ নেই। আমরা আমাদের বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগবাঁটোয়ারা করি, সত্যের আলোকে এসব অলীক প্রাচীর কুয়াশার মত মিলিয়ে যায়।

পৃথিবীর যে মানসিক ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি তাহা কোনও বিশেষ দেশের বা বিশেষ যুগের রচনা নয়, সকল দেশের সকল যুগের মনীষিবৃন্দ তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদেশী সাহিত্যচর্চা করিবার প্রয়োজন আছে এইজন্য যে ঐ সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিশ্বমানব মনের একাংশের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। স্বদেশী সাহিত্যের অনুশীলনেই যদি আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকে তবে এক ধরণের সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা জন্মে যাহা জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। জাতি

যত বড়ই হউক না কেন, কেবল তাহার সাহিত্যেই সমস্ত আনন্দ ও জ্ঞানের উপাদান রহিয়াছে, অন্যত্র তাহা নাই এই প্রকার ধারণা ভ্রমাত্মক। আমরা যে বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হই, তাহার একটি প্রধান কারণ যে বিদেশীর শ্রেষ্ঠ মনের সঙ্গে আমাদের কোনও পরিচয় নাই। বিদেশী সাহিত্যের সহিত পরিচয় হইলে অন্য জাতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জন্মে ও বিরাগ দূর হয়। বিদেশী সাহিত্যের চর্চায় আমাদের মন সংকীর্ণতামুক্ত হইয়া উন্নতি লাভ করে।

সংক্ষেপ করণের কয়েকটি আদর্শ

সংক্ষেপ করণ বাংলায় একেবারে নূতন জিনিষ। ভাবসম্প্রসারণ বা ভাবার্থ রচনা আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে ও পরীক্ষায় বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে সুতরাং বহুকাল যাবৎ অভ্যাসের ফলে এই দুই বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা শিক্ষার্থিগণের হইয়া গিয়াছে কিন্তু Precis বা সংক্ষেপ করণ এতকাল উচ্চতর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় থাকিত বটে কিন্তু স্কুল কলেজের সাধারণ পাঠ্যভুক্ত হয় নাই।

বর্তমান সময়ে সংক্ষেপ করণ বা Precis রচনার ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম। যাঁহারা কোন দেশের গভর্ণমেণ্ট চালান সেই মন্ত্রীমণ্ডলী বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণকে দেশের কোথায় কি হইতেছে এ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ রাখিতে হয়। সরকারের সমালোচক কোন বক্তা হয়তো সরকারের কোন কার্য বা নীতির বিরুদ্ধে একটি বক্তৃতা করিলেন—সেই বক্তৃতার সারমর্ম বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া সরকারের নিকট প্রেরিত হইল; মন্ত্রী বা কর্মচারিগণ সেই সংক্ষেপিত বিবরণ দেখিয়া তাঁহাদের কর্তব্য স্থির করিলেন। যদি কেহ বক্তৃতাকে সংক্ষেপিত করিয়া বলেন, অমুক বক্তা সরকারের নীতির দোষ দেখাইয়া সরকারের কার্যের প্রচুর নিন্দা করিয়াছিলেন—তাহা হইলে ইহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। বক্তা যে বক্তৃতা করিলেন তাহার মধ্যে তথ্য ছিল, যুক্তি ছিল, সেগুলি বক্তৃতার প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সুতরাং প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে সার সংক্ষেপ রচনা করিবার সময় তথ্য যুক্তি প্রভৃতি কোন প্রয়োজনীয় অংশ একেবারে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না।

সারসংক্ষেপে তথ্যকে সংক্ষিপ্ত করিতে হয়—মূলের প্রয়োজনীয় কোন অংশ বাদ না দিয়া সংক্ষিপ্ত করাই সারসংক্ষেপের আসল কথা।

এখন জিজ্ঞাস্য দাঁড়ায় কতটুকু সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে ? এ সম্বন্ধে প্রশ্ন পত্রের নির্দেশ পালনীয়। দেড় শত শব্দ যদি মূলে থাকে তবে সংক্ষিপ্ত আকার দাঁড়াইবে কতটুকু ? যদি বলা হয় ৬০টি শব্দের মধ্যেই সংক্ষেপিত কর তবে সেই ভাবে করিতে হইবে। যদি কোনও নির্দেশ না থাকে তবে মূলের এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ লিখিতে হইবে—উত্তরটি মূলের এক তৃতীয়াংশের কম হইবে না এবং কোন অবস্থাতেই উত্তরটি যেন মূলের অর্ধেকের বেশী না হয়।

রাজকার্য পরিচালনায়, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনে আমরা সর্বদাই সারসংক্ষেপের উপযোগিতা লক্ষ্য করিতেছি। সার-সংক্ষেপ রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ—সেইজন্য ইহা প্রথম হইতেই সযত্নে শিক্ষা করা উচিত।

(১) রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান আহ্নিক সমাপিত করিয়া সীতা, কুশ লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্র পর্যবসিত দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতিকষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন এবং না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি আসন পরিগ্রহণ না করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাশ্রেণীর নরপতিগণ কৌশলরাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত হইয়াছেন ; তোমরা সকলেই অবগত আছ রাজা রামচন্দ্র অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে চলচিত্ত হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে তোমরা প্রশস্তমনে অনুমোদন প্রদর্শন কর। জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারিণী সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অনুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। (রামায়ণী কথা)

সংক্ষিপ্তসার—প্রভাত হইলে মহর্ষি বাল্মীকি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া শীর্ণকায়া সীতা ও লবকুশকে লইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। সীতার কঙ্কালসার মূর্তি দেখিয়া রামচন্দ্রের দুঃখের সীমা রহিল না। কিন্তু প্রজাগণ আবার কি মন্তব্য করিবে এই আশঙ্কায় রামচন্দ্র ব্যাকুল। সীতাকে দেখিয়া সভায় উপস্থিত সকলেরই হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত হইয়াছিল। বাল্মীকি আসনে না বসিয়াই সভায় উপনীত সমস্ত পৌরজানপদবর্গকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে রামচন্দ্র মিথ্যা লোকাপবাদে বিহ্বল হইয়া সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। সীতা যে শুদ্ধাচারিণী এ বিষয়ে যখন কোনই সন্দেহ নাই তখন সকলেই যেন সীতার পরিগ্রহ অনুমোদন করেন।

(২) সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষে পরের কাজ করে; কেন না, পরের কাজটা ভাল কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ, উহাতে নিজেরও লাভ আছে, সমাজেরও লাভ আছে। ইহলোকে, এবং হয় ত ইহলোকের পর আর একটা যে লোক আছে শুনা যায়, সেইখানে, এই কাজের জন্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায় খাইতে চায়, পিপাসার উত্তেজনায় জলার্থী হয়; শারীরবিজ্ঞানঘটিত কোন তত্ত্ব তখন তাহার মনে স্থান পায় না; এমন কি, ক্ষুধার ও পিপাসার তাড়নায় এমন খাদ্য ও এমন পানীয় সে উদরস্থ করিয়া ফেলে যে, শারীরবিজ্ঞান তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। সেইরূপ পরার্থপরতা তখনই স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইবে, যখন মনুষ্য সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের মুখে আপনা হইতে ধাবিত হইবে। তাহার এই কার্য্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে, কি অমঙ্গল হইবে, তাহা সে চিন্তা করিতে সময় পাইবে না। মনুষ্যের ইতিহাসে যদি কখন এইরূপ দিন আইসে, যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপে মনুষ্যকে পরের কাজে প্রেরিত করিবে, তখন হয় ত রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্ম্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং কারাগার ও গির্জ্জাঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্রশালিকায় একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদবিশেষের সাক্ষ্য দিবে। (চরিত কথা)

সংক্ষিপ্তসার—বর্তমান সময়ে মানুষ যে পরের জন্য কাজ করে তাহা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া। পরোপকারে নিজের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ লাভ হয়—লোকেও প্রশংসা করে। কিন্তু স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া এমন কি স্বার্থের কথা চিন্তা না করিয়া হৃদয়ের সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণায় যখন মানুষ পরোপকারে ব্রতী হইবে তখন পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। সেই শুভদিন যখন পৃথিবীতে দেখা দিবে তখন কাহাকেও ধর্মোপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না—কাহাকেও দণ্ড দেওয়ার দরকার হইবে না। মানুষ তখন নিজ প্রবৃত্তির প্রেরণায় পরার্থসাধনে তৎপর হইবে।

(৩) আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুঝাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে সংসারে আমার মন নাই। আমি সুখী নই। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম-পরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ। কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা হয় না, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

(কমলাকান্তের দপ্তর)

সংক্ষিপ্তসার—আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব লোক কখন সুখী হইতে পারে না। পরের দায়িত্বকে যে চিরকাল নিজের আরামের জন্য বর্জন করিয়া আসিয়াছে সুখের অধিকারও সে নিজে হাতে বিসর্জন দিয়াছে। আত্মসর্বস্ব লোক যে নিজের খাওয়া পরা লইয়াই এতকাল ব্যস্ত ছিল সে একদিন অনুভব করে যে পৃথিবীতে সে অপ্রয়োজনীয়। যাহারা বিবাহ করিয়াছে অথচ

যাহাদের স্নেহ প্রেম কেবল পত্নী পুত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে তাহাদের বিবাহও নিষ্ফল। সংসারে তাহাদেরও সুখে অধিকার নাই।

(৪) রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড়পর্ব্বত, জল মাটি, বনজঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন এই আজ প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবীজোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে আর সমস্ত বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশবাতাস স্বর্গমর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! মরি! এমন অপরূপ-রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার; সর্ব্বলোকাশ্রয় আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সেকি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝিনা, জানিনা,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখিনা, তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন; কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোনদিন এ পথে চলি নাই। তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল সেত কোনদিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো

বলিয়া কুৎসিত নয় ; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত সুন্দররূপে আমার দু'চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে—হে আমার কালো! হে আমার সর্ব্বদুঃখভয় ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আবার এই দু'টি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধ তমসাবৃত নির্জ্জন মৃত্যু মন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমায় অনুসরণ করি। (শরৎচন্দ্র)

সংক্ষিপ্তসার—কেবল আলোরই যে রূপ আছে তাহা নয়,—অন্ধকারের, রাত্রিরও একটা নিজস্ব রূপ আছে, তাহা চোখ থাকিলে ও মন থাকিলে দেখা ও অনুভব করা যায়। যাহা অগাধ ও অসীম, যাহা গভীর ও অগম্য মানুষের কাছে তাহা অন্ধকার। মৃত্যুর রূপও তাই মানুষের চোখে কালো। কালো হইলেই কোন জিনিষ অসুন্দর হয় না। লেখকের প্রতীতি হইল যে মৃত্যুর মধ্যেও হয়তো অফুরন্ত সৌন্দর্য লুকাইয়া আছে। এই প্রত্যয় যখন মনে দৃঢ় হইল তখন মৃত্যুকে মহানন্দে বরণ করিয়া লইতে লেখকের মনে আর কোন বাধা রহিল না।

(৫) আসামের পূর্বপ্রান্তে গিয়ে দেবতাত্মা হিমালয়ের জটা স্তরে স্তরে যেমন খুলে ঝুলে পড়েছে দক্ষিণে—যেমন সে-অঞ্চলে তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা পাটকাই, লুসাই, নাগা, গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া—ইত্যাদি নামে পরিচিত, তেমনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারতেও হিমালয়ের জটিল জটারাশি নেমে এসেছে হিন্দুকুশের দক্ষিণ ভূ-ভাগে। তারা নানা পর্বতমালার নানান শ্রেণীতে এবং বিভিন্ন নামে আমাদের কাছে পরিচিত। যেমন চিত্রলের শস্যশ্যামল এবং মৃৎশোভাসম্পন্ন সুন্দর উপত্যকার কাছে কোহিস্তান ও কাফ্রিস্তান, পঞ্চশির ও সফেদকো,—তারপর পাঘমান, টোচিখেল, মীরনশা,—এবং তারপর পর্বতের নানা শাখা চলে গিয়েছে সুলেমান পর্বতমালার দিকে। এরা সুপ্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুকুশ এবং হিন্দুরাজ পর্বতমালার শাখা-প্রশাখা রূপেই পরিচিত। ভারত সীমান্তে এরা চিরকালই প্রায় অচিহ্নিত রয়ে গেছে

এবং কাশ্মীর প্রদেশের সীমানারেখা নিয়ে ভারতবর্ষও শত শত বছরের মধ্যে কখনও মাথা ঘামায়নি। একথা বেলুচিস্তানে, গিলগিটে, পামীরে, সমগ্র কাশ্মীরে এবং আসামের দিকে চীন ও ব্রহ্মের সীমানাতেও সত্য। যা চলে এসেছে এতকাল, তাই চলছে। আজও তিব্বত-ভারত সীমানা, গিলগিট সীমানা, হিন্দুকুশ-কাশ্মীর সীমানা, ভুটান-তিব্বত সীমানা,-- এরা খুব স্পষ্ট নয়। এরা রাষ্ট্রীয় কারণে কোনোদিন সমস্যাসঙ্কুল ছিল না বলেই ভারতবর্ষ এতকাল উদাসীন ছিল। একথা বহু জায়গায় প্রমাণসিদ্ধ হয়ে আছে যে, সমগ্র হিমালয় তা'র শাখা-প্রশাখা নিয়ে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। কিন্তু বিভ্রাট বেধে রয়েছে সংখ্যাতীত উপত্যকা এবং অধিত্যকার সমষ্টি নিয়ে। যারা বলে, ধর্মবিশ্বাস থেকে রাষ্ট্রসীমানার উৎপত্তি তারা নিতান্ত ভুল বলে না। ধর্মানুষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদ এবং ক্রিয়াপ্রক্রিয়া থেকে সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-বিচার বদলাতে থাকে। যেমন বৌদ্ধ তিব্বত ও শৈব ভারতের মধ্যে পার্থক্য; যেমন তুর্ক-ইরানীর সঙ্গে আর্যজাতির প্রভেদ। এই প্রভেদ থেকেই ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছে রাষ্ট্রসীমা। কেউ এসে জায়গা পেয়েছিল হিমালয়ের উপত্যকায়, কেউ দখল করেছিল অধিত্যকাভূমি। এইভাবেই পরস্পর আপন আপন অধিকারের সীমানা প্রসারিত করে এসেছে, এবং এই সীমানা থেকেই অচিহ্নিত রাষ্ট্রসীমানা স্থির হয়ে এসেছে এতদিন। পশ্চিম তিব্বতের একটা অংশের উপর ভারতের অধিকার কবে থেকে ঘুচল, এটা এ যুগের গবেষণার বিষয় বৈকি। চিত্রলরাজ্যের সঙ্গে কাশ্মীরের বিচ্ছেদ কবে এবং কা'র জন্য ঘটলো, এ প্রশ্ন কেউ আর করতে চায় না।

গান্ধার থেকে যদি কান্দাহার হয়ে থাকে, এবং পুস্তু ভাষার প্রথম পাঠ যদি এসে থাকে সংস্কৃত ভাষা থেকে তবে ভারতের সাংস্কৃতিক সীমানা আফগানিস্তান অবধি প্রসারিত সন্দেহ কি! কে না জানে গান্ধার প্রসারিত ছিল পারস্যের আংশিক ভূভাগ অবধি,—আফগানি-

স্তানের জন্ম এই ত' সেদিন! যেমন একদা সিন্ধু ওরফে হিন্দুদেশের সীমানা প্রসারিত ছিল দক্ষিণ পারস্য অবধি। আর হিমালয়কে কেন্দ্র করেই ত' ভারত সভ্যতার বিস্তার! হিমালয় থেকে নেমে এসেছে নদী, আর সেই নদীর ধারার সঙ্গে আর্য-সংস্কৃতি। ইদানীং এই সংস্কৃতির এক প্রান্ত বেষ্টন ক'রে আছে সিন্ধুনদ, অন্যপ্রান্ত ব্রহ্মপুত্র নদ। ওদেরই আশে পাশে নেমে এসেছে পূর্ব-পশ্চিম হিমালয়ের শাখা-প্রশাখা।

(দেবতাত্মা হিমালয়—প্রবোধ সান্যাল)

সংক্ষিপ্তসার—হিমালয়ের বিশাল দেহ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তেই নানা শাখা প্রশাখা, নানা পর্বতমালা বের হয়েছে। এই সব পাহাড় নানা নামে পরিচিত হলেও এরা আসলে হিমালয়েরই শাখা। এর ফল হয়েছে ভারতের সীমানা রেখা অনেক স্থানেই চিহ্নিত ও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে ভারতের কোনও দুশ্চিন্তাও ছিল না, কারণ ইহার দ্বারা এতকাল কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই। হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই কিন্তু হিমালয়ের অসংখ্য উপত্যকা ও অধিত্যকা খানিকটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ধর্মবিশ্বাস প্রাচীনকালে রাষ্ট্র সীমানার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বৌদ্ধ তিব্বতের সঙ্গে হিন্দু ভারতের, তুর্ক ইরাণীর সঙ্গে আর্যজাতির প্রভেদ থেকে রাষ্ট্রীয় সীমানা গড়ে ওঠে—কোন জাতি যদি আপন অধিকারের সীমানা বিস্তৃত করে তবেই গোল বাধে। পশ্চিম তিব্বতের একটা অংশ ভারতের ছিল—ভারতের পশ্চিম সীমা গান্ধার হইয়া পারস্যের প্রান্ত অবধি বিস্তৃত ছিল। আজ পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এই সীমানার মধ্যেই ভারতের সংস্কৃতি সঙ্কুচিত।

(৬) একদিন তরীখানা থেমেছিল এই ঘাটে লেগে,
বসন্তের নূতন হাওয়ার বেগে।
তোমরা শুধায়েছিলে মোরে ডাকি
পরিচয় কোনো আছে নাকি,
যাবে কোনখানে।
আমি শুধু বলেছি, কে জানে।

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান,
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি,
কুসুমিত তরুতলে তরুণ তরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, ‘এ আমাদেরি লোক’।
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয়।

তারপরে জোয়ারের বেলা
সাঙ্গ হল, সাঙ্গ হল তরঙ্গের খেলা,
কোকিলের ক্লান্ত গানে
বিস্মৃত দিনের কথা অকস্মাৎ যেন মনে আনে ;
কনক চাঁপার দল পড়ে ঝুরে,
ভেসে যায় দূরে—
ফালগুনের উৎসব রাত্তির
নিমন্ত্রণ-লিখন-পাঁতির
ছিন্ন অংশ তারা
অর্থ হারা।

ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
সুধাইছে দূর হতে চেয়ে,
“সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণী কে ?”
সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরি লোক।
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

সংক্ষিপ্তসার—কবি আপনার অতীত ও বর্তমানকে একই সঙ্গে স্মরণ করেছেন। অতীতে যখন কবির জীবন নদী জোয়ারে উদ্বেল হয়েছিল তখন তিনি যৌবনের গান শুনিয়েছিলেন—সেই গান শুনে তখনকার যুগের নরনারী তাঁকে আপন বলে আত্মীয় বলে স্বীকার করেছিল। সেই অতীত যুগ শেষ হয়ে আবার নূতন যুগের আরম্ভ হয়েছে। এখনও কবি গান গাইছেন তবে তার সুর পৃথক। নূতন যুগের ছেলেমেয়ে তাঁর গান শুনে তাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছে—কবি গান গেয়েই তার উত্তর দিয়েছেন। তিনি যে মানুষের কবি এই কথাটি তিনি জীবনের শেষ বেলায় মনে করিয়ে দিতে চান। তাঁর ব্যক্তিমানস মানুষের অন্তরের উষ্ণ স্পর্শটুকু লাভ করার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

নব-প্রবেশিকা রচনা ও অনুবাদ

(উচ্চতর মাধ্যমিক সংস্করণ)

দ্বিতীয় ভাগ

প্রবন্ধ-রচনা

প্রবন্ধ-রচনা

পরীক্ষার পূর্ব রাত্রি

সংকেত—সব রকম পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতি এক রকম নয়, সুতরাং মনের প্রতিক্রিয়াও সকলের একরকম হয় না। যারা একদম পড়াশুনা করে নাই তাদের অবস্থা—যারা নিয়মিত পড়াশুনা করেছে তাদের অবস্থা এবং দুই সীমার মধ্যবর্তী ছাত্রছাত্রীর অবস্থা আলাদা রকম; তবু একটা ত্রাস, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা প্রায় সকলেরই থাকে। প্রশ্ন সম্পর্কে নানা গুজব। শেষ মুহূর্তে এইজন্য সময় নষ্ট। উপসংহার।

পরীক্ষার আগের রাত্রি ছাত্রদের কাছে বিচিত্র মূর্তিতে দেখা দেয়। এক শ্রেণীর ছাত্র সারা বছর ফাঁকি দিয়ে কাটায়—'শিয়রে শমন' না দেখা দিলে তারা পড়াশুনায় উৎসাহ পায় না। পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে তাদের পড়াশোনার মাত্রা চরমে ওঠে। পরের দিন যে বিষয়ে পরীক্ষা, সে বিষয়ের বই আর খাতাপত্র চারদিকে ছড়িয়ে তাদের ঘোরতর পাঠচর্চা সুরু হয়। সারা বছরে যে পড়া প্রস্তুত করবার কথা ছিল একদিনে বা এক রাতে সেটা সেরে ফেলবার দুশ্চেষ্টার সময় এইটি। কিন্তু যা পাঠ্য তার সবটুকু পড়বার অবকাশ নেই—সেইজন্য পড়ার বই বা খাতার বিশেষ বিশেষ অংশ লাল-নীল পেনসিলের দাগে ভর্তি করে সেইগুলোকে গলাধঃকরণের চেষ্টা এই সময় করতে হয়। পরীক্ষার দিনটায় যেন মস্ত বড়ো একটা ফাঁড়া আছে, সেটাকে কাটাবার জন্য যত রকমে আটঘাট বাঁধা যায় তার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হয় এই পরীক্ষার আগের দিন রাত্রিতে। এই রাত্রে তাদের চোখে ঘুম থাকে না—সারা রাত জাগবার সংকল্প নিয়ে তারা পড়তে বসে। মাঝ রাত্রে যখন আর পড়া এগোতে চায় না, একসঙ্গে গাদা-করা জিনিসের ভারে মস্তিষ্ক যখন অসাড় হয়ে আসে, তখন ঘন ঘন হাই ওঠে—কিন্তু তখন একটু ঘুমিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সদ্য-পড়া লাইনগুলো মাথার ভিতর কিলবিল করতে থাকে। হয়তো বা ক্ষণেকের জন্য একটু তন্দ্রা আসে, কিন্তু ঠিক তার পরেই অজানা শঙ্কায় তা যেন ভেঙে যায়। এইভাবে সারা রাত্রির অর্ধ-জাগরণের পর পরীক্ষার্থী যখন সকালে শেষ পড়া পড়তে বসে তখন তার মাথায় আর কতটুকু ঢোকে! শেষকালে পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র পেয়ে যখন

সে উত্তর দিতে যায়, তখন দেখে যে সারা রাত ধরে যা কিছু পড়া গেছে সবই যেন কি রকম গোলমাল হয়ে গেছে। তখন 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপিয়ে কোনো রকমে খাতা ভর্তি করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

এদেরই বিপরীত প্রান্তে থাকে সেই সব ছাত্র, যারা ফাঁকি না দিয়ে নিয়মিতভাবে পড়ে এসেছে। পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে তারা এক রাতে সব পড়ে ফেলে অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করে না। যে সব পড়া অনেকদিন আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে, সেগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই তারা যথেষ্ট হল বলে মনে করে। এদের মধ্যে যারা একটু পরিশ্রমী, তারা হয়তো সম্ভাব্য প্রশ্নের আদর্শ উত্তর লিখে পড়া কতদূর তৈরি হল সেইটুকুই একবার যাচাই করে নিতে চেষ্টা করে। পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে এদের একমাত্র কাম্য হল সুনিদ্রা—যাতে তারা সারা রাত ধরে ভালো করে ঘুমিয়ে সকালে তাজা মস্তিষ্ক নিয়ে জাগতে পারে। উপযুক্ত বিশ্রাম পেলেই যে স্মৃতিশক্তি ভালোভাবে কাজ করতে পারে তা এদের অজানা নয়। তবে স্মৃতিশক্তি যাতে না একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে এইজন্যই আগের দিন রাত্রে কিছু কিছু বইপত্র নাড়াচাড়া করতে হয় এই মাত্র।

এই দুই প্রান্তের মাঝখানে আছে সাধারণ ছাত্ররা—যারা সারা বছর একেবারে ফাঁকি দেয়নি, কিন্তু যা পড়েছে তাও ভালো করে তৈরি করে উঠতে পারেনি। একরাত্রে সব পড়ে ভেল্‌কি লাগিয়ে দেবার আশা এরা করে না—কিন্তু পড়া-তৈরি-হওয়া ভালো ছেলেদের মতো নির্লিপ্ততা এদের নেই। এরা প্রতিদিন যেমন পড়ে, পরীক্ষার আগের দিন রাত্রেও সেই রকমই পড়ে—পড়ার মাত্রা আর মনোযোগ একটু বেড়ে যায় এইমাত্র। যারা সারা বছর না পড়ে পরীক্ষার আগের ক'টাদিন মাত্র পড়ে, তাদের মনে আশা-নিরাশার দোলাটা খুব জোরে দুলতে থাকে। পরীক্ষায় কী রকম ফল হবে সে সম্পর্কে তারা একই সঙ্গে একেবারেই বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করে। তারা একাধারে আশাবাদী আবার হতাশ। কিন্তু এই মাঝারি ছাত্ররা পরীক্ষার ফল সম্পর্কে ঠিক ততটা বিপরীত ধারণা রাখে না। এরা অনেকেই নিজেরা কতটা তৈরি করল তা বোঝে—একেবারে অভাবনীয় কোনো কিছু না হলে পরীক্ষায় ফল যে কী রকম হবে তা এদের এক রকম জানা আছে।

অবশ্য পরীক্ষার আগের দিন মনে কিছুটা-না-কিছুটা উৎকণ্ঠা থাকে সকলেরই। ফেল-করা ছেলে যেমন কোনো রকমে পাশ-করার মতো নম্বর পাবার জন্য উৎকণ্ঠিত, তেমনই ভালো ছেলেরা বেশি নম্বর পাবার জন্য সচেষ্ট। আবার এই উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সকলে মনে মনে যে আশাবাদী হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে পরীক্ষার আগের ক'দিনের পড়ুয়া, সে প্রশ্ন বেছে বেছে সেগুলো পরীক্ষায় আসবে এই আশা করে উত্তর তৈরি করে। যারা মাঝারি রকমের ছাত্র তারা পছন্দসই প্রশ্নগুলোর উত্তর ভালো করে তৈরি করে। যারা ভালো ছেলে সম্ভাব্য সবরকম প্রশ্ন তাদের দৃষ্টি এড়ায় না বটে, কিন্তু তারাও পছন্দমত কিছু কিছু প্রশ্নের দিকেই বেশি করে মনোযোগ দেয়।

পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় উত্তেজনার আর একটি উপাদান সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কে নানাধরণের গুজব। কিছুদিন হইল এই উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সন্ধানে একদল ছাত্র থাকে। কোনো না কোনো সূত্রে প্রশ্নের সন্ধান পেলে তারা ছুটে আসে কিছুটা-তৈরি আর একজন সহপাঠীর কাছে। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ-পাওয়া প্রশ্নের দিকে তাদের মনোযোগ এতটা আকৃষ্ট হয় যে, যে সব জিনিস পড়বে বলে তারা আগে থেকে ঠিক করেছিল সেগুলোর দিকে অনেক সময়ই নজর দেওয়া শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে না। শেষমুহূর্তে-পাওয়া প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে করতেই তাদের সময় শেষ হয়ে যায়। সেই প্রশ্ন পরীক্ষায় না এলে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি তো হয়ই, পরীক্ষায় এলেও সেই একটা প্রশ্নের জন্য তাদের অনেকটা সময় নষ্ট করতে হয়।

আগে থেকে ভালো করে পড়াশোনা তৈরি করে পরীক্ষার আগের রাত্রে মন শান্ত করে তৈরি পড়াগুলো দেখাই উচিত—কিন্তু যা করা উচিত তা করতে পারে ক'জন! আমাদের দেশে পরীক্ষার ওপর এতটা জোর দেওয়া হয় যে, সারা বছর পড়াশোনা করা হোক আর নাই হোক—পরীক্ষার আগে কিছু দিন ছাত্র মহলে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আর সেই প্রস্তুতির শেষ মহড়া হয় পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে। সারা বছরের নিষ্ক্রিয়তা যেন এক দিনের চরম উত্তেজনায় শোধ নিতে চায়।

পরীক্ষাগৃহের দৃশ্য

সংকেত—পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বাইরের ঘটনা—ঘণ্টা বাজে, পরীক্ষার্থী ঘরে যায়—অজানা ভয় ও উত্তেজনার মুহূর্ত—প্রশ্নপত্র বিলি করা হয়—চোখে মুখে নানারকম ভাব—সময় চলে, লেখা এগোয়—শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা।

পরীক্ষা আরম্ভ হবার ঘণ্টা বাজে বাজে। বাইরে উঠানে ছাত্ররা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে গেছে। একদল ছাত্র সম্ভব অসম্ভব সব রকমের প্রশ্নের উত্তর উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত, সারা বছরে যা তৈরি হয়নি দু'চার মিনিটের এই সব আলোচনাতেই তা যেন তৈরি হয়ে যাবে। অনেকেরই হাতে বই কিংবা খাতা বাড়ি থেকে সঙ্গে করে এনেছে, কিন্তু খুলে দেখবার অবকাশ আর হয়নি। হাতে বই থাকলে কিছু প্রেরণা পাওয়া যায় কি?—অবশ্য দুই একটি সাবধানী ছাত্র ঘণ্টা বাজার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বইয়ের পাতা ওলটায়—নূতন কিছু পড়া তাদের উদ্দেশ্য নয়—পছন্দসই প্রশ্নগুলোর উত্তর যাতে ঠিক মনে থাকে এইজন্য তাদের এই আয়োজন। এদের এই প্রয়াস যেন মরণাপন্ন রোগীকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা।—যে সব ছাত্র কিছুটা পড়া তৈরি করেছে, তারা পরীক্ষার জন্য এখন আর তেমন উদ্বিগ্ন নয়—যাদের তৈরি হয়নি এমন কোনো কোনো ছাত্রকে তারা উপদেশ দিচ্ছে।

যথাসময়ে পরীক্ষাগৃহে প্রবেশের ঘণ্টা বাজল। পরীক্ষাগৃহে যাবার সময় সকলের 'বক্ষ দুরু দুরু'। পরীক্ষাগৃহে ঢুকে সকলেই নিজের নিজের আসনে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। যতক্ষণ পর্যন্ত না সকলে বসছে বা খাতা পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত গোলমাল থামে না। খাতা পেয়ে ছাত্ররা নামধাম লিখতে আরম্ভ করে। কোনো কোনো ছাত্র পরীক্ষায় বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাবে ভেবে খাতার প্রথম পাতার মাথার উপর মঙ্গলাচরণ করে—'God is good', 'সরস্বত্যৈ নমো নমঃ' বা অপর কোনো শ্লোকের অংশ।

প্রশ্নপত্র পাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছাত্ররা সকলেই উৎকণ্ঠিত। যখন একদিকে প্রশ্নপত্র দেওয়া হচ্ছে তখন অপর দিকের ছাত্ররা যে কী ভাবে ব্যগ্র হয়ে প্রতীক্ষা করে তা বলে বর্ণনা করা যায় না। প্রশ্নপত্র দেবার সময় যা একটু হৈচৈ গোলমাল থাকে তাও প্রশ্নপত্র বিলি হবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। এখনও কেউ লিখতে আরম্ভ করেনি—সকলেই সাগ্রহে প্রশ্নপত্রের

দিকে চেয়ে আছে—চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। কেবল দুই একজন ছাত্র যদি শেষ পড়া পড়ে নেওয়ার জন্য বা পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে না পারার জন্য দেরীতে আসে, তাহলে একটু আধটু শব্দ শোনা যায়।

প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মুখে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তা লক্ষ্য করবার মতো।—যারা ভালো ছাত্র তারা প্রশ্নটা আদ্যন্ত একবার পড়ে নিয়ে যেটা সুবিধাজনক মনে হবে সেই প্রশ্নটার উত্তর লিখতে সুরু করে দেবে। তাদের মনে কোনো উদ্বেগ নেই। অন্য ছাত্রদের মুখে আশা-নিরাশার আলো-ছায়া। কেউ বা ভালো করে পড়েনি অথচ তৈরি-করা গোটাকতক প্রশ্ন দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। আবার কেউ বা যথেষ্ট পড়েছে কিন্তু তৈরি-করা প্রশ্ন না দেখে মুস্ড়ে পড়েছে। প্রশ্নপত্রের অন্ধকারে অল্প-তৈরি প্রশ্নের আলোর রেখা দেখবার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব। প্রশ্নপত্র পেয়েই হাল ছেড়ে দিয়ে শূন্য খাতা দিয়ে বেরিয়ে-আসা ছাত্রদের সংখ্যা বিরল হলেও শূন্য নয়। কিছু লেখবার চেষ্টা করে শোচনীয় ফল করার চেয়ে এইভাবে নিজেদের ব্যর্থতা জাহির করাকে এরা যেন বীরোচিত কাজ বলে মনে করে।

পরীক্ষা শুরু হবার আধ ঘন্টার মধ্যেই সকলে উত্তর লিখিতে মনোযোগী হয়। তখন চারিদিক চুপচাপ। কেবল লেখবার সময় কাগজের উপর মৃদু খস্‌খস্ শব্দ শোনা যায়। আর পরিদর্শকরা পায়চারি করলে তাঁদের জুতোর শব্দ একটু আধটু শোনা যায়। পরীক্ষার জন্য যে যে-ভাবেই তৈরি হোক না কেন পরীক্ষা আরম্ভ হবার সময় থেকে ঘন্টা দেড়েক সকলেই একমনে লেখবার চেষ্টা করে।

প্রথম ঘন্টা শেষ হবার পর সংকেতধ্বনি পরীক্ষার্থীদের উৎসাহই দেয়। এই সময় কিছুটা লেখার ফলে তাদের মধ্যে কতকটা পরিমাণে সতেজতা সঞ্চারিত হয়—তারা এতদিনের তৈরি জিনিসগুলোকে খাতার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় ঘন্টা পড়বার কিছু আগে থেকেই আবার লেখায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে যায়। ভালো ছেলেরাও এই সময় একটু শ্রান্ত হয়ে পড়ায় লেখার বেগ কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বেশীর ভাগ ছাত্রের পুঁজি এই সময়ই শেষ হয়ে আসে। তখন তারা একবার প্রশ্নপত্রের দিকে চেয়ে দেখে, আর একবার স্মৃতির শরণ নিয়ে কোনোরূপে উত্তর লেখবার জন্য চেষ্টা করে। পাশের

পরীক্ষার্থীর খাতা দেখা বা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে উত্তরের সূত্রের সন্ধান করার দিকে ঝোঁক এই সময়েই দেখা যায়। যারা টুকরো কাগজে উত্তর চুরি করে নিয়ে আসে, তারাও এই সময় সক্রিয়। কিন্তু অভিজ্ঞ পরিদর্শকরা এই সময়েই সবচেয়ে সজাগ থাকেন। তাঁরা প্রয়োজনবোধে পরীক্ষাগৃহের কোনো কোনো অংশে ছাত্রদের সাবধান করে দেন, কোনো ছাত্র নকল করতে করতে ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। আবার কোনো কোনো সহানুভূতিশীল পরিদর্শক উৎসাহের কথা বলে পরীক্ষার্থীদের অবসন্ন.মনে আশা সঞ্চার করতেও অগ্রসর হন।

দ্বিতীয় ঘণ্টার সংকেতধ্বনি বেশীরভাগ পরীক্ষার্থীর কাছেই হতাশার সংকেত। দুঘণ্টা হয়ে গেল, এখনও এত নম্বরের উত্তর করা হয় নি—এই ভাবটা সকলের মনেই জাগে। বিশেষ করে প্রশ্নপত্র লম্বা হলে অনেকে যেন কী যে করবে ভেবেই কূল-কিনারা পায় না। যেটুকু জানা আছে সেটুকু সম্বল করে সংক্ষেপেই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সকলে চেষ্টা করে। কিন্তু ক্লান্ত কলম যেন আর চলতে চায় না। এতক্ষণ উত্তেজনার পর মন যেন আবার অবশ হয়ে আসে।

শেষ ঘণ্টার মিনিট পনেরো আগে যে সংকেতধ্বনি হয় তাতে বেশির ভাগ ছাত্রই যেন নূতন উদ্দীপনা পেয়ে আবার লিখতে সুরু করে। এই সময় অনেকে খাতা দিয়ে পরীক্ষাগৃহ ছেড়ে যায়, কেউ কেউ উত্তরগুলো আবার পড়ে, আবার কেউ কেউ ডুবন্ত লোক যে রকম করে কুটো ধরে ভাসতে চায়, সেইভাবে যা মনে আসে তাই লিখতে চেষ্টা করে।

শেষ ঘণ্টা বেজে গেলে পরীক্ষার্থীরা খাতা দিয়ে বেরিয়ে আসে। কোনো কোনো শেষ মুহূর্তের লেখকের কাছ থেকে পরিদর্শককে খাতা কেড়ে নিতে হয়। তারপর বাইরে এসে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তর সম্পর্কে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলে—তারপর পরের দিনের পরীক্ষার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরার পালা।

পরীক্ষা

সংকেত—ভালো হউক মন্দ হউক পরীক্ষাকে সকলেই মানিয়া লইয়াছে—কিন্তু পরীক্ষার পাশ-ফেল সব সময় অভ্রান্ত বিচারক নয়—পরীক্ষা ও বিদ্যাচর্চা—পরীক্ষা একটা ভাগ্য-পরীক্ষামাত্র—শিক্ষা-পদ্ধতি উভয়েরই সংস্কার প্রয়োজন।

পরীক্ষা বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইহার প্রতি ছাত্রদের মনোভাব বিচিত্র। কোন কোন ছাত্র পরীক্ষাকে নিতান্তই ভয়ের চোখে দেখে কিন্তু এমন ছাত্রেরও অভাব নাই পরীক্ষা যাহাদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, যে সকল ছাত্র নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাস করে তাহারা পরীক্ষার মধ্য দিয়া আত্মপরীক্ষাই করে—নিজের শিক্ষা যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহাদের আগ্রহ থাকে। তাহা ছাড়া মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে পরীক্ষাকে অবলম্বন করিয়া প্রতিযোগিতার উত্তেজনার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যেসব ছাত্র পিছাইয়া পড়িয়া আছে পরীক্ষা তাহাদের পক্ষে বিভীষিকামাত্র। তাহাদের শিক্ষার মধ্যে যে দুর্বলতা আছে তাহা ধরা পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় তাহারা পরীক্ষা এড়াইয়া যাইতে চাহে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে অধিকতর শিক্ষার সুযোগ ঘটিবে না বলিয়া তাহারা বাধ্য হইয়া পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এবং পরীক্ষা শেষ হইলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে।

ছাত্র কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রম গ্রহণ করিতে পারিয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্যই পরীক্ষা-পদ্ধতিকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় কে কতখানি উৎকর্ষের পরিচয় দিল তাহা গৌণ ব্যাপার। ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হয় তাহারা নির্দিষ্ট শিক্ষা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, তাহারা ঐ নির্দিষ্ট শিক্ষালাভ করে নাই বলিয়া বিবেচিত হয়।

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে পরীক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্রের শিক্ষার মান কতকটা যাচাই করা যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক যুগের শিক্ষাবিদেরা পরীক্ষা-পদ্ধতিকে শিক্ষার পক্ষে অনাবশ্যক ভার ও ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন। বিশেষ করিয়া বর্তমানে যে পরীক্ষা-প্রণালী প্রচলিত, তাহাতে ছাত্রদের

জ্ঞানলাভের স্পৃহা নিষ্পেষিত হইয়া যায় বলিয়া তাঁহারা ইহার তীব্র বিরোধিতা করেন।

পরীক্ষার বিরুদ্ধে তাঁহাদের মূল অভিযোগ এই যে, পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকায় ছাত্ররা যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। শিক্ষকমণ্ডলী যখন শিক্ষা দান করেন তখন পরীক্ষার দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে। ছাত্ররাও যখন শিক্ষা গ্রহণ করে, তখন বিদ্যা অর্জন করিবার পরিবর্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথাই বেশী করিয়া ভাবে। কোন্ বিষয় জ্ঞানলাভের জন্য কতটা প্রয়োজন সে দিকে কেহই চিন্তা করে না। অধীত বিষয় হইতে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করা হয়।

ইহাতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হইয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ছাত্ররা শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ভালোরকম জ্ঞান অর্জন না করিয়া কেবল মুখস্থ করিয়া পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং অনেক সময়ই সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হয়। প্রকৃত বোধের অভাবে জ্ঞান পরিপক্ক হইতে পারে না। ফলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই অধীত বিষয় স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অবশেষে বিদ্যার সার অংশটুকুই বাদ পড়িয়া গিয়া পরীক্ষা-পাশের গৌরবটুকুই থাকে। পরীক্ষার প্রয়োজনে সমগ্র পুস্তক না পড়িয়া বিশেষ বিশেষ অংশ পড়ায় বিদ্যার ক্ষেত্র কমিয়া আসে। প্রচুর পরিমাণে মুখস্থ করার ফলে ছাত্রের চিন্তাশক্তি উপযুক্ত পরিমাণে বিকশিত হইতে পারে না। বিদ্যাসম্পর্কে প্রকৃত বোধের পরিবর্তে একটা অস্পষ্ট সীমাবদ্ধ ধারণামাত্র লাভ করিয়া ছাত্র শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

পরীক্ষায় ছাত্রের যে শক্তির অপব্যয় হয় তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস ছুটিতে কাটে। আরও তিন চার মাস কাটে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিতে। সুতরাং শিক্ষার জন্য মাত্র অর্ধেক সময় অবশিষ্ট থাকে। ছাত্ররা পরীক্ষার দিকেই শক্তি নিয়োগ করিতে বাধ্য হয় এবং পরীক্ষার জন্য শক্তি অপব্যয় করায় তাহাদের বিদ্যার প্রতি আগ্রহশীল হইবার শক্তি কমিয়া আসে।

পরীক্ষা দ্বারা উৎকর্ষের বিচারও যে সব সময় যথার্থভাবে হইয়া থাকে তাহা বলা যায় না। পরীক্ষায় মোটামুটিভাবে বিচার হইলেও পরীক্ষার্থীর কাছে ইহা একটা ভাগ্যের খেলা বলা যাইতে পারে। ছাত্র যথার্থই জ্ঞানলাভ

করিল কি না, সে বিচার প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিতে হয় না—যে প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে সেই ভালো বলিয়া বিবেচিত হয়। ভাগ্যক্রমে প্রস্তুত বিষয় পরীক্ষায় আসিয়া গেলে সাধারণ ছাত্রও ভালো ফল করিতে পারে। আবার যথার্থ মেধাবী ছাত্রও দৈবক্রমে পরীক্ষায় খারাপ ফল দেখাইতে পারে।

সকল দেশেই যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া বন্দিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষায় খুব ভালো ফল দেখাইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের এযুগের দুই মহামানব রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার পরীক্ষায় খুব ভালো ফল দেখাইয়াও ভবিষ্যতে অতি সাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এমন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সুতরাং পরীক্ষাকে উৎকর্ষ-বিচারের উপযুক্ত কষ্টিপাথর বলা চলে না।

পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর মারাত্মক ত্রুটিরই অন্যতম নিদর্শন। বর্তমানে জনগণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যেমন একটা কলে-ছাঁটা আদর্শে শিক্ষা বিতরণ করা হইতেছে, তেমনই জ্ঞান আহরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়া পরীক্ষার প্রতি ছাত্রসমাজের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। এই শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার হইলে এই মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা-পদ্ধতিরও অবসান হইবে।

গ্রীষ্মের ছুটি কিভাবে কাটাইতে ইচ্ছা কর

সংকেত—প্রথম কয়দিন নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা—আমোদ-প্রমোদ—ভ্রমণ—সমাজসেবা—খেলাধুলা—সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন।

ছুটির আগে পরীক্ষা মিটে গেলে গ্রীষ্মের লম্বা ছুটি কি করে যে কাটাব সেটা একটা সমস্যা হয়ে ওঠে। প্রতিদিনকার পড়াশোনার চাপে অন্য দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারি না। অনেক কাজই করব করব বলে মনে করি, সময়ের অভাবে আর হয়েই ওঠে না। অবশ্য যদি সে রকম আগ্রহ থাকত, তাহলে কোনো কাজই আটকে থাকত না।

যাই হোক ছুটির প্রথম ক'টা দিন কিছু করব না—স্রেফ আড্ডা দিয়ে আর গল্পের বই পড়ে কাটাব। কয়েকজন বন্ধু আছে, তারা তাসে বিশেষ উৎসাহী—তাদের সঙ্গে মন্দ কাটিবে না। আর বিকেল বেলা ফুটবল তো আছেই।

নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাবার এই তো অবসর। পড়াশোনার চাপে তো সারা বছরই কেটে যায়—এখন ক'টা দিন একটু আরামে কাটাব না তো কি করব?

পিসিমার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে, তাঁর আমবাগানে নিশ্চয়ই চমৎকার আম ধরেছে। হিমসাগর এখনও পেকেছে কি না বলতে পারি না, তবে সরিখাস যে ঠিক খাবার মতো হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একদিন গিয়ে দুবেলা আম খাব। দুপুরে তাঁর পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরব। যদি পারি বন্ধুদের দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

আরও অনেক জায়গায় বেড়াতে যাব বলে তো মনে করেছি কিন্তু এই দুর্দান্ত গরমে কি আর তা হয়ে উঠবে? এখন কোথাও রোদে রোদে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়ে পড়লে অনেক আরাম হবে। দিবানিদ্রাটি গ্রীষ্মের ছুটির নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত না করলে চলবে না।

অবশ্য নিশ্চিন্ত আরামে কাটাতে বেশী দিন ভালো লাগবে না—হপ্তা খানেক পরেই কি করি কি করি' মনে করে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে। সকালের দিকে কিছুক্ষণ, দুপুরে কিছুক্ষণ আর সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ অবশ্য বই নিয়ে নাড়াচাড়া করব—কিন্তু শুধু ঐটুকু কি আর ভালো লাগবে। একটা কিছু বড়ো কাজ করবার চেষ্টা করতে হবে।

পাড়ার সংঘটা কর্মীর অভাবে যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে, ওটাকে নিয়ে পড়লে মন্দ হয় না। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী থেকে সুরু করে সব মনীষীরাই তো ছুটিতে আমাদের সমাজ-সেবা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নির্দেশ পালন করবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সংঘের স্বাস্থ্যবিভাগের খেলাধূলার দিকে অবশ্য আমাকে দৃষ্টি দিতে হবে না। ফুটবল যখন পড়েছে তখন ছেলেরা বিকেলে মাঠে যাবেই। অবশ্য দু'একজন রামকুঁড়ে তখনও আড্ডা দিয়ে সময় কাটাবার চেষ্টা করে—তাদের খেলার মাঠে টেনে নিয়ে যেতে হবে।—ব্যায়াম-শাখার কাজ অবশ্য এই গ্রীষ্মে তেমন এগুবে না। যে দু'চারজন নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করে তারা ছাড়া আর কে এই গরমে ব্যায়াম করতে আসবে। তবে ব্যায়ামাগারের দু'চারটে জিনিস মেরামত করাতে হবে। দড়ি পাল্টাবার জন্য সেই যে সেবার রিং খোলা হল তারপর তো আর টাঙানো হয় নি।

প্যারালাল বারটা তো গজ গজ করছে—ওটাতে ছুতোর লাগাতে হবে। গোটা কতক ছোটো ছোটো স্প্রিং ডাম্বল কেনাতে হবে—ছোটোরা বড়ো ডাম্বল নিয়ে তেমন সুবিধা করতে পারে না।

সংস্কৃতি-বিভাগের দিকেই বেশি করে মন দিতে হবে। গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা বহু দিন বাড়ে নি। চাঁদা থেকে যা পাওয়া যায় তাতে বই-বাঁধাই আর সাময়িক পত্রিকার খরচ মিটিয়ে অতি সামান্যই থাকে। পাড়ার কয়েকজন সহানুভূতিশীল ভদ্রলোককে ধরে কিছু মোটা রকম দান আদায় করতে হবে। টাকা তোলার আরও দুটো উপায় আছে। একটা হচ্ছে চ্যারিটি লটারি করা, আর একটা সিনেমা শো বা ভ্যারাইটি শো'র ব্যবস্থা করা—শেষেরটাই ভালো। কিছু কিছু বাইরের শিল্পী আনিয়ে যদি একটা জলসার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে টাকা মন্দ উঠবে না। একখানা মাঝারি ধরণের নাটক ধরে যদি অভিনয় করা যায় তাহলেও বেশ হয়। পাড়ার ছেলেরা এতে বেশ উৎসাহই পাবে। অভিনয়ের ব্যয় মিটিয়ে যে টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকবে, তাতে গ্রন্থাগারে একসঙ্গে কিছু মোটা রকম বই আনানো যেতে পারে। এই সময়টাই লোককে চাঁদাপত্র কম দিতে হয়। সুতরাং এই সময় প্রতি বছরই যদি একটা কোনো ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা যায় তা হলে তো বেশ ভালোই হয়।

এ ছাড়া সাপ্তাহিক সংস্কৃতি সম্মেলন করতে হবে। শনিবারের পাঠচক্র তো অনেক দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে—সেটা আবার চালাতে হবে। শুদ্ধমাত্র আলোচনা হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না, সেইজন্য মাসে অন্তত পক্ষে একদিন গানবাজনার আয়োজন করতে হবে।

সমাজ-সেবা বিভাগের কাজ করা শক্ত—এতে সকলের আগ্রহ আর সহায়তা চাই। সন্ধ্যাবেলার পাঠশালাটা তো কোনো রকমে চলছে—অবৈতনিক হলেও এতে ছাত্র জোটা ভার। বিজুদা নিত্য সন্ধ্যাবেলা এদের নিয়ে বসেন তাই কোনো রকমে এটা টিকে আছে। গ্রীষ্মের ছুটিটায় দুপুর বেলা যদি গরীব ছাত্রদের জন্য একটা কোচিং ক্লাসের মত খোলা যায় তাহলে অনেকের পক্ষে সুবিধেই হয়।—প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষার ক্লাস তো আজকাল আর হয়ই না—ওষুধপত্রও কতটা আছে জানি না। ওটাও রবিবার খুলতে হবে।

গ্রীষ্মের ছুটিটা কী করে কাটাব সে সম্পর্কে অনেক কিছুই জল্পনা-কল্পনা করছিতো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতটা যে হয়ে উঠবে তা বলা মুস্কিল। সবই হয়তো দিবাস্বপ্নে পরিণত হবে—যা করব ভাবছি তার গোড়াপত্তন করতে করতেই ছুটিটা পার হয়ে যাবে। হয়তো বা ছুটি পড়বার ক'দিনের মধ্যেই কোথাও বেড়াতে চলে গিয়ে ছুটিটা সেখানে কাটিয়ে আসব। যাই হোক, ভালো কাজ দু'চারটে করব বলে আশা করতে তো কোনো ক্ষতি নেই।

ছাত্র ও রাজনীতি

সংকেত—দুই পক্ষের দুই মত—নূতন যুগের দাবী—স্বাধীনতা লাভের পর পরিবর্তিত অবস্থা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী—রাজনীতি ক্ষতিকর নয় কিন্তু দলাদলিতে না থাকাই ভাল।

ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত কি না এ বিষয়ে আলোচনা বহুকাল ধরিয়াই হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো চরম মীমাংসাই হয় নাই। দুই পক্ষেই যুক্তির অভাব নাই এবং কোনো পক্ষের যুক্তিই দুর্বল নয়।

যাঁহারা ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের প্রথম কথা এই যে, 'ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ'—অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। অনন্যচিত্ত হইয়া বিদ্যা অর্জন করিতে অগ্রসর না হইলে বিদ্যালাভ করা যাইবে না। রাজনীতিতে যোগদান করিলেই ছাত্রদের মনোযোগ অন্যত্র আকৃষ্ট হইবে, সুতরাং তাহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন অগ্রসর হইতে পারিবে না। জ্ঞানের সাধনা একেই দুরূহ, তাহার উপর যদি ছাত্রদের চিত্ত অন্যত্র আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদের জ্ঞানসাধনা ব্যাহত হইবে। রাজনীতির আকর্ষণে বহু মেধাবী ছাত্র জ্ঞানতপস্যা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

অপর পক্ষ বলেন যে, যে-যুগে অধ্যয়নকে তপস্যারূপে গণনা করা হইত, সে যুগ বহুকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন যাঁহারা জ্ঞানার্জন করিতেন তাঁহারা জ্ঞানের সাধনাতেই জীবন যাপন করিতেন—বাহির বিশ্বের দিকে তাকাইবার প্রয়োজন তাঁহাদের প্রায়ই হইত না। কিন্তু বর্তমানে কেবলমাত্র অধ্যয়ন লইয়া থাকিলে ছাত্রদের চলে না। জীবনের দাবী এখন প্রবলতর

হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ছাত্রদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কেও সজাগ হইতে হইবে এবং তাহাতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণও করিতে হইবে।

যাঁহারা ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের বিরোধী, তাঁহারা বলেন যে, দেশ সম্পর্কে ছাত্ররা সচেতন থাকিলে ক্ষতি নাই। বর্তমানে জ্ঞানের পরিধিও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে – দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও বর্তমানে অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হইয়াছে। বিশেষতঃ সংবাদপত্রের প্রচারের ফলে ছাত্ররা দেশের অবস্থা সম্পর্কে অনায়াসেই অবহিত থাকিতে পারে। সেজন্য তাহাদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

প্রতিপক্ষ বলেন যে, রাজনীতিতে যোগদান যে দেশের সেবা তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। দেশের অবস্থা সম্পর্কে পুঁথিগত জ্ঞান থাকিলেই চলে না—ছাত্রদের হাতে কলমে স্বদেশের সেবা করিবার শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য ছাত্রদের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করা কর্তব্য।

ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের বিরোধীরা বলেন যে, রাজনীতি ছেলেখেলা নয়। অনেক প্রবীণ যেখানে হিমসিম্ খাইয়া যায়, সেখানে অনভিজ্ঞ ছাত্ররা কীই বা করিতে পারে। যাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই তাহারা রাজনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশ গ্রহণ করিয়া বৃথা গোলযোগের সৃষ্টি করে কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির সামান্য মাত্র প্রয়োগ না করিয়া নেতাদের নির্দেশে ওঠে বসে। অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনে বিদ্যালয়ের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা যোগ দেয়—কিন্তু তাহারা কি আন্দোলন সম্পর্কে সত্যই সজাগ থাকে? একটা হুজুগ পাইয়া তাহারা মাতিয়া উঠে এই পর্যন্ত। ইহার ফলে একটা ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

যাঁহারা ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের পক্ষপাতী তাঁহারা এই অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা হটিয়া যান না। তাঁহারা বলেন, যাহারা রাজনীতি সম্পর্কে কিছুটা সজাগ, যাহারা রাজনীতি বলিতে যে কী বোঝায় সেই বোধের অধিকারী, কেবল তাহারাই রাজনীতিতে যোগদানের অধিকারী। যে সব ছেলেরা হুজুগে মাতিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাহারা রাজনীতিতে যোগ দিয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।—কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতার অভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিলেও ছাত্ররা বহুকাল ধরিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ

করিয়া আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অপর পক্ষ বলেন যে, সাময়িকভাবে ছাত্ররা রাজনীতিতে যোগদান করিতে পারে বটে কিন্তু সে সময় তাহাদের ছাত্রত্ব খর্ব হয়। যুদ্ধ বাধিলে অনেক দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদের সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয়। তখন তাহাদের ছাত্র বলার কোনো অর্থ হয় না। ছাত্ররা যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তখন তাহারা যে ছাত্র তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের নেতার নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে হয়। বিশেষত মুক্তি-সংগ্রামের মতো ব্যাপারে অধ্যয়নরত তরুণরা অংশ গ্রহণ করিলেও সাধারণ অবস্থায় ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত নয়। এইজন্যই ভারতবর্ষের যে সব নেতা এক সময় ছাত্রদের লইয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন ছাত্রদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করা ক্ষতিকর বলিতেছেন। বিশেষতঃ রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে দলাদলি আছে তাহা ছাত্রদের মানসিক গঠনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

প্রতিপক্ষ ইহার উত্তরে বলেন যে, এখনও দেশে যে পরিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা আসে নাই, দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন তাহার প্রমাণ। এখনও যথেষ্ট সংখ্যক দেশবাসীকে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা শেষ করিয়া অবসর বিনোদনের জন্য রাজনীতি করিব—রাজনীতি সে বিষয় নয়। রাজনীতির সাধনা কঠিন বলিয়াই ছাত্র অবস্থা হইতেই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দেশ-সেবার ব্রতে কৈশোর হইতেই দীক্ষিত না হইলে চলিবে কি করিয়া?

বাস্তবিক পক্ষে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই বলিবার আছে। উভয় পক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি ও কূটতর্ক উত্থাপনের সুযোগ আছে। ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের গঠনমূলক দিক ও ধ্বংসাত্মক দিক, দুইয়েরই নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে ছাত্রদের সকলেই কিন্তু সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে না এবং ছাত্রসমাজের কিছু অংশ সকল হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সকল ছাত্রই রাজনীতি করিবে এইরূপ ধারণাও যেমন অবাস্তব, আবার ছাত্র অবস্থায় রাজনীতির ত্রিসীমানায়

যাওয়া অনুচিত এরূপ মতও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কিছু কিছু ছাত্র রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিবেই—তবে যাহাতে তাহারা নিতান্ত দলাদলিতে না মাতিয়া সত্যকার গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ভূদান-যজ্ঞ

সংকেত—ভূদান আন্দোলনের ইতিহাস—গান্ধীজীর আদর্শবাদের প্রভাব—ভূদান ও সমাজতন্ত্র—ভূদানের বিরুদ্ধে সমালোচনা—ইহার সাফল্য আশানুরূপ না হইলেও একেবারে কম হয় নাই—একটা প্রকাণ্ড সমস্যার অহিংস সমাধানের পথ।

আদিম যুগে মানুষ যখন পৃথিবীতে চাষবাস আরম্ভ করিয়াছিল, তখন যে জমি সে চষিত তাহার উপর তাহার অলিখিত অধিকার ছিল। মানুষ তাহার শ্রমের ক্ষেত্রকে যতদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিত, তাহার ভোগের অধিকারও ততদূর পর্যন্ত ছিল। কিন্তু সভ্যতা ক্রমে এমন জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষ জমির উপর তাহার স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া ফেলিয়াছে। যাহারা জমি চষে তাহারা জমির মালিক নয়, যাহারা হয়তো কোনো পুরুষে চাষ করে নাই, তাহারা জমির মালিক হইয়া চাষীর শ্রমের ধন আত্মসাৎ করে।

ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে চাষীদের এই সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্বকালে ভারতবর্ষে ভূমি-সংক্রান্ত এই সমস্যা এত জটিল ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আমলে জমিদারি-প্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চাষী জমির উপর অধিকার হারাইয়া কেবল শ্রমের ভাগী হইয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এ-রকম যে, কেহ কেহ নিষ্প্রয়োজনে প্রচুর ভূমির অধিকারী আবার কেহ কেহ একেবারে ভূমিহীন—পরের জমিতে বাস করা বা পরের জমিতে চাষ করা ছাড়া তাহাদের আর অন্য গতি নাই।

সমাজতন্ত্রবাদ এই সমস্যা মিটাইবার জন্য সকলের মধ্যে সমভাবে জমি বণ্টন করিবার দাবী করে। রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগ করিয়া সকলের মধ্যে ভূমি বণ্টন করিয়া দেওয়াই সমাজতন্ত্রীদের মতে এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। কিন্তু অনেকে এই বলপ্রয়োগ সমর্থন করেন না। তাঁহারা রাষ্ট্রকর্তৃক ভূমির স্বত্ব গ্রহণ এবং ভূতপূর্ব মালিককে ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব করেন।

কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিয়া সমগ্র ভূমি গ্রহণ করিয়া তাহা প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন করিবার শক্তি কোনো রাষ্ট্রেরই থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষে কোনো কোনো অঞ্চলে জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ হইলেও ভূমি-বিভাগ হয় নাই।

বলপ্রয়োগ বা ক্ষতিপূরণ দ্বারা ভূমিভাগের বণ্টনের পরিবর্তে আর একটি উপায়ে ভূমিহীনদের ভূমির ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা গান্ধীজীর আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আচার্য বিনোবা ভাবে এই আদর্শের সিদ্ধির জন্য সাধনা করিতেছেন।

তাঁহার এই সাধনা ভূদান-যজ্ঞ নামে প্রখ্যাত। ভারতবর্ষে দানের আদর্শ নূতন নয়—অর্থদান বা শস্যদানের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিদানও এদেশের লোক করিয়াছে। পূর্ব যুগে রাজা বা ভূস্বামীরাও ভূমিদান করিয়াছেন—কিন্তু সে দান প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, দেবতা বা কোনো গুণী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। বিনোবাজী ভূমিহীনকে ভূমিদানের আদর্শটি ভারতময় প্রচার করিতেছেন। অন্যান্য নেতাদের সহিত তাঁহার একটি বিষয়ে পার্থক্য এই যে, তিনি কেবলমাত্র উপদেশমূলক বিবৃতি দান করিয়া কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি স্বয়ং পদব্রজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে গমন করিয়া ভূদানের জন্য আবেদন করিতেছেন।

তাঁহার এই ভূদান-যজ্ঞের আদর্শ বিভিন্ন কারণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কারণ ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করিতে হইলে বলপ্রয়োগ বা ক্ষতিপূরণের পথ বর্তমানে গ্রহণীয় নয়। তাহা ছাড়া বিনোবাজীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে একটা মহানুভবতা জড়িত আছে তাহাও সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে।

অবশ্য সকলেই যে বিনোবাজীর ডাকে সাড়া দিয়াছে তাহা নয়। বিনোবাজী ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাঁচ কোটি একর ভূমি ভূমিহীনদের দান করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্যের এক-দশমাংশও পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার আদর্শবাদে আস্থা থাকিলেও নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাঁহার আদর্শবাদের সমর্থন করার কথা অনেক ভূমিবানই ভাবিতে পারেন নাই। সুতরাং কোনো কোনো স্থানে মাঝারী রকমের ভূমির অধিকারী যেখানে ভূমির একটা বড়ো অংশ দান করিয়াছে সেখানে প্রচুর ভূমির

অধিকারীরা সামান্য অংশ দান করিতেও কার্পণ্য করিয়াছে। এমন লোকের অভাব নাই যাঁহারা চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া ভূমিদান করিয়াছেন কিন্তু এমন ভূমি তাঁহারা দান করিয়াছেন যাহা কৃষির পক্ষে একেবারেই অযোগ্য। 'উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ' বলিয়া তাঁহারা কোনো ক্রমে কাজ সারিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে যে আদর্শ গ্রহণ করিতে হইলে আত্মত্যাগ করিতে হয়, সে আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করিবার শক্তি কয়জনের থাকে ?

বিনোবাজীর পরিকল্পনা অবশ্য অর্থনীতিবিদ্দের সমালোচনা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ভূদানের ফলে ভূমিহীনরা ভূমি লাভ করিতে পারে বটে কিন্তু তাহারা সেই ভূমি কতদূর কাজে লাগাইতে পারিবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিশেষতঃ জমির উপর ক্ষুদ্র স্বত্বাধিকারীদের প্রয়াস কৃষির ক্ষেত্রে প্রায়ই উপযুক্ত ধন উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং উৎপাদনের দিক দিয়া এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এই ক্ষুদ্র স্বত্বাধিকারীরা ভূমির উপর ভারস্বরূপ হইয়া পড়িতে পারে। তাহা ছাড়া এই ভাবে জাতীয় ধন বৃদ্ধি হয় না—কারণ ভূমির পরিমাণ একই থাকিয়া যায়। স্থূল বাস্তবের দিক হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই আন্দোলনকে নিছক আদর্শবাদীর স্বপ্ন-বিলাস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

অর্থনীতিবিদ্দের বিরুদ্ধে অভিমত সত্ত্বেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, এই পরিকল্পনার মূলে সুগভীর মানবপ্রেম বর্তমান। সমগ্রভাবে বিচার করিলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু যে অগণিত মানুষ ভূমিহীন হওয়ায় যাযাবরের মতো জীবন যাপন করিতেছে—অকথ্য দারিদ্র্য যাহাদের জীবনকে নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদের জন্য এই আন্দোলন মানবতার দিক দিয়া সার্থক। আর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলনের মূলে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা বর্তমান। বলপ্রয়োগ বা আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে বিনোবাজী মানুষের অন্তরের শুভ কামনার নিকট আবেদন করিয়াছেন। বাহ্য কোনো রকম চুক্তির পরিবর্তে মানুষের চিত্তকে জাগ্রত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যে স্বার্থের ও লোভের দূষিত বায়ু সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার নিকট ইহা অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাই অহিংসভাবে সমস্যা সমাধানের তথা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ।

পঞ্চশীল

সংকেত—প্রাচীন ভারতের 'শীল' ব্রত – বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পঞ্চশীলের প্রয়োজন—চীন ও ভারত অগ্রণী – অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র ইহার সমর্থক – আধুনিক রাজনীতিতে পঞ্চশীল নূতন দৃষ্টিভঙ্গী খুলিয়া দিয়াছে।

সুদূর অতীত কালে বুদ্ধদেব জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য শীল-সাধনার কথা বলিয়াছিলেন। মানুষের বাসনা-কামনার অন্ত নাই, তাহার লোভ দুর্নিবার। কিন্তু সেই লোভ তাহার মানবতার পরিচয় দেয় না—উহাকে সংযত করিয়া জীবনকে মৈত্রী ভাবনায় সঞ্জীবিত করাকেই বুদ্ধদেব আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ তাঁহার সেই বাণীকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া জীবন-সাধনায় অগ্রসর হইয়াছে। পরবর্তীকালে ধর্মাশোক বুদ্ধের শীল-সাধনার বাণীকে প্রস্তরের অক্ষরে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে জীবনকে যদি কঠোর আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করা না যায়, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। মানুষ যে চারিত্র-ধর্মে পশুসমাজের উপরে থাকিয়া বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে, বুদ্ধদেবের দশশীল তাহার উপযুক্ত বিকাশেরই পথ নির্দেশ করিয়াছে।

আধুনিক যুগেও অতীতের সেই শীলব্রতের কথা মানুষ বিস্মৃত হয় নাই। বর্তমানে বিশ্ব-রাজনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র বিশ্ব দুইটি প্রধান সামরিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে। বড়ো বড়ো কয়েকটি শক্তি ছোটো ছোটো রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিতে উদ্যত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক জগতে বিশেষ সুবিধা আদায় করিবার জন্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চেষ্টার অন্ত নাই। বিভিন্ন অজুহাতে অপর রাষ্ট্রের স্বার্থহানি ঘটাইয়া আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই উদ্যত। সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া একটা ঘোরতর স্নায়ুযুদ্ধ চলিতেছে।

এই অবস্থায় ভারতবর্ষ বিশ্ব-রাষ্ট্রক্ষেত্রে অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পঞ্চশীলের কথা বলিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন কয়েকটি নিয়ম পালন করিতে হয়, তেমনই রাষ্ট্রগুলিকেও পাঁচটি শীল পালন করিতে হইবে—

(১) প্রত্যেক জাতিকে অপর জাতির স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

(২) কোনো জাতির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো চলিবে না।

(৩) কোনো জাতি অপর জাতির ঘটনাবলীতে হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৪) প্রত্যেক জাতির মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধার ভাব থাকিবে।

(৫) আদর্শগত পার্থক্য বা মতভেদ থাকা সত্ত্বেও জাতিগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অস্তিত্বের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী, মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্য এবং ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শে অনুপ্রাণিত জওহরলাল নেহরু বিশ্বের সম্মুখে এই পঞ্চশীল ঘোষণা করিয়া ভারতবর্ষের শাশ্বত আদর্শকেই নবভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্য শান্তিসম্মেলনগুলির সহিত এই বাণীর পার্থক্য অনুভূত হইবে। পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি শান্তিস্থাপনের নামে সামরিক সহায়তার চুক্তিই করিয়াছে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার প্রতাপে শঙ্কিত আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ উত্তর অতলান্তিক শান্তিসংস্থা স্থাপন করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের মন শান্ত হইল না। ইহার পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শান্তিসংস্থার পরিকল্পনা করিয়া তাহারা ভারত, ব্রহ্ম, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশকে ম্যানিলা দ্বীপে আমন্ত্রণ করিল। অতলান্তিকে তাহারা যে শক্তি অর্জন করিয়াছিল তাহাকে দ্বিগুণিত করিবার জন্যই তাহাদের এই প্রয়াস।

ভারত এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল। ভারত বলিল যে, এশিয়াতে অনুরূপ কোনো চুক্তির প্রয়োজন নাই। এশিয়ার দেশগুলি স্বাধীনভাবে থাকুক—শান্তির আবরণে যুদ্ধের প্রস্তুতিকে এশিয়া স্বীকার করিতে পারে না। এশিয়ার অপর অনেকগুলি দেশ ভারতের অভিমত গ্রহণ করিল। এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে কেবল পাকিস্তান, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন এই চুক্তি গ্রহণ করিল। বাস্তবিক পক্ষে এই চুক্তি নিষ্ফল হইয়া গেল।

এই সময়ই ভারতের প্রতিভূ জওহরলাল শান্তিস্থাপনের জন্য গঠনমূলক পরিকল্পনার কথা বলেন। তিনি বলেন যে, কেবল যুদ্ধ বন্ধ করার চুক্তিই যথেষ্ট নয়—প্রকৃত শান্তি স্থাপন করিতে হইলে মানবকল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া শান্তির জন্যই শান্তির আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। শান্তির মূলে অহিংসা ও মৈত্রীকে স্থাপন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি পঞ্চশীলের আদর্শ প্রচার করেন।

এই পঞ্চশীলই যথার্থ শান্তির ভিত্তি হইতে পারে। বর্তমানে প্রধান রাষ্ট্রগুলি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু আদর্শের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে যে সহ-অস্তিত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে পঞ্চশীল তাহারই নির্দেশ দিয়াছে। তাঁহার এই আদর্শ একটা অবাস্তব কল্পনামাত্রে পর্যবসিত হয় নাই। বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তাহার আদর্শে বিশ্বাসী থাকিয়াই বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সহিত সম্প্রীতি স্থাপন করিয়াছে, এমন কি বিভিন্ন বিরোধী শক্তির মধ্যে মিলন-সংস্থাপনেও কৃতকার্য হইয়াছে। বর্তমানে বিশ্বের বিজ্ঞানশক্তি যেভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে একমাত্র সহ-অস্তিত্ব ও মৈত্রীর আদর্শই মানবসমাজকে চরম ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে।

আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সংকেত—স্বাধীন ভারতের আত্মোন্নতি-সাধনের প্রচেষ্টার বিজ্ঞান-সম্মত রূপ—বহুমুখী উন্নয়ন-পরিকল্পনা—কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতি পরিকল্পনার অংশ—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—সমালোচনা।

ভারতবর্ষ বিশ্বের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়াছে; কিন্তু বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সব দিক দিয়া যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা হইতে সে বঞ্চিত। জ্ঞানের দিক দিয়া সে সভ্য দেশগুলির প্রায় সমকক্ষ হইলেও অন্য অনেক দিক দিয়া সে পিছাইয়া আছে। বৃটিশ শাসনকালে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা ফলবতী হয় নাই। তৎকালীন শাসনকর্তারা এদেশের উন্নতি সাধনের জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বেগের ভাব পোষণ করেন নাই—এ দেশ হইতে কাঁচামাল লইয়া নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতবর্ষ আর পিছাইয়া থাকিতে না চাহিয়া পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল তখনও জাতীয় নেতৃবৃন্দ ইহার উন্নতি সাধনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় যে বিপ্লব সাধিত হয়, তাহার পরই রাশিয়া কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

গ্রহণ করিয়া অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। রাশিয়ার সেই দৃষ্টান্ত ভারতের নেতাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট ছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, তখন তিনি একটি গঠনমূলক পরিকল্পনার নির্দেশ দেন। মেঘনাদ সাহা, নাজির আহম্মদ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রভৃতিকে লইয়া যে সমিতি গঠিত হয় জওহরলাল ছিলেন তাঁহার সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন কে. টি. শাহা—সে সময় সেই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই—কিন্তু জওহরলালের চিত্তে ইহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার অল্প কয়েক বৎসর পরেই, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি পরিকল্পনা কমিশন বসান এবং অবশেষে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ। দেশকে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সব দিক দিয়াই উন্নত করিবার প্রয়াস এই পরিকল্পনার মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। দেশ যাহাতে কোনো দিকেই না পিছাইয়া থাকে এইজন্য প্রচেষ্টাকে সর্বতোমুখী করা হইয়াছে। একটি বিরাট কর্মসূচী এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কিন্তু উপযুক্ত জলসেচের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। কৃষকদের বৃষ্টির মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। বাংলার মতো নদীমাতৃক দেশেও অতি অল্প মাত্র জমিতে জলসেচ করা হয়। দেশের মধ্যে জলসেচ করিবার জন্য কয়েকটি নদীতে বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। জলসেচ করা উদ্দেশ্য হইলেও এই বাঁধগুলি হইতে জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া শিল্পাঞ্চলগুলিতে অল্পমূল্যে সরবরাহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। দামোদর উপত্যকা, হীরাকুঁদ, তিলাইয়া, মাইথন প্রভৃতি নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রাস্তাঘাট তৈয়ারিও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ হইলেও ইহার অনেক অংশেই যানবাহনের উপযোগী পথ নাই। বিভিন্ন অংশে পথ নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতের বন্দরগুলি বিস্তৃত করাও এই কার্যসূচীর অন্যতম বিষয়।

কয়েকটি শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেও ভারত সরকার পঞ্চ-

বার্ষিকী পরিকল্পনাতে ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টাকে উৎসাহদানই করিয়াছেন। গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ গ্রহণ করিয়া ভারত সরকার গ্রামের শিল্পগুলির উন্নতিসাধনের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁতশিল্প হইতে শুরু করিয়া সর্বপ্রকার গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়া ভারত সরকার ভারতের অগণিত গ্রামগুলির উন্নতি সাধন করিতে তৎপর হইয়াছেন। গ্রামোন্নয়ন ব্যতীত যে ভারতের উন্নতির আশা নাই ইহা উপলব্ধি করিয়া পরিকল্পনাকারীরা গ্রামকে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছেন।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই পরিকল্পনায় বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে। বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার-সাধনও এই পরিকল্পনায় স্থান লাভ করিয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুই হাজার কোটিরও বেশি টাকা নিয়োগ করা হইয়াছিল। আশা করা হইয়াছিল যে, ইহাতে জাতীয় আয় শতকরা এগারো ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।—কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে নাই। ইহার কারণ এই যে, বিভিন্ন অংশের মধ্যে উপযুক্ত সংযোগ রক্ষা করা হয় নাই। বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি সাধিত হইতেছিল—কিন্তু ইস্পাত রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় অল্পকাল পরেই উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। উপযুক্ত ফল পাওয়া গেল কি না সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে। ক্রেতা কিরূপ হইবে সেদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল উৎপাদনের দিকে দৃষ্টিপাত করায় অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া এবং প্রথম পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যসূচী রচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বৃহৎ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা অবশ্য প্রয়োজন। কুটিরশিল্পকে যেন বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না হয়—যন্ত্র যাহাতে মানুষের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া মানুষের সহায়তা করে সেই দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট আট হাজার আটাশ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুমান করা হয় যে,

এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোক এই পরিকল্পনায় কাজ পাইবে। ইহাতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা প্রধানত কর হইতে গ্রহণ করা হইবে—ঋণ বা সাহায্য হইতেও কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। সমগ্র পরিকল্পনাটি সার্থক করিবার জন্ম ব্যয়ের দিকেও যেমন, উৎপাদন ও বিক্রয়ের দিকেও তেমন অখণ্ডভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্ম ভারত সরকার যে কর আদায় করিতেছে তাহা ভারতবাসীর পক্ষে গুরুভার সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে সারা দেশে যে উন্নতি হইবে তাহাও ভুলিবার নয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সার্থক হইলে ভারত পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশগুলির অন্যতম বলিয়া গণ্য হইবে—ভারতবাসীর দুঃখ-দুর্দশার সমাধানের পথও সেইদিন উন্মুক্ত হইবে।

বন্যা ও বন্যাপ্রতিরোধ

সংকেত—বন্যার কারণ—নদীগুলি নানা কারণে মজিয়া যাইতেছে—নদীগর্ভ উঁচু হইয়া উঠিতেছে—বন্যায় যে ক্ষতি হয় তাহার বর্ণনা—বন্যার গতি রোধ করিবার জন্ম বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ—বিজ্ঞানসম্মত উপায়—দামোদর ও ব্রহ্মপুত্র—উপসংহার।

নদীমাতৃক দেশের অনেকগুলি সুবিধা আছে সন্দেহ নাই। নদীগুলি কৃষিকার্যের সহায়তা করে। দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্য চালাইবার পক্ষে নদীগুলি উপযুক্ত পথরূপে ব্যবহৃত হয়। নৌকার সাহায্যে অতি সামান্য ব্যয়েই একস্থান হইতে অন্যস্থানে জিনিসপত্র লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে বা শরৎকালের প্রথমে নদীগুলি কূল ছাপাইয়া প্রবল বন্যা বহাইয়া অশেষ দুর্গতি ঘটায়। ভারতবর্ষে হিমালয়ের পাদদেশে, উত্তরপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিহার, বাংলা ও আসামে প্রায় প্রতি বৎসরই গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাগুলি প্রবল বন্যায় ভাসিয়া যায়। নিম্নভূমিতে যে সকল লোক বাস করে তাহাদের দুঃখের আর সীমা থাকে না। অগণিত মানুষ গৃহহারা হইয়া যায়। বন্যার জলে ডুবিয়া কত লোক আর গৃহপালিত পশু যে প্রাণ হারায় তাহার ইয়ত্তা নাই। বন্যার ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয় তাহারও পরিমাণ সামান্য নয়। তাহা ছাড়া বন্যার পর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে

টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ করাল মূর্তি ধারণ করে। সরকার অথবা কোনো কোনো জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান যে সাহায্য করে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যৎসামান্ত।

উত্তর-ভারতে যে বন্যা হয় তাহার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে হিমালয়ের শৃঙ্গের তুষারস্তূপ গলিয়া যাইতে থাকে—এই গলন্ত তুষারের পরিমাণ খুব বেশী হইলে নদীগুলি জলভারে স্ফীত হইয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া দেয়। বৃষ্টিপাতের আধিক্যও বন্যার অপর কারণ। পার্বত্য প্রদেশে যে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় তাহা এই নদীগুলি দিয়াই নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হয়। বর্ষায় বৃষ্টিপাতের প্রাবল্যে নদীগুলি পূর্ব হইতেই জলে পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহার উপর এই অতিরিক্ত জল-প্রবাহ আসিয়া পড়িলে স্বতঃই বন্যায় নিম্নভূমি প্লাবিত হইয়া যায়। এই বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্ত উপযুক্ত বাঁধ এ দেশে নাই। পূর্বে তরাই অঞ্চলের বনভূমি প্রাকৃতিক বাঁধের মতো এই আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসকে কতক পরিমাণে সংযত করিত কিন্তু যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার এই বন উচ্ছেদ করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করায় বন্যাপ্রতিরোধের একটি প্রাকৃতিক উপায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির জলে নদীর তটভূমি ক্ষয়িত হইয়া নদীবক্ষে অতিরিক্ত পরিমাণে মৃত্তিকা সঞ্চিত হওয়াতে বন্যা প্রায় নিয়মিতভাবেই ঘটিতেছে। ভূমিকম্পের ফলেও ভূভাগ এরূপভাবে পরিবর্তিত হয় যাহাতে অনেক সময় বন্যা দেখা যায়। রেল-লাইন পাতার ফলে অনেকস্থলে জলনিকাশের স্বাভাবিক পথগুলি রুদ্ধ হওয়াতেও বন্যার স্বাভাবিক প্রতিরোধের উপায় দূরীভূত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে বন্যার ফলে সাময়িকভাবে ক্ষতি হইলেও পরিণামে তাহা ফলপ্রদ হয় সন্দেহ নাই। বন্যার জলে প্লাবিত ভূভাগের উপর যে পলিমাটি সঞ্চিত হয় তাহাতে ভূমির উর্বরা-শক্তি বহুগুণে বর্ধিত হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসর যে পরিমাণ শস্য জন্মায় তাহাতে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়। কিন্তু এককালে অকস্মাৎ যে ঘোরতর বিপর্যয় আসে তাহা কাহারও কাম্য নয়। সেইজন্ত ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ হইলেও বন্যাকে মানুষ ভগবানের আশীর্বাদরূপে না দেখিয়া একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা রূপেই দেখে এবং ইহার প্রতিরোধের জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহে।

বহুকাল পূর্ব হইতেই মানুষ বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্ত বাঁধ তৈয়ারি

করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই বাঁধগুলি ছোটো-খাটো বন্যা প্রতিরোধ করিতে পারিলেও প্রবল জলোচ্ছ্বাসের নিকট এগুলি হার মানে। নিম্নভূমিগুলিতে জলসেচন করিবার জন্য যে খাল কাটা হয়, তাহাতেও নদীর অতিরিক্ত জল অনেকটা বাহির হইয়া যায়। নদীর পথ সরল করিয়া দিলেও অনেক সময় বন্যা এড়ানো যায়। কিন্তু প্রবল বন্যার নিকট এই উপায়গুলি নিষ্ফল হইয়া যায়।

আধুনিক যুগে পূর্ত বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বন্যা প্রতিরোধের বিজ্ঞান-সম্মত উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। যে স্থানে বন্যা হয় সেই স্থানে প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা না করিয়া নদীর উৎস-অভিমুখে কোনো স্থানে বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কেবল বাঁধ দিয়াই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। বড়ো বড়ো কৃত্রিম জলাধারে জল রক্ষা করিয়া ঐ জলকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

যথেষ্ট সংখ্যক কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ অবশ্যই একটি বৃহৎ এবং বহু-ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। একমাত্র সরকারই এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে হাত দিতে পারে। বিশেষ করিয়া বাঁধের জলের জন্য বিভিন্ন সরকারের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইতে পারে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথমাবস্থায় বিহার অনেক বিষয়ে বাধা দিয়াছিল, কারণ ইহার জলাধার প্রভৃতির জন্য বিহারকে প্রচুর ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইলেও বাংলাদেশই ইহার ফলভোগ করিবে। তবে ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাঁধের জল লইয়া যে সমস্যা দেখা যায় তাহা ভারতবর্ষে ঘটে নাই। তবে সম্প্রতি তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের যে বাঁধের কথা হইতেছে তাহাতে অনুরূপ সমস্যা দেখা দিতেও পারে। তবে পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য ভূভাগ অধিকারের জন্য সাময়িকভাবে বাধা দেওয়া হইলেও ভবিষ্যৎ কালের বহুমুখী ফলের কথা চিন্তা করিলে তাহা নিতান্তই সামান্য বলিয়া বোধ হয়।

আধুনিক বন্যাপ্রতিরোধ পরিকল্পনা যে কতটা কার্যকরী, দামোদর পরিকল্পনা তাহার অন্যতম প্রমাণ। সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্রের প্রবল বন্যায় আসামের বহুস্থান বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। অথচ দামোদর পরিকল্পনার ফলে ইহার অববাহিকায় আদৌ বন্যা হয় নাই। অপরপক্ষে যে বহুমুখী উদ্দেশ্য লইয়া এই পরিকল্পনা গঠিত হইয়াছে তাহা এই অংশের অধিবাসীদের

উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। রাষ্ট্র যদি এইরূপ দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাহা হইলে নদীর তটবর্তী অধিবাসীরা কেবল যে বন্যা হইতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে তাহা নয়, এই পরিকল্পনাগুলি তাহাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিবে।

দামোদর পরিকল্পনা

সংকেত—সংহার মূর্তি দামোদরের প্রচণ্ডতায় মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি—ইহার জলোচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কল্পনা বহু দিনের—ইহাকে সংযত করিবার উপায়—বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ—ইহাকে কার্যকরী করিয়া তুলিলে কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্যের উন্নতি—পশ্চিমবঙ্গের একটি বৃহৎ অঞ্চলের সার্বিক সমৃদ্ধি।

বাংলার দামোদর নদ চিরদিনই তাহার খেয়ালের জন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। শীতের শেষে বা গ্রীষ্মের প্রথম দিকে এই নদে জল খুব কম থাকে বা আদৌ থাকে না। কিন্তু বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ ইহার বালুকাময় বক্ষোদেশ প্রবলবেগে প্রবাহিত জলধারায় ভরিয়া যায়। কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও যেখান দিয়া মানুষ হাঁটিয়া যাইত বা গরুর গাড়ি করিয়া জিনিসপত্র লইয়া যাইত, তাহাতে তখন স্রোত এত প্রবল যে, সুদক্ষ মাঝিও তাহাতে খেয়া দিতে পারে না। এই খেয়ালী নদ মহাদেবের মতো প্রলয় নৃত্য করিতে থাকে… উচ্ছ্বাসিত জলধারা প্রবল বন্যারূপে আসিয়া অকস্মাৎ দুই কূল ভাসাইয়া দেয়। দুই কূলের মাঠ-ঘাট সব ডুবিয়া যায়, ঘর-বাড়ী সব ভাঙিয়া পড়িতে থাকে, গরু-ছাগল হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্যন্ত সকলেই রুদ্র দেবতার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হইয়া ভাসিয়া যায়। কত নরনারী তাহাদের শেষ সম্বলটুকু হারাইয়া পথের ভিখারী হইয়া পড়ে।

এই সংহারমূর্তি নটরাজকে কল্যাণমূর্তি শঙ্করে পরিণত করিবার সাধনা করিতে আধুনিক বিজ্ঞান অগ্রসর হইয়াছে। যে নদ জনগণের কাছে বিভীষিকার প্রতীক ছিল তাহাকে মানব-কল্যাণে নিয়োগ করিবার ভার গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান বাংলার একাংশের সমৃদ্ধি সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। যে বিপুল জলরাশি চারিদিক প্লাবিত করিয়া সর্বনাশ সাধন করিত, তাহাকে সংহত করিয়া একই সঙ্গে ক্ষেত্রে সেচনের উপযোগী জলদান ও তড়িৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

বর্ষার প্রারম্ভে দামোদরের উৎপত্তিস্থল মধ্যভারতের পাহাড়গুলি জলে ভরিয়া যায়। এই জল তখন দামোদরের খাত বাহিয়া সবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সুবিপুল জলরাশিকে সুবৃহৎ জলাধারে আবদ্ধ করিয়া রাখার পরিকল্পনা বৃটিশ যুগেও করা হইয়াছিল। ডাঃ মেঘনাদ সাহা এবং ডাঃ এন্. কে. বসু অনুরূপ পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন। তখনই অনুভব করা গিয়াছিল যে, এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে কেবল যে বাংলাদেশের বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কঠিন-মৃত্তিকা অঞ্চলগুলি উপযুক্ত জল পাইবে তাহাই নয়, ইহা একটি প্রকাণ্ড জলজ তড়িৎ উৎপাদনের উৎসরূপে পশ্চিমবঙ্গের একটি সুবিস্তৃত অংশে স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে তড়িৎ সরবরাহ করিতে পারিবে। একদিকে কৃত্রিম হ্রদ নির্মাণ করিয়া অনেকগুলি খাল দিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা এবং অপরদিকে সুপ্রচুর তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন—এই যুগ্ম পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়াতে দামোদর নদ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অশেষ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

দামোদর নদ বাংলা ও বিহার এই দুইটি রাজ্যের উপর দিয়া প্রবাহিত। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে উভয় রাজ্যের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা থাকে এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিবার জন্য একটি সংস্থা স্থাপন করিয়াছেন। প্রথমে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন পরীক্ষা করিয়া কাজ আরম্ভ করিবার উপযোগী তথ্যাদি প্রকাশ করেন। তাহার পর সেই তথ্যগুলি লইয়া একটি কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা হয়। যে সকল স্থানে বাঁধ দিলে সবদিক দিয়া সুবিধাজনক হইবে সেই সকল স্থান চিহ্নিত করা হয়। সেচকার্য, বন্যাপ্রতিরোধ ও তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন এই তিনটি উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় সেদিকে পরিকল্পনাকারীদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। যাহাতে সবচেয়ে বেশি ভূভাগ সেচের জল পায় এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন অংশে তড়িৎ-শক্তি সরবরাহ করিয়া নূতন পথ বা রেলপথ উন্মুক্ত করিয়া নূতন গ্রাম নির্মাণ করা যাইতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইল। ইহার পরেই কাজ আরম্ভ করা হইল। জলজ তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র, বাঁধ এবং আনুষঙ্গিক বহু জিনিস পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার উপযোগী করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে। তাহার পর সমগ্র পরিকল্পনাটিকে অখণ্ডভাবে পরিচালনা করিয়া জনকল্যাণ সাধন করিতে হইবে।

দামোদর পরিকল্পনার বাঁধগুলির কয়েকটি ইহার মধ্যেই নির্মিত হইয়াছে এবং অপরগুলি সমাপ্তির পথে চলিয়াছে। চারিদিকে শত শত মাইল ব্যাপিয়া ইহার তড়িৎ-শক্তি প্রেরণ করা হইতেছে। এই তড়িৎ-শক্তির মাত্রা অসামান্য। অতিরিক্ত জল সঞ্চিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জলাধার স্থাপন করা হইয়াছে; চারিদিকে জলসেচের বন্দোবস্ত করিবার জন্য অসংখ্য খাল কাটা হইতেছে। আমরা বর্তমানে এই পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি ও এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্ময়কর পরিবর্তন আশা করিতে পারি।

এই পরিকল্পনা প্রায় এক কোটি লোকের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। পশ্চিমবঙ্গের নগর, গ্রাম ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হইবে। তড়িৎ-শক্তি গ্রামের জীবন-যাত্রায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনিয়া দিবে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনী-শক্তি ক্ষয় করিবার প্রয়োজন হইবে না। ইহার সহিত উন্নত ধরণের কৃষিপ্রণালী সংযুক্ত হইয়া মানুষের শ্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করিয়া তুলিবে। পল্লীজীবন সুস্থতর ও সমৃদ্ধতর হইবে। নগরগুলিতেও কারখানাগুলি স্বল্প মূল্যের তাড়িত-শক্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া দ্বিগুণ সক্রিয় হইয়া উঠিবে এবং দেশের সম্পদ আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুতঃ এই প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

এভারেষ্ট বিজয়

সংকেত—দুর্গম স্থান ও দুঃসাধ্য কর্ম এক শ্রেণীর ভয়লেশহীন মানুষকে আহ্বান করে—এভারেষ্ট শৃঙ্গে আরোহণ করিবার প্রচেষ্টার বিবরণ—ব্যর্থতার মধ্য দিয়া অবশেষে সার্থকতা আসিল—১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল হান্টের অভিযান—তেনজিং ও হিলারী।

পৃথিবীতে এমন লোক আছে গৃহের শান্তিময় নীড় যাহাদের বাঁধিতে পারে না। যত কিছু দুঃসাধ্য সাধনের জন্য তাহাদের অন্তর চিরদিন উৎসুক হইয়া থাকে। তাহারা অনুভব করে—

তপতী কুমারী মরু আজ চাহে প্রথম পায়ের ধূলি,
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি,
নিসঙ্গ গিরিচূড়া
তুহিন তুষার শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে,
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে;

যে সমস্ত দুর্গম স্থান অভিযাত্রীদের আকর্ষণ করিয়াছে, হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গ সেগুলির অন্যতম। এই পর্বতশৃঙ্গটিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বতশিখর—২৯,০০২ ফুট উচ্চ এই শৃঙ্গটি বহুকাল হইতেই মানুষকে যেন তাহার শক্তির পরীক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছে। মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই, সে তাহার শক্তির পরীক্ষা দিবার জন্য বার বার আসিয়াছে। বহুবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাহার বিন্দুমাত্র অগৌরব হয় নাই—অবশেষে এই শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া মানুষ প্রকৃতির উপরে তাহার আধিপত্যই যেন প্রমাণ করিয়াছে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে একজন বাঙালী—রাধানাথ শিকদার এই শৃঙ্গটি যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাহা আবিষ্কার করেন। এই শৃঙ্গটির উচ্চতা নির্ণয় করিতে তাঁহাকে যে গণনা করিতে হয় তাহা শেষ করিয়া তিনি তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে বলেন, "মহাশয়, আমি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশিখর আবিষ্কার করিয়াছি।"—এখনও পর্যন্ত এই শৃঙ্গটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বলিয়া পরিজ্ঞাত। তৎকালীন সার্ভেয়ার জেনারেল সার জর্জ এভারেস্টের নাম অনুসারে এই শৃঙ্গটির নাম রাখা হয় এভারেস্ট শৃঙ্গ।

ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে পর্বতারোহণের চর্চা করা হইয়া থাকে। এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের পরিকল্পনা করেন স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই শৃঙ্গের অভিমুখে কোন অভিযান অগ্রসর হয় নাই। প্রথমে ভারতের দিক হইতে এই শৃঙ্গে আরোহণ করিবার যে প্রয়াস করা হয় তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দলাই লামা তিব্বতের দিক হইতে এই শৃঙ্গে আরোহণের অনুমতি দান করেন। কিন্তু তখনও পূর্বদিক হইতে রংবক গ্লেসিয়ারের উপর দিয়া যাওয়ার পরিকল্পনাই অভিযাত্রীরা করিয়াছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়ার্ড বেরী একদল বৃটিশ অভিযাত্রীদের লইয়া ২৩,০০০ ফুট উঠিয়াছিলেন। জেনারেল ব্রুস ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে একদল অভিযাত্রী লইয়া ২৭,৩০০ ফুট উঠেন। ইহার পর বৎসর যে অভিযাত্রিদল যাত্রা করে তাহার মধ্যে ম্যালোরি এবং অক্সফোর্ডের তরুণ গ্র্যাজুয়েট আর্ভিন ২৮,১০০ ফুট পর্যন্ত উঠিবার পর নিখোঁজ হইয়া যান।

ইহার পর প্রায় দশ বৎসর কোনো চেষ্টা করা হয় নাই। হিউ রাটলেজ ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রসর হন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ২৮,০০০ ফুট উচ্চতায় ম্যালোরির কুঠার দেখিতে পান। এইবার তিনি ২৮,১০০ ফুট পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের যাত্রা অনিবার্য কারণবশতঃ পরিত্যক্ত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোনো অভিযাত্রিদল আসে নাই। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে একদল সুইস্ অভিযাত্রী আসে, কিন্তু তাহারা ২৮,২১৫ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করে। ঐ বৎসরই আর একদল সুইস্ অভিযাত্রী ২৬,৫৭৫ ফুট উঠিয়া ফিরিয়া আসিলে এই শৃঙ্গকে অজেয় মনে করা হয়। কিন্তু সুইস্ অভিযাত্রীরা নিজেরা অকৃতকার্য হইলেও শৃঙ্গটির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে যে পথ গ্রহণ করেন, তাহাতে এই শৃঙ্গে আরোহণ অপেক্ষাকৃত কম কষ্টসাধ্য হয়। এই পথে সময়ও অনেক কম লাগে।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই মার্চ ১৩ জন বৃটিশ অভিযাত্রী, ২০ জন গাইড ও ৩৬২ জন কুলি লইয়া কিংস্ রয়েল রাইফেল কোরের কর্ণেল হাণ্ট এভারেস্ট বিজয় করিতে অগ্রসর হন। তিনি কাঠমাণ্ডু হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ২৬শে মে তারিখে তাঁহার দলের দুইজন অভিযাত্রী বোর্দিলন ও ইভান্স শেষ চড়াইয়ের আগে পৌছান। ২৮শে মে পাঁচজন অভিযাত্রী লইয়া একটি দল সকাল সাতটার সময় যাত্রা করে। অভিজ্ঞ পর্বতারোহী তেনজিংয়ের সহায়তায় দলটি ২৭,৮০০ ফুট উচ্চতায় শেষ তাঁবু খাটাইতে সমর্থ হয়। এইখানে তেনজিং ও হিলারী নামক জনৈক নিউজিল্যাণ্ডের অভিযাত্রী সারারাত্রি অপেক্ষা করিবার পর পরদিন প্রভাতে যাত্রা করেন। সকাল ছটার সময় যাত্রা করিয়া তাঁহারা অবশেষে বেলা সাড়ে এগারোটার সময় দুইজনে শিখরে পৌছান। এইখানে তাঁহারা কেক খাইয়া ফোটো তুলেন এবং ভারতীয় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা, ইউনিয়ন জ্যাক ও নেপালের পতাকা প্রোথিত করিয়া নামিয়া আসেন।

তাঁহাদের এই সাফল্যের সংবাদ তিনদিন গোপন রাখা হয়—তাহার পর ২রা জুন ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেকের পূর্ব-মুহূর্তে ইহা ঘোষণা করা হয়। বাঙালী তেনজিং নোরকে এবং নিউজিল্যাণ্ডবাসী এডমণ্ড হিলারী এক মুহূর্তে বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। ইহার পর তাঁহারা ইংলণ্ডের

রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র অশেষ সম্মান লাভ করিয়াছেন। হিলারী ও কর্নেল হান্ট রাজকীয় সম্মান লাভ করেন। তেনজিং ভারত সরকার ও নেপাল সরকার কর্তৃক অভিনন্দিত হন। তিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন।

দুঃসাধ্যসাধনে মানুষ যে কোনো দিনই পিছ্‌পা হয় না। এভারেস্ট-বিজয় তাহার অন্যতম নিদর্শন। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, বহু প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করিয়া অবশেষে মানুষ তাহার সাধনাকে ফলবতী করিয়া চলিয়াছে।

ভারতের শান্তিপ্রচেষ্টা

সংকেত—ভারত চিরকালই শান্তিকামী—বুদ্ধদেব ও অশোকের নীতি—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদর্শ—বর্তমান যুগে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় সকল জাতিই শঙ্কিত—স্নায়ুযুদ্ধ এখনও চলিতেছে—ভীষণ মারণাস্ত্রের আবিষ্কার সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিতেছে—সকলের সহ-অস্তিত্বে ও পঞ্চশীলে বিশ্বাসী ভারতের আপ্রাণ চেষ্টা—বিরোধী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা—আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ভারত শান্তিপূর্ণভাবে সকল সমস্যা সমাধানের প্রয়াসী।

ভারতবর্ষ চিরদিনই শান্তির প্রয়াসী। আজ হইতে সার্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেব অহিংসার বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের প্রতি অপরিমিত মৈত্রীর ভাব পোষণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার অমর বাণী দেশের মধ্যে বহু অশান্তি দূর করিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পরে সম্রাট অশোক তাঁহার আদর্শকে দিকে দিকে প্রচার করিয়াছিলেন। যিনি প্রথম জীবনে বহু নিষ্ঠুর কার্য করিয়া আপনার ক্রূর কর্মের জন্য চণ্ডাশোক নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনিই আবার শেষ জীবনে ধর্মের প্রতি অনুরাগের জন্য ধর্মাশোক নামে লোকের বরণীয় হইয়াছিলেন ইহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া রাজ্য-শাসন করায় সম্রাট অশোক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে অভিনন্দিত হইয়াছেন।

এ যুগে ভারতের দুই মহামানব বুদ্ধদেবের সেই শান্তির বাণীকে নূতন ভাবে প্রচার করিয়াছেন। ঐ দুইজন রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর মধ্যে প্রেমের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিশ্বপ্রেমের

উচ্চারণ করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি বিশ্বের জ্ঞানসাধনার সহিত ভারতের জ্ঞানসাধনাকে মিলাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বময় ভারতের শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। উগ্র জাতিবিরোধের মধ্যেও বিশ্ববাসী সাগ্রহে তাঁহার বাণী শুনিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী আজীবন অহিংসা ও শান্তির বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রামেই তাঁহার জীবনের প্রায় সমগ্র অংশ কাটিয়াছিল। অহিংসাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে স্থাপন করিবার ব্রতপালন করিতে গিয়াই তিনি জীবনদান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য এবং মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রশিষ্য জওহরলাল নেহরু ভারতের চিরন্তন শান্তির ঐতিহ্যের অধিকারী হইয়া স্বাধীন ভারতের পক্ষ হইতে বিশ্বের সমক্ষে এই বাণী ঘোষণা করিতেছেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বপ্রেমের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদ ও অত্যুগ্র জাতিবিরোধের নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন বিশ্বের মনীষিবৃন্দ তাঁহার উক্তির মর্ম অনুভব করিলেও পরাধীন ভারতের মহামানবের বাণী সেদিন রাজনৈতিক কূটচক্রীদের কর্ণে পৌঁছায় নাই। বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর সংঘর্ষের ফলে সকল দেশেই যখন ঘোরতর অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে, আণবিক অস্ত্র সম্পর্কে নবতম আবিষ্কারে সমগ্র বিশ্ব ভাবী যুদ্ধের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত, তখন সকলে প্রাচীন ভারতের এই নবীন প্রতিনিধির বাণী সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছে। একদিন যে আদর্শ কবিত্বময় কল্পনামাত্র বলিয়া যুযুধান জাতিগুলি কর্তৃক উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়াছিল, তাহাই বর্তমানে একমাত্র পথরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই বিশ্বব্যাপী স্নায়ুযুদ্ধের কালেও শান্তির আদর্শকে যে ব্যবহারিক জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সমগ্র বিশ্ব যখন দুইটি সামরিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে তখনও যে নিষ্ক্রিয় না হইয়াও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা সম্ভবপর, ভারতবর্ষ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছে।

আণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতি যে শক্তি অর্জন করিয়াছে তাহা প্রয়োগ করিলে বিশ্ব হইতে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং এখন জাতিগুলির মধ্যে এমন সহযোগিতা ও সহ-অস্তিত্বের বোধ প্রয়োজন যাহা পূর্বে একরূপ অজ্ঞাত ছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ অপরিমিত উন্নতিলাভ করিয়াছে। সভ্যতার ক্ষেত্রেও যদি সে ঐরূপ অগ্রসর

না হয়, তাহা হইলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধাতঙ্ক দেখা দিয়াছে, সকলের মধ্যে মৈত্রীর দ্বারাই তাহার অবসান যে সম্ভবপর শ্রীনেহরু তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

এসিয়ার অপর নবজাগ্রত শক্তি নয়াচীন ভারতের এই বাণী শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছে। পঞ্চশীলের আদর্শ স্থাপন ভারত ও চীনের মৈত্রী ও সহযোগিতার অন্যতম নিদর্শন। এই দুই দেশের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়ের পরস্পরের দেশে ভ্রমণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনাই বান্দুংয়ে এসিয়ার শক্তিগুলির মিলন সম্ভবপর করিয়াছে। স্বার্থান্বেষী দুই একটি পাশ্চাত্ত্য শক্তি এই সম্মেলনকে ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু শান্তির বাণী জনচিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত হওয়ায় সে চক্রান্ত সফল হয় নাই।

কেবল এসিয়াতেই যে শ্রীনেহরুর শান্তিপ্রচেষ্টা কার্যকরী হইয়াছে তাহা নয়। ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে তাঁহার প্রচেষ্টা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার ইউরোপ সফরের সময় সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে, বিশেষ করিয়া সোবিয়েৎ রাশিয়ায় তাঁহার অতুলনীয় সম্বর্ধনা তাহার জলন্ত প্রমাণ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু সহ-অস্তিত্বের উপর জোর দিয়া ভারত যে পঞ্চশীলের আদর্শ স্থাপন করিয়াছে সকলেই তাহাতে বিশ্বাসী।

জেনেভাতে পঞ্চশক্তি সম্মেলনে শান্তিসম্পর্কে যে আলোচনা হয়, তাহার আয়োজনের মূলে ভারতের সক্রিয়তা আছে। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সে তাহার শান্তির আদর্শ লইয়া বিভিন্ন জাতির কল্যাণকার্যে অগ্রসর হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র যখন যুদ্ধ বন্ধ করাইবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল, তখন ভারত চিকিৎসকমণ্ডলী পাঠাইয়াছে। কোরিয়া ও ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতির মূলে তাহার কৃতিত্বই সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। সম্প্রতি সুয়েজখাল লইয়া মিশরে যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল তাহার অবসানের মূলেও ভারতের শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস বর্তমান।

শান্তির মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই ভারত জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্য প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া বর্তমান পুঁজিবাদের অবসান ঘটায় নাই। ভারত সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু শান্তি ও সহ-অস্তিত্বের আদর্শ গ্রহণ করায় সে ধীরে ধীরে

জাতির অর্থনৈতিক জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনয়ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। তাহার সুপরিকল্পিত অর্থনীতি প্রবল বিরোধ এড়াইয়াই সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করিবে।

শখ

সংকেত—কত বিভিন্ন লোকের অদ্ভুত রকম খেয়াল বা শখ দেখা যায়—বাঁধাধরা কাজের মধ্যে যাদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয় না, তাদের উদ্বৃত্ত শক্তি নানারূপ খেয়ালে বা শখে মেতে ওঠে—পাশ্চাত্ত্য দেশে শখ আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী—শখ প্রত্যেকেরই থাকা ভাল কিন্তু দেখা দরকার তা যেন অপরের পক্ষে বিরক্তিকর না হয়।

প্রতি রবিবার সকাল আটটা-নটা থেকে বিকাল দুটো-তিনটে পর্যন্ত যে-কোনো সময়ে চৌধুরীদের পুকুরে গেলে দেখা যাবে যে, দক্ষিণ পাড়ে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রোদের তাপ তুচ্ছ করে বসে আছেন। ধ্যানমগ্ন মুনি-ঋষিদের মতোই তাঁর মন একাগ্র—তবে তিনি একটি ঐহিক জিনিসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন,—সেটি ছিপের একটি ফাৎনা।—রাজেন দত্তকে এ অঞ্চলের সবাই চেনে—তিনি সারা সপ্তাহ ধরে সদাগরী প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার পর এই একদিনের ছুটিটা মাছ ধরতে বসেন। প্রায় সারাদিন ছিপ নিয়ে তিনি পুকুরধারে বসে থাকেন—কখন্ মাছে টোপ গিলবে সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি ঠায় বসে থাকেন। ছোটো-খাটো মাছ ধরে তিনি বদনাম নিতে চান না—দৈবাৎ ছিপে একসেরের নিচের মাছ উঠলে তিনি ছেড়ে দেন। চার করা, টোপ জোগাড়—সব কাজেই তিনি এতটা অভিজ্ঞ যে, কোনো রবিবারেই তাঁকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয় না, কিন্তু এতক্ষণ বসে একটি কি দুটি মাছ নিয়ে গেলে কি পোষায়?

পোষানোর কথা নয়—এটি রাজেনবাবুর শখ। এমনি শখ আরো অনেকেরই আছে—মানুষের খেয়ালের তো আর অন্ত নেই। কেউ ডাকটিকিট জমান—দেশবিদেশের বিচিত্র ডাকটিকিটে তাঁদের সংগ্রহের পরিমাণ বিস্ময়কর। ছোটো বয়সে অনেকেই হরেক রকম দেশলাইয়ের ছবি খাতায় সেঁটে রাখে। কেউ কেউ রবিবার দিনটা বাইরে কোথাও ঘুরে আসবার জন্য সাইকেল নিয়ে লম্বা পাড়ি দেয়। নানা কাজের মধ্যেও একটু আধটু অবসর

পেলে অনেকে ছবি আঁকে, পুতুল গড়ে, ফুলবাগান করে, কাঠের টুকিটাকি জিনিসপত্র তৈরি করে, এমন কি মৌমাছির চাষ পর্যন্ত করে।

মানুষ কেবল নিয়মবাঁধা কাজ নিয়ে থাকতে পারে না। তার মধ্যে এমন একটা বাড়তি শক্তি আছে যা বাঁধাকাজ ছাড়া আরও একটা কিছু করতে চায় —সেই বাড়তি কাজ করাতেই তার আনন্দ। সেই উদ্বৃত্ত শক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র মানুষের শিল্প-সাহিত্য। মানুষ যে সব কাজ নিছক শখের বশে, খেয়ালের বশে করে থাকে, সেও এই উদ্বৃত্ত শক্তির চাহিদা মেটাবার জন্য। অবসরের মুহূর্তগুলো খেয়ালের খেলা খেলে মানুষের মনটা তৃপ্তি পায়—উদ্বৃত্ত শক্তিকে প্রকাশ করবার অবসর দিয়েই মানুষ সবচেয়ে বড়ো আনন্দ পায়।

অনেক শখ কেবলমাত্র একটা উদ্ভট খেয়ালই—তার বিশেষ কোনো মূল্য নেই—যেমন মাছ ধরা কিম্বা শিকারে যাওয়া। কতকগুলো শখের একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে, যেমন বাগান করা, পুতুল গড়া বা শৌখিন জিনিস তৈয়ারি করা। আবার কোনো কোনো শখ শিল্পের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে—সেগুলোকে সৃষ্টি বলা যায়—যেমন ছবি আঁকা, সঙ্গীত চর্চা, এমন কি সাহিত্য-চর্চাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। নিছক শখের বশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ছোটোদের জন্য আজগুবি কাহিনী লেখেন বা জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অবসর সময়ে বেহালা বাজান।

আমাদের দেশের তুলনায় পাশ্চাত্তা দেশগুলোতে এই সব শখের ক্ষেত্রটা প্রশস্ত—শখের দাবি মেটাতে লোকেরা অগ্রসরও বটে। ওদেশে লোকে নানা বিষয়ে গবেষণা করে, সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পের চর্চা করে নিতান্ত শখের বশে—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সেজন্য দেখা যায় ওদেশে শিক্ষা, সভ্যতা আর সংস্কৃতি বিশেষ একটা গণ্ডি বা বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই—তা সর্বত্র প্রসারিত। কিন্তু এদেশে আমাদের ঐ রকমের কোনো শখ বড়ো একটা দেখা যায় না। কাজের মধ্যে একটু অবসর পেলে আমরা সাধারণতঃ আড্ডা দিই—গল্পগুজব করে সময় কাটাই। যারা ওরই মধ্যে একটু উৎসাহী, তারা হয়তো তাস-দাবা-পাশায় সময় কাটায়। শখের বশে—মনের চাহিদা মেটাবার জন্য অবশ্য কেউ কেউ খেলাধূলা, গানবাজনা বা সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকেন —কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম! বাস্তবিকপক্ষে আমাদের দেশে সর্বত্রই এমন একটা নিস্তেজ ভাব দেখা যায় যে, উদ্বৃত্ত শক্তিকে কোনো একটা বিশেষ

দিকে বহিয়ে দেবার কথা কেহই যেন ভাবতে পারে না। সহজ আরামে দিনগুলোকে কোনো গতিকে কাটিয়ে দিতে পারলেই যেন সব মিটে গেল। জড়তায়, আলস্যে এদেশের মানুষের অন্তরের শক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।

ছেলেমেয়েরা যদি ছাত্রজীবন থেকেই একটা শখ, একটা খেয়াল নিয়ে থাকে তা হলে এই জড়তার অবসান হতে পারে। অবশ্য শখের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও একটু সতর্ক হওয়া দরকার। শখটা যেন নিছক ব্যসনে পরিণত না হয়। যে সব শখের একটা মূল্য আছে সেগুলোর দিকে ঝোঁক হওয়া ভালো। তা ছাড়া শখটা আর্থিক সাধ্যের মধ্যে পড়ে কি না তা দেখা উচিত। ছোটো বাগান করে তা থেকে আর্থিক সংগতি করা দুষ্কর নয়—কিন্তু ফোটো তোলার শখ থাকলে তার খরচ চালানো কঠিন। অবশ্য এসব শখ বিশেষ শিক্ষার ফলে অর্থকরীও হতে পারে।—তবে মনের বিশেষ প্রবণতার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যার ছবি আঁকার শখ তাকে কাঠের কাজ করতে বললে তার ভালো লাগবে কেন?

শখ সম্পর্কে আর একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। শখ আমার পক্ষে রুচিকর হলেও অপরের পক্ষে বিরক্তিকর যেন না হয়। ধরা যাক আমি অনেক পরিশ্রম করে দেশী-বিদেশী ফুলের চাষ করেছি—কিন্তু সেই ফুল-বাগানের লম্বা ইতিহাস যদি আর একজনকে শোনাতে যাই তা হলে তার কাছে সেটা খারাপই লাগবে। সবাইকার কাছে ফুলের ইতিহাস বললে হয়তো আমাকে সকলে আড়ালে 'ফুল'-বাবু বলে ডাকতে পারেন। পাশের বাড়ির একটি ছেলের হঠাৎ গানের শখ হয়েছে—সে যদি রাত চারটের সময় উঠে তারস্বরে সা-রে-গা-মা করে তা হলে আমি তাতে অতিষ্ঠ হতে পারি।—সুতরাং শখ বা খেয়াল থাকলে অপরের সুবিধা-অসুবিধার কথাও একটু ভাবা দরকার।

আদর্শ সঙ্গী

সংকেত—ভালো-মন্দ সব রকম লোকের সঙ্গেই মিশিতে হয়—ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের সঙ্গী হইয়া পড়ে—মনের মিল থাকাই সবচেয়ে বড় কথা—সঙ্গী বন্ধু হতে পারে।

'ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্'—দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ কর, সাধুদের সমাগম আশ্রয় কর—ইহাই প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর উপদেশ। দুর্জনের সহিত মিশিলে সাধুতার অবকাশ থাকিবে না, সৎব্যক্তির সহিত মিশিলে

অসৎ হইবার আশঙ্কা কম। সুতরাং সৎব্যক্তিদের সঙ্গ করিতে হইবে—অসৎ সঙ্গ পরিহার করাই কর্তব্য।

অবশ্য বাস্তব জীবনে আমাদের সৎ-অসৎ সবরকম লোকেরই সহিত মিশিতে হয়। লোকের সহিত মিশিবার সময় সে সৎ কি অসৎ সে বিচার করা চলে না। মানুষের প্রয়োজন বর্তমানে এমন বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত যে, সর্বশ্রেণীর মানুষের সহিত তাহাকে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। কেবলমাত্র সৎব্যক্তির সহিত সম্পর্ক রাখিব, যাহারা অসৎ তাহাদের পরিহার করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে বনে বাস করিতে হয়।

অবশ্য যাহাদের সঙ্গ আমাদের করিতে হয়, তাহারা সকলেই যে আমাদের সঙ্গী এমন নয়। সঙ্গী বলিলে এমন একজনের কথা আমাদের মনে আসে যাহার সহিত আমরা হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি। বাস্তবিকপক্ষে আদর্শ সঙ্গী এমন একজনকে করিতে হয় যাহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্থান দিতে পারি। সঙ্গী ও বন্ধু এই শব্দ দুইটির মধ্যে একটা পার্থক্যের ভাব থাকিলেও সঙ্গীদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ আমাদের যথার্থ বন্ধুর মর্যাদা লাভ করে। সঙ্গীদের মধ্য হইতেই বন্ধু নির্বাচন করা হয়।

আদর্শ সঙ্গী বাছিয়া লইতে হইলে এমন একজনকে গ্রহণ করিতে হইবে যাহার সহিত অনেক দিক দিয়াই মিল আছে। বয়সের পার্থক্য অনেকখানি হইলে, একজন আর একজনের সঙ্গে কতটা আনন্দ পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। দুইজন সঙ্গীর মধ্যে একজন যদি খেলাধূলার খুব ভক্ত হয় আর একজন যদি ঘরকুনো হয়, তাহলে দুজনের মধ্যে মিল বেশিদিন বজায় থাকা কঠিন। ছাত্রদের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদের প্রশ্নটা তেমন ওঠে না, কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গিত্ব থাকে না।—অবশ্য সঙ্গিত্ব যখন গাঢ় হয়ে বন্ধুত্বে পরিণত হয়, তখন যে-কোনো দিকেই অমিল থাকুক না কেন, তা বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে না। প্রকৃত বন্ধুত্ব শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও অটুট থাকে।

কোনো সঙ্গীর সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতিদিন তাহার সহিত কাটাইতে হইবে। দুইজনের প্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু অমিল অবশ্য থাকেই—কিন্তু তাই বলিয়া দুইজনের মধ্যে যেন কোনো বিষয় লইয়া ঘোর বিরোধের অবকাশ না থাকে। যাহারা

রাজনীতির চর্চা করে তাহারা যদি বিরুদ্ধ দুইটি দলের সমর্থক হয়, তাহা হইলে কোনো-না-কোনো সূত্রে মনোমালিন্য দেখা যাইতে পারে। অবশ্য দুই সঙ্গীর একজন নিরপেক্ষ হইলেও চলে।

আদর্শ সঙ্গী প্রকৃত বন্ধুর মতোই আমাদের প্রীতির একটি আবরণ দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে। কিন্তু জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমরা কদাচিৎ সেইরূপ একজন মিত্রের সন্ধান পাই। বাস্তব জীবনের মুখ চাহিয়াই সঙ্গ ও সঙ্গী নির্বাচন করিতে হয়; সুতরাং যথার্থ বন্ধুর পরিবর্তে আমাদের চলনসই রকমের সঙ্গী লইয়া কাজ চালাইতে হয়। কিন্তু তাহারই মধ্যে এমন লোকেদের সঙ্গী হিসাবে বাছিয়া লওয়া উচিত যাহাদের সঙ্গ আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না। সঙ্গী-নির্বাচনের ইহাই প্রথম কথা। ইহার পর দেখিতে হইবে সঙ্গীদের নিকট নানাবিষয়ে আমরা কতটা উপকার পাইতে পারি। অর্থাৎ জীবনের যে খণ্ডাংশে আমরা তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছি, সেই অংশে তাহাদের সহযোগিতা আমাদের পক্ষে কতটা কল্যাণকর হইতে পারিবে।

অবশ্য বন্ধুদের মতোই সঙ্গীদের মধ্যেও নানাবিষয়ে আদান-প্রদান হইতে থাকে। সহযোগিতাই সঙ্গিত্বের প্রধান ভিত্তি। জীবনক্ষেত্রে আমরা সকলেই সংগ্রামরত। সেই সময় কেহ যদি আমাদের সাহায্য করে, তাহা হইলে আমরা দ্বিগুণ শক্তি লাভ করিব। বন্ধুর মতো প্রাণ ঢালিয়া কোনো কিছু করিতে হয়তো সকলে পারে না, কিন্তু সকলেই এমন কিছু করিতে পারে যাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক হইতে পারে।—আমার সঙ্গী আমার জন্য কোনো কাজ করিয়া দিতে পারে, আমাকে কোনো মূল্যবান্ উপদেশ দিতে পারে, আবার তাহার সাহায্য লইয়া আমি কোনো কাজও করিতে পারি। সে যেরূপ আমার প্রয়োজনের সময় আমাকে দেখে, আমাকেও সেইরূপ তাহার প্রয়োজনের সময় তাহার সহায়তা করিতে হইবে। এই যৌথ সহযোগিতার ভাব যাহাদের মধ্যে আছে তাহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হইতে পারে।

বন্ধুর স্থান অপেক্ষাকৃত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ—কিন্তু বাহিরের জীবনকে সহজ ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য আদর্শ সঙ্গীর অনুসন্ধান করিতে হয়। খেলার মাঠে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, বিদেশ ভ্রমণের সময়, রাজনীতির ক্ষেত্রে—সর্বত্রই উপযুক্ত সঙ্গীর উপরই সাফল্য নির্ভর করে।

বন্ধুত্ব আপনা হইতে গড়িয়া উঠে—তাহার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচনের প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আদর্শ সঙ্গী গ্রহণ করিতে হইলে সতর্কভাবে বিচার করিতে হয়। বন্ধুবিচ্ছেদ হইলে মনোভঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু পুরাতন সঙ্গীর সহিত বিরোধ অনেক সময় বিষময় ফল সৃষ্টি করিতে পারে।

একটি খেলার বর্ণনা

ভালো-মন্দ অনেক খেলা অনেকবার দেখেছি। কিন্তু সপ্তম শ্রেণীতে পড়বার সময় একবার যে ফুটবল খেলা দেখেছিলাম তার তুলনা হয় না।

স্কুলের ফুটবল টিমে পাত্তা না পেলেও, পাড়ার মাঠে যে ফুটবল খেলা হত তাতে বেশ নাম করেছিলাম। বাঁদিকের হাফব্যাক হিসাবে আমি পাড়ার প্রায় সব ক'টা প্রতিযোগিতাতেই খেলেছিলাম। আমার দিক দিয়ে বল নিয়ে যাওয়া প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। বিশেষ করে বাঁ-পা ডান-পা দুটো পা-ই সমান চলায় পদযুগলের সদ্ব্যবহার করার সুযোগ আমি পুরোপুরিই নিতে পারতাম।

হুগলী জেলায় মানকুণ্ডু নামে একটা স্টেশন আছে—এটাও রাঁচীর মতো না হলেও পাগলাগারদের জন্য কিছুটা বিখ্যাত। এই স্টেশনের কাছে রেল লাইনের নিচে দিয়ে যে পাকারাস্তাটা আছে, তাই ধরে মাইলটাক গেলে আলতাড়া গ্রাম—সেই গ্রামে আমার মামার বাড়ি।—সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আম খেতে মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। দুপুর বেলায় দরজা জানালা বন্ধ করে দিবানিদ্রা শেষ করে সবে একটা কানাইবাঁশি আমের আঁটি চুষছি এমন সময় ছোটো মামা জিজ্ঞাসা করলে, "কিরে, বল খেলতে যাবি?" আমি সোৎসাহে রাজি হয়ে গেলাম—তার ফলেই একটি খেলার মাঠে আমার প্রথম ও শেষ আবির্ভাব।

আলতাড়া থেকে ব্যাজরা দু' মাইলও হবে না—সেটুকু অনায়াসেই হেঁটে যাওয়া গেল—আমবাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়ায় রোদটা তেমন লাগল না। তারপর মাঠে পৌছেই আমার চক্ষু ছানাবড়া। চাষের মাঠ হিসাবে এটি অনবদ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু খেলার মাঠ যে এ রকম হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। মাঠটা লম্বা মন্দ নয়, কিন্তু এর একদিকটা ষাট-সত্তর হাত

চওড়া, অপর দিকটা সরু—তিরিশ ফুট চওড়া হবে কি না সন্দেহ। মাঠে মাঠে হয়তো বেগুন কি চ্যাঁড়শের চাষ হত—মাটি এবড়োখেবড়ো। এক জায়গায় একটু আলের মতো আছে; আর মাঠের প্রায় মাঝখানে আছে একটি জামগাছ। একদিকে দুটো আস্ত আর জ্যান্ত সুপুরিগাছ পুঁতে গোল পোস্ট করা হয়েছে—অন্যদিকে হাতখানেক করে উঁচু দুটো বাঁশ পোঁতা। তারই পাশে, ছোটোমামার দেখাদেখি জামাজুতো ছেড়ে খেলতে নামলাম।

খেলোয়াড়রা সব দিক থেকেই বিচিত্র। আমার বয়স তখন বছর বারো-তেরো হবে। দেখলাম অপর খেলোয়াড়দের বয়স আমার প্রায় অর্ধেক থেকে প্রায় তিনগুণ। আমরা মামা-ভাগ্নে খেলতে নেমেছিলাম, খুড়ো-ভাইপোও দুচারজন ছিল, তবে বাপ-ছেলে ছিল কিনা তা জোর করে বলতে পারি না। খেলোয়াড়ের সংখ্যা মোট সাতাশ জন—রেফারিকে বাদ দিয়ে। রেফারির কথাও বলছি এইজন্য যে, খেলা বেশ জমে উঠলে আর একজনকে বাঁশি গছিয়ে দিয়ে রেফারিও খেলতে নেমে গিয়েছিল। তবে রেফারি-বদল এই একবারই হয়েছিল।

দল ভাগ হলে একদিকে বারোজন আর একদিকে পনেরোজন হল। প্রত্যেক দলেই কে কোন্ জায়গায় খেলছে তা বোঝবার উপায় ছিল না, কারণ যেদিকে বল যাচ্ছিল প্রায় সকলেই সেই দিকে ছুটছিল। কেবল গোলে যারা খেলছিল তাদের স্থানই নির্দিষ্ট ছিল—কারণ দরকার হলে হাত দিয়ে বল ধরতে একমাত্র গোল-কীপারই পারে। তবে একদিকের গোলে বেশ বয়স্ক একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন—গোলরক্ষার দায়িত্বের চেয়ে বল হাতে ধরে হাইকিক মারার দিকেই তাঁর বেশি দৃষ্টি ছিল—হয়তো এরই লোভে তিনি একপ্রান্তে এসে দাঁড়ান। অপর দিকের গোলে তিনজন গোল-কীপার—যা এমনই অসম্ভব একটা ব্যাপার যে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। এই তিনজন গোলরক্ষী তিনটি নাবালক—এদের আড়াল করে বিশালদেহ এক ভদ্রলোক ব্যাকে খেলছিলেন। খেলা চলবার পর বুঝতে পারলাম—গোলপোস্টের পিছনে যে নালাটা রয়েছে সেটা থেকে বল কুড়োনোই এই তিনটি বালকের কাজ। তারই পুরস্কারস্বরূপ তাদের খেলতে দেওয়া হয়েছে।

রেফারির বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে খেলা আরম্ভ হ'ল। প্রতিপক্ষের একজন খেলোয়াড় বল নিয়ে এগিয়ে আসছে দেখে তার দিকে এগিয়ে যেতেই আর

একজন খেলোয়াড় পায়ে ল্যাং দিয়ে আমাকে ফেলে দিলে। ফাউল হয়েছে জেনে রেফারির বাঁশির অপেক্ষা করলাম—কিন্তু কোথায় বাঁশি? ততক্ষণে বল গোল-কীপার ভদ্রলোকের কাছে চলে গেছে—তিনি জাঁদরেল একটা হাইকিক করে বলটিকে একেবারে নালাপার করে দিয়েছেন। এদিকের গোল-কীপারত্রয়ের একজন সেদিকে ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

প্রথম চোটেই আছাড় খাওয়ায় আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলার হালচাল বুঝতে পারলাম। এই মাঠে বীর খেলোয়াড় বলে গণ্য হতে গেলে হয় মারকুটে হতে হবে আর না হয়তো খুব জোরে জোরে কিক করতে হবে। প্রথমটা আয়ত্ত করা অসম্ভব জেনে দ্বিতীয়টার দিকে দৃষ্টি দিলাম। স্বপক্ষ বা বিপক্ষের দু-চারজন খেলোয়াড় ছাড়া আর কারোরই বলের উপর পায়ের কন্ট্রোল ছিল না—সুতরাং অনায়াসেই বল ছিনিয়ে নিয়ে হাফব্যাকের বল সরবরাহের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে প্রতিপক্ষের গোল উদ্দেশ করে জোরে জোরে কিক করতে লাগলাম। সৌভাগ্যক্রমে বলটি সুপারিগাছ দুটোর মাঝখানে পড়ে ছেলে তিনটিকে দিশেহারা করে দিয়ে তিনবার গোল হল। সুতরাং অল্প বয়স্ক হলেও আমিই মাঠের একজন সেরা খেলোয়াড়ের পর্যায়ে উঠে গেলাম—প্রায় সকলেই আমাকে একটু সমীহ করে খেলতে লাগল। প্রথমে দুএকজন আমাকে একটু বেকায়দায় ফেলতে চাইলেও আমার একটা রিটার্ণ কিক মাথায় লাগায় যখন আমার দ্বিগুণ বয়সের একজন খেলোয়াড় বসে পড়ল তখন আর বড়ো কেউ আমার দিকে ঘেঁসতে চাইল না।

সেদিন আধ ডজন গোলে জিতে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে বাড়ি ফিরতে পারতাম, কিন্তু মধ্য থেকে একটা ফ্যাসাদ হওয়ায় খেলা ফেঁসে গেল। হ্যাণ্ডবলের দরুণ একটা ফ্রি কিক পেয়ে একজন খেলোয়াড় যেমনি বলটি বসিয়ে মোশান নেবার জন্য পিছিয়ে গিয়েছে, অমনি আর একজন খেলোয়াড় অতর্কিতে ছুটে এসে বলে কিক করে দিল। অমনি দুজনের মধ্যে প্রথমে ঝগড়া, তারপর মারামারি আরম্ভ হয়ে গেল। বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সংঘর্ষ অনেকবার দেখলেও স্বপক্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে মারপিট এই একবারই দেখেছিলাম। মারামারির বহর ক্রমশ বেড়েই চলল। সুতরাং রেফারি বাঁশি না বাজালেও ঐখানেই খেলার ইতি হয়ে গেল।

কলিকাতার রাস্তাঘাট ও যানবাহন সমস্যা

সংকেত—কলিকাতার কতক অংশ পুরাতন আবার কতক অংশ নূতন—রাস্তা ও ফুটপাথ বিভিন্ন রকমের—লোকের ভিড়ে, যানবাহনের ভিড়ে পথে বাহির হইলেই বিপদের সম্ভাবনা—লোকসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়িয়াছে, বিভিন্ন শ্রেণীর মোটর যে ভাবে বাড়িয়াছে সে অনুপাতে রাস্তা বাড়ে নাই—ইহাই প্রধান সমস্যা—পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন বিভাগের আন্তরিক চেষ্টা—উপসংহার।

কলিকাতার পথে বাহির হইলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। যে সব রাস্তা দিয়া ট্রাম-বাস চলে সেগুলিতে ভিড়ের সীমা নাই। বিশেষ করিয়া সকালে বিকালে সারা কলিকাতা যেন ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া আসে—এই সময় কলিকাতার অনেক অঞ্চলেই পথ হাঁটা নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। আবার, দুই একটি জনবিরল গলিও দেখা যায়।

কলিকাতার রাস্তাঘাট বলিলে প্রথমেই তাহার ভিড়ের কথা মনে আসে। তারপর পথগুলির আকৃতিগত বৈসাদৃশ্যের কথা বলিতে হয়। পথ যে কত রকমের হইতে পারে কলিকাতার পথে ঘুরিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সাদার্ণ অ্যাভেনিউ ও বাগবাজারের কোনো গলি—দুইই কলিকাতার পথ, কিন্তু দুইটির মধ্যে কি পার্থক্য—একটিকে স্বর্গে প্রবেশের পথ বলিলে অপরটিকে নরককুণ্ড বলা বিশেষ অসংগত হইবে না। চৌরঙ্গী রোডেও ট্রাম চলে, কিন্তু তাহার সহিত চিৎপুরের ট্রাম চলার কোথাও কি মিল পাওয়া যায়? রসা রোড ও হাজরা রোডের মোড়ে মাঝে মাঝে গাড়ি 'জাম' হইয়া যায়—কিন্তু লোয়ার চিৎপুর রোডে যে গাড়ি 'জাম' হয় তাহার কি তুলনা আছে? ট্রাম, রিক্সা, প্রাইভেট কার, লরী, বাস ও ঠেলাগাড়িগুলি গুঁতাগুঁতি করিয়া আগাইয়া যাইতে যাইতে যখন রাস্তা আটক করিয়া বসে তখন রাস্তা পরিষ্কার করিতে গিয়া ট্রাফিক পুলিশকে হিমসিম খাইতে হয়।

কলিকাতার—বিশেষ করিয়া উত্তর কলিকাতার রাস্তাগুলির শ্রীই বা কী রকম! ফুটপাথ সব রাস্তায় থাকার প্রয়োজন হয়তো না থাকিতে পারে, কিন্তু পথ দিয়া যাহাতে চলা যায় তাহার জন্য তো একটা কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত। পথের দুই পাশে যেখানে সেখানে আবর্জনা; একটু জনবিরল গলি প্রস্রাবের কটু গন্ধে পরিপূর্ণ, আর পথ দিয়া গাড়িগুলি এমন বেপরোয়াভাবে চলিতে থাকে যে পথ চলা ভার হইয়া উঠে। আর ফুটপাথ থাকিলেই বা কি হইবে? অনেক ফুটপাথ নামে আছে মাত্র, কিন্তু কবে যে তাহার সংস্কার

হইয়াছিল তাহা গবেষণা করিয়া বাহির করিতে হয়। ভালো করিয়া দেখিয়া সাবধানে না চলিলে পতন অনিবার্য। কোনো কোনো অঞ্চলে ফুটপাতের উপর গোরু বা মোষ বাঁধা—সেটি স্থায়ী বা অস্থায়ী একটি গোয়ালে পরিণত হইয়াছে। কোনো কোনো ফুটপাথ হয়তো সর্বদোষমুক্ত, কিন্তু এত হকার সেখানে ভিড় জমাইয়াছে যে সেখান দিয়া পথ হাঁটা দায়।

কলিকাতার পথে নামিলেই বিপদের আশঙ্কা। চারিদিকে অসংখ্য গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছে—মনে হয় এই বুঝি ধাক্কা দিল। এক একটি মোড়ে রাস্তা পার হওয়া যে কতখানি শক্ত ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। কলিকাতার পথে দুর্ঘটনা অনেকগুলিই ঘটে, কিন্তু রাস্তাঘাটের অবস্থা ও ব্যবস্থা যে রকম, তাহাতে আরো দুর্ঘটনা কেন যে ঘটে না তাহা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়। ফুটপাথ দিয়া চলাও সব অঞ্চলে নিরাপদ নয়—কোথা হইতে একটি ষাঁড় আসিয়া যে গুঁতাইয়া দিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় যাইতে হইলে সাধারণের পক্ষে ট্রাম-বাসই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ভোরের দিকে কয়েক ঘণ্টা, দুপুরের দিকে কয়েক ঘণ্টা এবং বেশী রাত্রে কিছু সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় ট্রামে বা বাসে উঠিবার জন্য রীতিমত মল্লযুদ্ধ করিতে হয়। অনেক সময় ট্রামে বা বাসে উঠিবার জন্য যে সময় অপেক্ষা করিতে হয়, তাহাতে পায়ে হাঁটিয়াই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়।—ট্রামে বা বাসে একবার পা ঠেকাইতে পারিলেই যথেষ্ট ভাগ্য বলিয়া মানিতে হয়। ভিতরে যাহারা আসনে বসিয়া থাকে তাহারা নিতান্ত ভাগ্যবান—বেশীর ভাগ লোককেই হয় ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে আর না হয় বাদুড়ঝোলা হইয়া যাইতে হয়। কোনো মতে উঠিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেও বিপদ—তাহা হইলে গন্তব্য স্থলে ঠিক নামা যাইবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে।

বাস্তবিকপক্ষে যানবাহন সমস্যা কলিকাতার একটি 'জ্বলন্ত' সমস্যা। বিশেষ করিয়া অফিস যাইবার সময় বা অফিস হইতে ফিরিবার সময় ট্রাম-বাস গুলিতে যে ভিড় দেখা যায় তাহা সত্যই অবর্ণনীয়। টার্মিনাস হইতে ছাড়িবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঐগুলি ভর্তি হইয়া যায়—হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশন হইতে যে ট্রাম-বাস ছাড়, সেগুলিতে ছাড়িবার আগে হইতেই আর তিলধারণের জায়গা থাকে না। মাঝপথে যাহারা থাকে—যানবাহনের জন্য তাহাদের যে

কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। যানবাহনের সমস্যা এত প্রবল যে, অসংখ্য ব্যক্তিকে হাঁটিয়াই অফিসের দিকে যাইতে হয়।

ভিড়ের সময় ট্রাম-বাসের সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়া এই যানবাহন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, ট্রাম-বাসের সংখ্যা বেশি বাড়াইলে তাহাতে পথের ভিড় বাড়িয়া যায় ও প্রায়ই রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন পথ দিয়া ট্রাম-বাস চালাইবার পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় ট্রাম-বাসের সংখ্যা বাড়াইয়াও পথের ভিড় কিছু পরিমাণে এড়ানো যাইতেছে।

যাহারা অপেক্ষাকৃত বিত্তবান্ তাহাদের সুবিধার জন্য কলিকাতায় বেবি ট্যাক্সি চালু করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমতঃ, ট্যাক্সির ভাড়া দিবার ক্ষমতা সকলের নাই, দ্বিতীয়তঃ, এই ট্যাক্সিগুলির সংখ্যা এত কম যে, এইগুলি চালু হওয়ায় কলিকাতার যানবাহন সমস্যা কিছু কমিয়াছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন বিভাগ যানবাহন সমস্যা মিটাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত হওয়ায় এই বিভাগের পরিকল্পনা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। প্রয়োজন অনুসারে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করাও বর্তমানে সম্ভবপর নয়—এবং তাহাতে পথের ভিড় বহুগুণে বর্ধিত হইবার আশঙ্কা আছে।

মধ্যে একবার কলিকাতার চতুর্দিক বেড়িয়া ভূগর্ভস্থ রেলপথ নির্মাণ করিবার কথা উঠিয়াছিল। সারা শহরটি এইরূপ রেলপথ দিয়া ছাইয়া ফেলিতে পারিলে হয়তো যানবাহনের সমস্যা মিটিত, কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার পক্ষে কয়েকটি গুরুতর বাধা থাকায় পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং একদিকে যেমন পথ-ঘাটের দুরবস্থা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, অপর দিকে তেমনই যানবাহনের সমস্যা দিন দিন চরমে উঠিতেছে।

কলিকাতার বর্ষা

সংকেত—ক্রমাগত অসহ্য গরমে কাতর হইয়া লোক বৃষ্টি চায়—কিছুক্ষণ বৃষ্টি হইলেই বৃষ্টিকে উপদ্রব বলিয়া মনে হয়—রাস্তায় জল জমে—ট্রাম-বাস বন্ধ হইয়া যায়—কাজকর্ম শিথিল হয়—জলনিকাশের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা—পরিকল্পনার অভাব—বস্তির লোকের দুর্দশা—পাকা পুরাতন বাড়ীও ধ্বসিয়া পড়ে।

দারুণ গ্রীষ্মের তাপে চারিদিক যখন দগ্ধপ্রায় হইয়া উঠে, তখন কলিকাতাবাসী সকলেই একপশলা বেশ জোর বৃষ্টিই চাহেন। কিন্তু দুই-এক ঘণ্টার প্রবল বর্ষণের পর কলিকাতার চেহারাই যখন পাল্টাইয়া যায় তখন আকাশের স্নিগ্ধ ধারাকেও যেন একটা প্রবল উপদ্রব বলিয়া মনে হয়।

সারা কলিকাতায় যদি এক-আধ ঘণ্টা ধরিয়া প্রবল বর্ষণ হয়, তাহা হইলেই অনেক রাস্তায় জল জমিয়া যায়। রাস্তায় ট্রামগুলি বন্ধ হইয়া গিয়া সারি সারি দাঁড়াইয়া থাকে ; কদাচিৎ একটি দুইটি শাখায় দুই-একখানি করিয়া ট্রাম চলিতে থাকে। জল একটু বেশী জমিলে বাসও বন্ধ হইয়া যায়। দুই-একজন দুঃসাহসী বাসচালক বা লরীচালক জলের মধ্য দিয়াই বাস বা লরী চালাইতে চেষ্টা করে। যাহারা সৌভাগ্যবান্ তাহারা জল কাটাইয়া বেগে চলিয়া যায়। কিন্তু ইঞ্জিনের মধ্যে জল ঢুকিয়া ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হইয়া গেলে গাড়ি আর চলে না। চারিদিকে এক হাঁটু বা তাহার চেয়ে একটু বেশি জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে আর তাহার মাঝখানে এক একটি বিরাটদেহ বাস বা লরী দ্বীপের মতো দেখা যাইতেছে এইরূপ দৃশ্য বিরল নয়। যে সব অঞ্চলে বেশি জল জমে সে সব স্থানে কেবল ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা যে কাগজের নৌকা ভাসাইয়া দেয় তাহা নয়, বয়স্করা কাঠের নৌকা করিয়া জলবিহার করিতেছে এরূপ দৃশ্যও প্রায় প্রতি বৎসরই দুই এক দিন দেখা যায়। তখন কলিকাতায় আছি না ভেনিস শহরে আছি সে বিষয়ে যেন একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়।

কলিকাতার পথে ঘাটে এই জলপ্লাবনের কারণ জলনিকাশের ব্যবস্থার অভাব। এই বিরাট শহরটি কেহ পরিকল্পনা করিয়া গড়িয়া তোলে নাই, সুতরাং ইহার নগরোচিত ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরতিশয় অপর্যাপ্ত। সেই জন্যই অল্প কিছুক্ষণ বৃষ্টি পড়িলেই রাস্তায় জল জমে এবং হাইড্রেন্টের মুখ খুলিয়া দিয়া জলনিকাশের চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেও জল যে কখন নামিয়া

যাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরিয়া জল জমিয়া আছে এমন ঘটনাও ঘটে।

বাংলা দেশে বর্ষার দাক্ষিণ্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু ইহার পল্লীগুলিতে অনেক পুকুর, খাল, বিল ও নদী থাকায় বৃষ্টি হইলেই কোনো এক জায়গায় জল জমে না—বর্ষার শেষ দিকে কখনও কখনও ঐ জলাশয়গুলি উপচাইয়া উঠে এই মাত্র। কলিকাতায় জলাশয় নাই বলিলেই হয়—দুই চারিটি থাকিলেও তাহাতে পথের জল যাইতে পারে না। পথের ধারে ঝাঁঝরি দিয়া ভূগর্ভস্থ নর্দমায় জল নামিয়া যাইবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা তেমন কার্যকরী হয় না। সুতরাং বৃষ্টি হইলেই কলিকাতার পথে-ঘাটে জলপ্লাবন হইয়া যায়।

অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায় যে সব বস্তি আছে, এই সময় সেগুলির শোচনীয় অবস্থা চরমে পৌছায়। এই অঞ্চলগুলির পথ-ঘাটতো ডুবিয়া যায়ই, অনেক সময় বাড়ির ভিতর, এমন কি ঘরের ভিতরও জল ঢুকিয়া পড়ে। চারিদিকের স্তূপীকৃত আবর্জনা ভাসিয়া বাড়ীঘরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে এরূপ দৃশ্য এই সময় অসম্ভব নয়। বৃষ্টির ফলে মেটে ঘর বা জীর্ণ বাড়ীগুলি প্রায়ই ভাঙিয়া পড়ে।

কেবল বস্তি অঞ্চলে নয়, অন্যত্রও বর্ষায় পুরাতন বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িবার সংবাদ প্রত্যেক বৎসরই দেখা যায়। বাহ্যত বোঝা না গেলেও অনেক বাড়ীই বাসের দিক দিয়া নিরাপদ নয়। বৃষ্টি হইলেই ঐগুলির ছাদ দিয়া বা দেওয়াল বাহিয়া জল পড়িতে থাকে। ছাদ ও দেওয়াল সর্বদাই এমন ভিজা অবস্থায় থাকে যে মনে হয় এইবার বুঝি তাহা ভাঙিয়া পড়িবে। কলিকাতা কর্পোরেশনকে প্রতি বৎসরই কয়েকটি বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে হয়—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কিছু কিছু বাড়ী প্রত্যেক বৎসরই ভাঙিয়া পড়ে।

বর্ষা নামিলেই কলিকাতার জীবনযাত্রা যেন কিছু পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়ে। পথে-ঘাটে ভিড় থাকে না। দুই-তিন দিন বাদলা থাকিলে সকলেই যেন বর্ষাকে আপদ বলিয়া মনে করে। চারিদিকের প্যাচ্‌প্যাচানি যেন অসহ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যেই দুই-তিন দিনের জন্য বৃষ্টি বন্ধ হইয়া রোদ ওঠে, অমনি সকলে আবার এক পশলা বৃষ্টির জন্য ছটফট করিতে থাকে। অসুবিধার কথা পরে ভাবা যাইবে—এখন এই গরম হইতে প্রাণটা একটু বাঁচুক তো!

ভবিষ্যৎ বাংলার গ্রাম

সংকেত—বাংলার গ্রাম পুরাতন শ্রী ও সমৃদ্ধি হারাইয়াছে—দেশের উন্নতি করিতে হইলে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইবে—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ—কৃষিশিল্পের উন্নতি—নিরক্ষরতা ও ব্যাধি নির্মূল হইবে—কুটির-শিল্প গড়িয়া উঠিবে—বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের পাশে ছোট ছোট কলকারখানা—ভবিষ্যৎ গ্রামের দৃশ্য।

বাংলার গ্রামগুলির মধ্যে যে শান্তমধুর শ্রী আছে তাহা কবিগণকে চিরদিনই মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গজননীর বন্দনা করিতে গিয়া পল্লীর শ্রীরই অনুপম বর্ণনা করিয়াছেন—

> নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
> গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
> অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি—
> ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
> পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলা গেহ—
> স্তব্ধ অতল দিঘি-কালোজল নিশীথ শীতল স্নেহ।
> বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
> মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

কিন্তু বাংলার পল্লীর সেই শ্রী আজ আর নাই। একথা সত্য বটে যে, পর্জন্যদেবের দাক্ষিণ্যে বাংলার উর্বর মৃত্তিকা চিরশ্যামল—কিন্তু অর্ধশতাব্দী পূর্বে তাহার মাঠগুলি যেমন বিচিত্র শস্যে পরিপূরিত হইত এখন আর তাহা দেখা যায় না—তাহার গ্রামগুলি বৃক্ষলতায় ও পুষ্পপুঞ্জে যে অপরূপ শোভা ধারণ করিত তাহা এ যুগে অনুমান করা যায় না। বর্তমানে বাংলার পল্লীর মাঠে আর তেমন ফসল ফলে না; তাহার গ্রামগুলি অনেক স্থলেই পতিত জমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ; বহুকালের পুরাতন দীঘিগুলি মজিয়া গিয়া অস্বাস্থ্যকর ডোবায় পরিণত হইয়াছে। সর্বোপরি গ্রামের মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ—সব কিছু হইতেই বঞ্চিত হইয়া দিন দিন সর্বনাশের পথে আগাইয়া যাইতেছে।

ভারত সরকার যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে গ্রামোন্নয়ন একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের

সভ্যতা গ্রামের উপর নির্ভরশীল। সমগ্র দেশকে উন্নত করিতে গেলে সর্বপ্রথমে গ্রাম উন্নত করিতে হইবে। গ্রামগুলির অবনতি হইলে সারা দেশ ধ্বংসের পথে আগাইয়া যাইবে; গ্রামগুলি উন্নত ও সমৃদ্ধ হইলেই দেশের উন্নতি সকল দিক দিয়াই সম্ভবপর হইবে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রামের তুলনায় শহরের সংখ্যা অতি সামান্য।

গ্রামগুলিকে উন্নত করিবার জন্য সরকার সারা দেশময় আধুনিক বিজ্ঞানের অর্জিত সম্পদগুলি প্রসারিত করিয়া দিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। গ্রামের কৃষির উন্নতির জন্য তাঁহারা ক্ষেত্রগুলিতে যাহাতে ভালোভাবে জলসেচের ব্যবস্থা হয় এইজন্য দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীতে বাঁধ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জলসেচ ছাড়াও এই বাঁধগুলির আরও দুইটি উদ্দেশ্য আছে—প্রথমটি বন্যা-প্রতিরোধ, অপরটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন। দামোদর নদে বাঁধ দিয়া যে বৃহৎ তড়িৎ-উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা কার্যকরী হইলে পশ্চিম বাংলার সমস্ত গ্রাম তড়িৎ শক্তি লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

গ্রামগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইলে গ্রামগুলির চেহারাই পালটাইয়া যাইবে। গ্রামাঞ্চলে কেবল ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলোই জ্বলিতে পারিবে তাহা নয়, গ্রামের মধ্যে বহুস্থলে, ছোটো বড়ো কারখানা স্থাপন করা যাইবে। উৎপন্ন দ্রব্য যাহাতে শহরে লইয়া আসা যায় এই জন্য গ্রামের মধ্যে পথনির্মাণের কাজ এখন হইতেই সুরু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তবে কলিকাতার নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলগুলির সহিত এই গ্রামগুলির পার্থক্য রাখা যাইবে। বাংলা দেশ যে কৃষিপ্রধান এই সত্যটি বিস্মৃত হইলে বাংলার গ্রামগুলির যথার্থ উন্নতি সাধিত হইবে না। পল্লী অঞ্চলে বড়ো বড়ো কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নাই। বরং কুটিরশিল্পের দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে। গান্ধীজী পল্লী অঞ্চলে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই কুটিরশিল্প চালাইয়া যাইবার কথা বলিয়াছিলেন। বিধানচন্দ্র জাপানী পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধনের জন্য ছোটো খাটো যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতী। বাস্তবিকপক্ষে ছোটো-খাটো যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলে শিল্পের মান উন্নত হইবে অথচ গান্ধীজীর বিকেন্দ্রী-করণের আদর্শও অব্যাহত থাকিবে। শহরে বড়ো কারখানা কোনো কোনো শিল্পের পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু দেশের সর্বত্রই যাহাতে শিল্পের প্রসার

হয় এবং বিভিন্ন স্থান যাহাতে শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যগুলির দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখাই উচিত। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনে গ্রামগঠনের এই আদর্শটিই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রামগুলিতে শিক্ষা-বিস্তরণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা কার্যকরী হইলে আগামী দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যে নিরক্ষরদের সংখ্যা অর্ধেকের চেয়ে বেশি কমিয়া যাইবে। আর্থিক অবনতিই শিক্ষার অভাবের প্রধান কারণ। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলির অর্থনৈতিক মান উন্নত হইলে শিক্ষাবিস্তার সহজ হইবে। বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়ায় শিক্ষার সহিত সকলেরই পরিচয় সাধিত হইতে পারিবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক করিয়া তুলিলে সমগ্র জাতি শিক্ষার দিক দিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই অগ্রসর হইতে পারিবে। তখন গ্রামে গ্রামে একাধিক বিদ্যায়তন স্থাপিত হইবে, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপিত হইবে—গণ্ডগ্রামগুলিতে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও দুরূহ হইবে না।

বর্তমানে বাংলার গ্রামগুলি অশেষ দুর্গতিগ্রস্ত হইলেও আশাবাদীর দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া দেখিলে বাংলার গ্রামের একটি মনোহর মূর্তিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। গ্রামগুলি বর্তমানের মতো জঙ্গলে ভরিয়া থাকিবে না, অথচ যন্ত্ররাক্ষসের গ্রাসে পড়িয়া রুক্ষও হইয়া উঠিবে না। গ্রামের মধ্যে একদিকে থাকিবে উদার বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, আমবাগানের স্নিগ্ধ ছায়া, বড়ো বড়ো দীঘির অগাধ জল, অন্য দিকে থাকিবে বিদ্যুৎ-চালিত ছোটো ছোটো শিল্পপ্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, বড়ো দোকান, বাজার, পাকা রাস্তা। আগামী দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যে বাংলার সব গ্রামে পাকা বাড়ী হয়তো সম্ভবপর হইবে না, কিন্তু গ্রামের ঘরবাড়ীগুলি ও পথঘাট বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়া কমিয়া গিয়াছে—উপযুক্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থায় গ্রাম হইতে অন্য রোগও দূরীভূত হইবে। বর্তমানে গ্রামগুলিতে স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া উন্নতি লাভ করিবার সুযোগ অতি সামান্য—কিন্তু ভবিষ্যতের গ্রামগুলিতে মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধনের সব সুযোগই থাকায় গ্রাম্যজীবন সব দিক দিয়াই লোভনীয় হইয়া উঠিবে। এখন মানুষ যেমন উন্মত্ত হইয়া শহরের দিকে ছুটিতেছে, তখন শহরের যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় বীতস্পৃহ

হইয়া অনেকেই গ্রামের দিকে ছুটিয়া যাইবে। ইংলণ্ড বা ফরাসী দেশের গ্রাম-গুলির মতোই বাংলার গ্রামগুলিও সমৃদ্ধি ও শোভার আকর হইয়া উঠিবে।

একটি রেল-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

সংকেত—ভূমিকা—ভ্রমণের উপলক্ষ্য—টিকিট কাটা ও গাড়ীতে ওঠা—মাঝের ষ্টেশনে যাত্রী ওঠা-নামার বর্ণনা—গাড়ীর ভিতরের দৃশ্য—গন্তব্য স্থলে উপনীত হওয়ার কথা।

মা-বাবার সঙ্গে বার কয়েক লম্বা রেল-ভ্রমণ করিলেও প্রথম যেবার একলা রেল-ভ্রমণ করিতে গেলাম, সেবার যেন একটা দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হইলাম বলিয়া মনে হইল।

অবশ্য আমাকে বহুদূরে যাইতে হয় নাই। হাওড়া হইতে মাত্র পঁচিশ মাইল—রেলপথে বাইশ মাইল দূরে চুঁচুড়া। এই শহরে আমার মাসীমার বাড়ী। বড়দিনের সময় কয়েক দিন ছুটি থাকায় সেই সূত্রে সেখানে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। সকাল আটটায় গাড়ী। প্রায় ঘণ্টা খানেক আগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখনও গাড়ীর প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি। তখন একটি বড়ো কাজ বাকি—টিকিট কাটা। কাউণ্টার-গুলিতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যখন সঠিক কাউণ্টারে পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম যে সেখানে যথেষ্ট ভিড়। 'কিউ'টি অন্ততঃপক্ষে কুড়ি গজ লম্বা হইয়াছে। সকলের পিছনে দাঁড়াইলে যখন পালা আসিবে তখন ট্রেন চলিয়া যাইবে মনে করিয়া সামনের একজনকে টিকিটটা কাটিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু সে এমনভাবে কটমট দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া অস্বীকার করিল যে, হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিয়া ট্রেন-ফেল নির্ঘাত জানিয়া সকলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অতবড় লম্বা কিউ ততক্ষণে পঁচিশ গজে দাঁড়াইয়া গিয়াছে—তাহার পিছনে দাঁড়াইলেও মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে টিকিট কাটিয়া ফেলিলাম—কয়লা কিংবা আটার কিউ হইলে হয়তো বারোটা বাজিয়া যাইত।

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম হইতে গাড়ী ছাড়ে। যখন প্লাটফর্মে পৌঁছিলাম তখনও গাড়ী লাগে নাই—সকলে জিনিসপত্র লইয়া প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করিতেছে। একটু পরেই গাড়ী আসিলে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গাড়ীতে চড়িবার জন্য ছুটিতে লাগিল। চলন্ত গাড়ীতে অনেকে যেভাবে উঠিতে

লাগিল তা' দেখিয়া মনে হইল যে, দুই একজন বুঝি পড়িয়াই যায়। যাহা হউক কেহ সেইরূপ পড়িল না, আমিও দেখাদেখি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু কিসের জন্য চলন্ত গাড়ীতে উঠিতে হয় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উঠিবার পর গাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা ছিল।

ট্রেনে বসিবার পর একে একে অনেক হকার আসিয়া 'চা গরম', 'পটাটো চিপ্‌স্', 'চানাচুর ভাজা', 'বাদাম ভাজা', 'টাটকা রুটি', 'মিঠা কামলে' (মিষ্টি কমলালেবু) প্রভৃতি হাঁকিতে লাগিল। হকার যথেষ্ট দেখিলেও প্ল্যাটফর্মের এই হাঁক একটু নূতন রকম বলিয়া মনে হইল। তখনও মাঝপথের চানাচুর ভাজার 'বাসন্তী', 'ভারতী', 'তৃপ্তি', 'নিউ বাসন্তী', প্রভৃতি নাম শুনি নাই—হাতকাটা তেল, আশ্চর্য মলম, দাদ-হাজার মলম, জংলা পিস্তল প্রভৃতি দাঁতের মাজনের বক্তৃতা শুনি নাই। ট্রেনের হকারদের বক্তৃতা একবার শুনিবার পর মনে হয় যে, বুঝি ঐ জিনিষটি না কিনিলে একটি অমূল্য সম্পদ হারাইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চানাচুর জাতীয় দুই একটি জিনিস ছাড়া আর কিছুই বিক্রি হইতেছে দেখিলাম না।

গাড়ী ছাড়িবার পর সহযাত্রীদের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম। স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো, পরিষ্কার পোষাক পরা, নোংরা পোষাক পরা সব রকমেরই যাত্রী রহিয়াছে। একটি বছর আটেকের ছেলে একা যাইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম—পরে অবশ্য উহারই সমবয়সী কয়েকটি ছেলেকে চানাচুর ও লজেন্স বিক্রয় করিতে দেখিলাম।

আগে এক্সপ্রেস গাড়ীতে যাওয়ায় এই সব জায়গার দিকে দৃষ্টি দিতে পারি নাই—এখন জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দুই পাশে অগুণতি রেললাইন পার হইয়া যখন দুই চারিটা গাছপালা দেখিতে পাইলাম তখন গাড়ী লিলুয়া স্টেশনে আসিয়াছে।

লিলুয়া ও বেলুড় স্টেশনে লোকজন বিশেষ উঠিল না; কিন্তু গাড়ী যখন বালি স্টেশনে আসিল তখন অনেক লোক উঠিতে লাগিল; উত্তরপাড়া স্টেশনেও অনেক লোক উঠিল। বালি স্টেশনে কয়েকজন লোক উঠিয়া বসিবার মতো জায়গা থাকাসত্ত্বেও দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। উত্তরপাড়া স্টেশনে যাত্রী উঠিবার সময় একজন লোক দরজা আটকাইয়া থাকিবার জন্য ঘোর প্রতিবাদ করিলে দুই চারিজন লোকের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়া

গেল। এই বুঝি হাতাহাতি হয় মনে করিয়া আশঙ্কিত হইয়া চুপ করিয়া আছি এমন সময় গাড়ী হিন্দ্ মোটর্স্ স্টেশনে আসিলে তাহারা ও আরও অনেকে নামিয়া গেল—ইহারা কারখানার কর্মী।

হিন্দ্ মোটর্স্ ও কোন্নগরের মাঝখানে দুইদিকেই বড়ো বড়ো মাঠ—দুই চারিটা কারখানা থাকিলেও শ্যামল শ্রী একেবারে নষ্ট হয় নাই—আমার মতো কলিকাতাবাসীর চোখ ইহাতেই যেন জুড়াইয়া গেল। অবশ্য বৈদ্যবাটী স্টেশনের পর হইতে যে বৃক্ষলতার সমারোহ দেখা যায় তাহার সৌন্দর্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।—শ্রীরামপুর স্টেশনেও যথেষ্ট ভিড় হইল, কিন্তু সেওড়াফুলি স্টেশনে আবার গাড়ী অনেকটা খালি হইয়া গেল। এখানে তারকেশ্বরগামী অনেক যাত্রী নামিয়া গেল—রেলপথের যাত্রীর তুলনায় সামান্য হইলেও অনেক লোক বাসে করিয়াও ঐ দিকে যায়।

সেওড়াফুলি স্টেশনে গাড়ীটি মিনিট দশেক দাঁড়াইল। তারকেশ্বর হইতে হাওড়াগামী একটি গাড়ী আসিলে তাহা হইতে অনেক লোক নামিয়া এই গাড়ীতে উঠিল—তাহার পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমাদের কামরাটি বেশ খালিই ছিল, কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যে কাঁচা কলার কাঁদি, বেগুন, পালংশাক, ঢ্যাঁড়শ, মোচা প্রভৃতি নানারকম সব্‌জিতে ভর্তি কয়েকটি বড়ো বড়ো বাজরাতে কামরাটি ভর্তি হইয়া গেল—ঐগুলি ব্যাণ্ডেলে যাইবে শুনিলাম।

মানকুণ্ডু স্টেশনের আগে হইতেই কলাবাগান দেখিতে পাইয়াছিলাম—চন্দননগর স্টেশনে যখন গাড়ী থামিল তখন 'কেলা', 'কেলা', বলিয়া কয়েকজন হিন্দুস্থানী কলা বিক্রয় করিতে লাগিল। চন্দননগরের চাঁপাকলা প্রসিদ্ধ—দরকার না থাকিলেও এক ডজন কিনিয়া খাইতে লাগিলাম।

গাড়ী চন্দননগর ছাড়িবার পরই কয়েকজন লোক উল্টাদিকের দরজার সম্মুখে গিয়া সারবন্দী দাঁড়াইল। প্ল্যাটফর্ম ঐদিকে পড়িবে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম যে, প্ল্যাটফর্ম ওদিকে না পড়িলেও শহরে যাইবার বাস পাইবার জন্য সকলেই উল্টা দিক দিয়া নামিয়া লাইন টপকাইয়া যাইবে। আমি শঙ্কিত হইয়া অন্য কোনো যানবাহন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সাইকেল রিকসাও পাওয়া যায়। চুঁচুড়া স্টেশনে নামিবার

পর অবশ্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম। স্টেশন হইতে বাহির হইতে না হইতেই একদল রিক্সাওয়ালা 'যাবেন বাবু', 'যাবেন বাবু', বলিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

তোমার জীবনের অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

জীবনের বেশীর ভাগ ঘটনাই অতি সাধারণ—সেগুলি মনে রাখিবার যোগ্য নয়। সেগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ। মৌসুমী ফুল যেমন ফুটেই ঝরে যায়, তেমনই সেসব ঘটনা অল্পকাল পরেই আমাদের স্মৃতির পট থেকে মুছে যায়। আবার আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলো অতি তুচ্ছ, কিন্তু সারা জীবনভোর তার স্মৃতি আমাদের মনে জেগে থাকে—বয়স বেড়ে গেলে তার কোনো কোনটা ভুলে গেলেও সেগুলো আমাদের স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করতে থাকে। কিন্তু সব ঘটনার মধ্যে বেশীর ভাগই এত তুচ্ছ যে, সেগুলিকে অবিস্মরণীয় বলা যায় না। অবিস্মরণীয় বলে নির্দেশ করবার মতো ঘটনা আমাদের জীবনে খুব কমই ঘটে। এইসব তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দু-একটাই আমাদের মনে চিরকাল জেগে থাকে।

এমনই একটা তুচ্ছ ঘটনার স্মৃতি আমার মনে জেগে আছে। ঘটনাটির মধ্যে আমার কৃতিত্ব থাকলেও সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তবে তাতে আমরা কয়েকজন একটা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম।

সেবার গুডফ্রাইডের ছুটিতে স্কুল বন্ধ থাকায় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ধীরেন নামে আর একটি বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম। ধীরেনদের একটা বড়ো পুকুর ছিল, সেই পুকুরে মাছ ধরে বিকেলের দিকে পিকনিকের মতো করব এই ছিল আমাদের মতলব।

বেলা দশটা নাগাদ্ চালডাল মশলাটশলা নিয়ে ধীরেনদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পুকুরের দিকে রওনা হলাম। তখন চৈত্রের প্রায় মাঝামাঝি—রোদ বেশ চড়া হওয়ায় দুটো ছাতা চেয়ে নিলাম। তারপর পুকুর ধারে বসে মাছ ধরার জন্য ধ্যান করতে লাগলাম। ধীরেন লোক পাঠিয়ে আগে থেকেই চারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল; তখন শুধু মাছ ধরার অপেক্ষা। আমরা কয়েকজন বেশ দূরে দূরেই পুকুরের প্রায় চারিদিকে বসলাম—সকলেরই

হাতে ছিপ অবশ্য ধীরেন বাদে। সে পাকা শিকারী। আমরা সকলে মিলে যদি কিছু করতে না পারি, তাহলে সে মাছ ধরায় হাত দেবে এই রকম কথা ছিল।

আমরা মাছ তেমন ধরতে না পারলেও তাকে অবশ্য ছিপে হাত দিতে হয়নি। অবশ্য এর মধ্যে অনেকবারই তার উপদেশ মতো কাজ করতে হয়েছে। ফাৎনা একটু নড়লেই ছিপে খ্যাঁচ দেওয়ার কথাই আমরা জানতাম। কিন্তু কখন যে মাছ ঘুরঘুর করে, কখন যে কুরে কুরে খায় বা কখন যে খুব ছোটো মাছে ঠোকরায় তা আমাদের জানা ছিল না। তার কথামতো আমরা কখনও বা নিঃস্পৃহভাবে বসে রইলাম আবার কখনও বা সবেগে খ্যাঁচ দিলাম।

যাই হোক ঘণ্টা দুই শিকারের পর যখন সের পাঁচেক মাছ আমাদের বালতিগত হয়েছে, তখন শিকারে ক্ষান্ত দিয়ে আহারের দিকে মন দেওয়া গেল। একটা সের দেড়েক রুই রেখে বাকি মাছ ধীরেনদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আমরা স্টোভ ধরালাম। চাল আর ডাল দিয়ে খিচুড়ি আর গরম মাছ ভাজা এই ছিল আমাদের খাদ্যতালিকা। ধীরেন মাছ কুটতে বসে গেল। বিনয় নামে আমাদের একজন বন্ধু কলাপাতা কাটতে গেল। আমি তো রান্নার ব্যাপারে একেবারে দিগ্‌গজ—কেবল স্টোভে মাঝে মাঝে পাম্প দিয়ে সক্রিয়তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করলাম।

তখন খিচুড়ি নেমেছে। ধীরেন কড়াতে তেল দিয়ে মাছ ছাড়বার উপক্রম করছে, এমন সময় বিনয় হৈ হৈ করে উঠল। সে কলাপাতা কেটে এনে পুকুর থেকে ধুয়ে একটু দূরে একটু উঁচু জায়গায় কলাপাতাগুলির জল ঝরতে দিয়েছিল। একটা ষাঁড় এসে সেই কলাপাতা ধরে টানাটানি করছিল। বিনয় কলাপাতা কেটে আনায় সেদিকে তারই বেশী দৃষ্টি ছিল। সে তখনই ছুটে গিয়ে ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে কলাপাতাগুলো কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। ষাঁড়টা হঠাৎ রেগে শিং নেড়ে বিনয়কে তাড়া করল। বিনয় ঘাবড়ে গিয়ে কলাপাতা সমেতই আমাদের দিকে পালিয়ে আসতে লাগল—তার পেছনে রেগে-ওঠা ষাঁড়ের ভয়ঙ্কর মূর্তি।

কী যে হত বলা যায় না। ষাঁড়টা আমাদের দু'একজনকে জখম করতে পারত—তার পায়ে লেগে স্টোভটা ওলটালে একটা অগ্নিকাণ্ডও হতে পারত

—হঠাৎ আমাদের ছেলেবেলায় পড়া এক মেম সাহেবের বাঘ-তাড়ানোর গল্প মনে পড়ে গেল। আমি তখনই ষাঁড়ের দিকে গিয়ে ছাতাটা হঠাৎ তার সামনে খুলে দিলাম। আচমকা এই রকম বাধা পাওয়ায় সে পালিয়ে গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পালাবার সময় সে পায়ের ধাক্কায় আমাদের সাধের খিচুড়ির হাঁড়িটা উলটে দিয়ে গেল।

যদি কোটিপতি হতাম

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা একটা হাস্যকর প্রবাদ বটে, কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্তের ছেলে হয়েও কোটিপতি হলে কী করতে পারতাম সে কথা বলা হয়তো ততখানি হাস্যকর হবে না। কোটি টাকা জীবনে কোনো দিনই জুটবে না, তবুও কল্পনার লাগামটা খুলে দিয়ে বিচরণ করলে ক্ষতি নেই।

আদর্শবাদের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে বটে—ত্যাগের আদর্শকে আমি বড়ো বলেই মনে করি। কিন্তু হঠাৎ যদি এক কোটি টাকা পেয়ে যাই, তাহলে তার অর্ধেকটা রামকৃষ্ণ মিশন কি বিশ্বভারতী কি অন্য কোনো জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে দেবার কথা ভাবলেও বাস্তবিক পক্ষে তা করতে পারব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ তো রাখতেই হবে। এখন অল্প পুঁজি সত্ত্বেও দু'চার জায়গায় সামান্য কিছু দিতে পারছি, তখন সব ছেড়ে ছুড়ে টাকার পাহাড়ে বসে থাকতে পারব বলে তো মনে হয় না। তবে কাকে ছেড়ে কাকে দিই এই সমস্যাটাই তখন বড়ো হয়ে উঠবে।

অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে দানের উপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই। যাকে দান করা হয় সাময়িকভাবে তার অভাব একটু কমে বটে কিন্তু তার উপায়ের কোনো পাকা ব্যবস্থা না থাকলে তার অভাব সত্যসত্যই মেটানো যায় না। সেজন্য দানছত্র খোলার চেয়ে একটা কারখানা খোলা অনেক ভালো। আমিও কয়েক লক্ষ টাকা গোটাকতক কুটিরশিল্পে নিয়োগ করব। আমাদের পল্লীর কত শিল্পী উপযুক্ত কাজের অভাবে বেকার হয়ে বসে আছে—তাদের উপযুক্ত মাইনে দিয়ে রেখে বা তাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনে বাজারে সেগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। দু'চার হাজার একর জমিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে চাষ করব। জমি সবটা কিনতেও পারি, নাও পারি। খরচ-খরচা বাদে যা লাভ হবে তার শতকরা একটা নির্দিষ্ট অংশ আমার কমিশন হিসাবে নিয়ে বাকিটা যাদের জমি তাদের মধ্যে দিয়ে দেব। শুনেছি রাশিয়ায় সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান আছে; এদেশেও যদি সে রকম প্রতিষ্ঠান করা না যায় তাহলে উন্নতির আশা কম।

আগেকার দিনে বড়ো লোকেরা দেবতার মন্দির তৈরি করত। দেব-মন্দির করার দিকে আমার আদৌ ঝোঁক বা আগ্রহ নেই—তার চেয়ে যদি একটা-দুটো বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারি তাহলে কাজের কাজ করা হবে। পাড়ার গ্রন্থাগারটার জন্য জমি কিনে বাড়ী করিয়ে দেব। গ্রন্থাগারের নামে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেব—যাতে তার সুদে গ্রন্থাগারের মাসিক খরচটা উঠে আসে। ব্যায়ামাগারটায় কিছু কিছু যন্ত্রপাতি কিনে দেব। পালেদের দীঘিটা সংস্কার করিয়ে একটা সাঁতারের পুকুর করাব। তার পাশে যে বনজঙ্গল আছে সেটা কাটিয়ে একটা পার্কের মতো করিয়ে দেব, তাতে বড়ো বড়ো কয়েকটা খেলার মাঠ থাকবে। হাসপাতালটাতেও একটা ওয়ার্ড খুলে দিতে হবে।

সিনেমা বা থিয়েটারের দিকে আমার ঝোঁক নেই। তবে পাড়ার অর্কেস্ট্রা ক্লাবে একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি কিনে দেব। বিভূতি মাস্টার ক্লাবের জন্য একটা পিয়ানো দরকার বলে চ্যারিটি শোর ব্যবস্থা করছেন শুনেছি, আমার টাকা থাকলে আমিই কিনে দিতে পারি। আমাদের স্কুলেও কয়েক লক্ষ টাকা দেব, যাতে স্কুলের উন্নতি হয়, মাস্টারমশাইরাও একটু ভালো মাইনে পাবেন। তবে ও-পাড়ার কার্তিক পূজোর দলকে এক পয়সাও দেব না—সারা রাত লাউড স্পীকারে গান দিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়, একটু দুচোখ বোজায় কার সাধ্যি।

একটা খবরের কাগজ প্রতিষ্ঠা করব। আজকালকার কাগজগুলো রাজ-নীতির খবরে ভর্তি। আমার কাগজে দেশের শিল্প, বাণিজ্য আর সংস্কৃতির কথাই বেশী করে থাকবে। কোনো রকম দলাদলিতে ঢুকব না, এতে আমার কাগজ দেশের সত্যিকার কাজ করতে পারবে আর একদিন না একদিন জনপ্রিয় হবেই। যে সব জিনিস আমার পছন্দ নয়, সে সব জিনিসের বিজ্ঞাপন নেব না।

অবশ্য সব টাকা এইভাবে নানা কাজে খাটিয়েই যে শেষ করে দেব তা নয়। আমার নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখব। তিনটে বড়ো বড়ো বাড়ি করব—একটা কলকাতায়, একটা দীঘায়, আর একটা কার্সিয়াং কি কালিম্পংয়ে। কলকাতার বাড়িটা অনেক ফ্ল্যাটে ভাগ করে অল্প ভাড়ায় কম মাইনের চাকুরেদের দেব, একটা ফ্ল্যাট নিজের জন্য রাখব। আর দুটো হবে হাওয়া বদলের জায়গা। একটা মোটর অবশ্য না কিনলে নয়, একটা ড্রাইভারও রাখতে হবে। তবে রাতদিন খালি মোটর চড়ে বাত আর ব্লাডপ্রেশার বাড়াবার পাত্র আমি নই—রোজ সকালে আর বিকালে দুমাইল করে হাঁটব, মাঝে মাঝে সাঁতারও কাটব। অন্য খেলাধূলার সময় কি পাব? কোটিপতির সময় বড়ো অল্প!

একটা বড়ো ঘরে শুধু বই-ই থাকবে। ডিকেটটিভ বই আমার প্রিয়। তবে কেবল রহস্যলহরী, রোমাঞ্চ, প্রহেলিকা, পিরামিড বা মোহন সিরিজের বই-ই আমার বই-ঘরে থাকবে না, সৎসাহিত্যও থাকবে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এঁদের সব বই কিনে ফেলব। আর সব লেখকদেরও ভালো বইগুলো কিনব। যে বইগুলো ভালো লাগবে না সেগুলো পাড়ার গ্রন্থাগারে দিয়ে দেব। দেশবিদেশের বড়ো বড়ো লেখক বা নেতাদের সঙ্গে লেখনী-বন্ধুত্ব করতে হবে। অবশ্য সব চিঠি আমি লিখতে পারব না—একজন সহকারী রাখতে হবে।

বক্তৃতা আমি তেমন দিতে পারি না—মঞ্চে দাঁড়িয়ে সামনে অগুণ্তি মাথা দেখে বুক গুরগুর করে, তবে কোটিপতি হলে সকলকে দুচার কথা না বললে কি ভালো দেখাবে। সহকারীকে দিয়ে ভাষণ লিখিয়ে নিয়ে ভালো করে সেটা মুখস্থ করে একেবারে গড় গড় করে আউড়ে যাব। অবশ্য মাঝখানে ভুলে গেলেই মুশকিল! কিন্তু আজকাল যে লোকে লেখা পড়লে শুনতে চায় না। তবে এক কাজ করলে হয়। বক্তৃতাটা বাড়ীতে বসে টেপ রেকর্ডিং করে, পরে সভায় গিয়ে শরীর অসুস্থ বলে রেকর্ড চালিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

অবশ্য এ সবই জল্পনা-কল্পনা। কোটি টাকা দূরে থাকুক, কোটি পয়সাও আমার কাছে একটা স্বপ্ন। সবাই তো আর ঝুনঝুনওয়ালা কোম্পানির ভাগ্য পায় না যে, লোটা-কম্বল নিয়ে এসে দশ বছরে দশটা মিলের মালিক হবে।

পড়াশোনা শেষ করে কোনো গতিকে একটা কেরানিগিরি কি মাস্টারি জোটাতে পারলেই যথেষ্ট—একটা ছোটো-খাটো ব্যবসা করতে পারলে সেইটাই চরম উন্নতি। কোটিপতি হবার বরাত কজন-কার আছে; তবে এও বলি যে, কোটিপতি হলে কী করতাম তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করবার উৎসাহও খুব কম লোকেরই আছে। আর কিছু হোক না হোক কোটিপতি হলে কী করতাম তার জল্পনা-কল্পনাতে আমি পেছপা থাকব না—এই অলস মস্তিষ্ক থেকে হাজার রকম চিন্তা কিলকিল করে বেড়িয়ে আসবে।

রবীন্দ্রনাথ

সংকেত—জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্ম—ঠাকুরবাড়ীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকার—স্বাধীন শিক্ষা—বহুমুখী প্রতিভা—কাব্য কবিতা, গান—উপন্যাস ও ছোট গল্প—বহু প্রকার নাটক—গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও সাংকেতিক নাটক রচনা—বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ—স্বদেশ সেবা—হিন্দু মেলা ও স্বদেশী আন্দোলন—উপাধিত্যাগ—নির্ভীক সত্যভাষণ—বিশ্বভারতী—তাঁহার গুরুদেব আখ্যা—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন—দেহাবসান।

বাঙালীর জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাহার মতো উৎসবপ্রিয় জাতি পৃথিবীতে খুব অল্পই দেখা যায়। তাহার উৎসবের দিনগুলি প্রধানতঃ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু একটি দিন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত না হইয়াও তাহার জাতীয় উৎসবের দিনে পরিণত হইয়াছে—সেই দিনটি পঁচিশে বৈশাখ।

প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ তারিখে বাংলায় এক মহামানবের আবির্ভাব হয়—তাঁহার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার জন্মস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। তাঁহার পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একদিকে যেমন ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তৎকালীন ধনী-সমাজকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই এদেশে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে অগ্রণী হইয়া ভারতপথিক রামমোহনের সাধনাকে সফল করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিকে যেমন ধর্মসাধনায় জীবনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন অপরদিকে তেমনই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে এযুগে পুনরুজ্জীবিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারত-সংস্কৃতিকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করিয়া উভয়ের মিলন সাধন

করিয়াছেন। বিশ্বের উদার পরিসরে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশ্বমানব ও বিশ্ব-সংস্কৃতির মিলন-সাধকরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তিনি যথার্থই বিশ্বকবি। আর ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে তাঁহার দানের সীমা নাই। তাঁহার মধ্য দিয়া ভগবানের আশীর্বাদ বাংলাদেশে নামিয়া আসিয়াছে, ইহাই এদেশের মনীষীদের বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা একটি ঘরকুনো ছেলের কাহিনী। তিনি ছোটো বেলা হইতেই একটু লাজুক-প্রকৃতির ছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর বিরাট পরিসরে তাঁহারা কয়েকটি বালক ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে থাকিতেন—সেইজন্য তাঁহার পক্ষে স্বাধীনচিত্ত হইবার অবকাশ ছিল। অথচ ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতির ধারা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন নাই। পিতা দেবেন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—সেইজন্য স্কুল-পালানো ছেলে হইলেও কৈশোরেই তাঁহার অধ্যয়নের সীমা সুবিস্তৃত ছিল। মাত্র বারো বৎসর বয়সেই তিনি সুললিত ভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। প্রথম কৈশোরের রচিত কুমারসম্ভব ও ম্যাকবেথের অংশবিশেষের অনুবাদ তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার পরিচয় দেয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ধারা যেমন সুদীর্ঘ তেমনই বিচিত্র। তাঁহার কাব্যের মধ্যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সুর লাগিয়াছে—তটপ্লাবিনী নদীর মতোই তাঁহার কাব্যধারা বারবার বাঁক ফিরিতে ফিরিতে নূতন সৌন্দর্য ও অভিনব পলিমৃত্তিকায় বাংলার কাব্যক্ষেত্রে নবতর শস্য উৎপন্ন করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে। তাঁহার কৈশোরের কাব্যে স্বপ্নাবেশই সুপ্রচুর। তাহার পর প্রভাত সঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, মানসী প্রভৃতি কাব্যে হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হইয়াছে। সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতি কাব্যে তাঁহার জীবনানুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ প্রকাশিত হইয়াছে। কল্পনা, নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যে প্রাচীন ভারতের গৌরববোধ ও তাহার ধর্মাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত হইয়াছে। খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি তাঁহার সুগভীর অধ্যাত্মবোধের পরিচয় বহন করে। ইহার পর বলাকা, পূরবী প্রভৃতি কাব্যে জীবনের স্ফূর্তি ব্যক্ত হইয়াছে। শেষ জীবনেও অসংখ্য কবিতায় তাঁহার বিচিত্র জীবনবোধ ও গভীর অনুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে। এত বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ পৃথিবীর আর কোনো কবির রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কেবল

যে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অনবদ্য বলিয়াই বরণীয় তাহা নয়—তাঁহার বিরাট কাব্য-সৃষ্টি শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই কাছে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এমনটি পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই।

কেবল কবিতাই নয়, গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের পর তিনিই সর্বপ্রথম উপন্যাসের মধ্যে নূতন রস সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আধুনিক যুগে টানিয়া আনিয়াছেন। বাংলা ছোটো গল্পের তিনিই প্রথম এবং সার্থকতম স্রষ্টা। তাঁহার নাটকগুলি ভাবের দিক দিয়া অনবদ্য। রাজা, ডাকঘর, রক্তকরবী প্রভৃতি যেসব সাংকেতিক নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন তাহা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সহিত একাসনে স্থান পাইবার যোগ্য। সাহিত্য, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া রচিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সর্বোপরি তিনি গানের রাজা—কীর্তন বা শাক্ত-সঙ্গীতের মতোই কথা ও সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার একটি অমূল্য সম্পদ। তাঁহার আঁকা ছবিগুলি বিশ্বের রসিকগণের কাছে অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। তিনি যে নৃত্যের ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা বাঙালীর হৃদয় জয় করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর বরপুত্র।

কিন্তু মাত্র এইটুকু বলিলেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সব কিছু বলা হইল না। রবীন্দ্রনাথ কেবল সাহিত্য ও শিল্পের সাধনাই করেন নাই—তিনি জীবনের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের একদিকে যেমন শিল্পব্রত, অপর দিকে তেমনই কর্মব্রত। স্বদেশের কল্যাণের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। বাল্যকালে হিন্দুমেলার আয়োজনে তাঁহার স্বদেশসেবার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গের সময় যখন সারা দেশে স্বাদেশিকতার বন্যা বহিয়া গিয়াছিল তখন তাঁহার প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও গান দেশবাসীকে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলেন। রাখীবন্ধন উৎসবের সময় তিনি হিন্দুমুসলমান-নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখী পরাইয়া মিলনের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করিবার পর তাঁহার খ্যাতি বিশ্বময় প্রচারিত হইয়াছিল; ইহার পর বৃটিশ সরকার তাঁহাকে 'স্যার' উপাধি দিয়া নাইটের সম্মানে ভূষিত করেন। কিন্তু পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালা-বাগে ডায়ার নামে জনৈক বৃটিশ সেনাপতি

নিরস্ত্র সমবেত জনগণের উপর নির্বিচারে গুলি চালাইলে তিনি বৃটিশ সরকারের শাসনের প্রতিবাদে সেই উপাধি পরিত্যাগ করেন। দেশের সংকট-মুহূর্তে তিনি বারবার উপদেশ দিয়া দেশবাসীকে সত্যপথের নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার ঋষিজনোচিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণীর জন্য মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

দেশের সুকুমারমতি বালক-বালিকার শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগের সীমা ছিল-না। গুরুদের সাহচর্য লাভ করিয়া ছাত্ররা যাহাতে উপযুক্তভাবে জীবন গঠন করিতে পারে এইজন্য তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমই কালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি বিশ্বভারতী স্থাপন করেন। এই স্থানে পৃথিবীর সকল দেশের সংস্কৃতির মিলনসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।—এই দুই বিদ্যায়তনকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নূতন সুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

পল্লী-উন্নয়নের দিকেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল। রাশিয়ার অনুসরণে তিনি এদেশে সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া কৃষকগণকে মহাজনদের হাত হইতে রক্ষা করাও তাঁহার অন্যতম প্রচেষ্টা। শ্রীনিকেতনে কুটিরশিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই স্বাধীন ভারতের গ্রামোন্নয়ন-পরিকল্পনায় প্রেরণা দান করিয়াছে।

গীতাঞ্জলি-প্রমুখ কাব্য ও শান্তিনিকেতন নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে ভগবৎ-প্রীতি ব্যক্ত হইয়াছে তাহার জন্য তাঁহাকে ঋষি বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ঋষিদের মতোই সত্যের সাধক ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণের সহিত তাঁহার মত মেলে নাই, সেখানেও তিনি সত্যকথা বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমাদের প্রচেষ্টার অনেকটাই যে উচ্ছ্বাসমাত্র—সংগঠনের দিকে যে যোগ দিতে হইবে, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের যে দেশের দিকে দৃষ্টি নাই একথা তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর সেবাব্রত সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হইলেও চরকা কাটিয়া স্বরাজলাভের আদর্শকে তিনি অবাস্তব কল্পনা করিয়াছেন। লোকায়ত মতের বিরুদ্ধে অভিমত দেওয়ায় বহুবার তাঁহাকে

নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল—কিন্তু তিনি উপলব্ধ সত্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ তাঁহার দেহাবসানের পর আমরা তাঁহার সেই সত্যভাষণ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি। তাঁহার বিরাট সাহিত্যসম্ভার তাঁহার মননের পরিচয় দান করে, তাহা অধ্যয়ন করিয়া আমরা সত্যপথের সন্ধান পাইতে পারি বটে, কিন্তু এই পথভ্রান্ত জাতিকে সত্যপথের নির্দেশ দিতে তাঁহার মতো প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। তাঁহার বিপুল বিচিত্র সৃষ্টি এখনও বহুকাল আমাদিগকে আনন্দ ও উৎসাহ দিবে কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্পর্শটুকু আমরা হারাইয়াছি।

শ্রীঅরবিন্দ

সংকেত—জন্ম ও পারিবারিক পরিবেশ—ছাত্রজীবন—বরোদায় কর্মজীবনের আরম্ভ—রাজনৈতিক জীবন—বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ—ন্যাশনাল কলেজে যোগদান—পত্রিকা-সম্পাদন—রাজদ্রোহিতার অভিযোগ—গভীরতর দার্শনিক সাধনা—দিব্যজীবন—জ্ঞানযোগী শ্রীঅরবিন্দ—পণ্ডিচেরী আশ্রম—দেহাবসান।

১৫ই আগস্ট তারিখটি কেবল ভারতের স্বাধীনতা-দিবস বলিয়াই যে স্মরণীয় তাহা নয়, এই তিথিতে ভারতের এক মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেন—তিনি এ যুগের ঋষি, জ্ঞানযোগী শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ ইংলণ্ডে গিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস পাইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার মাতামহ। কৃষ্ণধন ঘোষ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ভক্ত ছিলেন এবং আপনার পুত্রদের পুরাপুরিভাবে ইংরেজী শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। অতি শৈশবেই তিনি পুত্রদের প্রথমে দার্জিলিংয়ের লরেটো বিদ্যালয়ে ইংরেজী কায়দায় শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে পাঠান। ইহার পর, অরবিন্দের বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর, তখন তিনি সপরিবারে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। অরবিন্দ প্রথমে ম্যানচেস্টার শহরে ডুরাট-দম্পতীর নিকট কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন, তাহার পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের সেন্ট পল্‌স্ বিদ্যালয় ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে তাঁহার অতুলনীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শীঘ্রই শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করিয়া প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়ান সিবিল

সার্বিস পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় গ্রীক ভাষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি গুণানুসারে দশম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু অশ্বারোহণ-বিভার পরীক্ষায় যোগদান না করায় তিনি এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য বলিয়া পরিগণিত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কিংস কলেজে প্রবেশ করিয়া কেমব্রিজের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ট্রাইপস লাভ করেন। এইভাবে তাঁহার ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি হয়।

অরবিন্দের কর্মজীবন আরম্ভ হয় বরোদায়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার মহারাজা ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার সহিত অরবিন্দের পরিচয় হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া তিনি বরোদা রাজ্যে প্রথমত রাজস্ব বিভাগে যোগ দেন—পরে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করেন। এখানে তিনি তেরো বৎসর কাল অবস্থান করেন এবং ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদে উন্নীত হন। এইখানেই সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা এবং ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। স্বরাজ, স্বদেশী ও বয়কট—এই তিনটি ছিল তাঁহার আদর্শ। কংগ্রেসের প্রাচীনপন্থী নেতারা তাঁহার আদর্শ প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয় তখন তাঁহার আদর্শ গৃহীত হয়। এই সময় তিনি বরোদার মাসিক সাড়ে সাত শত টাকা মাহিনার চাকুরি ত্যাগ করিয়া বাংলায় আসিয়া ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ মাত্র পঁচাত্তর টাকায় গ্রহণ করেন। এই ন্যাশন্যাল কলেজই কালক্রমে যাদবপুর পলিটেকনিক ও বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ—মোটামুটিভাবে এই আট নয় বৎসর কাল তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তি। প্রথম দিকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি সুবোধচন্দ্র মল্লিকের 'বন্দে মাতরম্' নামক ইংরেজী সংবাপত্রের ভার গ্রহণ করিয়া এই পত্রের মাধ্যমে অগ্নিগর্ভ বাণীতে দেশকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন। এই পত্রিকা তৎকালীন যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়াছিল এবং দুই একটি বিপ্লবীদলকে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সভাপতি নির্বাচন লইয়া চরমপন্থী ও প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে

বিরোধ হওয়ায় সুরাটের কংগ্রেসের অধিবেশন ভাঙিয়া গেলে তিনি বিভিন্ন স্থলে বক্তৃতা দান করিবার পর পরবৎসর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি রাজদ্রোহিতা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ধৃত হন, কিন্তু এক বৎসরের কিছু বেশিকাল বিচারোপলক্ষে কারাবাসের পর নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলায় তাঁহার ও বিপ্লবীদের পক্ষ গ্রহণ করেন।

এইখানেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে। সুরাট হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তিনি বিষ্ণু ভাস্করের নিকট যৌগিক সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাইবার পর তিনি 'কর্মযোগিন্' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করিয়া তাহাতে ভারতের মুক্তি সাধনায় যোগের স্থান সম্পর্কে প্রবন্ধাদি রচনা করেন। এই পত্রিকাটিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের একটি অনবদ্য ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু অল্পদিন পরে এই পত্রিকা উঠিয়া যায়। পুলিশের বিরক্তিকর সংস্পর্শ এড়াইয়া গভীরতর সাধনা করিবার জন্য তিনি প্রথমে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর এবং তাহার পর পণ্ডিচেরিতে গমন করেন। এইখানেই তাঁহার ধ্যানজীবনের সূত্রপাত হয়।

পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ চার বৎসর মৌনযোগে অতিবাহিত করেন, তাহার পর 'আর্য' নামে একটি ইংরেজী দার্শনিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তাহাতে আপনার চিন্তাগুলি পরিবেশন করিতে থাকেন। এই সময় হইতে তাঁহার গুণমুগ্ধ শিষ্যের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং ক্রমে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি আশ্রমের মতো প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। দার্শনিক ও জ্ঞানযোগী হিসাবে তাঁহার নাম অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

ভারতের প্রাচীন ঋষিদের মতোই শ্রীঅরবিন্দ একাধারে কবি ও দার্শনিক। 'উর্বশী', 'দি হিরো অ্যাণ্ড দি নিম্ফ,, 'সাবিত্রী' প্রভৃতি কাব্য তাঁহার ভাবকল্পনা ও শিল্পকর্মে দক্ষতার পরিচয় দেয়। 'এসেজ অন গীতা', 'লাইফ ডিভাইন' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্বের মূল্যবান সম্পদ। মানুষের মধ্যে যে দিব্যশক্তি আছে এবং মানুষ যে তাহার সাধনা বলে একদিন দেবত্ব লাভ করিবে ইহাই তাঁহাব দর্শনের মূল বাণী।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীঅরবিন্দের দেহাবসান হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ কয়েকদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে এবং তাহা হইতে জ্যোতি নির্গত হইতে থাকে। যোগসাধনায় তিনি কীভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্য গভীর রহস্যে আবৃত। তাঁহার জীবৎকালে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি বিশ্বগত সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠাগার বা পাঠমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। তবে তাঁহার দুরবগাহ দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাঁহার স্বদেশবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে স্বদেশীযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতারূপেই দেখেন এবং তিনি রাজনৈতিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে ভারতের স্বাধীনতা বহুপূর্বে লাভ করা যাইত বলিয়া মনে করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সংকেত—ভূমিকা—বঙ্গভূমি বহু বীর সন্তানের জননী—সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন—স্বদেশপ্রেম, মর্যাদাবোধ ও তেজস্বিতা—কর্মজীবন—দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র—অসহযোগ আন্দোলন—বাংলা ও ভারতের নেতৃত্ব—মতবিরোধ—ফরোয়ার্ড ব্লক—মহাযুদ্ধ—আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী—উপসংহার।

বাংলা দেশে একদিকে যেমন মনীষী ও সাধকবৃন্দ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন,তেমনই এদেশে বীরেরও অসদ্ভাব হয় নাই। বঙ্গজননী বীরপ্রসূতিও বটেন। রামপাল, ভীম, চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি অসংখ্য বীর এদেশে শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাদের শৌর্য-বীর্যের উত্তরাধিকার লইয়া আর এক বীর এ যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি দেশগৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—যিনি নেতাজী এই নামে কেবল বাঙালীর নয়, সারা ভারতবাসীর হৃদয়ে অম্লান গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

২৩শে জানুয়ারী ভারতবাসীর পক্ষে একটি গৌরবের দিন—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এই তারিখটিতে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান কটক—পিতা জানকীনাথ বসু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষায় মুগ্ধ। সুভাষচন্দ্র প্রথমে স্থানীয় ইউরোপীয় বিদ্যালয়ে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্রদের সহিত অধ্যয়ন করিবার জন্য

প্রেরিত হন ও তাহার পর র‍্যাভনশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয় হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি একবার অধ্যাত্মসাধনার পথে অগ্রসর হইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন —কিন্তু ভারতবাসীর সৌভাগ্যবশত পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু জনৈক ইউরোপীয় অধ্যাপক ভারতীয়দের সম্পর্কে নিন্দাসূচক উক্তি করায় ছাত্রদলের নিকট অপমানিত হইলে বিদ্রোহী ছাত্রদের নেতা বলিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বহিষ্কৃত হন—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় ফলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন নাই। ইহার পর স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হইয়া তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি ইংলণ্ডে গিয়া ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিয়া চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষার সময় কোনো একটি প্রশ্নপত্রে ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি অসম্মানসূচক উক্তি থাকায় তিনি তাহার প্রবল প্রতিবাদ করেন। দেশের প্রতি অনুরাগ প্রবল হইয়া উঠায় তৎকালীন অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সুভাষচন্দ্র বৃটিশ সরকারের অধীনে চাকুরি করিতে অস্বীকৃত হইয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি কেমব্রিজে দর্শনে ট্রাইপস-সহ উপাধিও লাভ করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পর্কে নির্দেশ গ্রহণ করিবার জন্য গান্ধীজীর নিকট গমন করেন। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন ও চরকার সাহায্যে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ তাঁহার চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহাকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া গান্ধীজী তাঁহাকে বাংলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে প্রেরণ করেন। দেশবন্ধুর আবেগদীপ্ত দেশপ্রেম তাঁহাকে মুগ্ধ করে এবং দেশবন্ধু ইহার পর যে কয় বৎসর জীবিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ করেন। দেশবন্ধু যখন কলিকাতা পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হন, তখন তিনি ইহার প্রধান কর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে উত্তরবঙ্গে যে প্রবল বন্যা হয় তাহাতে তিনি তিনমাস কাল অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া দেশবাসীর সেবা

করিয়া সকলের হৃদয় জয় করেন। তাঁহার অসাধারণ জনপ্রিয়তা বৃটিশ সরকারের যথেষ্ট ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী গান্ধীজীর সহিত তাঁহার মতের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। গান্ধীজীর স্বরাজ লাভের আদর্শকে অস্বীকার করিয়া তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতা লাভকে লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈপ্লবিক চিন্তাধারা থাকা সত্ত্বেও জওহরলাল নেহরু গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মতবাদকে দুর্বল বলিয়া তাহার বিরোধিতা করেন। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনই একমাত্র পথ বলিয়া তিনি নির্দেশ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া তিনি ইউরোপের আসন্ন মহাসমরের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার কথা বলেন। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে আধুনিক জগতের উপযোগী করিবার পরিকল্পনাও তিনি এই সময়ে করেন। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও পর বৎসর তিনি তাঁহার জনপ্রিয়তার জন্য পুনরায় সভাপতির পদে নির্বাচিত হন কিন্তু গান্ধীপন্থী নেতারা তাঁহার সহিত সহযোগিতা না করায় পদত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক নামে একটি স্বতন্ত্র দল গড়িয়া তোলেন। অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ তাঁহার এই যুগের আন্দোলনের ফল।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই বৃটিশ সরকার তাঁহাকে বন্দী করে। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তিনি স্বগৃহেই আবদ্ধ থাকেন। বৃটিশ পুলিশ ও গুপ্তচরদের দৃষ্টি এড়াইয়া তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পাঠানের ছদ্মবেশে কাবুল যাত্রা করেন, তাহার পর জার্মান সরকারের সহায়তায় তিনি জার্মানি যাত্রা করেন। জার্মানিতে তিনি ভারতের মুক্তি সাধনের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করিবার প্রস্তাব করিলে হিটলার তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহার পর তিনি জাপানে গিয়া রাসবিহারী ঘোষের সহায়তা লাভ করেন। জাপানের আক্রমণে সিঙ্গাপুরের পতন হইলে যেসব ভারতীয় সৈন্যদের ফেলিয়া বৃটিশ বাহিনী পলায়ন করিয়াছিল তাহাদের লইয়া তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং তাহাদের সহায়তা লাভ করিয়া ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়েই তিনি নেতাজী আখ্যায় ভূষিত হন। —তাঁহার সৈন্যবাহিনী মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চল ভেদ করিয়া ভারতে পদার্পণ

করে। কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্র ও খাদ্যের অভাবে তাঁহাকে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। ইতিমধ্যে জার্মানি ও জাপান পরাজিত হইলে আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে সুভাষচন্দ্র একটি জাপানী বিমানপোতে সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করেন। ১৮ই আগস্ট তারিখে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করা হয়।

কিন্তু ভারতের জনগণ ঐ সংবাদ বিশ্বাস করে না। এই বিমান দুর্ঘটনার কাহিনীটি তাহাদের নিকট একটি রহস্যজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, নেতাজী জীবিত আছেন এবং স্বাধীনতা লাভ করিলেও ভারতে যে দুঃখ-দুর্দশার সীমা নাই তাহা দূর করিবার জন্য নেতাজী একদিন নিশ্চয়ই আসিবেন। প্রতি বৎসর ২৩শে জানুয়ারি তারিখে ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া বাঙালী এই বরেণ্য বীরকে অন্তর হইতে আহ্বান জানায়। অনেকে আবার বিশ্বাস করেন যে, ভারতোদ্ধার ব্রত পালন করিবার পর নেতাজী অধ্যাত্মসাধনার পথে যাত্রা করিয়াছেন। ভারতের অগণিত জনগণের এই বিশ্বাস প্রিয় নেতার প্রতি তাহাদের অপরিসীম ভালবাসারই নিদর্শন।

—জয়তু নেতাজী!

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সংকেত—ভূমিকা—চিরকুমার জ্ঞানতপস্বী—ছাত্রজীবন—কর্মজীবন—নিজে কেবল বিজ্ঞানচর্চা করেন নাই, নিজের চারিধারে ছাত্রগণকে বিজ্ঞান অনুশীলনে ব্রতী করিয়াছিলেন—বাঙালীর কল্যাণকামী বন্ধু—বেঙ্গল কেমিকেল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—উত্তরবঙ্গের বন্যা ও আর্তত্রাণ ব্রত।

প্রফুল্লচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, তাকে কেবলমাত্র জ্ঞান দেন নাই—নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকে পেয়েছে। বস্তু-জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে প্রকাশিত করে বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার

চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন কত যুবকের মনোলোকে, ব্যক্ত করেছেন তার গুহান্বিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান্ করতে পারেন, এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।"

এই সর্বত্যাগী বৈজ্ঞানিক, যিনি চিরকুমার থাকিয়া ছাত্রদের কল্যাণের জন্য ও দেশের উন্নতির জন্য আত্ম-দান করিয়াছিলেন, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে খুলনা জেলার কায়স্থকুলের প্রখ্যাত রায় পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়—এই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথও আবির্ভূত হন। ছাত্র-জীবনে প্রফুল্লচন্দ্রের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষত বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত রুগ্ন থাকায় তাঁহার পাঠচর্চায় প্রায়ই বিঘ্ন হইত। তাহা সত্ত্বেও তিনি যখন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে দুষ্প্রাপ্য গিলখ্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন তখন অনেকেই বিস্ময়বোধ করেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি ডী. এস্-সী উপাধি লাভ করেন। এডিনবরার রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধাদি বিজ্ঞানসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। বহুপূর্বকাল হইতেই তিনি রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন তাঁহার গবেষণা পূর্ণোদ্যমে চলে। গন্ধক দ্রাবকের সহিত বিভিন্ন ধাতুর রাসায়নিক সংযোগে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই সময় তিনি ঘৃত, মাখন, চর্বি প্রভৃতি তৈল জাতীয় পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের স্বরূপ নির্ণয় করেন।—তিনি যে কেবল নিজেই বিজ্ঞান লইয়া গবেষণা করিতেন তাহা নয়, এদেশে যাহাতে বিজ্ঞানচর্চা ছড়াইয়া পড়ে এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে যাহাতে এদেশও পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মতো উন্নতি লাভ করে তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি ছিল। তিনি এ দেশে একদল বিজ্ঞানসাধক সৃষ্টির দুষ্কর কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রীতি সঞ্চারের চেষ্টা করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ নিয়োগী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন নিয়োগী, নীলরতন ধর, বিমান বিহারী দে, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বীরেশচন্দ্র গুহ, হেমেন্দ্রকুমার সেন প্রভৃতি বিজ্ঞানচর্চায়

বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার মুখ উজ্জল করিয়াছেন।—১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার পালিত অধ্যাপকরূপে (Palit Professor) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্বদেশের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরাগ ছিল অসাধারণ। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে রসায়নের যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আয়ুর্বেদ, চরক, সুশ্রুত. বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর. চক্রপাণি প্রভৃতির গ্রন্থাদি মন্থন করিয়া তিনি প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ন সাধনার বিবরণ সংগ্রহ করেন। 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' তাঁহার সেই সাধনার ফল।—এককালে রসায়নে বিশেষ দক্ষতা সত্ত্বেও ভারতবাসীকে রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য পাশ্চাত্ত্যের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়—এই ঘটনাটি তাঁহাকে পীড়া দিয়াছিল। মাত্র সামান্য মূলধন লইয়া তিনি মানিকতলায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস নামে একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি সমৃদ্ধি লাভ করিয়া অন্যান্য রাসায়নিক প্রতিষ্ঠাস্থাপনে প্রেরণা দান করিয়াছে।—ইহা ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। স্বদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে উন্নতিলাভ করে সেজন্য তাঁহার চেষ্টার সীমা ছিল না।

প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ তাঁহাকে কেবলমাত্র বিজ্ঞানচর্চায় বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাঁহার জীবনকে সীমাবদ্ধ থাকিতে দেয় নাই। জনসেবার আদর্শরূপেও তিনি সর্বজনের শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের বন্যা বা খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দুর্গতদের সেবা করিবার জন্য নিজে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রদের লইয়া তিনি যেভাবে সাহায্য বিতরণ করেন, তাহাতে দুর্গতদের দুঃখ অচিরেই দূর হইয়া যায়।

বাঙালীর জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। বাঙালীর জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত না হইলেও তাহার চাল যে বাড়িয়া যাইতেছে—ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আহারে বিহারে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণের তিনি বিরোধী ছিলেন। চা, কেক, বিস্কুট প্রভৃতি জলপান যে নিতান্তই শৌখিন এবং খাদ্যমূল্যের দিক দিয়া চিড়া, মুড়ি, নারিকেল, গুড় প্রভৃতির মূল্য যে খুব বেশি ইহা তিনি বারবার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নামে অযথা বিলাসিতার বিরোধী ছিলেন। একাধিক

প্রবন্ধে তিনি বাঙালী সমাজকে কর্মশীল এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ে অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন। বর্তমানে বাংলা দেশে অবাঙালীরা অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং কাজ যে একচেটিয়া করিয়া লইতেছে দেখিয়া তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র চাকুরির দিকে না তাকাইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে মনোনিবেশ করিতে তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালী যুবকবৃন্দকে উপদেশ দেন—বাস্তবিক পক্ষে এই পথেই বাংলার বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে এই জ্ঞানতপস্বী, স্বদেশানুরাগী, ছাত্রপ্রেমিক কর্মব্রতীর জীবনাবসান হয়।

রাণী ভবানী

সংকেত—ভূমিকা—দরিদ্র গৃহে জন্ম—পরবর্তীকালে অর্ধবঙ্গেশ্বরী—নিজে সন্ন্যাসিনী থাকিয়া বিশাল জমিদারীর আয় নানা কল্যাণ কর্মে দান—রাণী ভবানীর দান ও পুণ্য কর্মের বিবরণ—বৈষয়িক ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারেও মনোযোগী—সিরাজউদ্দৌলা ও রাণী ভবানী—রাণীর জনপ্রিয়তা—উপসংহার।

ভারতমহিলা চিরদিনই ধর্মশীলতার জন্য বিখ্যাত। ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ জাতি। বিশেষ করিয়া এদেশের রমণীবৃন্দ ধর্মব্রত উদ্‌যাপনে চিরদিনই অগ্রণী। গৃহের প্রতিটি কল্যাণকর্মেও যেমন, দানব্রত ও পুণ্যকর্মেও তেমনই ভারতের নারী যুগ যুগ ধরিয়া আত্মদান করিয়া আসিতেছেন। নারীর কল্যাণী মূর্তির কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ তাঁহাদের পূজার্হা এবং গৃহের দীপ্তিস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে ভারতের মহিলাবৃন্দ দান ও সেবাকার্যে যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক বা বর্তমান যুগেও এমন অনেক নারীর পরিচয় আমরা পাই যাঁহারা কল্যাণকর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন। এই পুণ্যশ্লোকা মহিলাদের মধ্যে রাণী ভবানীর নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতে হয়।

ভবানী পরে রাণী হইলেও দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী, মাতা কস্তুরী দেবী—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া নাটোরের রাজা রামজীবন কনিষ্ঠ পুত্র রামকান্তের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ঘরে আনেন।

নাটোরের রাজবংশ বাংলার একটি প্রখ্যাত বংশ—রঘুনন্দন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথমে পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের উকিলরূপে বাংলার তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে থাকিতেন। সেখানে তিনি আপনার প্রখর বুদ্ধিবলে নায়েব কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন এবং নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন হন। এই সময়ে তিনি ভ্রাতা রামজীবনের নামে প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। রামজীবনের দুই পুত্র, কালিকাপ্রসাদ ও রামকান্ত। কালিকা-প্রসাদ অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করিলে রামকান্ত বিষয় লাভ করেন। কিন্তু তিনিও ১১৫৩ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগ করেন—ভবানীর বয়স তখন মাত্র বত্রিশ বৎসর। এই সময় নাটোরের জমিদারির আয় ছিল বার্ষিক প্রায় দেড় কোটি টাকা। রাণী ভবানী কর্মচারীদের সহায়তা লইয়া নিজের এই জমিদারির শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

রাণী ভবানীর মতো দানবতী মহিলা অতি অল্পই আছেন। জমিদারির বিপুল আয়ের মধ্যে সত্তর লক্ষ টাকা নবাব সরকারে প্রেরণ করিয়া তিনি অবশিষ্ট সমস্ত অর্থই ধর্মকার্যে ও সাধারণের মঙ্গলকর্মে ব্যয় করিতেন। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়াও তিনি নিজে কঠোর ব্রতাচরণ করিয়া সন্ন্যাসিনীর মতো থাকিতেন।

রাণী ভবানী যে কত পুণ্যকর্ম ও জনহিতকর কার্য করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। বারাণসীতে তিনি ভবানীশ্বর নামক শিবমূর্তি স্থাপন করেন—বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ি ও দুর্গাকুণ্ডও তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গা-কুণ্ডের অদূরে কুরুক্ষেত্র তলাও যে জলাশয় আছে, এটিও তিনি খনন করান। ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য বিভিন্ন ছত্র, ভাস্কর পুষ্করতীর্থে পুষ্করিণী খনন, পিশাচ-মোচন তীর্থে পুষ্করিণী খনন, আদি কেশবের ঘাট, মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণ, পঞ্চকোশীর পথ নির্মাণ ও তাহার পাশে পাশে স্থানে স্থানে ধর্মশালা স্থাপন প্রভৃতি অসংখ্য কার্য তাঁহার কীর্তি। তিনি অনেক সময় বর্তমান আজিমগঞ্জের নিকটবর্তী বড়নগর নামক স্থানে বাস করিতেন। এইস্থানে অনেকগুলি ছোটো ছোটো মন্দির আছে। এখানে ভবানীশ্বর শিবমন্দির, রাজরাজেশ্বরী মূর্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি ইহাকে দ্বিতীয় কাশীধাম করিয়া তোলেন।—তাঁহার কন্যা তারাও এই স্থানে গোপালমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

রাণী ভবানী যে কেবল দেবসেবার ব্যবস্থা বা মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন তাহা নয়। তিনি বহু দরিদ্র ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিষ্কর জমির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণ দুঃস্থ মানুষের জন্যও তাঁহার সমবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি কবিরাজ বা হাকিম নিযুক্ত করিয়া দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি পশুপক্ষীদের আহারাদির জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় যখন বাংলাদেশের দুর্গতির সীমা ছিল না তখন তিনি মুক্ত হস্তে দান করিয়া দুঃস্থদের সেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার অপরিসীম করুণার জন্য অগণিত নরনারী তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিত। তিনি যে অর্থ ভূমিদান বা পুণ্যকার্যে ব্যয় করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ পঞ্চাশ কোটি টাকার কম হইবে না। তাঁহার দানশীলতা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য তাঁহাকে অনেকে বাংলাদেশের অহল্যাবাঈ বলিয়া থাকেন।

রাণী ভবানী অহল্যাবাঈয়ের মতোই একদিকে যেমন ধর্মনিষ্ঠা ও দানশীলতায় সর্বজনশ্রদ্ধেয়া ছিলেন অপর দিকে তেমনই বৈষয়িক কার্য পরিচালনার দিকেও তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাহার শাসনগুণে সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার অধিকারে কোনোরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার স্বদেশপ্রেমও ছিল অসাধারণ। কথিত আছে যে, মীরজাফর, রাজবল্লভ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যখন সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরেজদের আহ্বান করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা রাণী ভবানীকে আহ্বান করিলে তিনি তাঁহাদের আচরণের জন্য নিন্দা করেন। তাঁহার শাসনে প্রজাগণ এতদূর সন্তুষ্ট ছিল যে, হেষ্টিংস যখন তাঁহার জমিদারির কিছু অংশ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া কান্তবাবুকে প্রদান করেন, তখন প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া নূতন ভূস্বামীকে কর দান করিতে অস্বীকার করে।

রাণী ভবানীর পুত্রসন্তান ছিল না। যশোহর জেলার খাজুরা গ্রামের রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত তাঁহার কন্যা তারার বিবাহ হয়। কিন্তু অল্পবয়সেই বিধবা হইয়া তারা মাতার সহিত থাকিয়া তাঁহার ধর্মসাধনার সঙ্গিনী হন। ভবানী যে লোকটিকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন তিনিই সাধক মহারাজ রামকৃষ্ণ। তিনি মাতার জীবৎকালেই লোকান্তরিত হন। উনআশি বৎসর বয়সে বড়নগর গ্রামে রাণী ভবানী পরলোকগমন করেন।

তোমার প্রিয় গ্রন্থ

যখন খুবই ছোটো ছিলাম, তখন হইতেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়া আরম্ভ করিয়াছি। এ পর্যন্ত বইখানি কতবার পড়িলাম, তবুও তাহা পুরানো হইল না —যতবার পড়ি ততবারই যেন সব নূতন বলিয়া মনে হয়। সেই ত্রেতা-যুগের কাহিনী এখনও আমার চোখের সমুখে যেন সত্য ঘটনার মতো ভাসিতে থাকে—রামায়ণের ছবি আমার স্মৃতিপথ হইতে কোনো দিন মুছিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণ আমার চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছে।

বাল্মীকির রামায়ণের গদ্যানুবাদ পড়িয়াছি। কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রতি ছত্রে ছত্রে যে লালিত্য আছে বাল্মীকির রামায়ণে তাহা নাই। মহাকবির রচনায় ভাবসম্পদ বা সৌন্দর্যের অভাব নাই—কিন্তু বাঙালী কবি যেন বাংলার নিজস্ব সরসতা দিয়া কাব্যখানিকে সিক্ত করিয়াছেন। অতীত যুগের বীরত্ব কাহিনী কবির অনুপম বর্ণনাকৌশলে বাঙালীর ঘরের কথায় পরিণত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে রামের পরিচয় আমরা পাই, সে রামের মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণের বীর্য বা ধর্মব্রতের পরিচয় পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠের দীপ্ত মূর্তির পরিবর্তে নবদূর্বাদলশ্যাম এক কিশোরের ছবিই সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন করিয়াছেন, অসংখ্য রাক্ষস বধ করিয়া বীর্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার ত্যাগব্রত ও ধর্মাচরণ অতুলনীয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি দশরথের নয়নের পুতলি, সীতা হরণের পর বা সীতা বিসর্জনের পর তিনি কাঁদিয়া ভাসাইয়াছেন, তিনি ভক্তবৎসল—বীরবাহু, তরণীসেন বা রাবণের স্তব শুনিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া যায়। এমনকি বৈষ্ণব বাঙালীর কল্পনা তাঁহার হাত হইতে ধনুর্বাণ কাড়িয়া লইয়া একবার বাঁশি পর্যন্ত দিয়াছে।

সীতাও বাঙালী ঘরের বধূ—রাজার নন্দিনী হইয়াও তিনি চিরদুঃখিনী। তাঁহার স্নেহময়ী কোমলা মূর্তি আমাদের চোখের সমুখে যেন ভাসিতে থাকে। বিবাহের পরেই তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া বনে যাইতে হইল; সেখানে যদিও বা ঘর বাঁধিয়াছিলেন, রাবণ তাহা ভাঙিয়া দিয়া গেল; লঙ্কায় অশোক বনে তাঁহার উপর উৎপীড়নের সীমা ছিল না; রাবণ বধের পর তাঁহাকে

স্বামীর বিরূপ বাক্য সহ্য করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে হইয়াছে; অযোধ্যায় ফিরিয়া কিছুদিন পরে বনবাস; রামের সহিত লবকুশের মিলন হইল, কিন্তু সীতার ভাগ্যে পাতাল প্রবেশ। এই চিরদুঃখিনীর বিষাদকাতর মূর্তি বাঙালীর হৃদয় কাড়িয়া লইয়াছে।

দশরথের পুত্রবাৎসল্য আমাদের অতি পরিচিত বিষয়। রামের জন্য তাঁহার উদ্বেগ ও কাতরতার চিহ্ন সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামের বনবাসের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি যেভাবে শোকার্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তাহার দৃশ্য আমাদের অন্তরকে ব্যথিত করে। কৌশল্যা ও সুমিত্রার স্নেহবৎসলতা, কৈকেয়ীর দৃঢ়তা, মন্থরার কুটিলতা—প্রতিটি বিষয়ই কবির বর্ণনায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃবাৎসল্য ও তেজস্বিতা আমাদের মুগ্ধ করে। ভরত ও শত্রুঘ্ন এই দুই চরিত্রকেও কবি সুন্দর করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন; বিশেষ করিয়া ভরত চরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

কেবল মানবচরিত্র নয়, কবির অপরূপ বর্ণনা কৌশলে বানর ও রাক্ষস চরিত্রগুলিও মানবতার গৌরব লাভ করিয়াছে। বীভৎস রস বা কৌতুকরস সৃষ্টি করিবার জন্য কবি অবশ্য মাঝে মাঝে তাহাদের প্রকৃতির কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু তাহারা মানুষের, বিশেষ করিয়া বাঙালীর পরিচয় লইয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বালী, সুগ্রীব বা হনুমানকে আমাদের মহামল্ল বলিয়া মনে হয় না—তাহাদের বীরত্বের অতিরঞ্জিত বর্ণনার চেয়ে তাহাদের জীবনের ছোটখাট বিষয়গুলিই আমাদের নিকট অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কৃত্তিবাসের রাবণ বাংলার এক পরাক্রান্ত জমিদারের বেশি কিছু নয়—রাণী মন্দোদরীও জমিদার গৃহিণীরূপেই চিত্রিত হইয়াছেন।

এই কাব্যটিতে যে বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমাদের মন মুগ্ধ না হইয়া যায় না। আদিকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত সমগ্র কাব্যখানিই আমার ভালো লাগে। তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া সুন্দরকাণ্ডে ও লঙ্কাকাণ্ডে যে অভিনব বিষয়ের সমাবেশ করা হইয়াছে তাহা নিরতিশয় কৌতূহলজনক। যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা কম—স্বয়ং কবিরও যে অভিজ্ঞতা ছিল তাহা মনে হয় না; কিন্তু রাম-সৈন্য ও রাক্ষস-সৈন্যের যুদ্ধের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন তাহা আমাদের কাছে রুচিকর বলিয়াই মনে হয়।

কৃত্তিবাসের বর্ণনা অতি সরল ও সুন্দর। বড়ো বড়ো ঘটনা তিনি অতিশয় স্বচ্ছন্দে সাবলীলভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোনো কোনো বিষয় বর্ণনাতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতায় পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের বিভিন্ন অংশে সীতার খেদোক্তি তিনি যেভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা যথার্থই হৃদয়গ্রাহী।

রামায়ণের কাহিনী ভারতবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছে। হিন্দীভাষীদের কাছে তুলসীদাসের রামায়ণ যেমন, বাঙালীর কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণও তেমনই অতি প্রিয়, ইহার কাহিনী বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত। এই গ্রন্থটি পড়িবার পর হইতে অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছি—কোনো কোনো গ্রন্থ সাহিত্য বিচারের দিক হইতে হয়তো ইহার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের রচনা হইবে; কিন্তু এই কাব্যের মধ্যে এমন একটা সহজ সৌন্দর্য ও মাদকতা আছে যে, এই কাব্যটি পড়িতে বসিলেই মন যেন কল্পনার একটি স্বর্গলোকে ছুটিয়া যায়। আর কোনো গ্রন্থ এমন করিয়া হৃদয়কে নাড়া দেয় না।

ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা

সংকেত—অতীত যুগের তথ্য—মানবজীবনের অতীতের প্রভাব—অতীতকে জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন—ইতিহাস জাতির জীবনে পথ নির্দেশ করে—জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের আশ্রয়স্থল অতীতের দিকে চাহিয়া বলিয়াছেন,

স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত জীবনের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।

যাহা অতীত, যাহাকে আমরা ইতিহাস বলি, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। যাহা অতীত ছিল তাহাই বর্তমানের মধ্যে লীন হইয়া আছে। বর্তমানের মূলে সুদূর অতীতের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।—

হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে কথা কও, কথা কও।

আমাদের এই বর্তমান জীবনকে ভালোভাবে বুঝিবার জন্য অতীতকে জানা প্রয়োজন—ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা আমাদের পূর্বযুগের বৃত্তান্ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। মানুষের সভ্যতা একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। কোনো এক যুগে মানুষ যাহা লাভ করিয়াছে, তাহা তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়া যায় নাই—তাহা সে পরবর্তী যুগের জন্য দান করিয়া গিয়াছে। পূর্বযুগে লব্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিয়াছে বলিয়াই মানুষ এত বড়ো হইতে পারিয়াছে—নতুবা সে আজও আদিম যুগেই থাকিয়া যাইত। ইতিহাস মানুষের সেই পূর্বযুগকে ধারণ করিয়া তাহার কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

ইতিহাস পাঠ করিয়া মানুষ আপনার গৌরবের কথা জানিতে পারে। অতীত যুগে কোন্ কোন্ জাতি যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা সে ইতিহাস হইতে জানিতে পারে। যে জাতি কালে সমৃদ্ধি হারাইয়া দুর্গতি-গ্রস্ত হইয়া পড়ে, সেই জাতি আপনার অতীত গৌরবের ইতিহাস পাঠ করিয়া পুনরায় নবতর গৌরবের জন্য উৎসাহ পোষণ করিতে পারে। ইতিহাসে মানবশক্তির বিচিত্র প্রকাশের যে বৃত্তান্ত আছে তাহা মানুষকে গৌরবজনক কর্মসাধনে উৎসাহিত করিতে পারে।

ইতিহাস মানবজাতির অন্যতম শিক্ষকও বটে। অতীত যুগের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা কোন্ যুগে কোন্ সমৃদ্ধ জাতির কী কী কারণে পতন ঘটিয়াছিল তাহা জানিয়া সতর্ক হইতে পারি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবনের রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস বা স্যার যদুনাথ সরকারের মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস এইভাবে আমাদের শিক্ষাদান করিতে পারে। ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা অতীতযুগের কোনো সমস্যার সমাধান যে ভাবে হইয়াছে তাহা জানিয়া লইয়া বর্তমান কালে অনুরূপ সমস্যা সমাধানের উপায়ও করিতে পারি। কোন্ পথে গেলে সমৃদ্ধি এবং কোন্ পথে গেলে সর্বনাশ, ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষা দান করে।

জনৈক প্রাচীন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে, ইতিহাস জরার কুঞ্চন বা শুভ্র কেশ ব্যতীতই যুবককে বৃদ্ধের জ্ঞান দান করে। ইতিহাসের মধ্যে যে যুগ-যুগের জ্ঞান সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহার সহিত পরিচয়ের ফলে যুবকও অশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া বৃদ্ধের মতো অভিজ্ঞ হইয়া উঠে। বাস্তবিকপক্ষে

ইতিহাস ব্যবহারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারস্বরূপ। ইহার মধ্যে পূর্বপুরুষগণের জ্ঞান সঞ্চিত হইয়া থাকে বলিয়াই মানুষ তাহা লাভ করিয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।

ইতিহাস পাঠ করিলে আমাদের জ্ঞানদৃষ্টি একদিকে যেমন প্রসারিত হয়, অন্যদিকে তেমনই গভীরতা লাভ করে। অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমাদের বোধশক্তি স্বচ্ছ ও গভীর হইয়া উঠে। বিশেষত এই গণতন্ত্রের যুগে প্রত্যেকেরই যখন রাষ্ট্রপরিচালনায় কিছু কিছু অধিকার আছে, তখন ইতিহাস পাঠ করিয়া ব্যব্যহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ বিশেষ মতবাদ গঠন বা সমর্থন প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্যও বটে। ইতিহাস পাঠ করিয়া অতীত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা যেমন বর্তমান সম্পর্কে সচেতন হইতে পারি, সেইরূপ বর্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কিছুটা আভাস পাইতে পারি। ইতিহাস-পাঠ জাতির ভাবী জীবন নিয়ন্ত্রণের সহায়ক এবং ইতিহাসের সতর্ক পাঠককে একজন যোগ্য নাগরিক করিয়া তুলিবার উপযুক্ত শিক্ষকও বটে।

ছাত্রজীবন হইতেই ইতিহাস-পাঠ কর্তব্য। ইতিহাসের মতো বিপুল বিস্তৃত বিষয় আর নাই—ইহার মধ্যে যতই অবগাহন করা যাইবে, ততই নূতন নূতন রত্নলাভ করা যাইবে। প্রথম হইতে ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানলাভ না করিলে পরে এ বিষয়ে ঔদাসীন্য আসিতে পারে এমন নয়, কিন্তু এই বিস্তৃত বিষয় অধ্যয়ন করিতে যত অধিক সময় নিয়োগ করা যায় ততই ভালো। আমাদের দেশের প্রাচীন কবিও বলিয়াছেন যে, বেদপ্রমুখ শাস্ত্র প্রভুর মতো উপদেশ দেয় কিন্তু ইতিহাস বন্ধুর মতো উপদেশ দান করে। যে জ্ঞান দুর্লভ, ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা তাহা অতি অল্প আয়াসেই লাভ করিতে পারি।

উপন্যাস-পাঠ

সংকেত—গল্প শুনিবার আগ্রহ—কিশোর পাঠ্য উপন্যাস—কেবল গল্প নয়, উপন্যাসেও আমরা জীবনের চিত্র পাই, জীবন সম্পর্কে নূতন অভিজ্ঞতা জন্মে—মানব চরিত্রের জ্ঞান লাভ করা যায়—ঐতিহাসিক উপন্যাস—শিল্পবোধ ও রুচিজ্ঞান জন্মে—সদ্‌গ্রন্থ পাঠের সুফল।

গল্পশোনার ঝোঁক মানুষ মাত্রেরই আছে। ভালো একটি উপন্যাস পাইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহা লইয়া বসিয়া থাকে এমন লোকের

অভাব নাই। সময় থাকিলে হাতে একটা ভালো উপন্যাস আসিয়া পড়িলে তাহা পড়ে না এমন লোক নিতান্তই বিরল।

বাংলা দেশে এমন একদিন ছিল যখন কিশোরদের পক্ষে উপন্যাস-পাঠ একটা অপরাধ বলিয়া মনে করা হইত। শরৎচন্দ্র বাল্যকালে কীভাবে লুকাইয়া লুকাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার চিঠিপত্রের মধ্যে রহিয়াছে। অবশ্য সেযুগে ভালো উপন্যাসের সংখ্যা খুবই কম ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের উপন্যাস বাদ দিলে এমন উপন্যাস ছিল না বলিলেই হয় যাহা অল্পবয়স্ক পাঠকের উপযোগী হইতে পারে। উপন্যাসের মধ্যে পরিণত জীবনের যে ছবি আছে তাহা দেখিয়া সুকুমারমতি তরুণ-তরুণী অকালে পাকিয়া ওঠে বা উপন্যাসের মধ্যে অনাচারের চিত্র দেখিয়া সুনীতি হইতে ভ্রষ্ট হয়, এমন আশঙ্কাই তখনকার অভিভাবকদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল।

কিন্তু সেদিন এখন আর নাই। এখন উপন্যাস বড়োদের যেমন, তেমনই ছোটোদেরও হাতে হাতে। এখন বড়োদের পাঠ্য উপন্যাস ছোটোদের উপযোগী করিয়া রচিত হইতেছে; ছোটোদের জন্য আলাদা করিয়া উপন্যাস রচনা করা হইতেছে—অবশ্য এই সব উপন্যাসের মধ্যে একদিকে যেমন দক্ষিণারঞ্জন-প্রমুখ শিশু-সাহিত্যিকের রচনা আছে অপরদিকে তেমনই কাঞ্চন-জঙ্ঘা সিরিজের লোমহর্ষক কাহিনীও আছে। কিশোরদের পাঠ্য ভালো উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্তই কম।

বাস্তবিকপক্ষে বয়স্কদের পাঠ্য ভালো উপন্যাসের সংখ্যাও নিতান্ত কম। এযুগের তরুণ-তরুণী হইতে সুরু করিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত যে সমস্ত উপন্যাস গিলিতে থাকেন, সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগই অসাহিত্য বা কুসাহিত্য। আমাদের দেশে যথার্থ ডিটেকটিব উপন্যাস বা গল্প রচিত হয় নাই—এদেশে রহস্যলহরী সিরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া রোমাঞ্চ বা মোহন সিরিজে আমরা যে বস্তু পাই তাহার বেশির ভাগই মেকি বা তৃতীয় শ্রেণীর। বহু শক্তিহীন লেখক উপন্যাসের নামে বৃহৎকায় অসার গল্প লিখিয়া নাম কিনিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের ভিড়ে ভালো উপন্যাস যেন হারাইয়া যাইতেছে।

ভালো উপন্যাসের মধ্যে কেবল যে গল্পই আছে তাহা নয়; তাহার মধ্যে এমন অনেক বিষয় থাকে যাহা আমাদের মনটাকে গড়িয়া তুলিতে পারে।

ইহার মধ্যে জীবনের চিত্র থাকায় আমরা ইহা পাঠ করিয়া জীবন সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতার অধিকারী হইতে পারি। উপন্যাসকে মানবচরিত্রের আকর বলা যায়। পৃথিবীতে কত বিচিত্র মানুষের পরিচয় আমরা পাই—উপন্যাসের মধ্যেও আমরা বিচিত্র চরিত্রের সন্ধান পাই। মানবচরিত্র সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা গড়িয়া তুলিতে উপন্যাসের যে বিশেষ মূল্য আছে একথা অবশ্য স্বীকার্য।

কোনো কোনো উপন্যাস পাঠ করিয়া আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারি। ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠ করিলে আমাদের ঐতিহাসিক বোধ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। কোনো কোনো উপন্যাসে রাজনৈতিক এমন কি দার্শনিক আলোচনা পর্যন্ত থাকে। এই সমস্ত উপন্যাস পাঠ করিয়া আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সংলাপের মধ্যে এমন অনেক জিনিস থাকে যাহা আমাদের বহু বিষয় ও বহু তথ্য জানাইয়া দেয়।

শিক্ষালাভ বলিতে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভ বুঝায় না। রুচিকে গড়িয়া তোলা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ভালো উপন্যাস পাঠ করিলে আমাদের রুচি পরিমার্জিত হইতে পারে। বিশেষত উপন্যাস সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট শাখা; সুতরাং ইহার মধ্যে সাহিত্যের কলাগত সৌকর্যের দিকটাও উল্লেখ-যোগ্য। উপন্যাসের কলাগত সৌন্দর্য আমাদের চিত্তকে পরিমার্জিত করিয়া আমাদের চিত্তকে সৌন্দর্যপিপাসু করিয়া তোলে। বাস্তবিকপক্ষে সৌন্দর্য-বোধ ও রুচি না থাকিলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়; কারণ, শিক্ষা বলিতে স্তূপীকৃত জ্ঞান বোঝায় না, মানবচরিত্রের উৎকর্ষ বিধানই ইহার উদ্দেশ্য।

সৎ উপন্যাস পাঠ করিলে হৃদয়ের মধ্যে কোনো মহৎ কার্য সম্পন্ন করিবার প্রেরণা লাভ করা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসটি এক সময়ে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের অন্তরে স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দেশোদ্ধারের প্রেরণা দান করিয়াছিল।

সাহিত্যের বিভিন্ন অংশের মতোই উপন্যাসের রীতিমত চর্চাও প্রয়োজন। গল্পের সহিত সংযুক্ত থাকায় সাহিত্যের এই শাখাটিই সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু কেবলমাত্র গল্পটুকু উপভোগ করিবার জন্য উপন্যাস-পাঠে মনোনিবেশ

করা উচিত নয়। উপন্যাস-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনাও অবশ্য কর্তব্য। কোনো কোনো উপন্যাস মুখ্যত মনোরঞ্জনের জন্য রচিত—কিন্তু শক্তিমান ঔপন্যাসিক মহাকবির মতোই গ্রন্থ মধ্যে এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশ করেন যাহা উপযুক্ত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এই বিষয়গুলির জন্যই কোনো কোনো উপন্যাস সাহিত্য হিসাবে আদরণীয় হইতে পারে।

উপন্যাস পাঠ করিলেও উপন্যাসের নেশা যাহাতে না পাইয়া বসে সে দিকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। উপন্যাসের প্রতি অনুরাগের জন্য অন্য কাজে অবহেলা করিয়া কেবল এই দিকে মনোযোগ দিলে চলিবে না। যথার্থ ভালো উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিয়া উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যয়ন করিলে উপন্যাসের নেশা জন্মিতে পারিবে না এবং ইহাতে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও হইবে।

ছাত্রজীবনে বিজ্ঞান-পাঠের প্রয়োজন

সংকেত : বিজ্ঞান আধুনিক যুগে সকল ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতেছে—ছাত্রজীবনেই বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রয়োজন—জ্ঞানলাভের জন্যও অন্যান্য বিষয়ের সহিত বিজ্ঞান পাঠ্য—ব্যবহারিক বিজ্ঞান পাঠ—বিজ্ঞানে কল্পনাবিলাস নাই কিন্তু বৈজ্ঞানিক হৃদয়বানও কবি হইতে পারেন—মন যুক্তিবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত হয়—ভারতে এখন প্রচুর বিজ্ঞান-চর্চা হওয়া উচিত।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক মহাব্যোমে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ বিজ্ঞান-সাধনার একটি চূড়ান্ত বিস্ময়। এই উপগ্রহটি মাত্র দেড় ঘণ্টায় সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন যে, অচিরকাল মধ্যে মানুষ ঐরূপ প্রচণ্ড গতিতে মহাশূন্যে বিচরণ করিতে পারিবে। আদিম যুগ হইতে সুরু করিয়া বৈজ্ঞানিক যানবাহন আবিষ্কারের দিন পর্যন্ত যে বহু লক্ষ বৎসর বিস্তৃত তাহাতে মানুষ পদচারণ হইতে অশ্বারোহণ বা অশ্বশকটের প্রবর্তন করিতে পারিয়াছে মাত্র; কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সময় হইতে এই এক শতাব্দীর কম সময়ের মধ্যে মানুষ যে প্রচণ্ড গতিশক্তির অধিকারী হইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। কেবল গতির ক্ষেত্রে নয়, সর্বদিকেই বিজ্ঞান আজ অব্যাহত গতিতে তাহার জয়যাত্রা চালাইয়া যাইতেছে। আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে আজ বিজ্ঞানের

প্রভাব বর্তমান। বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া চলার কোনো অর্থই এ যুগে হয় না। বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলাই শ্রেয়।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, সকলেই বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিবে না। মনে-প্রাণে বিজ্ঞানের সেবা করিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। বিশেষত উচ্চতর বিজ্ঞান আয়ত্ত করাও সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানের প্রতি সকলের গভীর আকর্ষণ নাও থাকিতে পারে। সুতরাং সকলেই যে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবে এরূপ নির্দেশ দেওয়া অনেকে অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু নিছক বিজ্ঞানচর্চার জন্যই যে বিজ্ঞান পাঠ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল জ্ঞান লাভ। মানুষের অন্তহীন জ্ঞানপিপাসাকে তৃপ্ত করিবার জন্যই বিভিন্ন বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। যে জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য মানুষ ইতিহাস বা দর্শন পাঠ করে, তাহাকেই তৃপ্ত করিবার জন্য সে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে। জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। তেমনই তাহার পক্ষে বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাঠও অবশ্য কর্তব্য। বিজ্ঞান পাঠ না করিলে তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিশেষত এ যুগে বিজ্ঞানের যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞানের সহিত মোটামুটি পরিচয় না থাকিলে জ্ঞানের দিক দিয়াও যেমন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতেও তেমনই পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। বিজ্ঞান আধুনিক যুগের প্রধানতম বিদ্যা।

ছাত্রজীবন হইতেই বিজ্ঞান পাঠ প্রয়োজন। অল্প বয়স হইতে বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় স্থাপিত না হইলে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হইবে না। তবে বাল্যকালে যে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হইবে তাহা তত্ত্ব-নির্ভর না হইয়া পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হওয়া উচিত। এই জন্যই প্রকৃতি বিজ্ঞান দিয়াই শিশুদের পাঠ আরম্ভ করাইতে হয়। কৈশোরেও যে বিজ্ঞান পঠিত হইবে তাহাতে কিছু পরিমাণে তত্ত্ব থাকিলেও উপযুক্ত পরীক্ষাদির সহায়তায় বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করিয়া তুলিতে হইবে। যে বিষয়টি উপযুক্ত পরীক্ষা সহযোগে উপলব্ধি করা যায় তাহা মনের মধ্যে যেন গাঁথিয়া যায়।

বিজ্ঞানের মধ্যে কাল্পনিকতার অবকাশ নাই—তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ইহার নির্ভর। সেইজন্য অনেকে আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান পাঠ করিলে বুঝি ছাত্রছাত্রীদের অন্তর নীরস ও কল্পনাহীন হইয়া পড়িবে। দীর্ঘকাল

বিজ্ঞান লইয়া পড়িয়া থাকিলে প্রকৃতি রুক্ষ হইয়া যায় এমন একটা ধারণাও সাধারণে প্রচলিত আছে। রূঢ় বাস্তবের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন বলিয়া অনেকে বৈজ্ঞানিক হইলে হৃদয়হীন হন এইরূপ অভিযোগ করিয়া থাকেন।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নাই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে কাল্পনিকতার প্রশ্রয় দেন না বলিয়াই যে বৈজ্ঞানিক কল্পনাহীন, হৃদয়হীন বা রুক্ষ প্রকৃতির হইবেন এমন কোনো কথা নাই। বৈজ্ঞানিক হইয়া হৃদয়বান ও কবি প্রকৃতির হইয়াছেন আবার সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিয়াও হৃদয়হীন, বাস্তবপন্থী ও রুক্ষ প্রকৃতির হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যাইবে। জ্ঞান মানুষের হৃদয়কে কঠোর করিয়া তুলে এইরূপ মতবাদের কোনো ভিত্তি থাকিতে পারে না।

বাস্তবিকপক্ষে বিজ্ঞান চর্চা করিলে ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠা বর্ধিত হইবে। অজ্ঞতার জন্য অনেকেই বহুপ্রকার কুসংস্কার পোষণ করিয়া থাকে। বিজ্ঞান পাঠ করিলে সেই কুসংস্কারগুলি বিদূরিত হইয়া যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর। বিজ্ঞানের চর্চা করিতে করিতে বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট অনুশীলন হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়। কোনো বিষয় বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও বিজ্ঞান-পাঠ হইতে লাভ করা যায়।

বিশেষ করিয়া ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান-পাঠ অধিকতর প্রসারিত হইলে ভালো হয়। ভারত অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানের চর্চায় ভারত অনেক পিছাইয়া আছে। এখন এদেশে অগণিত বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন। সেই চাহিদা মিটাইবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্র এই দিকে অগ্রসর হইতেছে না; ফলে একদিকে যেমন বিজ্ঞানের তেমন প্রসার হইতেছে না, অন্যদিকে আবার যথার্থ বিজ্ঞানানুরাগীর সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ প্রসারিত না হইলে দেশে বিজ্ঞানব্রতী যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ভূত হইবে না। অল্প বয়স হইতেই ছাত্ররা বিজ্ঞান পাঠ করিলে অল্প কয়েক বৎসর মধ্যেই দেশের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা বাড়িয়া গিয়া দেশের কল্যাণের পথ সুগম করিয়া দিবে।

জীবনে সাফল্য সব চেয়ে অধিক নির্ভর করে কাহার উপর

সংকেত—কর্মে সাফল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে কর্মীর উপর, বাহিরের আগন্তুক কারণের উপর নহে—পুরুষকার ও নিরলস সাধনা উন্নতির মূল—সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত—উপসংহার।

যাহারা জীবনযুদ্ধে পরাজিত, ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে সর্বত্রই প্রায় একই উত্তর পাওয়া যাইবে—দুর্ভাগ্য, উপযুক্ত সুযোগের অভাব, মুরুব্বির অভাব, কোনো শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ—এইরূপ নানা বিষয়কে ব্যর্থতার কারণরূপে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। সকলেই বাহ্য কারণগুলিকে ব্যর্থতার জন্য দায়ী বলিয়া নির্দেশ করেন—নিজের মধ্যে যে তাহার মূল থাকিতে পারে তাহা কেহই স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তথ্যানুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার জন্য বাহিরের কোনো কারণের চেয়ে ব্যক্তি বিশেষই দায়ী। নিষ্ক্রিয়তা ও আলস্যের জন্যই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আসে; যাহারা সক্রিয় ও নিরলস, তাহাদের জীবনে ব্যর্থতা আসিয়াছে এরূপ বড়ো একটা দেখা যায় না।

পুরুষকারই মানুষের সকল উন্নতির মূল। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে উন্নতির সম্ভাবনা কম। ভাগ্য অনুকূল হইলে সব হইবে বলিয়া কেহ অন্য কিছু না করিয়া কেবল লটারির প্রাপ্তিযোগের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না। যাঁহারা জীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা দৈবের পরিবর্তে কর্মশক্তির উপরই নির্ভর করিয়াছেন। আমাদের দেশের বিদগ্ধমণ্ডলীর বাণীও তাহাই—"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"। যাঁহারা উদ্যোগী পুরুষ, তাঁহারা অশেষ শ্রী ও সম্পদের অধিকারী হন। অবিরতভাবে শ্রম না করিলে কখনও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কেহ যদি অক্লান্তভাবে সাধনা করে তাহা হইলে সে সিদ্ধি লাভ করিবেই। অবস্থার বৈগুণ্যে কদাচিৎ যদি সিদ্ধি তাহার করতলগত না হয়, তাহা হইলেও সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া সে যে সিদ্ধির অধিকতর নিকটবর্তী হইবে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাধারণ মানুষ যে তাহার পুরুষকারকে জাগ্রত করিতে পারে না তাহার প্রধান কারণ তাহার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। আপনার শক্তিতে বিশ্বাস না

থাকার জন্য অনেকেই কোনো কঠিন কার্যে অগ্রসর হয় না বা আরম্ভ করিলেও অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই কাজ ছাড়িয়া দেয়। যাহা সাধ্যের একেবারে অতীত এমন কোনো কাজ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে এইরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত থাকিলেও আত্মবিশ্বাসের অভাবে কার্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্তই বেশি দেখা যাইবে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থাকার জন্য অনেক উৎসাহী ব্যক্তি জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

অবশ্য এই আত্মপ্রত্যয়ের সহিত ইচ্ছাশক্তি সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন। 'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়' এই বহুপ্রচলিত প্রবাদটি অতিরঞ্জিত ভাষণ নয়—ইহা বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছাত্রজীবনে দুর্বল শরীর সত্ত্বেও এবং তখন একজন সাধারণ ছাত্র হইয়াও অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির বলে অধ্যয়নে নিমগ্ন হইয়া গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করিয়া বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ডিমস্থিনিস প্রথম জীবনে তোতলা হইলেও উত্তরজীবনে কীভাবে বাগ্মীর দেশ প্রাচীন গ্রীসে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহা সর্বজন-বিদিত। যাঁহারা মেরুপ্রদেশ বা অন্য দুর্গম স্থানে অভিযান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও প্রবল ইচ্ছাশক্তি ছিল। প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকিলেই কোনো বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই কাজ করিতে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে যে কোনো কাজই হোক না কেন, তদ্‌গতচিত্তে তাহা করা যায় না—ফলে তাহা অনেক সময়ই অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় শেষ করা হইয়া থাকে। সিদ্ধি প্রায় লব্ধ হইলেও ইচ্ছাশক্তি প্রবল না হওয়ায় সাধনার শেষ স্তরে আসিয়াও ব্যর্থ হইতে হইয়াছে এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

অবশ্য কেবল একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই যে কোনো বিষয়ে সফল হওয়া যাইবে তাহা নয়। সিদ্ধির জন্য সাধনা প্রয়োজন—বৃহৎ সিদ্ধির জন্য বহুদিনব্যাপী সাধনা প্রয়োজন। বহুদিন হইতে প্রস্তুতি না থাকিলে কোনো দুষ্কর কার্যে সফলতা লাভ করা যায় না। চিত্রকলাবিৎকে বহুদিন ধরিয়া চিত্রকলার সাধনা করিতে হয়, ওস্তাদ গায়ককে বহুদিন ধরিয়া সঙ্গীত সাধনা করিতে হয়, ব্যবসায়ে যাঁহারা বড়ো হইয়াছেন তাঁহাদেরও বহুকাল ধরিয়া ব্যবসায় কার্যে ব্রতী থাকিতে হইয়াছিল। পূর্ব প্রস্তুতি না থাকিলেও সিদ্ধি করায়ত্ত হইয়াছে এরূপ ঘটনা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাস্তবিকপক্ষে অনালস্য, আত্মবিশ্বাস, ইচ্ছাশক্তি ও প্রস্তুতি থাকিলে কোনো সাধনাই ব্যর্থ হইবার নয়। ভাগ্য কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিকূল হইতে পারে, কোনো বিশেষ ব্যাপারে উপযুক্ত সুযোগ নাও মিলিতে পারে, কিন্তু যদি প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও গভীর আত্মবিশ্বাস লইয়া নিরলসভাবে সাধনা করা যায়, তাহা হইলে জীবনে সফলতা আসিবেই। ভারতবাসী দৈবের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় দৈবের উপর সমস্ত কিছু ছাড়িয়া দিয়া সাধনাবিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই দৈবনির্ভরতা তামসিকতারই নামান্তর। পুরুষকারের নিকট দৈবের পরাভবের সত্যটি বুদ্ধদেব হইতে সুরু করিয়া বহু মনীষী ঘোষণা করিয়াছেন। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—ইহাই ভারতের চিরন্তন বাণী। এই উদ্বোধনের বাণী বিস্মৃত হইয়া কেবল দৈবের কথা বলিলে একটি গভীর সত্যকে উপেক্ষা করিয়া জীবনে ব্যর্থতাকে চিরস্থায়ী করিয়া তোলা হইবে।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম

সংকেত—স্বদেশপ্রেম সুস্থ মানুষের ধর্ম—স্বদেশপ্রেমের বিকৃতি থেকে গড়ে ওঠে পরজাতি-বিদ্বেষ—দুইটি মহাযুদ্ধ—সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি এই বিকৃতিরই রূপান্তর—মহত্তর আদর্শ প্রয়োজন—প্রাচীন ভারতের আদর্শ—রবীন্দ্রনাথ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—জন্মদাত্রী মাতা ও যে দেশে জন্ম সেই মাতৃভূমিকে প্রাচীন শাস্ত্রকাররা স্বর্গের চেয়ে উঁচু জায়গায় বসিয়েছেন। মা যেমন তাঁর স্তন্যদুগ্ধ দিয়ে শিশুকে পালন করেন, জন্মভূমিও তেমনই শস্য-সম্পদ দিয়ে আমাদের ক্ষুধা মেটান। জননীর স্নেহলাভ করে সন্তান বড়ো হয়ে ওঠে—জন্মভূমির স্নেহময় সমাজ পরিবেশের মধ্যে আমাদের জীবন গড়ে ওঠে। যে দেশ তার অতীতের ঐতিহ্য বর্তমানের শ্রীসম্পদ দিয়ে আমাদের জীবনকে পূর্ণ করে তোলে সেই জন্মভূমির প্রতি আমাদের গভীর অনুরাগ থাকা উচিত। স্বদেশপ্রেম মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির অন্যতম।

স্বদেশপ্রেমের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। রোমের বীর রেগুলাস স্বদেশের মুখরক্ষা করবার জন্য কার্থেজে জীবন সমর্পণ করেছিলেন। ইংরেজের আক্রমণ থেকে ফরাসী দেশকে রক্ষা করবার জন্য জোন আর্কের

মতো বীরাঙ্গনা আত্মদান করেছিলেন। বাংলার চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য স্বদেশের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য দুঃসাধ্য কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহামতি তিলক, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মনীষী থেকে আরম্ভ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম প্রভৃতি বিপ্লবী বীর স্বদেশপ্রেমের জীবন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

স্বদেশপ্রেম জাতির উন্নতিসাধনে সহায়ক। বাংলা দেশে বিংশ শতকের প্রথমদিকে যখন বিলেতি পণ্যদ্রব্যে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল, তখন কয়েকজন স্বদেশপ্রেমিক স্বদেশের জিনিস ব্যবহার করবার আদর্শ প্রচার করেছিলেন। যন্ত্রসাধনায় উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশ সুন্দর জিনিস হয়তো তৈরি করতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে যা তৈরি হয়, তা আমাদের নিজেদের জিনিস। সেদিন কান্ত কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল --

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

তাঁদের সেই গভীর স্বদেশপ্রেমই সারাদেশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছে—তার ফলেই সুদৃঢ় বৃটিশ শাসন অপনীত করে ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে।

স্বদেশপ্রেম জাতির উন্নতি বা সমৃদ্ধির মূল শক্তি সন্দেহ নেই—কিন্তু এই স্বদেশপ্রেমের যখন বিকার ঘটে তখন তা মারাত্মক হয়ে ওঠে। যাঁরা গোঁড়া দেশপ্রেমিক তাঁরা নিজের দেশের প্রতি এতটা দৃষ্টি দেন যে, তার জন্য যদি অপর দেশের ক্ষতি হয় তা হলেও তাঁরা সেটাকে অন্যায় বলে মনে করেন না। অপর দেশের যা হয় হোক, আমার দেশ বড়ো হলেই হলো—এই রকম একটা সংকীর্ণ মনোবৃত্তি তাঁদের পেয়ে বসে। স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে স্বার্থবুদ্ধি জড়িত হয়ে বিদেশের ক্ষতিসাধন করে, আত্মোদরপোষণের প্রশ্রয় দেয়। স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায় মত্ত হয়ে তাঁরা ন্যায়ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন।

এই স্বদেশপ্রেম উগ্র হয়ে উঠে যখন জাতিপ্রেমে পরিণত হয় তখন তা মানুষের শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একটা ঘোরতর বিজাতিবিদ্বেষ তখন তার মন অধিকার করে বসে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই উগ্র জাতিপ্রেমের

নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গত দুটো মহাযুদ্ধের মূলেই তীব্র জাতি-বিরোধ বর্তমান। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানির পতন হয়েছিল। হের হিটলার স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করে তার অভ্যুদয় সাধন করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বদেশপ্রেম যখন জাতিপ্রেমে পরিণত হল তখন তা একটা বীভৎস মূর্তি ধারণ করেছে। জার্মান জাতি তখন স্বজাতিপ্রেমের বশবর্তী হয়ে ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে; তাদের কেবল নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে শান্ত হয় নি, তখন তার প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রগুলোকেও ইহুদী-নির্যাতনে প্রবৃত্ত করেছে। এরপর সে বিদেশী রাজ্য-গুলোকে গ্রাস করে আপনার জাতিত্বের অহমিকা ঘোষণা করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু এই বিষোদ্গারী জাতিপ্রেম শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় নি, মহাকালের অমোঘ বিধানে জার্মানির আবার শোচনীয় পতন ঘটেছে।

স্বদেশপ্রেমের বিকৃত রূপ আমাদের দেশেও দেখা যায়। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিদ্বেষ এই স্বদেশপ্রেমেরই বিকৃত রূপ। নিজের গোষ্ঠীর প্রতি প্রেমে অভিভূত হয়ে মানুষ যখন ন্যায়-অন্যায় ভুলে যায় তখন সে মানবতার আদর্শ হারিয়ে ফেলে—তখন তার প্রয়াস কখনই পরিণামে শুভকর হইতে পারে না।

স্বদেশপ্রেমের এই বিষয়কে অতিক্রম করিবার জন্য বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। সেই আদর্শ বিশ্বপ্রেম—মানবপ্রেম যার নামান্তর। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—মৈত্রীই মানুষকে সমাজবদ্ধ করেছে। সেই মৈত্রী বা প্রেম যদি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে তাকে স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। বিশ্বপ্রেমের বৃহত্তর পরিমণ্ডলের মধ্যে স্বদেশপ্রেমকে স্থাপিত করতে হবে। স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ যাতে পরজাতি নিপীড়নে পর্যবসিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

কোনো কোনো স্বদেশপ্রেমিক বিশ্বপ্রেমকে অবাস্তব কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চান। তাঁদের মতে কোনো দেশ যদি বিশ্বপ্রেমের আদর্শের কাছে স্বদেশপ্রেমের আদর্শকে খাটো করে তবে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে; বিশ্বের মুখ চাইতে গেলে স্বদেশকে বড়ো করা যাবে না। এই যুক্তি আপাততঃ অকাট্য বলে মনে হতে পারে, বিশ্বপ্রেমহীন স্বদেশপ্রেমে কোনো

দেশ সাময়িকভাবে উন্নতিলাভ করতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। যে দেশ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানবতার আদর্শকে বলি দিতে পারে সেই দেশের মধ্যে ঘুণ ধরবেই। ন্যায়ের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হলে কোনো জাতিই বড়ো থাকতে পারে না। যে বিদ্বেষ একসময় পরজাতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা স্বদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে জাতিকে আত্মঘাতী করে তুলবে।

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম সত্ত্বেও বিশ্বপ্রেমের বাণী ঘোষণা করে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে জাতিবৈরের ভয়ানক পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন কিন্তু তাঁর আদর্শ ছিল অহিংসা—পরকে হিংসা না করেও দেশকে যে ভালোবাসা যায় তাঁর জীবন তার দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি জওহরলাল নেহরু বিশ্বের কাছে ভারতের মৈত্রীর আদর্শের কথা প্রচার করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে শুদ্ধমাত্র স্বদেশপ্রেম মধ্যযুগীয় অন্ধ উন্মাদনা মাত্র—বিশ্বপ্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত হলেই তা জাতির স্থায়ী কল্যাণসাধন করতে পারে।

ব্যর্থতাই সিদ্ধির ভিত্তিভূমি

সংকেত—ব্যর্থতার আক্রমণে সকলেই হতাশ হন কিন্তু দু' একজন ব্যর্থতা কাটিয়ে আবার উঠতে পারেন—ব্যর্থতা কেন আসে সেই কারণ অনুসন্ধান করা দরকার—আত্মসমালোচনা থেকেই উন্নতি হয়, সিদ্ধি আসে।

সব লোকই জীবনে খুব বড় আশা করে, কিন্তু সেই আশাগুলোর অনেকগুলি, হয়তো বেশির ভাগই পূর্ণ হয় না। কোনো কাজে এগিয়ে যাবার সময় সকলেই সফলতা চায়, কিন্তু ব্যর্থতা বারবার এসে আঘাত করে। জীবনের চলার পথে ব্যর্থতার হোঁচট অনেকবারই খেতে হয়।

ব্যর্থতা যখন আসে, তখন তার সঙ্গে হতাশা এসে মানুষকে অভিভূত করে দিতে চায়। কোনো কোনো লোক দুই-একবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে হাল ছেড়ে দেয়—হতাশার সাগর পার হবার মতো মনের জোর হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এমন লোকও অনেক আছে যারা হতাশায় ভেঙে পড়ে না; যতই আঘাত আসুক, ব্যর্থতার বেদনা যত তীব্রই হোক না কেন, তারা আবার

নবোত্তমে অগ্রসর হয়। যে অধ্যবসায়ী এবং বারবার ব্যর্থতা সত্ত্বেও কর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয় না, সে একদিন না একদিন সিদ্ধিলাভ করবেই।

রবার্ট ব্রুসের গল্প আমরা সকলেই জানি। স্কটল্যাণ্ডের এই বীর ইংরেজদের হাত থেকে স্বদেশ উদ্ধার করবার জন্ম সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু ইংরেজদের শক্তিশালী সৈন্যের কাছে বারবার পরাজিত হয়েছিলেন। এই-ভাবে ছবার পরাজয়ের পর তিনি একটি ছোটো গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে আপনার জীবনের ব্যর্থতার কথা ভেবে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন যে, একটা মাকড়শা গুহার মুখে জাল বোনবার চেষ্টা করছে কিন্তু গুহার মুখটা বড়ো হওয়ায় তার চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এইভাবে তার প্রয়াস ছবার ব্যর্থ হবার পর সপ্তমবারে সে জালটা তৈরী করে ফেলল। মাকড়শার এই কার্যকলাপ রবার্ট ব্রুসের অন্তরে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করল। তিনি আবার নতুন উদ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করে তুমুল যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যকে হটিয়ে দিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও অবশেষে সার্থকতা আসবেই। হৃদয়ে আশা নিয়ে কাজ করতে হবে—দুই-একবার ব্যর্থ হয়েই ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়লে চলবে না। কবি শিশুদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন :

পারিব না একথাটি বলিও না আর ;
কেন পারিবে না, তাহা ভাব একবার ;
পাঁচজনে পাবে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা.
পার কি না পার, কর যতন আবার
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

কেবল শৈশবেই নয়, সারা জীবনেই এই উপদেশটি মূল্যবান্। বারবার চেষ্টার ফলে সিদ্ধি অবশ্যই করায়ত্ত হবে।

কিন্তু ব্যর্থতাকে কেবল একটা দৈব প্রতিকূলতা বলে মনে করলে চলবে না—ব্যর্থতার শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে হবে। ব্যর্থতা কেন এল সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। নিশ্চয়ই কোথাও ত্রুটি হয়েছিল—হয়তো যতটা শ্রম করা উচিত ছিল ততটা করা হয়নি, হয়তো এমন কোনো ভুল করা হয়েছিল, যে ভুলের রন্ধ্রপথে ব্যর্থতা এসেছে। ব্যর্থতার এই শিক্ষাটুকু গ্রহণ

করে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে অধিকতর মনোযোগী হয়ে কোনো কাজ করতে অগ্রসর হলে সার্থকতা আসবেই।

মানুষের ইতিহাসে ব্যর্থতার মূল্য কম নয়। ব্যর্থতাই মানুষকে নূতন নূতন পথের সন্ধান দিয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতার ইতিহাস মূল্যবান্। একজনের ব্যর্থতা আর একজনকে সফলতার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। সামান্য একটা দেশলাই তৈরির মূলে মানুষের যত সাধনা আছে তা সামান্য নয়। যাতে সহজে জ্বালানো যায়, বিপদের ভয় থাকে না, কোনো রকম খারাপ গ্যাসও বার হয় না—বহু বিজ্ঞানসাধকের বহু পরীক্ষার পর এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করা গেছে।

বাস্তবিক পক্ষে ব্যর্থতা একটা অভাবাত্মক ব্যাপার নয়--ব্যর্থতার মূলেও সফলতার সাধনা ছিল, সেই সাধনাটুকুকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মানুষকে মনে আশা নিয়ে কাজ করে যেতে হবে; সাধনার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আসুক বিপদ, আসুক ব্যর্থতা—তার মধ্য দিয়েই মানুষ সিদ্ধির অভিমুখে অগ্রসর হয়ে মানবশক্তির জয়ঘোষণা করবে।

শ্রমের মর্যাদা

সংকেত—ভূমিকা—শ্রম কেবল দরিদ্রের প্রয়োজন, ইহা একটা ভ্রান্ত ধারণা—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টান্ত—রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজিপ্রমুখ মহামানবগণের দৃষ্টান্ত ও নির্দেশ।

"আরাম হারাম হায়"—জওহরলালের এই উক্তি এযুগের একটি স্মরণীয় বাণী। আয়েস করা, আরাম করা পাপ—যে নিশ্চিন্ত আরামে দিন যাপন করে, সে সমগ্র মানবসমাজের কাছে অপরাধী। মানবসমাজে সকলেই কাজ করিবে ইহাই সমীচীন। যাহারা নিজেরা পরিশ্রম করে না, কেবলমাত্র অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহারা মানবসভ্যতার গ্লানিস্বরূপ।

এমন এক সময় ছিল যখন অনেক অভিজাতম্মন্য ব্যক্তি কোনরূপ কায়িক শ্রম করাকে অপমানজনক বলিয়া মনে করিত। ফরাসীদের রাজকর্মচারী ও সম্ভ্রান্তসমাজের বিলাসিতার কথা আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে কী নিদারুণভাবে খাটাইয়া তাহারা আপনাদের

বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিত। জারের আমলে রুশ দেশেও অভিজাত-মণ্ডলীর শোষণের সীমা ছিল না। কিন্তু ঐ সকল দেশে বর্তমানে শ্রমের মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে—প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে শ্রম করা আবশ্যিক হইয়া উঠিয়াছে। শ্রম বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের একটি কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একদিন এক যুবক একটি রেলস্টেশনে 'কুলি', 'কুলি' বলিয়া হাঁকিতেছিল; তাহার মালপত্রের মধ্যে ছিল কেবল একটা স্যুটকেশ। তাহাকে ঐভাবে কুলির খোঁজ করিতে দেখিয়া জনৈক সাধারণবেশধারী প্রৌঢ় তাহার কাছে আসিয়া স্যুটকেশটি লইল এবং তাহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইবার পর যুবকটি জানিতে পারিল যে, ঐ প্রৌঢ় স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—কোনো কাজই যে হীন নয়, এবং সকলেরই যে শ্রম করা কর্তব্য একথা তাঁহার আচরণ হইতে সে শিক্ষালাভ করিল।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপন করেন, তখন তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে নিজেদের কাপড় কাচা, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজ নিজেদেরই করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেকি ভদ্রয়ানার কাছে তাঁহার আদর্শ শেষ পর্যন্ত হার মানিয়াছে। তবে এখনও কোনো কোনো শিক্ষায়তনে, বিশেষ করিয়া ভারতে চতুষ্পাঠীগুলিতে ছাত্ররা কায়িক পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বাস্তবিক পক্ষে নিজের নিজের ছোটো-খাটো কাজগুলি যদি আমরা করিয়া না লই, তাহা হইলে আমাদের আত্মনির্ভরতা আসিবে কিরূপে?

মহাত্মা গান্ধী প্রতিদিন সকলকে কিছু-না-কিছু কায়িক পরিশ্রম করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে সকলের কর্মকুশলতা যেমন বাড়িবে, তেমনই দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। কোনো কাজই যে নিন্দনীয় নয়, তাঁহার নিজের জীবন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহার ছাত্রদের সহিত তিনি সকল কাজ করিতেন—এমন কি নিজের হাতে মেথরের কাজ করিতেন। কায়িকশ্রমবিমুখ নিছক বুদ্ধিজীবিতাকেও তিনি নিন্দা করিয়াছেন।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, সুদূর অতীতকালে, যখন মানুষের মধ্যে কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিল না, তখন

সকলকেই শ্রম করিতে হইত এবং শ্রমকে কেহই নিন্দার্হ বলিয়া মনে করিত না। কিন্তু কালক্রমে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব লইয়া শ্রমের মর্যাদা কমাইয়া দিয়াছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কৃষক ও শ্রমিকেরা সকলের নিচে পড়িয়া গিয়াছে। ক্রীতদাসের মতো অহর্নিশি পরিশ্রম করিয়া তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে দিনের পর দিন অনাহার, অর্ধাহার এবং অকথ্য নির্যাতন। শক্তিশালী অভিজাতমণ্ডলী তাহাদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়া চরম অবজ্ঞা দিয়া তাহাদের দূরে সরাইয়া দিয়াছে। মানুষ হইয়াও তাহারা শ্রমজীবি বলিয়া সকলের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের রক্ত শোষণ করিয়া অলস ধনী সম্প্রদায় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে শ্রম তাহার হারানো মর্যাদা ফিরিয়া পাইতেছে। যাঁহারা যথার্থ মহাত্মা, তাঁহারা কোনো কালেই শ্রম করিতে পরাঙ্মুখ হন না। রুশ দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক টলস্টয় নিজে জমিদার হইয়াও কায়িক পরিশ্রম করিতেন, সাধারণ কৃষকের বা শ্রমিকের সহিত যাহাতে তাঁহার কোনো পার্থক্য না থাকে এইজন্য তিনি জমিদারি বিলাইয়া দিয়াছিলেন। যাহারা শ্রমজীবী, তাহারাই যে জাতিকে লালন করিতেছে, এই বোধটি একালে জাগ্রত হইয়াছে।

আধুনিক যুগের শ্রমিক আন্দোলন এই নূতন বোধেরই ফল। পূর্বে মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করিয়া নিজেরা বড়ো হইত অথচ তাহাদের উপের অব্যাহতভাবে অত্যাচার চালাইয়া যাইতে দ্বিধাবোধ করিত না। কিন্তু বর্তমানে শ্রমিক সমাজ একতাবদ্ধ হইয়া মালিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাইতে বাধ্য করিয়াছে। চরমপন্থী সমাজতন্ত্র-বাদীরা বা সমভোগবাদীরা ব্যক্তিগত মালিকানা দূর করিয়া কর্মের রাষ্ট্রায়ত্ত করণের পক্ষপাতী; যাঁহারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁহারা শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকারের কথা স্বীকার করিয়া সেই মর্যাদা ও অধিকার তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য আন্দোলন করিয়াছেন।

এক সময় এদেশে অত্যন্ত অল্প ব্যয়েই শ্রমিক পাওয়া যাইত। দরিদ্র শ্রমিক আর কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া নামমাত্র পারিশ্রমিকেই কঠোর পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বর্তমানে তাহাদের জীবনযাত্রার উপযোগী

নিম্নতম বেতন যে তাহাকে দিতেই হইবে, এই নীতির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। 'নিম্নতম বেতন আইন' (Minimum Wages Act) ভারত সরকারের অন্যতম কৃতিত্ব। জমির মালিকের যেমন ফসলের অধিকার আছে। তেমনই যাহারা ভূমিহীন অথচ শ্রমজীবী তাহাদেরও ফসলের অধিকার আছে। ভারতের 'তে-ভাগা' আন্দোলন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে শ্রমিকের উপার্জনের অঙ্ক এ দেশের অনেক ছোটো-খাটো প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের ঈর্ষ্যার বিষয়।

অবশ্য অর্থনৈতিক দিকটাই সবচেয়ে বড় নয়। আধুনিক যুগে শ্রমিক যে মর্যাদালাভ করিয়াছে, বুদ্ধিজীবীদের মতোই সমাজে যে তাহাদের বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহারাই সমাজের মূলভিত্তি এই বোধটি যে সর্বত্র জাগরিত হইয়াছে, ইহাই সবচেয়ে বড়ো কথা। শ্রমই যে মানুষকে যুগ যুগ ধরিয়া পোষণ করিয়া আসিতেছে এবং ইহাই যে তাহার সমস্ত উৎকর্ষের মূলে বর্তমান, এই বোধটিই শ্রমের মর্যাদাকে আধুনিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা

সংকেত—দৈনন্দিন জীবন নিয়মের অধীন—দৈনিক জীবনে, যুদ্ধক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে, কলকারখানায় শৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজন—শৃঙ্খলাহীন ও অগোছালো হওয়ায় কৃতিত্ব নাই—নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ যেন যান্ত্রিক না হইয়া পড়ে।

ছোটো বড়ো যে কোনো রকম কাজ করিতে গেলেই শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবন একটা অলিখিত নিয়মের সূত্রে গ্রথিত। আমাদের স্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটা প্রায় বাঁধা নিয়ম আছে। এই নিয়মটুকু না মানিয়া যদি যে যাহার ইচ্ছা তাহাই করিত, তাহা হইলে পারিবারিক জীবন বহুদিন অচল হইয়া পড়িত। তেমনই সমাজের মধ্যেও কয়েকটি নিয়ম আছে, সকলে যদি সেই নিয়ম মানিয়া না চলে এবং স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে সমাজও অচিরকাল মধ্যে অচল হইয়া পড়িবে। আমাদের জীবনে যে সব অলিখিত নিয়ম রহিয়াছে সেগুলি না মানিয়া উপায় নাই।

সৈন্যদলের নিয়মানুবর্তিতাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সৈন্যরা নির্দিষ্ট সময়ে শয্যাত্যাগ করে, শৌচাদি ক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

সম্পন্ন করে, তাহাদের আহার, কাজ সকলই নিয়ম দিয়া বাঁধা। বহুকাল ধরিয়া নিয়মানুবর্তী হইবার শিক্ষা লাভ করে বলিয়া সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে থাকিতে পারে। প্রকৃতির মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা সঞ্চারিত হয় বলিয়াই তাহাদের পক্ষে শত্রুদলের সম্মুখে নির্ভয়ে বিচরণ করা সম্ভবপর হয়।

বিদ্যালয় নিয়মানুবর্তিতার একটি অতি-পরিচিত দৃষ্টান্ত। বিদ্যালয়ে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যাহা সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়—প্রধান শিক্ষক মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুশ্রেণীর কনিষ্ঠ ছাত্রটি পর্যন্ত সকলেই একটা শৃঙ্খলার অনুবর্তী। এই নিয়মানুবর্তিতা না থাকিলে চলিত না। যদি বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার নির্দিষ্ট সময়ে সকলে না আসে, পঠন-পাঠনের নির্দিষ্ট নিয়ম যদি সকলে না মানে, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের কাজ চালানো সম্ভবপর হয় না। সকলে নিয়ম মানিয়া চলে বলিয়াই বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা থাকে।

আমাদের প্রতিটি কাজে শৃঙ্খলা অবশ্য প্রয়োজন। এমন কোনো কোনো লোক দেখা যায় যাহারা কোনো কাজেই শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারে না—তাহাদের সবই যেন অগোছালো। অনেকে আবার নিজেদের অগোছালো-পনার জন্য মনে মনে প্রচ্ছন্ন গর্ব পোষণ করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শৃঙ্খলাবোধের অভাব চারিত্রিক ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে জীবনের ছোটো খাটো কাজেই শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিল না, সে জীবনে বড়ো কাজ করিবে কী করিয়া? প্রতিটি কাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করা একটা সদ্‌গুণ মাত্র নয়, মানুষের মতো জীবন যাপন করিতে হইলে নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা অবশ্য প্রয়োজন।

কেহ কেহ নিয়মানুবর্তিতাকে অতিমাত্রায় যান্ত্রিক ও মানুষের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পরিপন্থী বলিয়া অভিযোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে যে-কোনো ভালো জিনিস যখন বিকৃত আকার ধারণ করে তখন তাহা দোষদুষ্ট হইয়া পড়িতে বাধ্য। শুদ্ধমাত্র নিয়ম পালন করিবার জন্যই যে মানবজন্ম-গ্রহণ এইরূপ ধারণা কোনো কোনো নীতিবাগীশ করেন, কিন্তু মানুষের কল্যাণের জন্যই যে নিয়ম-নিষ্ঠার প্রয়োজন এই সাধারণ বোধটি থাকা দরকার। নিয়মের তাৎপর্যটি অবগত না হইয়া কেবল নিয়মের জন্যই যদি নিয়ম পালন করা হয়, তাহা হইলে তাহা যান্ত্রিক অনুষ্ঠানমাত্রে পরিণত হয়। নিয়মতন্ত্র প্রবল হইয়া উঠিয়া যাহাতে মানবকল্যাণের পরিপন্থী হইয়া না দাঁড়ায়, সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

নিয়ম-নিষ্ঠার বিকৃতি সম্ভবপর হইলেও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ইহার যে একটি বিশেষ মূল্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নিয়মহীন জীবন কর্ণধারহীন তরণীর মতো সংসারসাগরে ভাসিয়া বেড়ায়। মানুষ যে পশু হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সমাজবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে সর্বজনগ্রাহ্য কয়েকটি অলিখিত নিয়ম বর্তমান। শৃঙ্খলাবোধ হইতে তাহার সৌন্দর্য ও সৌষম্যবোধ জাগ্রত হয়। যাহার শৃঙ্খলা ও নিয়মের প্রতি নিষ্ঠা আছে সে একদিকে যেমন সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে, অপর দিকে তেমনই তাহার সকল কিছুই ছিমছাম থাকে।

অবশ্য নিয়ম-নিষ্ঠা—কেবল নিয়ম-নিষ্ঠা কেন, সমস্ত নিষ্ঠাই আপাতকঠোর। ব্যক্তিগত ভালো লাগা, মন্দ লাগা এবং আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়মানুবর্তী হইতে হইবে। প্রথম প্রথম ইহা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হইতে পারে—বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষার সব অংশই সাধনাসাপেক্ষ, কোনো অংশই অনায়াসসাধ্য নয়। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠা একবার চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়া গেলে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করা সহজসাধ্য হইবে।

জীবনের সুখ-দুঃখ

সংকেত—কেহ বলেন জীবন দুঃখময়, কেহ বলেন জীবন আনন্দময়, আসলে জীবনে সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে—দুঃখ দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না—দুঃখকে জয় করিয়াই মানুষ বড় হইয়াছে—সুখ ও দুঃখকে সমানভাবেই বরণ করিতে হইবে—সুখে আত্মহারা বা দুঃখে বিহ্বল হওয়া উচিত নয়।

বৌদ্ধরা বলেন যে, এই জীবন দুঃখময়। মানুষ জন্ম হইতেই দুঃখ লাভ করে—জরা, রোগ ও মৃত্যু মানুষকে নিরন্তর তাড়না করিতেছে। ইহা ছাড়া সংসারে থাকিলেই নানা দিক দিয়া অশান্তি দেখা যায়। যে সংসারী, সে কখনই সুখী হইতে পারে না। কোনো এক সময়ে সে নিজেকে সুখী বলিয়া মনে করিতে পারে বটে, কিন্তু ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সে পৃথিবীতে যতটা সুখভোগ করিয়াছে, তাহার চেয়ে বেশি পরিমাণে দুঃখভোগ করিয়াছে। এই দুঃখ হইতে মুক্তির জন্য বৌদ্ধগণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। কারণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বহু সাধনার পর নির্বাণ লাভ করিলে আর এই দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঠিক ইহার বিপরীত কথা ব্যক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একটি গানে বলিয়াছেন—

আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে।

এই পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ দুইই আছে—জীবনটা যে কেবল দুঃখময়, এমন মনে করিবার কোনো কারণ নাই। কখনও কখনও দুঃখকে দুঃসহ বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তবুও জীবনের প্রতি প্রত্যেকেরই যে একটা গভীর অনুরাগ আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনের প্রতি মানবের চিরন্তন আকর্ষণের কথা স্মরণ করিলে মানবজীবনকে দুঃখময় বলিয়া চিহ্নিত করিবার অর্থ থাকে না।

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ উপনিষদে এক বিশ্বব্যাপী আনন্দের কল্পনা করা হইয়াছে। ঋষিরা বলিয়াছেন যে, আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী জন্মিয়াছে, আনন্দের মধ্যেই তাহারা বিচরণ করিতেছে, আনন্দের মধ্যেই তাহারা বিলয় প্রাপ্ত হইবে। যদি আকাশভরা আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেই বা জীবনধারণ করিত।

বাস্তবিক জীবনের মূলে একটা গভীর আনন্দ না থাকিলে মানুষ জীবনকে এত ভালোবাসিত না। মানুষ শত দুঃখ পাইতে পারে, কিন্তু সুখ পাইবার আশা তাহার যায় না। জীবনের প্রতি তাহার যে অনুরাগ, যে আকর্ষণ আছে, তাহাই তাহাকে জীবনপথে পরিচালিত করে। দুঃখের ঘোর অন্ধকারেও তাহার জীবনানুরাগ আশার ক্ষীণদ্যুতি সঞ্চারিত করে। দুঃখকে চিরন্তন বলিয়া স্বীকার না করিয়া মানুষ নানাভাবে তাহার জীবনপ্রেমকেই বড়ো বলিয়া প্রমাণ করিতেছে।

অবশ্য তাই বলিয়া মানুষের জীবন যে সুখে পরিপূর্ণ এমন কথা বলা চলে না। জীবনের মূলে আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবনটা সুখ ও দুঃখ দুইয়ের সমবায়েই গঠিত। জীবনে কখনও দুঃখ পায় নাই এমন লোক বিরল। নিরবচ্ছিন্নভাবে সুখভোগ করা সম্ভবপর নয়। যদি কোনো ধনী মনে করে যে, অর্থ ব্যয় করিয়া আরামে জীবন যাপন করিয়া দুঃখের হাত এড়াইব, তাহা হইলেও তাহার সে আশা সম্পূর্ণ সফল হইবে না। অর্থ আরাম দিতে পারে, কিন্তু শান্তি বা স্বাস্থ্য দিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

ধনকুবের কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়াও শোকের হাত এড়াইতে পারে না। সব মানুষকেই কিছু না কিছু রোগ ভোগ করিতে হয়।

ইহা ছাড়াও এই জগৎ সংসারে এমন অনেক অবস্থা আসে, যাহা দুঃখদায়ক। দুঃখের বিবিধ রূপ আমরা জীবনের মধ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু দুঃখের কঠোর মূর্তি দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইবারও কোনো কারণ নাই। মানুষ দুঃখের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিয়াই বড়ো হইয়াছে। মানুষ যদি কেবলই সুখভোগ করিয়া জীবন যাপন করিত, তাহা হইলে তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বের গৌরব প্রকাশিত হইত না।

এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে মানুষ সাধ করিয়া দুঃখ বরণ করিয়াছে। গৃহকোণের সুখময় পরিবেশ ছাড়িয়া মানুষ অজানার সন্ধানে গিরিশৃঙ্গে, মরুভূমিতে বা মেরুপ্রদেশে পাড়ি দিয়া দুঃখকে বরণ করিয়া লয়। যাঁহারা বিদ্যার সাধক তাঁহারা প্রতিনিয়তই দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। যাঁহারা সন্ন্যাসী তাঁহারা তো সংসারের সকল সুখ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়া কঠোর নিয়মচর্যায় দিনাতিপাত করেন।—দুঃখ-স্বীকারের মধ্য দিয়াই মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। যে যত বড়ো দুঃখকে স্বীকার করিতে পারে, এই পৃথিবীতে সে তত বড়ো হয়।

জীবনে যখন সুখ আসে, তখন আত্মহারা হইয়া সুখ উপভোগ করিবার কামনা করিলে চলিবে না। যাহা সুখকর, তাহা যেন মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলে। জীবনে যখন দুঃখ আসে, তখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না—দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া দুঃখকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহা দুঃখকর তাহা যেন মানুষের শক্তিকে পরাভূত না করিয়া তাহার শক্তিকে জাগ্রত করিয়াই তোলে। সুখ ও দুঃখ সুসমঞ্জসভাবে যেন জীবনকে বিকশিত করে। আমাদের সকল সাধ ও সাধনা যেন সুখ ও দুঃখের সমবায়ে সার্থকতা লাভ করে।

দারিদ্র্য কি অভিশাপ ?

সংকেত—'অর্থমনর্থম্' ও 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী' দুইটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী—দারিদ্র্য কি—জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার সামর্থ্যের অভাবই দারিদ্র্য—দারিদ্র্য বহু প্রতিভা বিনষ্ট করিয়াছে—ভারতের চিন্তাধারা।

'অর্থমনর্থম্'—অর্থই যত অনর্থের মূল, এই কথাটি প্রাচীন পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া অর্থের প্রলোভন হইতে সকলকে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন। যীশু খ্রীষ্ট বলিতেন যে, একটি সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটি উট গলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু একজন ধনীর পক্ষে স্বর্গে প্রবেশাধিকার অসম্ভব। এ যুগের কবি দারিদ্র্যের জয় ঘোষণা করিয়া উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,

> হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান,
> তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
> কণ্টক মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,
> অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
> উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার,
> বীণা মোর শাপে তব হল তরবার।

এইরূপ উক্তি শুনিয়া মনে হয় যেন দারিদ্র্যের মতো উৎকৃষ্ট পদার্থ আর নাই, দারিদ্র্য মানুষের পরম বন্ধু, ধনী হইলেই মানুষের অশেষ দুর্গতি। বড়ো হইতে গেলে প্রথমে দরিদ্র হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে এই ধরণের উক্তি যে নেহাৎ কাল্পনিকতা তাহা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। অনাড়ম্বরভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া হৃদয়ে উচ্চ চিন্তা পোষণ করার আদর্শ সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু দারিদ্র্য যখন প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া জীবনের সর্বশক্তি হরণ করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে কখনই বরণীয় বলা যায় না। কথিত আছে যে, বুনো রামনাথ তেঁতুল পাতার ঝোল দিয়া ভাত খাইয়াও ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন ; কিন্তু ইহাকেও চরম দারিদ্র্য বলা যায় না—ইহা তাঁহার নির্লিপ্ত জীবনযাত্রার পরিচায়ক মাত্র। পর্যাপ্ত পরিমাণ ধনের অভাবই দারিদ্র্য নয়—জীবনযাত্রার পক্ষে যাহা ন্যূনতম প্রয়োজন, তাহার অভাবই দারিদ্র্য। যে বাস্তবিকপক্ষে দরিদ্র, তাহার আহার জুটিবে কি না সন্দেহ থাকে, তাহার

পরণে বস্ত্র কোনো রকমে হয়ত জোটে, কিন্তু অসুখ করিলে চিকিৎসা করিবার কোনো উপায় থাকে না, বিপদ আপদে সাহায্য পাইবার আশা নাই।

'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী'—কবি কালিদাসের নামে প্রচলিত এই সুভাষিতটি যথার্থই সত্য। জীবনযাত্রার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে যাহার দিন কাটিয়া যায়, তাহার গুণ বিকশিত হইবে কী করিয়া? যে বালক হয়তো অসাধারণ প্রতিভা লইয়া দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার দুই বেলা অন্ন জোটে না, বিদ্যালয়ে পড়িবার সংগতি নাই—বড়ো জোর গ্রাম্য পাঠশালায় দুই এক বৎসরের মতো পড়িয়া তাহার পর কাজে লাগিয়া যায়। প্রতিকূল অবস্থা তাহাকে প্রতি মুহূর্তে নিপীড়ন করিতে থাকে। তাহার প্রতিভা অচিরে বিলয়প্রাপ্ত হয়।

কেবলমাত্র দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে কত প্রতিভা যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দারিদ্র্য মানুষের উচ্চাভিলাষ বিনষ্ট করিয়া তাহার কর্মশক্তিকে অসাড় করিয়া দেয়। ধনীর সহিত নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া তাহার মনে যে একটা হীনতাবোধ জাগে, তাহাতে সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহস পায় না। সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইয়া সে কোনোমতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।

কেহ কেহ বলেন যে, দরিদ্র হইলে সরল-অনাড়ম্বর জীবন যাপন সম্ভবপর। কিন্তু অভাবের মতো শত্রু আর নাই। জীবিকার জন্য যাহাকে সংগ্রাম করিতে হয়, এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহের জন্য যাহাকে পাগলের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, সে কয়দিন নৈতিক দৃঢ়তা পোষণ করিতে পারে। কোনো রকমে বাঁচিবার মতো উপাদান সংগ্রহ করিবার প্রয়াস করিতে করিতে তাহার দৃষ্টি ক্রমে হীন হইয়া পড়ে। সে মানবতার গৌরববোধই হারাইয়া ফেলে।

দারিদ্র্য এবং বিত্তের অভাব এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। উপনিষদে পাই যে, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যখন তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে তাঁহার সম্পত্তি দান করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন মৈত্রেয়ী বলিয়াছেন, 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্'—যাহা দিয়া আমি অমর হইব না, তাহা দিয়া আমি কি করিব? তিনি বিত্তকে উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে দারিদ্র্যকেই বরণীয় বলিয়াছেন এমন নয়। উপনিষদেই আছে যে,

সাধনার পথে প্রথমে অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শরীর ধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় অন্নের দাবি না মিটাইলে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। ধনের আড়ম্বরকে ভারতবর্ষ কোনো দিন চরম গৌরব দিতে চায় নাই, নিঃস্পৃহতাকে সে বরণীয় বলিয়াছে। কিন্তু কোনো মতে কায়ক্লেশে জীবন-যাপনের কথা সে প্রচার করে নাই। ভারতবর্ষে যে দারিদ্র্য সর্বত্রব্যাপী তাহার কারণ অন্যত্র। যাঁহারা আদর্শবাদী, যাঁহারা কবি বা ভাবুক, তাঁহারা ধনীর ধনচিন্তা-সর্বস্বতার নিন্দা করিয়া দারিদ্র্যের প্রশংসা করিয়াছেন—বাস্তবিকপক্ষে স্বচ্ছল অথচ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল।

ভদ্রতা ও শিষ্টাচার

সংকেত—অতি অভদ্র ও অতিরিক্ত বিনয়ী দুইপ্রকার লোকই চোখে পড়ে—মানুষের প্রকৃতি অশিষ্ট হইলে ব্যক্তিত্ব বা পৌরুষ প্রকাশ পায় না—শিক্ষা ও রুচির অভাবেই এই বিকৃতি ঘটে—শিষ্টাচার ও ভদ্রতা রক্ষা করিতে গিয়া অনেক সময় নিজের কিছু কিছু অসুবিধা ও ক্ষতি হয়।

এক একজন লোক আছে, যাহাদের সহিত কথা কহিলে এমন ভাবে তাহারা প্রত্যুত্তর দেয় যে তাহা আদৌ প্রীতিকর বলিয়া মনে হয় না। তাহাদের আচরণেও যেমন, বাক্যালাপেও তেমনই একটা রুক্ষতা দেখা যায়। আবার কোনো কোনো লোক সাধারণ কথা বলিতে গিয়া বিনয়ে যেন গলিয়া পড়ে। প্রতি পদে তাহারা অহেতুক স্তাবকতা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। তাহাদের বিনয়ের আতিশয্য রুচিকর না হইয়া বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। যে রূঢ় আচরণ করে এবং যে অতি বিনয় দেখায়, তাহারা উভয়েই আমাদের প্রীতি লাভ করিতে পারে না।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কাহারও সহিত আচরণ করিতে হইলে এই সম্প্রীতির বোধটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। যাহারা কঠোরভাবে কথা বলেন, তাঁহারা অনেক সময় মনে করেন যে, ইহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব যেন বড়ো হইয়া প্রকাশিত হইবে—তাঁহাদের পৌরুষ দেখিয়া লোকে সন্ত্রস্ত হইবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অকারণে বা সামান্য কারণে রূঢ় উক্তি ভদ্রতাবোধের অভাবের নিদর্শন এবং অশোভনও বটে। তাঁহারা যাহাদের সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন তাহারা কেহই তাঁহাদের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ

হইয়া পড়ে না, বরং তাঁহাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বা সুস্পষ্ট অশ্রদ্ধা ও বিরাগের ভাব পোষণ করে।

ভদ্রতাবোধের অভাবের মূলে যেমন অহংকার বর্তমান, তেমনই শিক্ষার অভাবকেও ইহার জন্য দায়ী করা যাইতে পারে। শৈশব হইতে শিষ্টভাবে আচরণ করিতে না শিখিলে অভদ্রভাবে কথাবার্তা বলা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়। 'তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অপ্রীতিকর উক্তি করা বা আচার-ব্যবহারে অশিষ্টতার পরিচয় দেওয়া যেন প্রকৃতির অনুগত হইয়া পড়ে। এই ধরণের অভদ্রতা ও অশিষ্টতা গ্রাম্যতার নিদর্শন।

আবার ভদ্রতার নামে বাড়াবাড়িও নিষ্প্রয়োজন। 'আপ পহ্‌লে' বলিয়া যে সব ভদ্রতার আতিশয্যজ্ঞাপক ব্যঙ্গ-কাহিনী প্রচলিত, তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। বিনীত ভাব ভালো সন্দেহ নাই, কিন্তু বিনয়ের বশবর্তী হইয়া আপনাকে তৃণজ্ঞান করিয়া অপরকে বড়ো করার কোনো সার্থকতা নাই। আচরণের মধ্যে যাহাতে ভারসাম্য বা সৌষম্যবোধ থাকে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। নিরর্থক অতি বিনয় চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়, আর না হয় বাহ্য বিনয়ের আবরণে প্রকৃত মনোভাবকে গোপন করিয়া রাখা হয়।

অপরিচিত, অল্প-পরিচিত বা অতিশয় ঘনিষ্ঠতা হয় নাই এইরূপ পরিচিত ব্যক্তির সহিত ভদ্রতা প্রয়োজন। নিকট আত্মীয় বন্ধু, যাহাদের সহিত অন্তরের সম্বন্ধ আছে, তাহাদের সহিত ভদ্রতার পরিবর্তে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়। ভদ্রতা মানুষের শিক্ষার একটি অঙ্গ—মানুষের সহিত মানুষের যে একটি অলিখিত প্রীতির সম্পর্ক আছে ভদ্রতা তাহারই পরিচয় প্রদান করে। যাহার মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার ভাবটি নাই সেই অভদ্র আচরণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

অবশ্য ভদ্রতার জন্য অনেক সময় ছোটোখাটো অসুবিধা এমন কি অন্যায়ও সহ্য করিতে হয়। কেহ যদি তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে অপ্রীতিকর আলোচনা করে, তাহা হইলে তাহা অসংগত জানিলেও ভদ্রতার খাতিরে তাহার প্রতিবাদ করা যায় না। কেহ কেহ ইহাকে মানসিক শক্তিহীনতা বলিয়া অভিযোগ করেন। কিন্তু ভালো করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে অনুভব করা যাইবে যে, ইহা আত্মসংযমের একটা নিদর্শন। আমাদের মনে অনেকগুলি

আদিম প্রবৃত্তি আছে, সেগুলিকে সাধারণভাবে ষড় রিপু বলা হয়। যখন শিক্ষার গুণে বা স্বভাবজ প্রবণতার ফলে এই রিপুগুলি আবৃত হইয়া থাকে, তখনই ভদ্রতা ও শিষ্টাচার সম্ভবপর হয়।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে শিষ্টাচারের তুলনায় ভদ্রতাকে কতকটা কৃত্রিম বলা চলে। কোনো কোনো স্পষ্টভাষী ভদ্রতাকে একটা মুখোশ মাত্র বলিয়া অভিযোগ করেন। তাঁহাদের মতে ভদ্রতার অর্থ মনের আসল ভাবটি চাপিয়া রাখিয়া একটা কৃত্রিম মিথ্যা ভাব বাহ্যত প্রকাশ করা। ভদ্রতা দিয়া এইভাবে মনের ভাবকে ঢাকিয়া রাখা চলে—কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকেই ভদ্রতার লক্ষণ বলা অসংগত। পৃথিবীতে সকলেই যদি আপন আপন মনের ভাব যথাযথ-ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে বিরোধের অন্ত থাকিত না। ভদ্রতা সেই সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে—শিষ্টাচার মানুষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ককে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ যে অসভ্য অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছে, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার তাহার অন্যতম প্রমাণ।

"অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"

সংকেত—প্রবাদটির তাৎপর্য কি—জীবনের ক্ষেত্র হইতে নানা দৃষ্টান্ত—হাতুড়ে ডাক্তার, আনাড়ি ইঞ্জিনীয়ার, অন্তঃসারশূন্য অধ্যাপক ও শিক্ষক—বিদ্যা অল্প হইলেও যদি সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা যায় তবে অল্পবিদ্যায় অনিষ্ট নাই—এক্ষেত্রে অজ্ঞতার চেয়ে অল্পবিদ্যা ভাল।

বিদ্যা যে শুভঙ্করী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং অল্পবিদ্যা কেন যে ভয়ঙ্করী হইবে সে সম্পর্কে আমাদের মনে একটা সন্দেহ থাকিয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যার সীমা নাই! সকলেই অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইতে পারে না। বেশীর ভাগ লোককেই বিদ্যা অল্পপরিমাণে চর্চা করিয়াই ছাড়িয়া দিতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানের বিরাট পরিসরের কথা স্মরণ করিলে আমরা যে তাহার একটি অতিক্ষুদ্র অংশের অধিকারী এই বোধটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। সুতরাং 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' বলিলে আমাদের প্রায় সকলের বিদ্যাকেই ভয়ঙ্করী বলিতে হয়। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিদ্যার সল্পাংশও মঙ্গলসাধন করে। সুতরাং এই প্রবাদটির যাথার্থ্য সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে।

প্রবাদটির তাৎপর্য এই যে, কেহ যদি অল্পবিদ্যার অধিকারী হইয়াও নিজেকে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া মনে করে এবং অভিজ্ঞের মতো আচরণ করিতে থাকে, তবে তাহার সেই অল্পবিদ্যাই ভয়ঙ্করী হইয়া উঠে। এমন দেখা যায় যে, পল্লী অঞ্চলে কোনো কোনো কম্পাউণ্ডার চিকিৎসা সম্পর্কে বাড়ীতে কয়েকখানি বই পড়িয়া ডাক্তার হইয়া উঠে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বই পড়িয়া চিকিৎসক হইয়া উঠিয়াছে এবং পসার জমাইবার চেষ্টা করিতেছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। কিন্তু তাহাদের চিকিৎসা নিতান্তই হাতুড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহাদের চিকিৎসা ফলপ্রদ হইলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মারাত্মক হইয়া উঠে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেখানে সাবধানে ঔষধ নির্বাচন করিয়া প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, সেখানে হাতুড়ে চিকিৎসক বিশেষ চিন্তা না করিয়া তাহার স্বল্পবিদ্যা অনুসারে একটা ঔষধের ব্যবস্থা করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভুল চিকিৎসায় রোগকে জটিলতর করিয়া তোলে। অল্পবিদ্যা যে ভয়ঙ্করী, হাতুড়ে চিকিৎসকরা তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

সব ক্ষেত্রেই স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী হইবার আশঙ্কা আছে। যাহারা ভালো করিয়া বিদ্যা অর্জন করে নাই, তাহারা যখন কোনো বৃত্তি অবলম্বন করে তখন তাহাদের আর্থিক দাবির পরিমাণ স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত কম হয়। অনেকে পয়সা বাঁচাইবার জন্য তাহাদের নিয়োগ করিয়া পরে ফলভোগ করেন। যেখানে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার প্রয়োজন, সেখানে আধা-ইঞ্জিনীয়ার দিয়া কাজ সারিবার চেষ্টা করিলে পরে পস্তাইতে হয়। আনাড়িকে দিয়া কাজ নষ্ট করিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই—জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইহা অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখা যায়।

যে ব্যক্তি অল্পবিদ্যার অধিকারী হইলেও নিজেকে অভিজ্ঞ বলিয়া জাহির করিতে চায়, সে তাহার শূন্যগর্ভতা ঢাকিবার জন্য নিজের ঢাক নিজেই পিটাইতে থাকে। সে তাহার বিদ্যার স্বল্পতার জন্য প্রতিপদেই ভুল করে, অথচ নিজের বিদ্যা সম্পর্কে একটা অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করার জন্য ভুল সংশোধন করিতে চেষ্টা করে না, বরং আপনার স্বল্প জ্ঞানকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া যথার্থ জ্ঞানের প্রতি একটা সজ্ঞান বিরুদ্ধতার ভাবই পোষণ করে। যাহারা একেবারে অনভিজ্ঞ, তাহারা তাহাদের আড়ম্বরে ভুলিয়া গিয়া সর্বনাশের পথ আবিষ্কার করিয়া দেয়। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহীশূরের

মহারাজাকে তাঁহার রাজ্যের প্রতিটি বিভাগে একদল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন ; কারণ অর্ধ-অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়া পূর্ণ কাজ হইবার আশা করা যায় না।

স্বল্পবিদ্যার অধিকারী হইলেও কেহ যদি সেই স্বল্পতা সম্পর্কে নিজে সচেতন থাকে তাহা হইলে তাহা ভয়ঙ্করী হইয়া উঠে না। একটু কাটিয়া গেলে ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হয় না, টিন্‌চার আয়োডিন দিয়াই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাজ চলিয়া যায়। জ্ঞানের সীমা সম্পর্কে সচেতন থাকিলে যেখানে স্বল্প জ্ঞান ব্যর্থ হইয়া পড়ে, সেখানে জোর করিয়া বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা করিলে উপযুক্ত ফলভোগ করিতে হয়। বিদ্যার স্বল্পতা সম্পর্কে সচেতন থাকাই অল্পবিদ্যার কুফল এড়াইবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

বর্তমানে বিদ্যার বিভিন্ন দিক এমন বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে যে, সবগুলিকে ভালো করিয়া আয়ত্ত করা সম্ভবপর নয়। তবে প্রতি বিষয়েই প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সেই পরিমিত জ্ঞানটুকু লইয়া যদি নিজেকে অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলেই বিপদ। তবে অল্পবিদ্যা বিকৃত মূর্তি পরিগ্রহ না করিলে অজ্ঞতার চেয়ে শতগুণে ভালো। অজ্ঞতা যেখানে অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরে, অল্পবিদ্যা সেখানে ক্ষীণ আলোকও দেখিতে পায়। সুতরাং অল্পবিদ্যার মন্দ দিকটা সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া সকলেরই বিভিন্ন বিষয়ে কিছু-না-কিছু জ্ঞান আহরণ করিবার চেষ্টা করা সমীচীন।

ভারতের শিক্ষা-সমস্যা

সংকেত—ভারতে ভয়াবহ নিরক্ষরতা—বৃটিশ শাসনে প্রাচীন ব্যবস্থার লোপ—সর্বজনীন শিক্ষার প্রাচীন ব্যবস্থা—স্বাধীনতা লাভের পর নূতন উদ্যম—আবশ্যিক ও অবৈতনিক—প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা—অর্থের অনটন।

বর্তমানে পৃথিবীর অনেকগুলি দেশই শিক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে। রুশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশ এমন কি সুদূর প্রাচ্যের জাপানেও শিক্ষার অভূতপূর্ব বিস্তার হইয়াছে। কয়েকটি অনুন্নত দেশে অবশ্য শিক্ষার বিস্তার তেমন হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে অশিক্ষিত ও নিরক্ষরের সংখ্যা এত বেশি যে, তাহা অন্যত্র কল্পনা করাও

দুঃসাধ্য। যে দেশ সংস্কৃতির চর্চায় বিশেষ উন্নতির পরিচয় দান করিয়াছে, সে দেশের অগণিত জনগণ কী করিয়া নিরক্ষর থাকে, এ প্রশ্নের উত্তর সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষ কখনও পুঁথিগত বিদ্যার উপর জোর দেয় নাই। লিখিতে ও পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে চিরদিনই কম, কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত ছিল না। দেশের যাহা সাধনার ধন, তাঁহা তাহারা অনায়াসে লাভ করিত। সমাজবন্ধনের উপর নির্ভরশীল থাকায় সমাজের সর্ব স্তরেই শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছিল—অবশ্য এ শিক্ষা কেতাবী শিক্ষা নয়, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাবনার উপরই ছিল ইহার ভিত্তি।

কিন্তু কালক্রমে, বৃটিশ শাসনের সময় হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সমাজ আর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে নাই। পূর্বে একদিকে চতুষ্পাঠী-পাঠশালার মধ্য দিয়া, অপরদিকে যাত্রা-গান-পাঁচালী প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সংস্কৃতির ধারা গিয়া পৌছাইতেছিল ; কিন্তু এখন হইতে শিক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল। ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত ভারতবর্ষের প্রাণের যোগ ছিল না। সুতরাং এই বিদ্যা সারা দেশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ আধুনিক কালে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষা অসাধারণ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। পরাধীন ভারতবর্ষে সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে উৎসাহ দিবার মতো শক্তি ছিল না—মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষাব্রতী বা সমাজহিতৈষী দেশের মধ্যে শিক্ষার ধারাকে প্রবাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ধনী বা মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডী পার হইয়া শিক্ষা দরিদ্র জনসাধারণের দ্বারে গিয়া পৌছায় নাই।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর দেশব্যাপী শিক্ষার অভাব দূর করিবার জন্য নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দিক দিয়া নানা প্রচেষ্টা করিতেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক এবং অবৈতনিক করিবার প্রস্তাব অনেকে করিয়াছেন—বহুস্থানে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিতও হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই সামান্য। গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্থাপন করিলে তবেই এদেশের দরিদ্র শিশুরা শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু শিক্ষার সেই বিপুল ভার বহন করিবার শক্তি বর্তমানে রাষ্ট্রের নাই। এই দরিদ্র দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বহন করাও দুঃসাধ্য। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বহুস্থলে ছেলেমেয়েরা শৈশব শেষ হইতে না হইতেই জীবিকা-অর্জনের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করিয়া তোলা নিতান্ত সহজসাধ্য হইবে না। তবে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কেরল-প্রমুখ কয়েকটি রাজ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা যেভাবে ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে আগামী কুড়ি বৎসরের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা দশ-বারো হইতে শতকরা পঞ্চাশে গিয়া দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইংরেজ আমলে এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে তাহাকেও অনেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং বিভিন্ন কারণে বর্তমানে অনুপযোগী বলিয়া মনে করেন। ইংলণ্ডে প্রায় দেড়শত বৎসর আগে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তাহার অনুসরণে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। তাহার পরে ইংলণ্ডের শিক্ষা যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে—কিন্তু ভারতের শিক্ষা-প্রণালীর সেই সাবেক কাঠামোটি আজও বজায় আছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এদেশের উপযোগী করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রণালীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই পরিকল্পনা অনুসারে যে কাজ হইয়াছে তাহার পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। গত একশত বৎসর ধরিয়া ছাত্ররা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহার বেশির ভাগই নিষ্ফল হইয়াছে। এইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম দিকে মোটামুটিভাবে জ্ঞানসঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়া বিদ্যালয়ের শেষ কয়বৎসরে বিজ্ঞান, কলা, ইতিহাস, ভেষজবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা বা কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রস্তুতির পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এই নূতন শিক্ষা-প্রণালীর ব্যয় বহন করা এই দরিদ্রদেশের জনগণের পক্ষে কষ্টকর—বিদ্যালয়গুলিতে রাষ্ট্র হইতে যে সাহায্য পাওয়া যায় তাহাও নিতান্তই নগণ্য। সুতরাং পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করার সময় একটা ঘোরতর শিক্ষাবিভ্রাটের আশঙ্কা রহিয়াছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা এইরূপ হওয়ায় উচ্চশিক্ষার তেমন প্রসার হয় নাই। ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি বিষয় ব্যতীত অন্যত্র উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র বিশেষ সম্প্রসারিত হয় নাই—সম্প্রতি অর্থনীতি ও বাণিজ্যবিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দিয়াছে এই মাত্র। কিন্তু কারিগরি বিদ্যা বা পূর্তবিদ্যার শিক্ষাদানের জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাহা নিতান্তই নগণ্য। দেশে ভেষজবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সংখ্যা পরিমিত। মহাবিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা আছে তাহাও যথেষ্ট নয়। ছাত্ররা প্রায়ই উচ্চশিক্ষার অবকাশ পায় না—তাহা ছাড়া উচ্চশিক্ষা এতই ব্যয়সাধ্য যে, সাধারণ মধ্যবিত্তের ছেলেদের পক্ষেও তাহার ভার বহন করা কঠিন।

বর্তমানে শিক্ষার দিকে অনেক মননশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু দুইটি কারণে ভারতের শিক্ষাসমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না—একটি অর্থাভাব, অপরটি উপযুক্ত উদ্যমের অভাব। অর্থের অভাবে একদিকে যেমন উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইতেছে না, অপর-দিকে অর্থনৈতিক কারণে ছাত্ররা শিক্ষাগ্রহণ করিতে পারিতেছে না। দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অনিশ্চিত হওয়ায় শিক্ষার প্রতি সকলে আগ্রহও পোষণ করিতেছে না। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হইলে এই সমস্যার কতকটা সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা হয়। বর্তমানে সরকার শিক্ষাখাতে যাহা ব্যয় করেন তাহার পরিমাণও যৎসামান্য। শিক্ষাই যে জাতীয় উন্নতির ভিত্তি এই বোধটি সুস্পষ্ট না হওয়ার জন্য রাষ্ট্র-পরিচালকবৃন্দ শিক্ষার দিকে যথোপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করিতেছেন না। এই অবস্থার অবসান না হইলে দেশের কল্যাণ নাই।

প্রাথমিক শিক্ষা

সংকেত—নিরক্ষরতা দূর করাই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ যথেষ্ট অগ্রসর নয়—দারিদ্র্য ও অশিক্ষা—রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থা—প্রাথমিক শিক্ষার বহুমুখী পরিকল্পনা।

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানই প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যে দেশ তাহার সমস্ত অধিবাসীকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারে নাই, সে

দেশ পিছাইয়া আছে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতবর্ষ উন্নতি লাভ করিলেও ভারতবর্ষ শিক্ষার দিক দিয়া একটি অনগ্রসর দেশ। এদেশের অগণিত জনসাধারণ শিক্ষার সংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত—বর্তমানে এ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত তাহা একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ—সাধারণ মানুষ সেই শিক্ষা গ্রহণ করিবার সুযোগ পায় না।

দেশের এই অবস্থা দূর করিবার জন্য প্রাথমিকশিক্ষার ব্যবস্থা সুপ্রচুর করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ যখন বৃটিশের অধীন ছিল, তখন ভারতবাসীকে শিক্ষা-দানের গরজ তৎকালীন শাসকবর্গের ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার দূরীকরণ অভিযান ভারতরাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে অবহিত—কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের দিকে যতটা দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, তাঁহারা ততটা দৃষ্টি দিতে পারিতেছেন না। অশিক্ষা-দূরীকরণেই যে সর্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া উচিত, এই কথাটা তাঁহারা যেন ভালো করিয়া বুঝিতে চাহিতেছেন না। এদেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিদূরিত হওয়ার কোন আশাই নাই। নেতৃবৃন্দ ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু সেই বিরাট ব্যয়ের শতকরা দশেরও কম অংশ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে—তাহারও একটি ভগ্নাংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অর্থসাপেক্ষ- কিন্তু তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে সাধ্যাতীত নয়—এ পর্যন্ত যে সামান্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার চেয়ে অনেক কিছু করা উচিত ছিল।

রাষ্ট্র যদি প্রাথমিক শিক্ষার ভার গ্রহণ না করে, তাহা হইলে এই দরিদ্র দেশে শিক্ষার প্রসার অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এ দেশের শতকরা আশীজন লোকের বিদ্যালয়ের মাহিনা জোগাইবার সংগতি নাই—শতকরা অন্ততঃপক্ষে ষাট জন অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগিতা প্রচার মাত্র করিলে চলিবে না। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং আবশ্যিক করিতে হইবে। নতুবা দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার উপযুক্ত পরিমাণে সম্ভবপর হইবে না। নব্য চীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের দুই-তিন

বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক এবং অবৈতনিক করিয়া একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে লিখিতে পড়িতে শেখানো। যাহাতে সকলে মাতৃভাষায় সংবাদপত্রাদি পড়িতে, চিঠিপত্রাদি লিখিতে ও হিসাবপত্র করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। দেশের সকলেই যাহাতে মোটামুটি রকমের জ্ঞান অর্জন করিতে পারে, অশিক্ষার অন্ধকারে একেবারে না ডুবিয়া থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে উপযুক্ত পাঠসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, অথচ যাহারা প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডী পার হইয়া উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

প্রাথমিক শিক্ষা মুখ্যতঃ শিশুদের জন্য। শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হইবে সে সম্পর্কে বর্তমানে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমান। পুরাতন মত হইতেছে 'দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ'। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে খেলার মধ্য দিয়া শিক্ষার ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ডিউই প্রণালী ব্যবহারিক কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করিয়াছে। বর্তমানে ভারতের শিক্ষাবিদ্‌বৃন্দ যে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাও কাজের মাধ্যমে এবং পরিচিত পরিবেশের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। —কিন্তু এই বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় একমাত্র পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ছাড়া আর কোনো কাজ হয় নাই বলিলেই হয়। বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এখনও চালু করা হয় নাই। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীকে বর্জন করিয়া নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিবার মতো সাহস অনেকের নাই। বাস্তবিকপক্ষে পূর্বতন শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন না করিলে শিক্ষার অধিকাংশ নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া পড়িবে। প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যার এই দিকটিতেও লক্ষ্য দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা

সংকেত—মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষার সোপান—মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা—আধুনিক পরিকল্পনা—ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী—নবম হইতে একাদশ শ্রেণী—multi-purpose বা বহু-বিধায়ক বিদ্যালয়।

প্রাথমিক শিক্ষা মানুষের সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তি—মাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষার সোপান বলা যাইতে পারে। দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার সময় কতকগুলি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এমন একটা শক্তি দেখা যায় যাহাতে মনে হয় যে, সে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে। সেই বিষয়টি যে সব সময় শুদ্ধমাত্র চর্চা হইবে এমন কোনো কথা নাই—বিজ্ঞানের বিভিন্ন অংশ, কারিগরি শিক্ষা, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষালাভের প্রস্তুতির জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা প্রয়োজন। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার যথার্থ মূল্য অবগত হইয়া ইহার দিকে যথোপযুক্ত দৃষ্টি দিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া দশ-এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত দেওয়া হয়। বারো-তেরো বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া সতেরো-আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার কাল। এই সময়, যেটিকে সাধারণভাবে কৈশোর বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহা জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ। এই সময়েই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়। এই সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মন স্বভাবতঃই নূতন বিষয় গ্রহণ করার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। এই সময়ে তাহাদের শিক্ষাদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিলে তাহাদের জীবন পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। অন্যথায় তাহাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই সময়ের শিক্ষাই ভাবী শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং এই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা উপযোগী ও পর্যাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাধ্যমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে ভারতবর্ষে কয়েকটি জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইংরেজ আমলে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, তাহাতে যথার্থ শিক্ষার

পথ অতিশয় সংকীর্ণ ছিল। কোনো মতে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি গলাধঃকরণ করিয়া পরীক্ষার নির্দিষ্ট মান অতিক্রম করিলে চলিত। যাহাদের মেধা প্রথম শ্রেণীর তাহারা অবশ্য প্রতিকূল অবস্থাসত্ত্বেও জ্ঞানচর্চায় অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের শিক্ষা ফলবতী হয় নাই। মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা ক্রমে সাধারণ লিখন-পঠন-ক্ষমতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কৈশোরের একাগ্র সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না।—বর্তমানে পুরাতন কাঠামো ভাঙিয়া নূতন একটা শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন করিবার মতো প্রতিভা শিক্ষাবিদ্‌দের কাহারও নাই—তাঁহারা শিক্ষাসংস্কারের জন্য যেটুকু চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সমালোচনায় সঙ্কুচিত হইতেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র যে অর্থ ব্যয় করিতেছে তাহা প্রধানতঃ ইষ্টক-মন্দির নির্মাণেই নিযুক্ত হইতেছে—বিদ্যার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবার দিকে প্রয়াস বিশেষ নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ করিয়া তুলিবার জন্য ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ষষ্ঠ হইতে অষ্টম ও নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম তিন বৎসর পরবর্তী তিন বৎসরের শিক্ষার প্রস্তুতি-কাল। বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ করিয়া দেওয়ায় এবং কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্যনীতি, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত প্রস্তুতিও শেষ তিন বৎসরে সম্ভবপর হইবে। প্রথম তিন বৎসরে যাহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ নাগরিক হইবার উপযোগী জ্ঞানের ব্যবস্থা আছে—শেষ তিন বৎসরের পাঠক্রমের উদ্দেশ্য অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেরণ করা। পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে মোটামুটি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল, বর্তমানে ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণীতেই তাহা লাভ করা যাইতে পারে—অবশ্য শিক্ষার মান কমাইয়া পরিধিটিকেই বিস্তৃত করা হইয়াছে।

কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বর্তমানে বেশির ভাগ বিদ্যালয়েই একাদশ শ্রেণীর পঠন-পাঠনের উপযোগী ব্যবস্থা নাই। মফঃস্বলের অতি অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়েরই বিজ্ঞান, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলির শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার উপযুক্ত সংগতি আছে। বর্তমানে রাষ্ট্র যে অর্থ মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় করিতেছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ শতটি বহু-বিধায়ক-

(multi-purpose) বিদ্যালয় স্থাপনের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে তাহা কার্যকরী হইতে অযথা বিলম্ব হইতেছে। দেশের ভাবী উৎকর্ষ-সাধনের ভার যে কিশোরদের উপর রহিয়াছে, তাহাদের গড়িয়া তুলিবার উপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় ত্রুটি ও ঔদাসীন্য সরকারী শিক্ষা-বিভাগের পক্ষেও যেমন, দেশবাসীর পক্ষেও তেমনই নিতান্ত অগৌরবের বিষয়।

সাহিত্য শিক্ষা বনাম বিজ্ঞান শিক্ষা

সংকেত—উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা সাহিত্যপ্রধান—বর্তমান যুগের শিক্ষা বিজ্ঞানপ্রধান—বিজ্ঞান বাদ দিয়া শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবতা-বোধবর্জিত—চিত্তবৃত্তির বিকাশ ও প্রকাশ-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সাহিত্যশিক্ষার প্রয়োজন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও শিক্ষা বলিতে প্রধানতঃ সাহিত্য শিক্ষাই বুঝাইত। এদেশে প্রাচীন বাংলা বা সংস্কৃত সাহিত্য পাঠই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল—দর্শনের চর্চা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পণ্ডিত করিতেন। ইউরোপেও ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। কেহ কেহ সাহিত্য শিক্ষা করিবার পর ইতিহাস বা দর্শন লইয়া চর্চা করিতেন। অতি অল্প কয়েকজন লোক বিজ্ঞান লইয়া চর্চা করিতেন। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নিতান্ত অপ্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞান আর কয়েকজন কৌতূহলী ব্যক্তির পাগলামির উপাদান হইয়া নাই—ইহা বর্তমান সভ্যতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ—বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানব সভ্যতা এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অসাধারণ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বর্তমানে নিত্য নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন; আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি পদেই বিজ্ঞান একটা অতি-প্রয়োজনীয় স্থান করিয়া লইয়াছে।

এ অবস্থায় বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া শিক্ষার কল্পনা বাস্তববোধের অভাবের পরিচয় দান করিবে। বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকিলে এক পাও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। বিজ্ঞানচর্চা করা সকলের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে

পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের বহু বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি শিক্ষা গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই আবশ্যিক। রামধনু কেন হয়, সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের সম্পর্ক কী, শিশির পড়ে কেন, স্টিম ইঞ্জিন বা মোটর গাড়ি কী ভাবে চলে, বিদ্যুৎ কী ভাবে পাখা চালায় বা আলো জ্বালায়—এই ধরণের সাধারণ বিষয়গুলি-সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে চলিবে না। বিজ্ঞান এতটা উৎকর্ষ ও প্রসার লাভ করিয়াছে যে, ইহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানকে এড়াইলে আমরা সংস্কৃতির একটা প্রধান অঙ্গ হারাইব।

বিজ্ঞান শিক্ষা প্রয়োজন হইলেও সাহিত্য শিক্ষারও যে অনুরূপ প্রয়োজন আছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্য মানুষের চিত্তকে প্রশস্ততর করিয়া তোলে। সাহিত্য মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে বলিয়া তাহার অন্তরকে মহৎ চিন্তায় পরিপূরিত করিতে পারে। ইহা তাহার রুচি উন্নত করিয়া তাহাকে সংস্কৃতিসম্পন্ন করিয়া তোলে। মানুষের হৃদয়ের ভাব ও আবেগগুলি পরিমার্জিত করিয়া সাহিত্য মানবমনে প্রশান্তি ও স্থৈর্য আনয়ন করিতে সক্ষম হয়। তাহা ছাড়া ইহাতে ভাষার জ্ঞান বর্ধিত হওয়ায় মানুষ আপনাকে আরো ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারে—এই গণতান্ত্রিক যুগে প্রকাশ-ক্ষমতার একটি বিশেষ মূল্য আছে সন্দেহ নাই। সুতরাং সাহিত্য শিক্ষাও অবশ্য প্রয়োজন।

বাস্তবিকপক্ষে সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুইটি বিষয়ই শিক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেকটির বিশিষ্ট গুণ আছে এবং আমরা এই দুইটির মধ্যে যে কোনো একটিকে বাছিয়া লইয়া অপরটিকে এড়াইয়া যাইতে পারি না। নিছক সাহিত্যের চর্চা করিলে কল্পনাপ্রবণ ও বাস্তব-জ্ঞান-বর্জিত হইবার আশঙ্কা আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকার জন্য আমরা আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলি স্বীকার করিয়া লইয়া অধ্যাত্মবাদ বা আদর্শবাদের নামে সব কিছু চাপা দিতে পারি। তাহাতে কালক্রমে আমাদের সংরক্ষণপন্থী হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে—প্রচলিত রীতিনীতির উগ্র সমর্থক হইতে পারি; কিংবা কর্মনিরপেক্ষ হইয়া ঘরে বসিয়া বৈপ্লবিক চিন্তা প্রচার করিতে পারি। অপরপক্ষে শুদ্ধমাত্র বিজ্ঞানের চর্চায় মানবমনের রসধারা শুকাইয়া যাইতে পারে। তখন আমরা সামঞ্জস্যবোধ হারাইয়া ফেলিয়া অহমিকামত্ত হইয়া উঠিতে পারি। জীবনের রহস্য ও ইহার বহুবিচিত্র রূপের দিকে তখন আর আমাদের দৃষ্টি থাকে না।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য এই দুইটির কোনো একটিকে অবহেলা করিলে চলিবে না। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া কৈশোর পর্যন্ত দুইটি বিষয়ই সমভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে—তাহা হইলে সাহিত্য পাঠের ফলে উদারচিত্ততা, কল্পনাশক্তি, মহত্ত্ববোধ ও রসবোধ সঞ্চারিত হইবে, তাহার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা সংযুক্ত হইয়া শিক্ষার্থীকে জীবন-সচেতন, স্থৈর্যসম্পন্ন, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, সৃষ্টিশীল ও আত্মবিশ্বাসী করিয়া তাহার জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, যেখানে বিশেষ বিশেষ বিভাগের শিক্ষা প্রয়োজন সেখানে অবশ্য এই দুইটি বিষয় একসঙ্গে শিক্ষা করা যায় না বা তাহার প্রয়োজনও নাই।

বর্তমান ভারতে ইংরেজীর স্থান

সংকেত—পরাধীন ভারতে ইংরেজী ছিল শিক্ষার বাহন—ইহার সুফল ও কুফল—স্বাধীন ভারতে ইংরেজীর স্থান সঙ্কুচিত হওয়া স্বাভাবিক—ইংরেজী ভাষা বিতাড়ন সম্ভব হইলেও কল্যাণ-জনক নহে—ইংরেজী ও হিন্দী।

ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে সময় যাহা কিছু শিক্ষা করিতে হইত, সবই ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা করা আবশ্যিক ছিল। বিদেশের একটি ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা অস্বাভাবিক বটে কিন্তু ইহার অনেকগুলি ভালো দিকও ছিল। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে আমরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছিলাম। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সম্পদগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের ফলে আমরা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানে দীক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়া আমরা আধুনিক জগতে উৎকর্ষ লাভ করিবার অবকাশ পাইয়াছি। ইহা ছাড়া একটি প্রধান বিদেশী ভাষায় আমাদের অধিকার যে হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করায় আমাদের অনেকগুলি অসুবিধা ও অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ইংরেজী ভাষার শিক্ষাই বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং মোট শিক্ষাকালের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সময় ইংরেজী শিক্ষার জন্য নিয়োগ করা হইত। ইংরেজীর দিকে জোর দেওয়ায় শিক্ষার অন্যান্য বিভাগগুলি স্বভাবতঃই উপেক্ষিত হইয়াছিল।

ইংরেজী ভাষায় বিষয়গুলি শিক্ষা করার ফলে শিক্ষার পথ সুগম ছিল না—ছাত্রদের অবশ্যই বিদেশী ভাষায় বার বার বাধিয়া যাইতে হইয়াছে এবং মাতৃভাষায় যেখানে অতি সহজেই বোধ সঞ্চারিত হইতে পারিত, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা করায় যেখানে একটা অস্পষ্ট ও অর্ধস্ফুট ধারণামাত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। যে ইংরেজী ভাষা আমরা শিক্ষা করিয়াছি তাহা একশত-দুইশত বৎসরের পূর্বেকার ভাষা—ইংরেজী ভাষার গতিশীল রূপ সম্পর্কে আমাদের বোধ জাগ্রত হইতে পারে নাই। ফলে আমাদের সময়, প্রয়াস ও মেধা তিনটিরই অপব্যয় হইয়াছে। তাহা ছাড়া একটা বিদেশীভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিবার ফলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিপদেই আঘাত পাইতে পাইতে অবশেষে নিস্তেজ ও ভোঁতা হইয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে ইংরেজী ভাষা শিক্ষিত বাঙালীর জীবনযাত্রার একটা অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কথায়বার্তায়, চিঠিপত্রে, বক্তৃতাদিতে তখন ইংরেজী ভাষারই প্রচলন ছিল। কেহ কেহ ইংরেজী ভাষায় চিন্তা করিবার এবং স্বপ্ন দেখিবার কল্পনাও করিয়াছিলেন। বর্তমানে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর, অনেকে আবার ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেশ হইতে ইংরেজী ভাষা বিতাড়ণের প্রস্তাবও করিতেছেন। তবে তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা-অনুপযোগিতার প্রশ্ন তোলেন নাই—এই ভাষা ভারতের পরাধীনতার স্মারক বলিয়া তাঁহারা এই ভাষার প্রচলনে আপত্তি করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এমন কি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজীকে আমরা গ্রহণ নাও করিতে পারি, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজীর স্থান এখনও রহিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রথমতঃ, এতদিন ধরিয়া আমরা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া আসিয়াছি। এমন কি ভারতবর্ষের বিস্তৃত ইতিহাস পাঠ করিতে গেলেও আমাদের একাধিক ইংরেজী গ্রন্থের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয়। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই আমরা পাশ্চাত্ত্য জগতের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজী একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে গণনা ব্যাপারে ইংরেজী ভাষার একছত্র অধিকার। বিদেশীদের সহিত বা ভারতের বিভিন্ন অধিবাসীদের সহিত বাণিজ্যিক লেনদেন করার জন্য ইংরেজীর প্রয়োজন

পরিমাণে পাঠ্যপুস্তক রচিত হইয়াছে এবং ঐ পুস্তকগুলি ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক-গুলির তুলনায় কোনো অংশে হীন নয়।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিদেশী ভাষার গ্রন্থ পড়িতে হয়। কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি যে ইংরেজীতে লেখা বলিয়াই ভালো এমন নয়—ঐ গ্রন্থগুলির রচয়িতাদের মনস্বিতাই তাহার কারণ। বাস্তবিক ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা শেষ হইয়া যেখানে জ্ঞান সাধনার কাল আরম্ভ হয়, সেখানে দেশের ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়। যাঁহারা দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান আহরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল ইংরেজী নয়, ফরাসী, জার্মান, ল্যাতিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন—এ দেশের সংস্কৃত প্রমুখ প্রাচীন ভাষা তো বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই ভাষাগুলিকে শিক্ষার বাহন বলা সঙ্গত নয়। যে ভাষায় প্রথম হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তাহাকেই শিক্ষার বাহন বলিতে হইবে।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহনের পদ হইতে অপসারিত হইবার পর বর্তমানে অনেকে আবার সর্বভারতীয় ঐক্যের জন্য শিক্ষাকে হিন্দীর মাধ্যমে পরিবেশন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। এই প্রস্তাবও শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে হানিকর। একমাত্র মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হইবার উপযুক্ত। কোনো নামকরা বিলাতী কৃত্রিম খাদ্য দিয়া যেমন মাতৃদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিলে শিশুর স্বাভাবিক পুষ্টি ব্যাহত হইবেই, তেমনই মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে তাহা ছাত্রদের বিদ্যা অর্জনের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবেই।

পরীক্ষার সুফল ও কুফল

সংকেত—বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর বিভিন্ন ধারণা—পাঠে উৎসাহ বৃদ্ধি করে কিন্তু জ্ঞানচর্চার বিঘ্ন হয়—পরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে—পরীক্ষা অনেক সময় ভাগ্য-পরীক্ষা—পরীক্ষার প্রতিযোগিতা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে—কিছু সুফলও আছে—উপসংহার।

বেশীর ভাগ ছাত্রই পরীক্ষাকে একটা বিশ্রী জিনিস বলিয়া মনে করে। ছাত্রদের উন্নতির পথে পরীক্ষা যেন একটা বাধা—উন্নতির পথ রোধ করিবার

জন্যই যেন পরীক্ষার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তাহাদের মতে এই পরীক্ষার প্রকৃত উপযোগিতা নাই, ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির বা শিক্ষার যথার্থ বিচার হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই ইহাতে লটারির মতো অনিশ্চিত ফল পাওয়া যায়। সুতরাং পরীক্ষা প্রথা একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত বলিয়াও অনেকে মনে করে।

কোনো কোনো কৃতীছাত্র অবশ্য অন্যরূপ মত পোষণ করে। তাহাদের কাছে পরীক্ষা নিজেদের শক্তি যাচাই করিবার একটা উপায়। পরীক্ষায় ভালো ফল করিবার জন্য তাহারা বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়নাদি করে। বিশেষ করিয়া যাহারা উচ্চ স্থানের জন্য প্রতিযোগিতা করে তাহারা পরীক্ষায় যোগদান করিতে বিশেষ উৎসাহই প্রদর্শন করে।

পরীক্ষার সুফল ও কুফল দুইই আছে। পরীক্ষা পাঠে উৎসাহ আনে বলিয়াই ঘন ঘন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন অসঙ্গত, তেমনই পরীক্ষা উন্নতির প্রতিবন্ধক বলিয়া ইহাকে একেবারে তুলিয়া দেওয়াও তেমনই অসমীচীন। শিক্ষার্থীদের উৎকর্ষ নির্ণয়ের জন্য বা তাহাদের পাঠাভ্যাস কিরূপ হইতেছে তাহা স্থির করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। তবে বর্তমানে যে পরীক্ষা-প্রণালী প্রচলিত তাহার মন্দ দিকটা সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত।

আধুনিক পরীক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো অভিযোগ এই যে, এই পরীক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বিকৃত করিয়াছে। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করা। কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করিবার সময় যখন পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকে, তখন শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই জ্ঞানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ না করিয়া পরীক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির দিকে মনোনিবেশ করেন। জ্ঞানলাভের পরিবর্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই তখন প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

কেবলমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বহু ছাত্র পরীক্ষার পূর্বে প্রচুর মুখস্থ করে। এই মুখস্থ বিদ্যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র বিরাগ পোষণ করিতেন। যাহারা পরীক্ষা-গৃহে কাগজে নকল করিয়া লইয়া যায়, তাহারা চুরি করে বলিয়া ধরা পড়িলে সাজা পায়। তাঁহার মতে যাহারা মগজে করিয়া বিদ্যা বোঝাই করিয়া পরীক্ষার খাতায় তাহা নামাইয়া দিয়া আসে, তাহারাও চুরি করে; উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য থাকিয়া যায়। বাঁধা প্রশ্ন

এবং তাহার বাঁধা উত্তর তৈয়ারী করিতে করিতেই ছাত্রদের শিক্ষা-জীবন কাটিয়া যায়, জ্ঞান-চর্চার আর অবকাশ হয় না। যান্ত্রিকভাবে পড়িয়া যাওয়ার ফলে জ্ঞানবৃত্তিও দিনে দিনে শক্তি হারাইয়া ফেলে। পরীক্ষার প্রয়োজনে অধীতব্য বিষয়েরও সীমা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে সুপ্রশস্ত জ্ঞান-চর্চার পরিবর্তে কলে ছাঁটা বিদ্যাই সম্বল হইয়া উঠে।

পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীর উৎকর্ষের মান নির্ধারিত হয় বলিয়া যে ধারণা প্রচলিত, তাহাও অভ্রান্ত নয়। পরীক্ষা বহু ক্ষেত্রেই ভাগ্য পরীক্ষায় পর্যবসিত হয়। যে সব ছাত্র সত্য সত্যই ভালো তাহারা অনেক সময় পরীক্ষায় খারাপ ফল করে; আবার সারা বৎসর ফাঁকি দিয়া অল্প কিছু পড়িয়া সৌভাগ্যবান ছাত্র ভালো ফল দেখাইতে পারে। যাঁহারা পরীক্ষার খাতা দেখেন তাঁহাদের মর্জির উপরেও অনেক সময় ছাত্রের কৃতিত্ব নির্ভর করে। একই উত্তর বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন ফল পায়। তাহা ছাড়া জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতার পরিবর্তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নের লাগসই উত্তর দেওয়ার উপরেই পরীক্ষায় কৃতিত্ব নির্ভর করে। উৎকর্ষের মান নির্ণয়ের এই ব্যবস্থাকে কোনো মতেই নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখানো জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য কষ্টিপাথর নয়। পরীক্ষায় ভালো ফল না দেখাইয়াও উত্তর জীবনে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে বা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াও জ্ঞানচর্চায় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই—এইরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

পরীক্ষার পদ্ধতির সহিত যে প্রতিযোগিতার ভাব জড়িত তাহাকে আদৌ স্বাস্থ্যকর বলা চলে না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব একটা ঘোরতর ঈর্ষ্যায় পরিণতি লাভ করিতে পারে। ইহাতে ছাত্রদের চিত্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়ে।

এতগুলি দোষ থাকাসত্ত্বেও পরীক্ষা পদ্ধতির ভালো দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষার্থী কতটা শিক্ষালাভ করিয়াছে পরীক্ষার সাহায্যে তাহা মোটামুটি রকম বোঝা যায়। তাহা ছাড়া পরীক্ষার চাপ থাকে বলিয়াই ছাত্ররা পড়ার দিকে অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে পারে। পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে তাহারা অন্যভাবে সময় নষ্ট করিতে পারে। সুতরাং ইহা তাহাদের পড়াশোনা করিতে একরূপ বাধ্য করে এবং তাহারা মোটামুটিভাবে শিক্ষালাভ করে। বর্তমানে এদেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহাতে পরীক্ষা ছাড়া অন্য

কোনো উপায় অবলম্বন করাও চলে না। শিক্ষার ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এই কৃত্রিম পরীক্ষা-প্রণালীকে স্বীকার করিতেই হইবে।

অবশ্য কোনো না কোনো ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখিতেই হইবে। প্রশ্নপত্রের উত্তর দেখিয়া ছাত্রের জ্ঞান সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণামাত্র করা গেলেও মৌখিক পরীক্ষায় তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করিবার কালে যদি মাঝে মাঝে সে কতটা শিক্ষালাভ করিয়াছে পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলে তাহার শিক্ষা কতটা হইয়াছে তাহা জানা যাইবে। এইরূপ পরীক্ষা বিচার বা উৎকর্ষের মাননির্ণয় মাত্র নয়, ইহার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর দোষত্রুটি জানিয়া তাহাকে ঠিকপথে চালনা করা। প্রতি মাসে ছাত্র কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা এইভাবে ব্যক্তিগত সংযোগের দ্বারা জানিবার চেষ্টা করিলে ছাত্র সর্বতোভাবে উপকৃত হইবে। অবশ্য বর্তমানে যে বড়ো বড়ো শ্রেণী বা বিভাগের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এই ধারা অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়।

বৎসরে একবার বা দুইবার পরীক্ষা করিয়া ছাত্ররা নির্দিষ্ট মান অনুসারে শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছে কিনা ইহা দেখা যাইতে পারে এই মাত্র—এই পরীক্ষা যে শিক্ষাবিস্তারের একমাত্র মাপকাঠি নয়, তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ছাত্ররা পরীক্ষাকে যাহাতে সহজমনে গ্রহণ করিতে পারে—ইহার জন্য তাহাদের উপর যাহাতে কৃত্রিম চাপ না পড়ে, সেদিকে সর্বপ্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নয়, জ্ঞানলাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য—এই মৌলিক সত্যটি ভুলিলে চলিবে না।

বৃত্তিশিক্ষা

সংকেত—সাধারণ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে বেকার সমস্যার বৃদ্ধি—অন্যদেশের দৃষ্টান্ত—কারিগরি বিদ্যা বেকার সমস্যা দূর করিতে সমর্থ—শিল্পের প্রসার ও বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে শিক্ষা যত প্রসারিত হচ্ছে, বেকার সমস্যাও তত বেড়ে চলেছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, আমরা শিক্ষার রাজকীয় পথটা বেছে নিয়েছি—কেজো শিক্ষার দিকে আমাদের আদৌ ঝোঁক নেই। বাঁধা ছকে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের দেশের যুবকরা যখন জীবনের সামনাসামনি দাঁড়ায়, তখন এক শিক্ষকতা করা ছাড়া অন্য কিছু করবার

যোগ্যতা তাদের থাকে না। অবশ্য শিক্ষকতার বদলে তারা ঝোঁকে আর একটা বুদ্ধিবৃত্তিহীন বৃত্তির দিকে—সেটি কেরাণীগিরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ কেরাণিগিরির ছাড়পত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমের দেশগুলোর দিকে চেয়ে দেখলে তফাৎটা বেশ বোঝা যাবে। ওদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে খুব কম ছাত্রই শুদ্ধমনে জ্ঞানচর্চার পথটা বেছে নেয়—যারা খুব মেধাবী মাত্র তারাই এই পথে যেতে সাহস করে। আর সব ছাত্রের দৃষ্টি থাকে জীবনের দিকে—শিক্ষা শেষ করে জীবন-সংগ্রামে নামতে হবে—তার জন্য চাই শিক্ষার হাতিয়ার—সেই হাতিয়ার বৃত্তিশিক্ষা।

আমাদের দেশে এতদিন অন্নের জন্য হাহাকার ছিল না—আমরা অল্পেই তুষ্ট,—জীবনটাকে বড়ো করে দেখবার মতো চোখ আমাদের হয়নি। তাই সদাগরি আপিসের চাকরিকেই আমরা বরণীয় বলে মনে করেছি, হাতের কাজ, পরিশ্রমের কাজের নাম শুনে আমরা নাক সিঁটকিয়েছি। তুচ্ছ সম্ভ্রমবোধ আর ফাঁকা বুদ্ধির গর্বে আমরা জীবনের বাস্তব দিকটাকে এতদিন অবজ্ঞা করেছি।

বাংলা দেশে এর ফল মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। কিছুদিন থেকে শ্রমের ক্ষেত্রে বাঙালী পিছিয়ে পড়েছে, পশ্চিমারা দেশের প্রায় সবটুকু শ্রমের ভার গ্রহণ করেছে। ফলে তারা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়েছে আর আমরা বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তুমুল বিতর্ক করেছি আর পেছিয়ে পড়বার জন্য আমাদের শিক্ষাহীন সঙ্গতিহীন ভগ্নোত্তম ভাইয়েদের নিন্দা করেছি।

গান্ধীজী সবাইকে হাতে-কলমে কোনো না কোনো কাজ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এতে স্বাবলম্বনই যে কেবল হয় তা নয়, দরকার পড়লে এই থেকেই রুটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একসময়ে আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ শিল্পের ভার ছিল বিশেষ বিশেষ জাতির উপর, কিন্তু আজ সমাজের সেই পুরাণো ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরেছে; এখন জাতিগত বর্ণবিভাগ আর নেই। ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে সব মানুষই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এই প্রতিযোগিতায় তারাই জয়ী হচ্ছে যারা ব্যবহারিক শিক্ষা পেয়েছে। বৃত্তিশিক্ষা না হলে এই প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো সম্ভবপর নয়।

এই যন্ত্রযুগটা কৌশলের যুগ। যারা বিশেষ বিদ্যায় দক্ষ হল না, তাদের

পিছিয়ে পড়তে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই দক্ষতা সঞ্চার করবার মতো কোনো ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে নেই। কোনো কোনো বিদ্যায়তনে কারিগরি শিক্ষার প্রহসন হয় এইমাত্র—সেখানে উৎসাহী কয়েকজন ছাত্র কিছুদিনের জন্য ভিড় করে এইমাত্র—তারপর সমস্ত ব্যবস্থাটা অবহেলিত হয়ে থাকে। বৃত্তিশিক্ষার উপযুক্ত বিদ্যালয়ও নেই বললেই চলে—যা দু'চারটে আছে তা দরকারের তুলনায় অতি সামান্য। কয়েকটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান শিক্ষানবীশ রাখবার ব্যবস্থা করেছে বলে ছেলেরা কতকটা শিক্ষা পায়, তা না হলে অপরের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকত না।

বৃত্তি শিক্ষার জন্য এখনই এদেশে দুটি ব্যবস্থা করা দরকার। একটি বিদ্যালয়ে যে কোনো একটি বৃত্তি সম্পর্কে মোটামুটি শিক্ষা আবশ্যিক করা, অপরটি বিভিন্ন শিল্পে উপযুক্ত শিক্ষার জন্য অনেকগুলি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা। সাধারণশিক্ষার দিকে দেশের যে অস্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তা প্রতিরোধ করবার একমাত্র উপায় যথেষ্টসংখ্যক বৃত্তি শিক্ষালয় স্থাপন। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তরুণদের মধ্যে অনেকেই কী যে করবে—তা ভেবে ঠিক করতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়ে। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষিত কারিগর প্রভৃতির একান্ত অভাব। দেশে শিল্পের প্রসার হবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের উপার্জনও ক্রমে সাধারণ কেরাণীর উপার্জনের কাছাকাছি এসেছে—অস্ট্রেলিয়া প্রমুখ দেশে তো শ্রমিকরা কেরাণীদের চেয়ে অনেক বেশী উপার্জন করে। তরুণরা যদি বৃত্তিশিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করে তা হলে চাকরির উমেদারি করে ঘুরে বেড়াতে হবে না—যে কাজ জানে তার কখনও কাজের অভাব হয় না।

আশার কথা এই যে, বর্তমানে শিক্ষিত বাঙালীর ছেলেরা কারিগরি বিদ্যার দিকে অনেকটা ঝুঁকেছে। দশ বৎসর আগে শিক্ষিত বাঙালী শিল্পীর সংখ্যা নগণ্য ছিল—কিন্তু এখন সেই সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আরও অনেক ছেলেমেয়ে বৃত্তিশিক্ষার দিকে ঝুঁকতে পারে, যদি তারা তেমন সুযোগ-সুবিধা পায়। কেবল বড়ো বড়ো শহরে নয়, মফঃস্বল বা গ্রামাঞ্চলেও কারিগরি বিদ্যায়তন স্থাপন করতে হবে—যাতে দেশের সর্বত্র বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ হতে পারে। তা না হলে শুদ্ধমাত্র জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থাই চালু রাখলে জীবনের বাস্তব দিকটা পঙ্গু হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা

সংকেত—ভারতের প্রাচীন ব্যবস্থা—নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—বৃটিশযুগে বিশ্ববিদ্যালয় 'গোলামখানা' আখ্যা পাইয়াছিল—চাকুরি ও উচ্চশিক্ষা—জ্ঞানচর্চার জন্যই উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন—একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন—উপসংহার।

ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় একটা নূতন জিনিস নয়। তিন চার হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষে জ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হইত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান যে তখন ছিল তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় তো পৃথিবীর তৎকালীন বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ইহা ছাড়াও ভারতবর্ষের সর্বত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছড়াইয়া ছিল।

মুসলমান শাসনের সময় ভারতের সেই ঐতিহ্য বিনষ্ট হইতে বসিয়াছিল। এই সময়ে যদিও কয়েক স্থানে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল, তবুও উচ্চ শিক্ষার জন্য সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান এ সময় ছিল না বলিলেই হয়। ইহার পর বৃটিশ আমলে পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এ দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা নগণ্য নয়।

এই বৃটিশ আদর্শে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দেশহিতৈষী মনীষিবৃন্দ অনেক অভিযোগ করিয়াছেন। এক সময় ইহাকে 'গোলামখানা' নামে অভিহিত করিয়া ইহাকে বর্জন করিবার জন্য নির্দেশও দেওয়া হইয়াছিল। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখা গেল যে, ইহা রাজ্যশাসন বা বাণিজ্যিক সহায়তা করিবার জন্য কর্মচারীর ছাড়পত্র দিতেছে মাত্র। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপ চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। মাত্র—ছাত্ররা অশেষ পরিশ্রম করিয়া যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, চাকুরিস্থলে শতকরা নিরানব্বুইটি ক্ষেত্রেই তাহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এইজন্য এখন অনেকে চাকুরির ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষাকে অধিকতর যোগ্যতার পরিচায়ক বলিয়া না ধরিবার প্রস্তাব করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, তাহা হইলে বর্তমানে ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য অভিভাবকদের মধ্যে যে একটা প্রবল ঝোঁক দেখা দিতেছে তাহা অনেকটা

কমিয়া আসিবে এবং যাহারা কেবল জ্ঞানলাভ করিতে বা কোনো বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে উৎসুক, তাহারাই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলেই বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র হইয়া উঠিতে পারিবে।

আর একদল ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, চাকুরি পাওয়ার সুবিধার জন্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ নিন্দনীয় বটে, কিন্তু এইরূপ কোনো সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের কথা বাদ দিলেও উচ্চ শিক্ষায় একটা বিশেষ মূল্য আছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমগ্র জাতির একটা ন্যূনতম শিক্ষার মান নির্দেশ করিয়া দেয় মাত্র—তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়াই নির্ধারিত হয়। জাতীয় অগ্রগতির পথে উচ্চ শিক্ষাই সর্বপ্রধান সহায়ক। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চ শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জিত করিয়া তাহাকে মননশীলতা ও গুরু দায়িত্ব বহন করিবার শক্তির অধিকারী করিয়া তোলে। কোনো মতে খাইয়া পরিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা মানুষের পক্ষে গৌরবজনক নয়। উচ্চ শিক্ষা এক দিক দিয়া জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, অপর দিকে তাহার আচরণ, চিন্তা ও কার্যধারার উৎকর্ষ সাধন, সর্বোপরি সৌষম্যবোধকে জাগ্রত করিয়া তোলে। তৃতীয়তঃ, উচ্চ শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিকে এরূপ সম্প্রসারিত করে যে, সে যে কোনো বিষয় দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে পারে। জীবনের সব দিক পুষ্ট করিবার অবকাশ উচ্চ শিক্ষা হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

আধুনিক যুগে বিদ্যার প্রায় সব বিভাগেই এতটা উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে যে, সেই বিষয়গুলিতে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ না করিলে চলে না। বর্তমানে সব বিষয়েই দক্ষ লোকের প্রয়োজন। সব বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা সকলেরই দরকার, কিন্তু সকলের পক্ষে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া অসম্ভব। এক একটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ না করিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। উচ্চশিক্ষা সেই জ্ঞানচর্চার সোপান। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া একজন মিস্ত্রী বা কেরাণীর কাজ করা যাইতে পারে—কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার বা অর্থনীতিবিদ্ বা গাণনিক হইতে হইলে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন। বেশির ভাগ লোকের পক্ষে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ না করিলে চলিয়া যায়—কিন্তু কয়েকজনকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা না হইলে দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে। তবে, সকলকেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত

করিয়া তুলিবার প্রয়াসও ব্যর্থ হইতে বাধ্য—অন্ততঃপক্ষে বর্তমানে যে সমাজ-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত তাহার মধ্যে।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা এক দিকে যেমন অপর্যাপ্ত, অপর দিকে তেমনই আবার ত্রুটিপূর্ণ। স্নাতক পরীক্ষা পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচন ও পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যতীত আমাদের দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি অন্য কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহে বলিয়া মনে হয় না। মহাবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান-কার্য প্রায়ই যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থী-দের জ্ঞান-তৃষ্ণাকে জাগ্রত করিবার কিংবা তাহাদের রুচি গঠন করিবার বিশেষ কোনো অবকাশ সেখানে নাই। স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্র-সম্পর্কেও ঐ কথা বলা চলে। সর্বত্রই শিক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি থাকায় ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়নকে তপস্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

অবশ্য বাস্তব জগৎ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া একটা নির্জন স্থানে কেবলমাত্র অধ্যয়নের সাধনা করিবার পরিকল্পনা এ যুগে চলে না। বর্তমানে আমাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী এত জটিল হইয়া পড়িয়াছে যে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার্থি-জীবন হইতেই তাহার সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমণ্ডল-সৃষ্টিই সব চেয়ে বড়ো কথা।

অনেকে মনে করিতেছেন যে, দেশে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে শিক্ষার উপযোগী পরিমণ্ডলটি রচনা করা সহজসাধ্য হইবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় যদি সারা দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে একটা যান্ত্রিকতা আসিতে বাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট অন্যান্য শিক্ষায়তনগুলির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইলে বিশ্ববিদ্যালয় ঐগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবার জন্য যে একটা উৎকট আগ্রহ থাকে, তাহা দূর করিয়া যথার্থ জ্ঞানতৃষ্ণা সঞ্চারের চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য। বর্তমানে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা অতি সামান্য হওয়ায় বেশির ভাগ যুবককেই চাকুরির জন্য একটা ছাড়পত্ররূপেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ গ্রহণ করিতে হয়। বৃত্তিশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক চাপ অপসারিত হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্র হইয়া উঠিবে।

একটি স্মরণীয় আধুনিক উপন্যাস

আমার প্রিয় লেখক রেমার্ক। আমি তাঁরই একটি উপন্যাসের কথা বলছি। রেমার্ক আমার প্রিয় লেখক কারণ তিনি বড় বড় চিন্তা আর তত্ত্বকথা শোনান নি। উপন্যাসের কাহিনী থামিয়ে দিয়ে বারো অধ্যায় ধরে মনোবিশ্লেষণ করেন নি। তিনি উদ্ভট ভাষা আর কায়দার আধুনিকতা দেখান নি। সোজা কথায় তিনি আমার মত সাধারণ মানুষের প্রাণের কথা প্রাণের ভাষাতেই বলেছেন।

তাঁর 'অল কোয়ায়েট ইন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট' অতি বিখ্যাত বই। নানা ভাষায় তার নানা সংস্করণ হয়েছে। সে বই আমি পড়েছিলাম তখন খুব ছোট। কিন্তু তখনই প্রাণের মধ্যে সেই বইএর কথাগুলি নাড়া দিয়েছিল। সেই বইতে আছে যুদ্ধের কথা। সেই ভয়াবহ যুদ্ধ আর কতকগুলি তরুণ প্রাণ। একদিন ইস্কুল ছেড়ে রেমার্ক গিয়েছিলেন যুদ্ধে। গিয়েছিলেন বললে মিথ্যে হয়। জার্মান রাজনীতিকরা সেদিন কিশোর ছাত্রদেরও ঠেলে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন যুদ্ধে। সাধারণ মানুষ জানে না কেন যুদ্ধ হয়, তারা ভাবে না। কিন্তু একদিন যুদ্ধ বাধে আর শেষে হাজার হাজার মানুষ হয় কামানের খাদ্য। আজো আমার সেই বইটির কথা মনে পড়লে মনে হয়, একটি উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত দিনে চারটি কিশোর স্কুলে যাচ্ছিল হঠাৎ বারুদের গন্ধে ভরে উঠল আকাশ। দূরে শব্দ হল কামানের। বেজে উঠল সাইরেন। মনে হয় রাইফেল নিয়ে সেই চারিটি কিশোর চলেছে। মনে হয় হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে ট্যাঙ্ক আর সেই হতভাগ্য তিনটি শিশুর মুখ থেকে রক্ত পড়ছে আর একটি কিশোর রাইফেল ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শপথ নিচ্ছে—আর না, আর করব না অনেক হল। ভগবানের দিকে তাকিয়ে বলছে—কোথায় এর শেষ—এই রক্তের? সেই রক্তধারা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে অন্ধকারের দিকে। সেই কিশোরই রেমার্ক।

আমি তাঁর আধুনিকতম গ্রন্থটির কথাই বলতে যাচ্ছি। তার নাম 'ভালবাসার সময় আর মৃত্যুর সময়'। যুদ্ধের সময় একটি তরুণ সৈনিক ফিরে এসেছে নিজের বাড়ীতে। সে ছিল রাশিয়ায়। তখন শীত আসছে। একটু একটু তুষার পড়ছে। তখন ছুটি পেয়ে সে আসছিল বাড়ীর দিকে। গভীর

রাত্রে আহত আর রুগ্নদের ট্রেন চলেছে সীমান্ত থেকে সীমান্তে। তার মধ্যে বসে আছে একটি সৈনিক। সে এসে পৌঁছল এক অন্ধকার রাত্রে নিজের শহরে। গলিতে গলিতে ঘুরতে ঘুরতে সে নিজের বাড়ী খুঁজছে। কিন্তু বোমা পড়ে সে বাড়ী কবে চুরমার হয়ে গেছে। সেই বোমার আগুনে কবে পুড়ে মরেছে তার বুড়ো বাপ আর মা, তার ছোট বোন। সেই আগুনে টোল খাওয়া, পুড়ে যাওয়া সহরের রাস্তায় রাস্তায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোথায় তার বাবা, কোথায় তার মা, কোথায় তার বোন! কোন অন্ধকারের আড়ালে তারা ঘুমিয়ে আছে! কোন্ ইট্গুলি ধ্বসে-যাওয়া বাড়ির তলায় তারা চাপা পড়ে আছে! মাঝে মাঝে ভয়ার্ত সাইরেন বাজে। ছেলেটি খোঁজে। মাঝে মাঝে দূরে সৈনিকদের মাতাল গলার গান শোনা যায়। আর ছেলেটি হেঁটে বেড়ায়। দুঃস্বপ্ন কবে কাটবে? কবে মানুষ তার ঘর খুঁজে পাবে? কতদিন পরে আবার শান্তিতে ঘর বাঁধবে?

এমনই এক ভয়ার্ত পৃথিবীতেও প্রেম আসে। যখন চারিদিকে মৃত্যুর থাবা ওৎ পেতে বসে আছে, তখনও গোপনে প্রেম আসে। বিশ্রী গন্ধকের গন্ধে, গুলির শব্দে, রাত্রিচর এরোপ্লেনের বীভৎস গোঙানির তলায় প্রেম ডাকছে—নূতন জীবনে এস। চল মাঠে—যেখানে অনেক ঘাস, অনেক রোদ, অনেক প্রজাপতি। চল যাই দূর দেশে—যেখানে যুদ্ধ নেই, যেখানে হিংসা নেই। কিন্তু হায় সারা পৃথিবীতেই যে আজ যুদ্ধ। তরুণ ভয়ার্ত চোখে তার প্রেমিককে বলে—আজ ভারতবর্ষের সবুজ মাঠেও সৈনিকরা তাঁবু খাটিয়েছে, আফ্রিকার নির্জন পথেও আজ কামান বসেছে। সুইজারল্যাণ্ডের আকাশে শুধু একটি নীল আলো—প্রাণের—গানের। হয়ত কালই তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রেমিকাটিরও বাবা যুদ্ধে মারা গেছে। বাড়িতে কেউ নেই। অন্ধকারে একা বসে থাকে। আর পেছনে আছে গুপ্তচর। চারিদিকে হিটলারের জয়ধ্বনি। আর মানবাত্মা কেঁদে কেঁদে অসহায়ভাবে ভারী বুটের তলায় পিষে পিষে মরছে। ফুলের গন্ধ বাতাসে মৃত্যুর মত ভারী হয়ে ওঠে।

তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন তাদের বিয়ে হয়। আর সাতদিন পরেই আবার ছেলেটিকে যুদ্ধে ফিরে যেতে হবে। তবুও একটি মুহূর্ত। এত গুলির শব্দ, এত বুটের শব্দ, এত ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর, এত বারুদের গন্ধ, পোড়া মাটির

কালো রং, সব শেষেও যেন জীবন কোথায় বেঁচে আছে। জীবন ফুলের মত ফুটে উঠতে চায়। একটি মুহূর্ত তাই বা কম কিসে।

সেই মুহূর্তটি অমর হয়ে থাকে। আর ছেলেটি এক নির্জন সীমান্তের বরফ-পড়া মাটিতে ঘুমোয়। চিরকাল ধরে ঘুমোয়। তার প্রেমের মুহূর্তটি তার মৃত্যুর মুহূর্ত দিয়ে ঢাকা হয়ে যায়। হয়ত তার বুকের উপর একদিন আবার সবুজ ঘাস হবে। কিন্তু আজ সব শীতল। সব ঠাণ্ডা।

এই বইটিই আমার প্রিয়। স্মরণীয় মনে করি। জানি বিজ্ঞ জনের জন্য এ লেখা নয়। এতে তত্ত্ব নেই। রাজনীতি থেকে যৌনতত্ত্বের সমাহার নেই। কিন্তু এই বই হল acid test of the youth—যৌবনের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষক। যার ভালো লাগবে না—তার যৌবনকে ভালো লাগে না। যে যৌবনকে জীবনকে ভালবাসে—সে রেমার্ক আর তাঁর এই অমর বইকেও ভালবাসবে।

বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতা

সংকেত—অগ্নির আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা—সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ—শিল্প-বিপ্লব—প্রাচীন ব্যবস্থার লোপ—আণবিক অস্ত্রের দানবীয় শক্তি—রোগমুক্তির অমৃত—বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুভ হোক—মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ হোক।

মানব জগতের ইতিহাসে এক অমৃতক্ষণের অপূর্বতাকে নিয়ে অগ্নির আবির্ভাব। জগৎ ও জীবনের নব নব রহস্যের উন্মোচনে মানবসভ্যতার ইতিহাস সেই জন্মক্ষণকে প্রতিমুহূর্তেই বিকশিত করেছে। আর তারই প্রতিফলিত আলোক-রশ্মিতে সমস্ত মানব সভ্যতা শুধু পরিবর্তিতই নয়, বিবর্তনের অপরূপতায় নিজেকে স্পন্দিত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা-পথের বাঁকে বাঁকে বহু মানুষের উদগ্রকামনার আত্মাহুতি, বহু মানুষের প্রাণদানের শেষ উল্লাসধ্বনি স্তব্ধ হয়ে আছে। কিন্তু মানুষের মৃত্যু ও তার যন্ত্রণা-পীড়িত আর্তনাদকে অতিক্রম করেও বিজ্ঞান তার জয়পতাকা বহু উচ্চে বিলম্বিত করেছে। সেই বিশাল অনন্ত আকাশ-তলে বিজ্ঞানের পতাকার স্থান নিঃসন্দেহে নিজ গরিমায় দীপ্ত। সভ্যতার ইতিহাসে তাই বিজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী এবং অবিচ্ছেদ্য।

সমাজ-ব্যবস্থার উন্নততর পরিকল্পনায় এবং সামাজিক বিধিনিষেধের দায়িত্ব-পালনের মধ্যেই তার উন্নতি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক প্রবৃত্তি—তার অনুশাসন, রাজনৈতিক অবস্থা—তার বৃহত্তর কল্যাণবোধ, বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে শুধু বিবর্তিতই নয়, পরিবর্তনের পূর্ণতর মহিমার রূপ নিতে সুরু করলো। আগুনের আবিষ্কার যেমন একদিন আদিম মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—ঠিক সেই আলোড়নের আনন্দধ্বনিতে সমগ্র মানবজাতি নিজেদের চকিত করলো শিল্প-বিপ্লবের জন্মমুহূর্তে। বিজ্ঞানের এই নূতনতর উদ্ভাবনার কথা নিঃসন্দেহেই এই জন্যই স্মরণযোগ্য যে, সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসের বিবর্তনে এরকম বিপ্লব দ্বিতীয়-রহিত। কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই এক বিরাট ব্যবধান ও পরিবর্তনের সূত্র টেনে আনলো এই বিপ্লব। এমন কি প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তরকে ভেঙ্গে চুরমার করে নতুনতর মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো একক মানুষের জীবন। আধুনিক মানুষের সমস্ত মূল্যবোধ ও জীবন-সত্যের বিস্তৃততর ভূমিকায় একক মানুষের জিজ্ঞাসাকে বিজ্ঞান অন্বিত বলেই মনে করি।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার বিবর্তনের প্রতিটি স্তরের বিশ্লেষণ যেমন সম্ভব নয়—তেমনি সেই গঠনমূলক ভূমিকায় বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়নও অসম্ভব। একথা ঠিকই বিজ্ঞান আমাদের আধুনিক সভ্যতাকে দিয়েছে আণবিক অস্ত্র এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষ শিহরণের মধ্যদিয়ে তার অমানুষিক দানবিক লীলা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু এও ঠিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছেও অনেক। মৃত্যুর একান্ত নিকটে বসে তার শীতলতার কথা ভাবতে ভাবতেও হয়ত মানুষ ফিরে পেয়েছে জীবনের উষ্ণতাকে —জীবনকে ভালোবাসবার স্বপ্নকে। সেখানেই তো মানব সভ্যতার বিবর্তন, মানুষকে ভালোবাসার অনুভূতির স্ফূর্তি। মানবিক সত্তার নিবিড়তম প্রকাশ। বিজ্ঞানের মহত্ত্ব সেইখানেই। কিন্তু একথাও অস্বীকার করলে চলবে না যে, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস রাজনৈতিক কূটচক্রজালে আবদ্ধ হয়েছিল। বিজ্ঞানের নবীনতর অস্ত্রের উদ্ভাবনে সদম্ভে চক্রান্তকারীরা স্বার্থ রক্ষা করতে অগ্রসর হয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করালছায়া পৃথিবীর ইতিহাসে কলঙ্কিত সভ্যতার রূপ। ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় যে নিদারুণতর হত্যার

চমকপ্রদ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছিল তার ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করলে জীবনের প্রতি মমতা ও আধুনিক সভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। আজ তাই সমগ্র পৃথিবীর বুকে এই দুটি যুদ্ধের যুগান্তকারী ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে প্রতিটি মানুষের মনে। আধুনিক মানবমনে এক তীব্র বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এই বিশ্বযুদ্ধ। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক মানবের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক পটভূমিকায় বিজ্ঞানের এই অপকীর্তির ইতিহাস সমগ্রজাতি ও জীবনকে বিষাক্ত ও নৈরাশ্যবাদী করে তুলেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এ নয়। মানবিক জীবনের উন্নততর প্রক্রিয়া এবং পরিকল্পনার বিশেষ ভূমিকা নিয়েই তার যাত্রা সুরু। স্বাভাবিকভাবে আধুনিক জীবনযাত্রার স্বল্পতম উপকরণের দিকে লক্ষ্য করলেই বিজ্ঞানের বিস্তৃত ভূমিকার স্বরূপকে লক্ষ্য করতে পারবো। কিন্তু এই জীবনের ভূমিকা ছাড়িয়ে, অন্নসমস্যার সমাধানকে অতিক্রম করলেও বিজ্ঞানের কানে বাজতে থাকবে অন্য সমস্যার পথ। ভরসা করি একদিন যেই হাত মানব সভ্যতার বিবর্তনকে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েই অগ্রসর হয়েছে, তার নতুনতর পরিকল্পনার ঐতিহ্যে ও আবিষ্কারের নতুন সম্ভারে একটি বিশেষ শিল্পীর দায়িত্ব সে বহন করেছে। তাই ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে সে যে একটি নিপুণ জীবনের ছবি এঁকে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। আর এ আশাও বোধ হয় অন্যায় নয়, একদিন যেমন গাছের বাকল থেকে অংশুকের ক্রমোন্নতিতে আরোহণ করতে পেরেছি—তেমনি বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান নিয়ে হয়ত একদিন সমস্ত জীবন ও জগত সত্যকে নির্বিকল্প দৃষ্টিতে দেখতে পারবো—সেই দেখার দৃষ্টিই প্রকৃত বিজ্ঞানীর দৃষ্টি এবং সেই দৃষ্টিকোণেই সমগ্র মানব সভ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন।

বৃক্ষরোপণ উৎসব

সমস্ত উৎসবেরই লক্ষ্য হল হৃদয়ের প্রসার। উৎসবের মধ্যে হৃদয় ব্যাপ্ত হয়। সেই ব্যাপ্তিটুকুই উৎসবের পরিবেশকে মুখর করে তোলে। মানুষের জীবনে একদিকে আছে কর্ম, অন্যদিকে তার বিশ্রাম। কর্মের প্রশান্তির আনন্দই উৎসবের মধ্যে প্রকাশিত। তার মধ্য দিয়ে অনুভব করা যায়

মানুষের বিরাট প্রাণ-ধারার সদাসচল গতি ও মানুষে মানুষে সেই প্রাণের নিহিত ঐক্য। তাই উৎসব মানুষের জীবনে কাম্য, তাই উৎসব মানুষের জীবনে অপরিহার্য।

উৎসব মাত্রই একটি সামাজিক কারণের ও একটি আনন্দের কারণের দ্বারা বেষ্টিত। আদিম মানুষ যখন উৎসবে ব্রতী হল তখন বিশুদ্ধ আনন্দ ছিল যেমন আজীব্য তেমনই সামাজিক নানা কারণও তার পেছনে সক্রিয় ছিল। দুই মিলে উৎসবকে করে তুলেছিল প্রাণচঞ্চল ও জীবনাভিমুখী। এই জীবনাভিমুখিতাই উৎসবের সব চেয়ে বড় ধর্ম। যে উৎসবের মধ্যে এই জীবনানুসরণ নেই, সে উৎসব মানুষের হৃদয়ের দ্বারে কোন আহ্বান নিয়ে আসতে পারে না। তাই দেখা যায় নানা উৎসব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন বিদায় নিয়েছে সমাজ থেকে। কিংবা দেখা যায় প্রাণের তাপ না পেয়ে ধীরে ধীরে বহু উৎসব উত্তাপহীন আড়ম্বর ও বাহ্য সৌন্দর্যেই ভরে উঠেছে কিন্তু সেখানে প্রাণের কোন সাড়া নেই। কিন্তু জীবনে এমন উৎসবও আছে সেখানে কোন জাতি নেই, ধর্ম নেই। ' নিখিল মানব জাতির ঐক্য যার মধ্যে অনুভূত হয়, তাই যথার্থ উৎসব। বৃক্ষরোপণ তেমনই এক জাতীয় উৎসব।

বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের যোগ অনাদি অনন্ত কালের। বৃক্ষই পৃথিবীর প্রথম সন্তান। একদিন যখন জলে জলে পৃথিবী পূর্ণ ছিল, যখন তার দিগন্তে কোন ঝাপ্‌সা নীল রেখা দেখা দেয়নি— যখন পৃথিবী ছিল স্থানে স্থানে শুষ্ক রুক্ষ—তখন সেখানে আবির্ভাব হয়েছিল বৃক্ষের। যেমন করে ইন্দ্রের অপ্সরী ধ্যানরত কঠোর মুনির তপোভঙ্গ করে তেমনই করে শ্যামল বৃক্ষ এসেছিল রুক্ষতার তপোভঙ্গ করতে। একদিন হয়ত দিগন্তের দক্ষিণ কোণে প্রথম জমেছিল কাজল মেঘবাষ্প, সেদিন দমকা হাওয়ায় আঁধার করে নেমেছিল দুরন্ত শ্রাবণ, সেদিন আকাশের নিভৃত মেঘমল্লার শোনার জন্য কেউ ছিল না, সেদিনের সচকিত বিদ্যুৎ দেখার কেউ ছিল না—সেই পৃথিবীতে ঝরেছিল বর্ষার প্রথম বৃষ্টি। তখন একটিমাত্র বৃক্ষশিশু ধরণীর এক কোণে প্রথম বৃষ্টির সুধা পান করে অবাক আনন্দে তাকিয়েছিল মেঘকজ্জল আকাশের দিকে। ধীরে ধীরে রাঙামাটির ওপর বিছিয়ে গেল সবুজ তৃণের আস্তরণ। ধীরে ধীরে জেগে উঠল নিঃসঙ্গ পৃথিবীর সন্তানেরা—শিশু বৃক্ষ। তাদের সবুজ

পল্লবে পল্লবে প্রথম ভোরের আলো এসে তাদের জাগাত। দূর সমুদ্র থেকে বাতাস এসে দুলিয়ে দিত বৃক্ষের শাখা। নির্জন পৃথিবীতে জেগে উঠত মর্মর। মর্মরিত দুপুরে রোদ এসে লুটিয়ে পড়ত গাছের গায়ে—একটি অবাক সুন্দর ফুল জেগে উঠত নিভৃতে। কেউ তাকে দেখার ছিল না। কিন্তু বিরাট প্রাণধারার আনন্দ সংকেত বয়ে এনেছিল সবুজ শ্যামল বৃক্ষ, শোভন লোভন পুষ্প। বৃক্ষ তাই প্রাণধারার আদি প্রতীক।

বৃক্ষের মধ্যে প্রাণের আলোর নিভৃত দিকটি যেন সুপ্রকাশ। প্রাণ যেমন সবল, তরঙ্গিত ও লীলায়িত, তেমনই প্রাণের একটি শুদ্ধ স্থৈর্যের দিক আছে। বৃক্ষের মধ্যে সেই প্রাণের গূঢ় সংকেতটি পাওয়া যায়। তার পাতার কাঁপনে, ফুলের দোলায়, শাখার মর্মরে সেই তরঙ্গিত প্রাণের উচ্ছ্বাস। আবার তার স্থির ঊর্ধ্বমুখী সাধনায় বহুশাখা-বিস্তারী ছায়ায় তাকে মনে হয় পরম স্তব্ধ। তাই উপনিষদের কবিরা বলেছেন বৃক্ষইব স্তব্ধ। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির।

বৃক্ষরোপণ উৎসবের মধ্যে এই হল প্রাণের তত্ত্বের দিক। বৃক্ষের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ দিকটিকেই পাওয়া যায়—মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা আরণ্যক সভ্যতা, তাই বুদ্ধের সাধনা বোধিদ্রুম-তলে। শুধু যে এই সাধনা ও প্রাণের নিহিত ঐক্যটাই সব কথা, তা নয়। সামাজিক দিকও আছে।

আদিকাল থেকে মানব সমাজের প্রতিটি কাজে বৃক্ষ অপরিহার্য। আদিম মানুষ যখন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার জানত না, তখন এই গাছের ডালই তার অস্ত্র ছিল। বৃক্ষতল তার বাসভূমি ছিল। সভ্যতা এগিয়েছে, বৃক্ষের প্রয়োজন বেড়েছে—তার ছায়া আর ফল, তার ঘর্ষণে ঘর্ষণে অগ্নি। রন্ধনের ইন্ধন, বন্ধনের রজ্জু, জীবনচারণের প্রতিটি কেন্দ্রে তার অসামান্য দান। কোন এক শুভ মুহূর্তে মানুষ অগ্নি আবিষ্কার করেছিল। সে দেখেছিল যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণে অরণ্যে দাবানল জ্বলে ওঠে—তাই সে ঘর্ষণে ঘর্ষণে অগ্নি জ্বেলেছে। তাই সমিধ দিয়ে আহুতি দিয়েছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে, মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন সম্ভার। সেই সম্ভার অকাতরে দিয়েছে বৃক্ষ।

জীবনযাত্রার জন্য তাই বনভূমি অপরিহার্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলি আজ

এদিকে দৃষ্টি দিয়েছে। বনজ সম্পদের দ্বারাও দেশ উন্নত হয়। বনের কাঠে, শাখায়, মধুতে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে একটি স্থান অধিকার করে আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, অরণ্য বৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুজলা সুফলা দেশের পক্ষে তাই অরণ্যভূমির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। পৃথিবীর নানাদেশে, যেমন কানাডা, মালয় প্রভৃতি দেশে বিরাট বনভূমি সেই দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বিরাট স্থান অধিকার করে আছে। অরণ্যজাত সম্পদ দেশে দেশে রপ্তানি ক'রে জাতি বড় হতে পারে। নিজের জাতির নানা প্রয়োজন নিবারণও সম্ভব।

অরণ্য আদিম কাল থেকেই সামাজিক প্রয়োজনে লেগেছে। মানুষের দৈনন্দিন সহস্র প্রয়োজনে তার অসামান্য দান। আদিকালে তার যা প্রয়োজন ও মূল্য ছিল, বর্তমানে তা আরো বেড়ে গেছে। মানুষের বুদ্ধি আবিষ্কার করেছে যে, তার প্রয়োজন আরো বেশি। অরণ্য কত কবির কল্পনা উদ্দীপ্ত করেছে, কত ঋষির ধ্যানে পবিত্র হয়েছে—কত সম্রাটের বিচরণ-ভূমিরূপে মহিমান্বিত হয়েছে। বৃক্ষরোপণ উৎসবের মূল প্রেরণা এখানেই।

রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি বৃক্ষদের মনে করেছেন রুক্ষতা বিজয়ের সৈন্য। তাই তাদের সম্বোধন করে বলেছেন—মরু বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে। এই মরুবিজয় যেমন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, তেমনই অন্তরের ক্ষেত্রেও। পৃথিবী হোক শ্যামল, হৃদয় হোক সরস—এই প্রেরণাতেই বৃক্ষরোপণ উৎসবের সার্থকতা।

দেশভ্রমণ

সংকেত—ঘরের বাহিরে যাওয়ার জন্য মানুষের আদিম কৌতূহল—দেশভ্রমণে মনের সংকীর্ণতা কাটে—নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হয়—দেশভ্রমণের বহু সুফল—শিক্ষার অঙ্গ—ভ্রমণের নেশা—পদব্রজে ভ্রমণই শ্রেষ্ঠ।

মানুষ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। বাহির বিশ্ব তাহাকে প্রতি মুহূর্তেই আহ্বান করিতেছে। মানুষ ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেশে—নিজের পাড়া ছাড়াইয়া তাহারা অন্য পাড়ার লোকেদের সহিত মিশিতে চায়, নিজের দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে গিয়া সেখানকার মানুষের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে উৎসুক হইয়া উঠে।

মানুষের মধ্যে এমন একটা অদম্য কৌতূহল আছে যাহা কোনোক্রমেই শান্ত হইতে চাহে না—পৃথিবীর নূতন সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের স্বাদ সে গ্রহণ করিয়াই চলে। একদিকে সে বাগ্‌দেবীর সেবা করিয়া তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, অন্য দিকে নানা দেশে গিয়া বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিচিত্র মানব জীবনের পরিচয় লাভ করিয়া সে তাহার আকুল জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করে।

সুদূর অতীত কাল হইতেই মানুষ বিভিন্ন দেশে গিয়া তাহার কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছে। যাযাবর জাতিরা এক দেশ হইতে যে আর এক দেশে গিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহা কেবল জীবিকার জন্য নয়, ইহার মূলে নূতনকে পাইবার একটা প্রেরণা আছে। পরবর্তীকালে কৃষিজীবী হইবার পর মানুষ এক এক স্থানে স্থায়ী বাসভূমি স্থাপন করিয়াছে বটে, কিন্তু বিচিত্র দেশ দেখিবার স্পৃহা তাহার মেটে নাই। মানুষ অতি সামান্য প্রয়োজনে এমন কি বিনা প্রয়োজনেও দেশভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছে।

দেশভ্রমণের ফলেই মানুষ তাহার সংকীর্ণ গণ্ডি পার হইয়া বিশ্বের উদার পরিবেশের মধ্যে আপনার জীবনকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রথমাংশে ভারত যখন বাহির বিশ্বে বাণিজ্য করিতে বা ধর্ম প্রচার করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন তাহার মনের ও ধনের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। এই সময় তাহার যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, আর পরবর্তী যুগে যে তাহার অবসান ঘটিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইহার পর হইতে ভারতবর্ষ সমুদ্র পার হওয়া নিষিদ্ধ করিয়া সব দিক দিয়াই সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। এই সময় তাহার মধ্যে ঘোরতর কূপমণ্ডূকতা দেখা দিয়াছে; ফলে তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। তবে স্বদেশে তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়া দেশভ্রমণের অবকাশ থাকাতে তাহার চিত্ত একেবারে দীন হইয়া পড়ে নাই—তাহার মনের প্রসার কমিয়া গিয়াছে এইমাত্র।

মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। দেশভ্রমণের ফলে তাহার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়া যায়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে। বিভিন্ন স্থানের রীতিনীতি, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন

সম্পর্কে জ্ঞান দেশভ্রমণের ফলে অতি সহজেই লাভ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য বা বিচিত্র জীবজন্তু বা অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান দেখিয়া সে একদিকে যেমন আনন্দ লাভ করিতে পারে, অন্যদিকে তেমনই অনেক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অতি সহজে লাভ করিতে পারে। বিভিন্ন দেশে গেলে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগও ঘটা সম্ভবপর।

দেশভ্রমণের ফলে মানুষের আলস্য দূর হইয়া যায়। এক সময় দেশভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল; বর্তমানে যানবাহন ও পথঘাটের উন্নতির ফলে দেশভ্রমণ অনেকটা সহজ হইয়াছে—তবুও ইহা মানুষকে পরিশ্রমী ও কষ্ট-সহিষ্ণু করিয়া তোলে। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে কত সুদূর-প্রসারী এবং পরস্পরের সহায়তা ব্যতীত যে মানুষ এক পাও চলিতে পারে না. এই বোধটি জাগ্রত হয়। ফলে ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া তাহার অন্তরে উদারতা, সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলি বিকশিত হইবার অবকাশ পায়। অথচ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার ভাবালুতা দূর হইয়া যায় এবং তাহার বাস্তববোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে।

পৃথিবীর মহামানবদের মধ্যে প্রায় সকলেই দেশভ্রমণের মধ্য দিয়া আপনাদের শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। এ দেশের রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ-যোগ্য। বর্তমানে সারা পৃথিবীর সহিত যোগসূত্র রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যাহার যেটুকু সাধ্য ভ্রমণের চেষ্টা করা অবশ্য-কর্তব্য।

তবে ভ্রমণকে নেশা করিয়া তোলাও সংগত নয়—সকলেই রামনাথ বিশ্বাস হইলে চলে না। কেবলমাত্র ভ্রমণের জন্যই ভ্রমণ নয়, মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্যই যে ভ্রমণ প্রয়োজন এই কথাটি স্মরণীয়। ভ্রমণের আনন্দটুকু উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু ইহার সংগঠনমূলক দিকটি যাহাতে বাদ না পড়িয়া যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। অনেকে পূজার ছুটিতে বা অন্য কোনো অবকাশে কোনো প্রসিদ্ধ স্থানে কিছুদিন গিয়া বাস করিয়া আসেন। ইহাকে দেশভ্রমণ বলা চলে না—ইহাকে বায়ুপরিবর্তন বলা যাইতে পারে এইমাত্র। যে দেশগুলিতে যাওয়া হইবে সেই দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে 'হাইকিং' নামক ইংলণ্ডের একপ্রকার ভ্রমণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদল ভ্রমণপিপাসু শনিবার কাজের পর ঝোলাঝুলি লইয়া গ্রামাঞ্চলে গিয়া সেখানকার লোকদের জীবনের পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে। এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সাধু। ইহাতে স্বদেশের যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের জীবনধারার পরিচয় পাইবার জন্য পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এইরূপ ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য—কিন্তু ইহার মূল্য অসাধারণ।

পল্লী জীবন ও নাগরিক জীবন

সংকেত—পল্লীজীবনের আকর্ষণ লুপ্ত—নগরের বিলাস ও সমৃদ্ধির আকর্ষণ—জীবিকার্জনের সুযোগ—শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ—নগরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া—গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বাল্যকালে পল্লী ও নগরের মধ্যে অল্পবয়সের ভাইবোনের মুখের আদরের মতো একটা সাদৃশ্য দেখা যাইত। কিন্তু বর্তমান যুগে পল্লী জীবন ও নাগরিক জীবনের মধ্যে ঘোরতর পার্থক্য দেখা যায়। কলিকাতা মহানগরীর সহিত নগর হইতে দূরবর্তী যে কোনো একটি পল্লীর মধ্যে সবদিক দিয়াই একটা ঘোরতর পার্থক্য দেখা যাইবে।

নাগরিক জীবনের কঠোরতায় কাতর হইয়া কবি একদিন কামনা করিয়াছিলেন, 'ফিরে লও এ অরণ্য, লও এ নগর', কিন্তু বর্তমানে নগরের দিকে ছুটিয়া যাইবার জন্য সকল মানুষের মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ দেখা যাইতেছে। পূর্বে অনেকে কর্মসূত্রে নগরে বাস করিলেও পল্লীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র বিলুপ্ত হইত না। কিন্তু বর্তমানে সকলেই গ্রামের সহিত সামান্যতম সম্পর্কটুকু ছেদন করিয়া নগরে স্থায়িভাবে বাস করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

নগরে বাস করিবার জন্য সকলে যে আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথেষ্ট কারণ যে নাই এমন নয়। নগরগুলিতে জীবিকা-অর্জনের সুবিধা প্রচুর। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া নগরগুলিতে আসা বহু লোকেরই পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। নগরে কলকারখানা থাকায় সেগুলিতে কাজ

করিবার জন্য বহু লোক আসিয়া জুটে। প্রত্যেক নগরেই কিছু-না-কিছু সরকারি কর্ম, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থাকে—এইগুলিতে কাজ করিবার জন্যও বহু লোক আসে। তাহা ছাড়া নগরের জনসংখ্যা সুপ্রচুর হওয়ায় চিকিৎসা হইতে সুরু করিয়া দোকানদারি পর্যন্ত বহু ব্যবসায়ের অবকাশ নগরে আছে। সুতরাং নগরের দিকে সকলে স্বাভাবিক কারণেই ঝুঁকিয়াছে।

অবশ্য গ্রামে যে জীবিকা-অর্জনের সুযোগ নাই এমন নয়। বরং ভারতবর্ষের বেশির ভাগ লোক গ্রামেই বাস করে এবং কৃষিকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছে। সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া গ্রামশিল্পের বহুলপ্রচার হইলেও কৃষিই এখনও ভারতবাসীর জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। পূর্বে পল্লী-অঞ্চলে কুটির শিল্পের প্রসার ছিল; বর্তমানে তাহা কমিয়া গেলেও গ্রামাঞ্চলের শিল্পীদের উৎপন্ন বস্তুসম্ভারের পরিমাণ কম নয়। তবে পল্লীঅঞ্চলে কোনো একটি স্থানে বিচিত্র কর্মসংস্থানের অবকাশ নাই।

কেবল অর্থ-উপার্জনের দিক দিয়া সুযোগ-সুবিধা আছে বলিয়াই যে লোকে নগরে বাস করিতে চাহে এমন নয়। নগরে আরও অনেক রকম সুবিধা আছে। নগরে শিক্ষা, চিকিৎসা, যানবাহন, প্রভৃতির যে ব্যবস্থা আছে, পল্লীঅঞ্চলে তাহা নাই। নগরে অর্থ ব্যয় করিলে পাওয়া যায় না এমন জিনিস নাই বলিলেই হয়। তাহা ছাড়া নগরে আমোদ-প্রমোদের যে সুপ্রচুর ব্যবস্থা আছে, পল্লী অঞ্চলে তাহা কল্পনার অতীত।

শিক্ষাদীক্ষার প্রচুর আয়োজন থাকায় নগরবাসীরা সকলেই চালাক-চতুর ও চটপটে হইয়া উঠে। তাহাদের তুলনায় পল্লীবাসীরা অপেক্ষাকৃত ঢিলাঢালা এবং শিক্ষাদীক্ষার বিশেষ সুযোগ না পাওয়ায় সব দিক দিয়াই পিছাইয়া পড়িয়া আছে। নগরবাসীরা পল্লীবাসীদের 'অজ্ঞ পাড়া গেঁয়ে' বলিয়া কটাক্ষ করিতে ছাড়ে না।

এক সময়ে বাংলার পল্লীর শ্রীর সীমা ছিল না। তখন দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, আমকাঁঠালের ছায়াঘেরা প্রাঙ্গণ, মাছে ভরা পুকুর বা দীঘি, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী এদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিত। কিন্তু তাহার সেই শ্রীবৃদ্ধি এখন আর নাই। এখন পল্লী অঞ্চলের সেই শ্রী নাই। তাহার প্রাকৃতিক শোভা গিয়াছে, চারিদিকে পতিত জমি আর জঙ্গল দেখা যায়, পুকুর ও দীঘিগুলি মজিয়া গিয়াছে, তাহার উপর ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য

মহামারীতে এক এক সময় দেশ উজাড় করিয়া দিয়াছে। অনেক গ্রামেই মাঠের আলের উপর দিয়া ছাড়া অন্যভাবে যাইবার পথই নাই।

কিন্তু নগরের দিকে অনেকেই ঝুঁকিলেও নগর স্বর্গ নয়। অনেক দিক দিয়া সুবিধা থাকিলেও নাগরিক জীবন স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রায়ই অনুকূল নয়। নগরে বাড়িগুলি এত ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে যে, ঘরগুলি প্রায়ই আলোবাতাস পায় না। কয়েকটি প্রশস্ত রাজপথ থাকিলেও সরুগলি যথেষ্ট সংখ্যায় আছে। এই সব স্যাঁতসেঁতে আলো-বাতাসহীন স্থানে বাস করিলে স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। তাহা ছাড়া কলকারখানার ধোঁয়া, পেট্রোল বা অন্য গ্যাসের গন্ধ, নর্দমার পচা গ্যাস প্রভৃতি শরীরকে ধীরে ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী এবং ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব নগরেই প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

নগরের জীবনযাত্রাও কৃত্রিম ও সংকীর্ণ। এইজন্যই নগরে প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চেনে না—সকলের মধ্যে একটা স্বার্থপরতা বদ্ধমূল হইয়া থাকে। পল্লী অঞ্চলে পরস্পরের মধ্যে যে হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকে, শহরে তাহা আদৌ নাই। সকলেই ছোটো ছোটো কয়েকটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে—পরস্পরের সহিত কোনোরূপ সম্পর্ক রাখিতে চাহে না।

পল্লী অঞ্চলে প্রকৃতির মধ্যে মুক্তিলাভ করিয়া দেহ ও মন দুই-ই স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে। নগরের গতানুগতিক জীবনে হাঁপাইয়া উঠিবার পর পল্লীতে গমন করিলে প্রাণ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। নগরের দিকে অত্যধিক দৃষ্টি দেওয়ার ফলে গ্রামগুলি উপেক্ষিত হওয়ায় তাহার এই দুরবস্থা হইয়াছে। জীবিকার উপায় এবং শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকিলে গ্রামজীবন নাগরিক জীবন অপেক্ষা আনন্দদায়ক ও কল্যাণকর হইবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে যে দলাদলি প্রভৃতি দেখা যায়, শিক্ষার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীদের অজ্ঞতাজনিত সংকীর্ণতা ও জড়তা দূর হইয়া যাইবে।—গ্রামজীবনের এই দিকটির কথা স্মরণ রাখিয়াই বর্তমান সরকার গ্রামোন্নয়নপরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

গ্রামের বাজার

গ্রামের বাজার শহরের বাজারের মতো নয়। শহরের বাজার রোজ বসে—সকালবেলায় ভিড় বেশি হলেও বিকেলেও ফাঁকা যায় না। কিন্তু গ্রামের বাজার সবদিন বসে না, সপ্তাহের মধ্যে দুদিন কি বড়ো জোর তিনদিন বসে। এই দিনগুলোকে হাটবার বলে। এই দিনগুলোতে

জিনিসপত্র জুটিয়ে এনে
গ্রামের মানুষ বেচে কেনে।
উচ্ছে বেগুন পটল মূলো,
বেতের বোনা ধামা কুলো,
সর্ষে ছোলা ময়দা আটা
শীতের র‍্যাপার নক্‌শা-কাটা।
ঝাঁঝরি কড়া বেড়ি হাতা,
শহর থেকে সস্তা ছাতা।

গ্রামের বাজারগুলোর ইতিহাসের সন্ধান করতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনো জমিদার সেই বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেকালে দেবালয়-প্রতিষ্ঠা বা পুকুর-কাটানোর মতো বাজার-বসানোও একটা পুণ্য কাজ বলে মনে করা হত। অবশ্য বেশির ভাগ জায়গাতেই জমির বা বাজারের মালিক বাজারে যারা জিনিষপত্র বিক্রি করতে আসে তাদের কাছ থেকে 'তোলা' আদায় করেন।

গ্রামের বাজার এক একটা প্রধান জায়গায় বসে। সাধারণতঃ নদীর ধারে বা কোনো ঠাকুরের মন্দিরের কাছে বাজার বসে দেখা যায়। এই বাজারে আশপাশের আট-দশ খানা গ্রামের লোক এসে জিনিষপত্র কেনা-বেচা করে। তবে কেনার চেয়ে বেচার ভাগটাই গ্রামবাসীরা বেশি পরিমাণে করে। সব্‌জির ব্যবস্থা তো প্রায় সকলেরই আছে, সবাই নানা জিনিষ বিক্রি করতে এসেছে—মহাজন বা পাইকারী ব্যবসাদাররা সেই সব জিনিস কিনে নিয়ে চলে যায় শহর অঞ্চলে—এখানে খুব কম দামে কিনে শহরের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে তারা প্রচুর মুনাফা পায়—আর চাষীরা তাদের রক্ত জল-করা খাটুনির দাম পায় না।

কলকাতার মতো বড়ো বড়ো শহরের বাজার ভোর থেকেই বসে। কিন্তু গ্রামের বাজার অত সকাল সকাল প্রায়ই বসে না—গ্রামের বাজারে যারা আসে তাদের তো আর আপিস যাবার তাড়া নেই। যারা দূরের গ্রাম থেকে আসে তারা অনেক সময় গরুর গাড়িতে মাল বোঝাই করে আগের দিন রাত্রে রওনা হয়। যারা একটু কাছে থাকে বা যাদের মালের পরিমাণ কম, তারা সকাল সকাল বেরোলেও বাজারে আসতে বেলা করে ফেলে। দুপুর বেলায় বাজার জমে ওঠে। বিকেলবেলা বেচার পালা শেষ করে দরকারী জিনিসপত্র কিনে চাষীরা ফেরার জোগাড় করে। সন্ধ্যার পর বাজারে আর কেউ থাকে না।

গ্রামের বাজারে ধানচাল আসে, নানারকম সব্জি আসে, আলাদা ঋতুতে আলাদা রকমের ফল আসে। কেউ হয়তো খেত থেকে বেগুন কি কপি তুলে নিয়ে এল, কেউ বা একগাড়ি আখ, কলা কি আম নিয়ে এসেছে দেখা যায়। মাছের চাহিদা গ্রামের বাজারে নেই। যাদের নিজেদের পুকুর আছে তারা পুকুরের মাছ খায়, আর মাছ ধরবার সময় পুকুরধারেই অনেকে মাছকেনার ব্যবস্থা করে। তবে মাছের উপর তেমন লোভ গ্রামবাসীদের নেই—টাটকা শাক-সব্জিতেই তাদের চলে যায়। মাংস-বিক্রির ব্যবস্থা এই বাজারে নেই ; তবে ছাগল, হাঁস-মুরগী জ্যান্ত অবস্থায় বেচাকেনা করা হয়। গরু-বাছুর বিক্রির ব্যবস্থাও আছে।

গ্রামের বাজারে চাষীদের মতোই শিল্পীরাও আসে। কড়া, খুন্তি, সাঁড়াশি, ছুরি, কাঁচি, কোদাল, কাটারি, লাঙলের ফাল এই সব লোহার জিনিস, কাঁসা, পিতল বা তামার বাসন, মাদুর, ঝুড়ি, চুপড়ি, হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো, জালা—গ্রামের বাজারে হরেক রকম জিনিস দেখা যায়। তাঁতিরা কাপড় বা গামছা নিয়ে আসে, পোষাকের গাঁটরি নিয়ে আসা আধা-শহুরে ব্যবসাদারও এই সব বাজারে দেখা যায়। আজকাল শহর থেকে চালান-দেওয়া জিনিসও গ্রামের বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। গ্রামের লোকেরা এগুলো তাদের দরকারের জিনিস মনে করে কেনে।

গ্রামের বাজার কেবল বেচাকেনার জায়গা নয়, পাঁচদশ গ্রামের লোকেদের মেলবার একটা অবকাশও বটে। পল্লী অঞ্চলে সকলের মধ্যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকে। এখানে পরস্পর আলাপের মধ্য দিয়া খবরাখবর

নেওয়া হয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও লঘু আলোচনা হয়। কোনো বিপদে পড়লে উদ্ধারের পরামর্শও বাজারের প্রাচীনদের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই হৃদ্যতার সুরটি শহরের বাজারে মেলে না—সেখানে ব্যবসায়িক লেনদেনটাই সবকিছু।

আমোদ-প্রমোদ

সংকেত—কাজও যেমন প্রয়োজন, আনন্দও তেমনি দরকার—বহুপ্রকার আমোদ-প্রমোদ—ব্যসন বা রুচিবিগর্হিত আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করা উচিত।

জার্মাণ জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রণনিপুণ জাতিগুলির অন্যতম। এই দেশের লোকেরা অক্লান্ত পরিশ্রমে যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া জগতের মধ্যে গৌরবের আসন গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাভবের পর তাহার পূর্বগৌরব সাময়িকভাবে কিছুটা ম্লান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার রণদৃপ্ত তেজস্বিতা ও অদম্য কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু ইহা জার্মাণ জাতির একটা দিক মাত্র। জার্মাণ জাতি অপরদিকে পৃথিবীর সৌন্দর্যপ্রিয় জাতিগুলির অন্যতম। এই দেশের নরনারীর পুষ্পপ্রীতি সুবিদিত। সংগীতে, নাট্যকলায়, ভাস্কর্যে জার্মাণ জাতি অতুলনীয় উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছে। কেবলমাত্র কর্মের সাধনায় তাহাদের জীবন সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, তাহারা আনন্দের সাধনাতেও পশ্চাৎপদ থাকে নাই।

মানুষ যেমন একদিকে কাজ করে, অপরদিকে তাহাকে আনন্দের সন্ধান করিতে হয়। মানুষ যন্ত্র নয়, আনন্দের অবকাশটুকু না থাকিলে সে হাঁপাইয়া মরিত। কাজের মাঝে মাঝে মনকে আনন্দ দিবার অবকাশ পায় বলিয়াই জীবনটা তাহার কাছে নীরস বলিয়া মনে হয় না। প্রাত্যহিক জীবনের কঠোরতাকে লাঘব করিবার জন্য মানুষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়াছে।

আমোদ-প্রমোদের প্রকারের সীমা নাই। অনেকের কাছে খেলাধূলা একটা বড়ো রকম আমোদের বিষয়। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাড্‌মিণ্টন, ভলিবল, টেনিকয়েট প্রভৃতি খেলা অনেকের কাছে আনন্দের বিষয়। যাহারা খেলে তাহারা তো আনন্দ পায়ই, যাহারা খেলা দেখে তাহারাও কম আনন্দ

উপভোগ করে না। ফুটবল খেলা ও কুস্তি বা বক্সিং প্রতিযোগিতায় দর্শকদের উত্তেজনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেহ কেহ ঘরে বসিয়াই ক্রীড়ার আমোদ পাইতে চাহেন। ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে লুডো বা গোলোকধাম জাতীয় খেলাগুলি চিত্তাকর্ষক। ক্যারম খেলা ছেলে-বুড়ো সকলের কাছেই বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। তাস-খেলার নেশা যাহাদের আছে তাহারা ইহাতে মাতিয়া থাকে। দাবাখেলার তো কথাই নাই। পাকা দাবা খেলোয়াড়রা দাবার ছকের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে কসুর করেন না। ঘরের খেলার মধ্যে বিলিয়ার্ড একটু রাজসিক ধরণের খেলা—ইহাতে ধৈর্য ও অভ্যাস দুইয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। টেবিলটেনিস অল্পবয়স্কদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।

সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া যে-সকল আমোদ-প্রমোদ গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলির মধ্যে পূর্বযুগের পাঁচালী, যাত্রাগান আর এযুগের অভিনয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত সুলভ চলচ্চিত্র বর্তমানে প্রমোদের একটা বিশেষ বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। শহরে থাকিয়া মাঝে মাঝে চলচ্চিত্র দেখিতে যায় না এরূপ লোকের সংখ্যা আঙ্গুলে গোণা যায়।

অভিনয়ও কলাবিদ্যার অন্তর্গত—কিন্তু সংগীত-কলার বিভিন্ন অংশে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। কণ্ঠসংগীতের বিভিন্ন বিভাগ আছে—সকলেই কোনো না কোনো বিভাগে আনন্দ পায়। যন্ত্রসংগীতেও অনেককে আনন্দ দেয়। নৃত্যের কলাগত দিকটা সকলে বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহার এমন একটা সুষম ছন্দ আছে যাহা অনভিজ্ঞেরও মনোহরণ করিতে পারে।

ইহা ছাড়া, নৌকাবিহার, চড়ুইভাতি বা দল বাঁধিয়া কোন জায়গায় যাওয়ার মধ্যেও যথেষ্ট আনন্দ পাওয়া যায়। এইগুলিকেও আমোদ-প্রমোদের অঙ্গীভূত করা যাইতে পারে।

মানুষের শ্রান্তমনকে আনন্দ দিবার জন্য আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ডুবিয়া থাকা নিতান্ত অসংগত। কর্মরত মানুষের জীবনকে সুসমঞ্জস করিবার জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়—ইহাকে জীবনের প্রধান বিষয় করিয়া তুলিলে চলে না। তখন উহা বিকৃত হইয়া মানুষের শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দিতে থাকে। তাহা ছাড়া এমন কয়েকটি আমোদ-প্রমোদ আছে যাহা নানা দিক দিয়া ক্ষতিকর। ঘোড়দৌড়,

জুয়াখেলা প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুৎসিত রুচির চলচ্চিত্র, অভিনয়, যাত্রা প্রভৃতি জাতীয় রুচিকে বিকৃত করিয়া তুলিতে পারে। আমোদ-প্রমোদকে নেশার মত উপভোগ করিতে চাহিলে তাহা অসুস্থ বিলাসিতায় পর্যবসিত হয়। জীবন যাহাতে কর্ম ও আনন্দ উভয়ের সামঞ্জস্যের ফলে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতে পারে সেই দিকেই দৃষ্টি দিতে হইবে।

বাংলার চাষী

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গজননীর প্রশস্তি গাহিয়াছেন—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

বাংলা দেশে উর্বর মৃত্তিকাতে চিরদিনই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। বৃষ্টির জলে সিক্ত ফলভারে সমৃদ্ধ, দক্ষিণ বাতাসে স্নিগ্ধ, প্রচুর শস্যে শ্যামাভ বাংলা দেশ কবির দৃষ্টিতে মোহিনী মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে। বাংলার চাষী মাটিতে আঁচড় কাটিলেই যেন সোনা ফলিতে থাকে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাংলার চাষী যে সুখে জীবন যাপন করে না বঙ্কিমচন্দ্র তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া দেশের প্রচুর মঙ্গল সাধিত হওয়ার কথা শুনিয়া তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, "কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরে রৌদ্রে খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি ভরিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা যাইবে না, এই চাষের সময়; সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত নুন-লঙ্কা দিয়া আধ পেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয়, গোহালের ভূমে একপাশে শয়ন করিবে— উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, কোন জমীদার, নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় চষিবার

সময় জমীদার জমিখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর সে কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস?"

বাংলার চাষীর এই যে ছবিখানি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছিলেন, এখনও তাহার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। বাংলার চাষীকে এখনও প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতে হয়। উর্বরা বঙ্গভূমি শস্যসম্ভার অর্পণ করে—কিন্তু তাহাতে তাহার অধিকার নাই। তাহার শ্রমের ফল ভূমির অধিকারী বা মহাজন ভোগ করে। তাহার ভাগ্যে সারা বৎসর ধরিয়া অর্ধাশন ব্যতীত আর কোনো কিছু জোটে না।

বাংলার চাষীর এই দুরবস্থার বহু কারণ বর্তমান। একেই বেশির ভাগ চাষীর নিজের জমি নাই—পরের জমি চষিয়া যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; তাহার মধ্যে যাহাদের জমি আছে তাহাদের জমিও উত্তরাধিকারসূত্রে বিভক্ত হইতে হইতে নিতান্ত অল্পপরিমাণ হইয়া পড়ায় কৃষির অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। দরিদ্র চাষীদের মূলধন নাই। একজোড়া বলদ বা বীজধান কিনিতে হইলে তাহাদের মহাজনের কাছে ঋণ করিতে হয়। চাষের ব্যবস্থাগত দুই সহস্র বৎসরে একটুও উন্নত হয় নাই, শস্যোৎপাদনের আধুনিক প্রণালী তাহাদের একেবারে অজ্ঞাত। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার কোনো উপায় তাহাদের নাই। ভাগ্যক্রমে যদি উপযুক্ত ফসল হয়, তাহা হইলে একটা মোটা অংশ মহাজনকে দিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ইহার পর কিছু ধান বীজের জন্য ও কিছু ধান খাইবার জন্য রাখিয়া দিয়া তাহারা বাকিটা বিক্রি করিয়া সেই টাকায় দরকারী জিনিসপত্র কেনে। বৎসরের মধ্যে কোনো সময় যদি কোনো কারণে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে খাইবার ধান বা বীজধান হইতে বেচিতে হয়। পরের বছর চাষের সময় তাহাদের বীজধানের অল্পই অবশিষ্ট থাকে। তখন আবার তাহাদিগকে নূতন করিয়া ঋণ করিতে হয়। মধ্যে এক বৎসর অজন্মা হইলে তাহারা ঋণভারে জর্জরিত হইয়া মহাজনের একেবারে কবলিত হইয়া পড়ে।

চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করিবার কোনো ব্যবস্থাই এদেশে নাই। অথচ এ দেশের বেশীর ভাগ লোকই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। চাষীদের অবস্থার অবনতি হইলে তাহা সারা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হয় সন্দেহ

নাই। তাহারা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াও যে দুই মুঠা অন্ন পায় না, ইহা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক। এই দরিদ্র জনসমাজের দুঃখকষ্টের সীমা নাই, রোগের সময় ডাক্তার দেখাইবার বা ঔষধপত্র কিনিবার সংগতি নাই। সমাজে যাহারা একটু প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের নিকট ইহারা অবজ্ঞা ব্যতীত আর কিছু লাভ করে নাই। শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে ইহারা চিরকাল বঞ্চিত। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ নানাদিক দিয়া আগাইয়া চলিতেছে, কিন্তু ইহাদের দুঃখ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এদেশে শ্রমের মর্যাদা অনেক কাল হইল লোপ পাইয়াছে। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার ফলে যে অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল তাহারা শ্রমজীবীদের নানাভাবে নিষ্পেষিত করিয়াছে। সেযুগে বাংলাদেশে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থাকায় চাষীদের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আমল হইতেই চাষীদের দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে। জমিদারী ও আমলাতন্ত্র—বৃটিশ শাসকদের এই দুইটি হানিকর ব্যবস্থার ফলে এদেশের চাষী ও কুটিরশিল্পীদের দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। ফলে বাংলার মতো উর্বর দেশেও এক এক বৎসর মন্বন্তর দেখা দিয়াছে।

অবশ্য গত কুড়ি-পঁচিশ বৎসর ধরিয়া অর্থনীতিবিদ্ বা সমাজসেবীদের কেহ কেহ বাংলার চাষীদের দিকে সহানুভূতির চোখে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের দুর্দশা মোচন করার চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ কয়েকজন মনীষী পল্লী অঞ্চলে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া মহাজনদের হাত হইতে চাষীদের বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষিকার্য করিবার উপযোগী ট্রাক্টর প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভবপর না হইলেও সারপ্রয়োগের ব্যবস্থা এবং জলসেচের প্রচুর ব্যবস্থা করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। চাষীরা যাহাতে উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য অংশ পায় এবং তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে যাহাতে যত্ন লওয়া হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিলে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চাষীদের সম্পর্কে উদাসীন। চাষীদের প্রতি তাহারা উপেক্ষা ও অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে। তাহারা যদি চাষীদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে, তাহা হইলে চাষীদের এই শোচনীয় অবস্থার অবসান হইতে পারে। চাষীরাই দেশের ভিত্তিস্বরূপ।

তাহাদের উন্নতি হইলেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইবে-তখনই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

বাংলার ঋতু

সংকেত—ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য—গ্রীষ্মের প্রখরতা—বর্ষার বর্ষণ— শরতের পরিপূর্ণতার শ্রী—হেমন্তের প্রাচুর্যের আনন্দ—শীতের সঞ্চয়—বসন্তের উচ্ছ্বাস।

বাংলাদেশে ষড়ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির মধ্যে যে রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়, অন্য কোথাও তার তুলনা পাওয়া যায় না। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের এই দেশটিতে প্রকৃতির বিচিত্র মূর্তি প্রতিদিন যেন নতুন হয়ে দেখা দেয়। বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে চৈত্র পর্যন্ত বাংলার প্রকৃতির মধ্যে যে বিপুল পরিবর্তন দেখা যায়, তা বর্ণনা করা যায় না।

গ্রীষ্মে প্রকৃতির যে রূপটি ফুটে ওঠে তাকে কবি রুদ্রের প্রলয়ংকর মূর্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে পৃথিবী যেন পুড়ে ছারখার হয়ে যায়—গ্রামের খালবিল সব শুকিয়ে কাঠফাটা হয়ে গেছে। গায়ের ঘাম শুকোতে চায় না—সূর্য একটা প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ডের মতো অগ্নি বিকীরণ করতে করতে সারা জগৎটাকে যেন জ্বলিয়ে দেয়। বাতাসও আগুনের মত গরম।—

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ॥

তবে গ্রীষ্মের রুদ্রমূর্তির অন্তরালে একটা শান্তস্নিগ্ধ ভাবও লুকিয়ে থাকে। বসন্তে যে সব ফুলের ফোটা সুরু হয়েছিল, এখন সেই সব ফুলের, বিশেষ করে সাদা আর ফিকে রঙের ফুলের বাহার। এক একদিন অপরাহ্ণে প্রলয়ের বেগে ছুটে আসে কালবৈশাখীর ঝড়—প্রমত্ত গর্জনে সব আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে যায়—বজ্রের আঘাতে উত্তাপকে বিদীর্ণ করে ক্ষণস্থায়ী বৃষ্টি ঝরিয়ে পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করে তোলে। সারা দিনের খরতাপের পর সমীর-স্নিগ্ধ সন্ধ্যার মাধুর্যের তুলনা নেই।

গ্রীষ্ম যায়। তারপর 'ঘনযৌবনে নবযৌবনা বরষা' 'জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ' ছুটে আসে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়—সহসা মেঘ ডেকে ওঠে—বিদ্যুতের ঝলকে সারা আকাশের বুক চিরে যায়, তারপর ঝরঝর করে বৃষ্টির ধারা নেমে আসে। কবি গেয়েছেন—

গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গরজে গগনে গগনে।

বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গেই সারা পৃথিবী সবুজ শোভায় ভরে যায়। বড়ো বড়ো গাছের পাতাগুলো গাঢ় সবুজ রঙে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মাটির বুকে অসংখ্য ছোটো বড়ো গাছ জন্মায়—'অনামা চারায় চলে অনুখন পাতার গুঞ্জরণ।' বৃষ্টি হলে শহরের রাস্তায় জল জমে, কিন্তু পল্লীর গাছে গাছে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটার যে শব্দ শোনা যায় তা কী অপরূপ।

বর্ষার কালো মেঘ ক্রমে ফিকে হয়ে আসে। আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায়। এই মেঘের ভার নেই—কখন এক-আধ পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে তারপর শেষ হয়ে যায়। বর্ষায় যে আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল সেই আকাশের গাঢ় নীল রং স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। সোনার মতো ঝলমলে রোদের হাসিতে চারিদিক ভরে ওঠে। পৃথিবীর মধ্যে চারিদিকে পরিপূর্ণতার ছবি। নদী, পুকুর, খাল, বিল সব জলে ভরে গেছে, গাছের ডালগুলো পাতায় ছেয়ে গেছে, সারা মাঠ নতুন ফসলে সবুজ হয়ে উঠেছে। শরতের এই অমল মহিমা দেখে কবি গেয়েছেন—

আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শরৎপ্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলভার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল তোমার কানন সভাতে।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের শোভার মধ্যেই বাঙালী বিশ্বজননী দুর্গার আবাহন করে।

হেমন্ত একদিকে শীতের আবাহন, অন্যদিকে পরিপূর্ণতার, পরিপক্বতায় অপরূপ। শরতের রোদের দীপ্তি ক্রমে ম্লান হয়ে আসে। জলাশয়গুলোর জল কমে যায়। শরতে পথেঘাটে যেটুকু কাদা ছিল এখন সব শেষ হয়ে গেছে। শরতের শিউলি ফুল দুদিন ফুটে তারপর ঝরে যায়। চারিদিকে সবুজের সমারোহ নিষ্প্রভ হয়ে আসে। শুধু মাঠে মাঠে ধান পাকতে থাকে।—

হেমন্তের আকাশেতে তারাগুলো মিটমিট করে।
হিমের ওড়নাখানা বাতাসেতে কে দিয়েছে মেলে।
আদিগন্ত ছায়াপথ তুষারের ফেনা দেয় ঢেলে ;
সে ফেনা শিশির হয়ে পৃথিবীতে গাছে গাছে ঝরে।...
আধপাকা ধান নিয়ে ভরা মাঠ ঘুম যায় সুখে।
সোনালী স্বপন যেন তারা হয়ে আকাশেতে কাঁপে॥

তারপরে আসে শীত। রাত্রে হিম, সকালে কুয়াশা, গাছ থেকে পাতা ঝরে যায়, ফুলের বাহার শেষ হয়ে আসে—কিন্তু শীতের দিনে রিক্ততার ভারে ক্লিষ্ট নয়, শীত হচ্ছে সঞ্চয়ের ঋতু। পৌষ আসতেই কবি গেয়ে উঠেছেন—

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে॥

শীতের বাংলা ফসলে ফসলে ভরে যায়। সমতল ভূমিতে শীত অসহ্য নয়, আর দার্জিলিং-এর প্রচণ্ড শীতসত্ত্বেও তুষার-ধবল শিখরের শোভা অপরূপ।

বসন্ত আসবার সঙ্গে সারা প্রকৃতির মধ্যে যেন আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। যেখানে যত গাছ ছিল সব জায়গায় ফুল ফুটে ওঠে। অশোক, পলাশ, শিমুল ফুলের টকটকে লাল রঙে বনভুমির রূপ অপরূপ হয়ে ওঠে—চাঁপা, করবী, মাধবী, মল্লিকা, গন্ধরাজ, বেলা বাগানের সাজি ভরিয়ে দেয়—আম্রমুকুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়—কোকিল থেকে সুরু করে হরেক রকম পাখির

ডাকে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে। বসন্ত যেন নূতন প্রাণের, নূতন আনন্দের উল্লাস বয়ে নিয়ে আসে। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী কবি গেয়েছেন—

এসো এসো বসন্ত ধরাতলে ;
আনো মুহুমুহু নব তান, আনো নব প্রাণ, নব গান,
আনো গন্ধ মদভরে অলস সমীরণ,
আনো বিশ্বের অন্তরে অন্তর নিবিড় চেতনা।
আনো নব উল্লাস হিল্লোল,
আনো আনো আনন্দের হিন্দোলা ধরাতলে ॥

বাংলার বেকার সমস্যা

সংকেত—বেকার কাহাকে বলে—কৃষিপ্রধানদেশে ভূমির উপর অতিরিক্ত চাপ—কৃষিজীবীদের অনেকেই কর্মহীন—বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফল—অবাঙালী শ্রমিক আমদানী—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ভয়াবহ অবস্থা—সরকারী পরিকল্পনা—উপসংহার।

যাহার চাকুরি নাই সচরাচর তাহাকেই বেকার বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যে কাজ করিতে পারে, অথচ করিবার মতো কাজ খুঁজিয়া পায় না তাহাকেই বেকার বলা যায়। চাকুরিই মানুষের জীবিকার একমাত্র উপায় নয়, তাহার জন্য আরও অনেক পথ উন্মুক্ত আছে। যে কোনো ক্ষেত্রে কেহ যখন অর্থ উপার্জনের জন্য কোনো কাজ করিবার অবকাশ বা সুযোগ না পায়, তাহাকে তখন বেকার বলা যায়।

শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসারসত্ত্বেও বাংলা দেশকে কৃষিপ্রধান বলা যায়। এদেশের অসংখ্য লোকের জীবনযাত্রা ভূমিকর্ষণের উপর নির্ভর করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হইবার সময় হইতে বাংলাদেশে কর্ষণোপযোগী ভূমির পরিমাণ অতিমাত্রায় কমিয়া গিয়াছে। অথচ পূর্ব-বাংলা হইতে অগণিত লোক আশ্রয়ের আশায় পশ্চিম-বাংলায় আসিয়াছে; তাহা ছাড়া পশ্চিম-বাংলার জনসংখ্যা স্বাভাবিক কারণে বৃদ্ধি পাইতেছে। নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠানও কর্ষণোপযোগী বহু জমি গ্রহণ করিয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বহু পল্লী ও গৃহ নির্মিত হইয়াছে। ফলে ভূমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় অনেকেই কর্ষণের পক্ষে উপযুক্ত ভূমি পাইতেছে না। ইহাতে কৃষিজীবীদের মধ্যে একটা মোটা অংশ কর্মসংস্থান করিতে না

পারিয়া অন্য বৃত্তির দিকে ঝুঁকিতেছে। ট্র্যাক্টর-যন্ত্রের প্রচলন দেশের মধ্যে তেমন না হইলেও ইহাতে অনেক লোককে কর্মহীন করিয়া দিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলা দেশে কর্মের ক্ষেত্র, বিশেষ করিয়া শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগে কর্মের অবকাশ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু এই জনবহুল প্রদেশের পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত নয়। দেশের মধ্যে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার ফলে কুটিরশিল্পগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ফলে কর্মহারা শিল্পীরা বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চাকুরির জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক চাকুরি পাইতেছে। ফলে জনগণের একটা বৃহৎ অংশ বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলাদেশে বহু অবাঙালী যে বহুকর্মে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতেছে ইহাও বাঙালী বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কুলিগিরি অবাঙালীদের একচেটিয়া। শারীরিক অপটুতার জন্যই হোক বা অপর কোনো কারণেই হোক বাঙালী গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসর শ্রমসাধ্য কাজে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহা ছাড়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও বাঙালী পিছু হটিয়াছে। ধোপা, নাপিত, মুচি, মাঝি, মিস্ত্রী প্রভৃতির কাজেও অনেক জায়গায় অবাঙালীর আধিপত্য দেখা যায়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজেই বেকারের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। উচ্চশিক্ষা লাভের ফলে অনেক যুবকের মনে একটা মেকি আভিজাত্যবোধ জাগ্রত হয়। ফলে তাহারা শ্রমকে অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া শ্রমসাধ্য কোনো বৃত্তিতে অগ্রসর হইতে চাহে না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বঙালীকে এই তুচ্ছ সম্ভ্রমবোধ পরিহার করিয়া যে কোনো কাজে লাগিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। চাকুরির মোহ শিক্ষিত বাঙালীকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, কোনো স্বাধীন বৃত্তিতে অগ্রসর হইতে সে পারত পক্ষে চাহে না। চাকুরি জীবনের নিরুদ্বিগ্নতাই ইহার অন্যতম কারণ।

অবশ্য সম্প্রতি কিছুকাল ধরিয়া বাঙালী যুবকরা কিছু কিছু শ্রমসাধ্য কাজ বা স্বাধীন ব্যবসায়ে অগ্রসর হইতেছে। ছোটোখাটো পোষাকের দোকান, মুদির দোকান, শহর অঞ্চলে চায়ের দোকান, মনোহারী জিনিসের দোকান প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম মূলধনের ব্যবসায়ে বাঙালী যুবকরা কিছু কিছু আগাইয়া গিয়াছে। প্ল্যাস্টিকের খেলনা বা অন্য ছোটোখাটো শিল্পজাত দ্রব্য

প্রস্তুত-কার্যেও অনেকে ব্যাপৃত হইয়াছে। মফঃস্বল অঞ্চলে অনেক অর্ধশিক্ষিত যুবক সাইকেল-রিক্সা চালাইয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে।

দক্ষ কারিগরের কাজেও বর্তমানে অনেকে লিপ্ত হইয়াছে। কারখানায় অনেক কাজে বাঙালীর ছেলেরা আগাইয়া গিয়াছে দেখা যায়। মিস্ত্রীর কাজে বাঙালীর সুনাম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান বা কারখানা, মোটর বা সাইকেল মেরামতের কারখানা, ঢালাইয়ের কাজ প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বাঙালী এখন জীবিকা-অর্জনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। ডকে বা জাহাজে নাবিকের কাজেও পশ্চিম-বাংলার অনেক যুবক যোগদান করিয়াছে।

কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কর্মব্যবস্থার পরিমাণ অতিশয় সামান্য। বাঙালী ব্যবসা করিতে চায়—কিন্তু তাহার মূলধন নাই, অবাঙালী বড়ো ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী না হইলে তাহার চলে না; কাজেই মুনাফার অধিকাংশই বড়ো ব্যবসায়ীর পেটে যায়। বাঙালী দক্ষ কারিগর হইতে চায়—কিন্তু তাহাকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নাই। যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাতে প্রবেশের অধিকার সীমাবদ্ধ। যাহারা শিক্ষা লাভ করে, তাহারাও অনেক সময় কাজ পায় না। তাহা ছাড়া অগণিত তরুণ সাধারণ শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় ছাত্রজীবন পরিসমাপ্ত হইবার পর উপার্জনের কোনো পথ খুঁজিয়া পায় না। ফলে একটা প্রবল হতাশা তাহাদের পাইয়া বসে—কর্মসংস্থানের কোনো উপায় না দেখিতে পাইয়া, অনভিজ্ঞতার জন্য প্রতি পদে আঘাত পাইতে পাইতে যুবকসমাজ ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে। এই হতাশাচ্ছন্ন তরুণদের বাঁচিবার পথ করিয়া দিতে না পারিলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইবে।

এই সারাদেশব্যাপী সমস্যা দূর করিবার জন্য সরকারকেই চেষ্টা করিতে হইবে। সোবিয়েৎ রাশিয়ায় যেভাবে কর্মকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া সকলের কর্মসংস্থানের আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা এদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে অসম্ভব। জনগণ যাহাতে ব্যক্তিগতভাবে অর্থকরী শিক্ষা লাভ করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বৃত্তিশিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিতে হইবে। কৃষিজীবীরা যাহাতে সারা

বৎসরই কর্মে নিযুক্ত থাকিতে পারে তাহার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। পল্লী অঞ্চলে কুটিরশিল্প যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে—দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণই বাঞ্ছনীয়। নতুবা বেকার সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা নাই।

তোমার দেখা একটি মেলা

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' গল্পে মাহেশের রথের উল্লেখ আছে। এখানকার রথযাত্রার খুব নাম আছে। কিন্তু রথযাত্রার দুদিন খুব ভিড় হয় বলে ঐ সময় সেখানে যেতে পারিনি। রথযাত্রার পরও মাসখানেক সেখানে মেলা থাকে। একবার শনিবারে ছুটির পর স্কুলের কয়েকজন ছেলের সঙ্গে মাহেশের রথের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম।

প্রথমে ট্রেনে করে শ্রীরামপুর স্টেশনে গিয়ে নামলাম। স্টেশনের কাছেই বাস—এই বাসে চড়ে গিয়ে মাণিকতলা বলে একটা জায়গায় নামতে হয়। এখান থেকে সুরু করে এক মাইলেরও বেশি রাস্তা জুড়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের দুধারে মেলা বসে।

মাহেশের জগন্নাথদেবের রথ অনেক বছরের। এখানে লোহার তৈরি রথে চড়ে জগন্নাথ মন্দির ছেড়ে মাসীর বাড়ি পর্যন্ত আসেন—তারপর পুনর্যাত্রা বা উল্‌টোরথের দিন মন্দিরে ফিরে যান। রথ দেখবার জন্য দুদিন খুব ভিড় হয়—রথ শেষ হয়ে গেলেও মেলাতে যে ভিড় হয় তাও কম নয়। বাস থেকে নেমে দেখলাম যে, দলে দলে অনেক লোক রাস্তা ধরে যাচ্ছে আর আসছে। বড়ো লোক যে নেই তা নয়—তবে ছেলে মেয়ে আর গিন্নিবান্নিদের ভিড়ই বেশি।

প্রথমে খানিকটা রাস্তার দুধারে শুধু বাদামভাজার দোকান। অবশ্য এই দোকানগুলোতে ছোলাভাজা, লাল মটর কলাইভাজা আর ভুট্টাদানা-ভাজাও পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে দু' একটা খাবারের দোকানও আছে। এগুলোতে যে সব মিষ্টি আছে সেগুলো কবে যে তৈরি হয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না। তবে সে দিকে তেমন আকর্ষণ নেই। গরম কচুরি, সিঙাড়া আর তেলেভাজাই খুব বিক্রি হচ্ছে দেখলাম। পথে দু-একটা রেস্টুরেন্ট জাতীয় দোকান চোখে পড়ল। এই দোকানগুলোতে ভেজিটেবল

চপ, চিংড়ি মাছের কাটলেট, ডিমের কারি আর বোম্বাই চপ যেভাবে সাজিয়ে রেখেছিল তা দেখলে লোভ হয়। তবে এসবগুলো খাদ্য হিসেবে বিষ বললেও ভুল হয় না—সারা দিন রাস্তার ধুলো পড়ে পড়ে এগুলোর উপর ধুলোর একটা অদৃশ্য পর্দা পড়ে গেছে।

আজকালকার সব মেলার মতোই এখানেও প্ল্যাস্টিকের হরেক রকম খেলনার দোকান এসেছে। প্ল্যাস্টিকের তৈরী ছোটো ছোটো রঙিন চেয়ার, ড্রেসিংটেবিল, ঘড়ি, স্টোভ, টেবিলফ্যান, বিশেষ করে রঙিন ফিতের পোষাক-জড়ানো পুতুল ছোটো ছেলেমেয়েদের আকর্ষণের জিনিস। এ ছাড়া রবারের বল, কাঠের পাখি বা পশু, নানা রকমের অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, কলাই, চীনামাটি আর কাচের জিনিসপত্রে দোকানগুলো ভর্তি। এ ছাড়া স্কিপিংএর দড়ি, খেলার বন্দুক, স্প্রিং-দেওয়া মোটর গাড়ি, ঘন্টিওলা চাকা; লাট্টু, লেত্তি এমন কি ফিতে, বুরুষ, চিরুণি—সব রকম জিনিসই এখানে পাওয়া যায়।

মেলার মধ্যে এই ধরণের দোকানই বেশি আর এই সব দোকানেই ভিড় বেশি। সস্তা দামের ঠুনকো খেলনা কিনে ছোটো ছেলেমেয়েদের তখনকার মতো ঠাণ্ডা করতে হয়। মাটির পুতুল সাজিয়ে কয়েকজন বসেছে—সেখানে তেমন ভিড় নেই। কাঠের উপর আর হাতীর দাঁতের উপর কাজ করা জিনিসের একটা দোকান দেখলাম। একটা পদ্ম-আঁকা চন্দন-কাঠের ছোট্ট কৌটো দেখে লোভ হল—কিন্তু যা দাম বলল তা শুনে পিছিয়ে আসতে হল।

লোহার জিনিসের কয়েকটা দোকান দেখলাম। জিনিসগুলো যে সরেস এমন মনে হল না, তবে দামে বেশ সস্তা। বেতের ধামা, বাঁশের চুপড়ি আর মাদুরের কয়েকটা দোকান দেখলাম—মাদুরের দোকানে বেশ বিক্রি হচ্ছে। শিল-নোড়া থেকে সুরু করে অনেক রকম পাথরের জিনিসের দোকান গোটা তিনেক ছিল। পিঁড়ে, র‍্যাক, কেঠো এই সব কাঠের জিনিসের দোকানও দুটো দেখলাম। পাশাপাশি দুটো ছবি-বাঁধানোর দোকান দেখলাম—কত রকমের যে বাঁধানো ছবি তাতে আছে! একটি নাড়ু গোপালের ছবি বেশ লাগল।

আর একটি জিনিসের দোকান দেখলাম যা অন্য কোনো মেলাতে

দেখিনি—সেটি হচ্ছে গাছের দোকান। আশপাশেই গোটা দুই-তিন নার্শারি আছে, সেখান থেকে কিছু কিছু গাছ এখানে বিক্রি হতে আসে। যাঁদের বিশেষ ফুল বা ফলের গাছের শখ আছে তাঁরা এখান থেকে গাছ নিয়ে যান। অনেক রকম ফলের কলমও এখানে পাওয়া যায়।

মেলার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও যথেষ্ট আছে। চীনে সার্কাস, বানরের অদ্ভুত কার্যকলাপ, ভুতুড়ে কাণ্ড, অদ্ভুত যাদুবিদ্যা, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্য দিয়ে দেখানো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছবি, বৈদ্যুতিক গোলোক ধাম, মৃত্যুকূপায় মোটর সাইকেলের খেলা—অনেক রকম জিনিস মেলায় দেখলাম। তবে ফেরবার তাড়া ছিল—দু-একটা দেখেই দেখার আগ্রহ মেটাতে হল।

যাবার সময় একদিক দিয়ে দেখতে দেখতে গিয়ে আর একদিক দিয়ে ফিরে এলাম। মেলা দেখতে দেখতে হাঁটায় প্রায় দুমাইল পথ হাঁটতে একটুও ক্লান্ত হয়েছি বলে মনে হল না। মেলা থেকে আমার নিজের জন্য একটা ছুরি আর ভাইবোনদের জন্য ছোটোখাটো দুচারটে জিনিস কিনলাম। তারপর কয়েকজন বন্ধুতে মিলে সের খানেক চিনেবাদাম কিনে তাই চিবুতে চিবুতে স্টেশনে যখন এলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমাদের গাড়িরও তখন মাত্র আর মিনিট কুড়ি দেরি।

বিজ্ঞান কি অভিশাপ ?

সংকেত—মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা—জনকল্যাণে বিজ্ঞানের আবিষ্কার—মানুষের অসাধু বুদ্ধিই দায়ী।

বিগত মহাযুদ্ধের সময় ব্যোমপথে বিমানযোগে বোমাবর্ষণে যেভাবে বহু দেশে অগণিত নিরপরাধ নরনারীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে, বিষাক্ত গ্যাসপ্রয়োগে জীবনহানির আশঙ্কা দেখা গিয়াছে, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে মানব সভ্যতার কীর্তিগুলি একে একে বিধ্বস্ত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সভ্যতাভিমানী শক্তিশালী জাতিগুলি যেভাবে দুর্বল জাতিগুলির উপর হিংস্র অভিযান চালাইয়াছে এবং সর্বোপরি হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণ করিয়া কয়েক লক্ষ নির্দোষ নরনারীকে যেরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে মানুষের

মনে এই প্রশ্নই জাগে—বিজ্ঞান কি অভিশাপ ? যুদ্ধ মিটিবার পরও আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্র লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে পরীক্ষা চলিতেছে, আগামী যুগে যদি মহাযুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে বিপক্ষকে পরাভূত করিয়া আপনার একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সহায়তা লইয়া যেভাবে নিত্য নূতন মারণাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া চলিতেছে তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ এই সন্দেহ আমাদের মনে প্রবল হইয়া উঠে।

বিজ্ঞান আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের দান রহিয়াছে। মানুষ বিজ্ঞানের সহায়তায় বহু প্রকার যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করিতে পারিয়াছে। সামান্য দেশলাই হইতে বিমান পর্যন্ত সবই বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে—মানুষ এখন অন্য গ্রহে যাইবার আশা করিতেছে। উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি তাহার অন্ন ও বস্ত্র উৎপাদনের পরিশ্রম কমাইয়া দিয়াছে। বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার মানুষের শক্তি বহুগুণে বর্ধিত করিয়া দিয়াছে। এমন একটি সুইচ্ টিপিবামাত্র ঘর আলোকিত হইয়া ওঠে, পাখা বা বেতারযন্ত্র চলে, বড়ো বড়ো কলকারখানা চলিতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না। মানুষের জ্ঞানের পরিধিও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। দূর গ্রহ বা নক্ষত্রের খবর হইতে সুরু করিয়া জীবদেহের ভিতরের খবরও তাহার অজ্ঞাত নয়। রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভেষজবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। দেহের মধ্যে কোথায় গ্লানি তাহা পরীক্ষা করিবার বহুবিধ ব্যবস্থা বর্তমান। পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিটিন, টেরামাইসিটিন প্রভৃতি ঔষধ আবিষ্কারের ফলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সহজেই নিরাময় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শল্যবিদ্যার উন্নতিও আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম দান।

বাইবেলে আছে যে, মানুষ যেদিন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে সেদিন হইতেই তাহার দুঃখের পালা সুরু হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বাইবেলের এই কথাটির তাৎপর্য অনুভব করা যায়। মানুষ তাহার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য এবং হয়তো কল্যাণসাধনের জন্য কোনো জিনিষ আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে সেই আবিষ্কারকে

বিস্তৃত করিয়া তাহাকে পরম অকল্যাণকর কাজে লাগানো হইতেছে। পথ পরিষ্কার করিবার জন্য বা কয়লার খনিতে ব্যবহারের জন্য স্যার আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়াছিলেন—কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহার আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করিয়া মারাত্মক বিস্ফোরক সৃষ্ট হইয়াছে। মানুষের শারীরিক যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য মর্ফিয়া বা ক্লোরোফর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু ঐগুলির কত ক্ষতিকর প্রয়োগই না করা হইতেছে। মানুষের চাহিদা মিটাইবার জন্য যন্ত্রের আবিষ্কার করা হইয়াছে। কিন্তু শহরের মধ্যে কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় অগণিত মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই বহুবিধ অকল্যাণজনক ব্যাপারও ঘটিতেছে। কিন্তু ইহার জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করা যায় না। দেশলাইয়ের আবিষ্কার যে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অভাব মিটাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু সেই দেশলাই জ্বালিয়া কেহ যদি ঘরে আগুন দেয় তাহার জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করা সঙ্গত হইবে না। অসাধু ব্যবসায়ী যদি খাদ্যদ্রব্যের সহিত কৃত্রিম কোনো উপাদান মিশায়, তাহা হইলে ঐ কৃত্রিম উপাদান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফল বলিয়া বিজ্ঞানকে দোষী করা চলে না—ব্যবসায়ীর অসাধুতাই তাহার জন্য দায়ী।

বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞানের উপর আমরা যে কল্যাণকারিতা বা অকল্যাণ-কারিতা গুণ আরোপ করি, তাহা যথার্থ নয়। বিজ্ঞান নিরপেক্ষ বিষয়—মানুষ তাহাকে যেভাবে চালায়, সে সেইভাবে চলে। মানুষের মধ্যে সুবুদ্ধি-কুবুদ্ধি দুই-ই আছে। মানুষ যখন কল্যাণব্রত গ্রহণ করে তখন সে বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করে; আর যখন সে শয়তানের উপাসনা করে তখন সে বিজ্ঞানকে অকল্যাণের নিদান করিয়া তুলে। বিজ্ঞান মানুষের শক্তিকে বহু-গুণিত করিয়াছে এইমাত্র বলা চলে। মানুষের কুবুদ্ধি যতদিন আছে, ততদিন বিজ্ঞান কুবুদ্ধির যন্ত্রহিসাবে অমঙ্গলই সাধন করিবে। কিন্তু যাঁহারা কল্যাণ-সাধক, তাঁহারা বিজ্ঞানকে চিরদিনই কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিবেন।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের দান

বিজ্ঞান বলিলে আমরা সাধারণতঃ যন্ত্রবিজ্ঞানই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু বিজ্ঞানকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—একটি তাহার বিদ্যাগত দিক, অপরটি তাহার ব্যবহারিক দিক। বিজ্ঞানের দান সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে এই দুইটি দিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে।

বিজ্ঞান শব্দের মূল অর্থ বিশেষ জ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান। বর্ত্তমানে এই শব্দটির অর্থ অনেকাংশে সংকীর্ণ হইয়াছে। এখন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জৈব-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ভেষজবিদ্যা, প্রভৃতিকে বিজ্ঞান বলা হয়। গণিতকেও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে—গণিতের অন্তর্গত বলবিদ্যা তো আধুনিক যুগের যন্ত্রবিজ্ঞানের মূলে বর্ত্তমান।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের আলোচনা করিয়া মানুষ বিশ্বের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ধর্ম, তাপের ধর্ম, শব্দের ধর্ম, আলোর ধর্ম, চুম্বক ও তড়িতের ধর্ম সম্পর্কে সে বহু তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে। পদার্থকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে সে অণু ও অণু হইতে পরমাণুতে পৌঁছাইয়াছে। পরমাণুর ধর্ম সম্পর্কে সে যে সব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সম্প্রতি পরমাণুকেও বিশ্লেষণ করিয়া প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন আবিষ্কার করিয়া সে একদিকে পদার্থের গঠন সম্পর্কে নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছে, অপরদিকে অসামান্য শক্তির উৎস আবিষ্কার করিয়াছে।

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার উন্নতির মূলে বিজ্ঞানের এই দুইটি শাখার উৎকর্ষ বর্ত্তমান। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রভূত গতিশক্তি লাভ করিয়াছে। সাবেক আমলের গরুর গাড়ী বা ঘোড়ার গাড়ীর তুলনায় মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, বিমান প্রভৃতির প্রচণ্ড গতির তুলনা করিলে উন্নতির পরিমাপ করা যাইবে। মানুষের শ্রমকে কমাইবার জন্য বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে কলকারখানায় যে বিপুল শক্তি নিয়োগ করা হয়, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমাদের প্রয়োজনের প্রত্যেকটি সামগ্রী বিজ্ঞানের সহায়তায় প্রস্তুত হইতেছে। দুধ হইতে যে গায়ের জামা তৈয়ারি করা যায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে

তাহা কল্পনারও অগোচর ছিল। মহাশূন্যে কৃত্রিম চাঁদ প্রেরণ বিজ্ঞানের অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তির একটি নিদর্শন। ব্যবহারিক বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অসাধ্যসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

জীবদেহ বিশ্লেষণ করিতে করিতে মানুষ অসংখ্য বিস্ময়কর তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছে। জীবদেহ কী বিচিত্র উপাদানে গঠিত, তাহার দেহযন্ত্র যে কীভাবে পরিচালিত হইতেছে, কোনো বিশেষ অবস্থায় তাহার যে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, বিশ্বের জীবসমাজ যে কী ভাবে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে সম্পর্কে মানুষ কিছুটা অবগত হইয়াছে। জীবদেহের সহিত উদ্ভিদের একটা নিকট সম্পর্ক আছে; উদ্ভিদের জীবনও জীবের মতোই প্রাণময় এবং তাহার জীবনযাত্রার একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে ইহা মানুষ জানিতে পারিয়াছে। পৃথিবীর মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া মানুষ পৃথিবীর গঠন সম্পর্কে নানা বিষয় জানিতে পারিয়াছে; পৃথিবীর গঠনের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি রকম জ্ঞানও সে লাভ করিয়াছে। কেবল পৃথিবী নয় অসীম আকাশের গ্রহ-তারকা সম্পর্কেও সে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছে। এই বিরাট বিশ্বে পৃথিবীর স্থান যে কোথায় জ্যোতির্বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় তাহাও অজ্ঞাত নাই। মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য বিজ্ঞান আপনার শাখাগুলিকে চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

ভেষজবিদ্যায় জ্ঞানের দিকটা কম নয়, তবে ইহার ব্যবহারিক উপযোগিতাই সবচেয়ে বেশি করিয়া উল্লেখযোগ্য। ব্যাসিলাই, ভাইরাস, কক্কাস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় রোগ-বীজাণু আবিষ্কারের পর রোগ-নিরাময়ের জন্য সালফাগোষ্ঠী বা পেনিসিলিনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ঔষধ উদ্ভাবন এ যুগের ভেষজবিদ্যার অন্যতম কৃতিত্ব। মৃত্যুকে কেহ চিরকালের জন্য প্রতিরোধ করিতে পারে না—তবুও মানুষ একমাত্র ক্যানসার ব্যতীত অপর প্রায় সর্বপ্রকার রোগের নির্ভরযোগ্য ঔষধ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। অস্ত্রচিকিৎসাতেও বর্তমানে নূতন দিক খুলিয়া গিয়াছে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, যে বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণসাধন করিতেছে, সেই বিজ্ঞানকে একদল কুটচক্রী মানবের অকল্যাণজনক কাযে নিয়োগ করিতেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে অবলম্বন করিয়া যে সব মারণাস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে সেগুলি মানবজাতির মঙ্গলের পরিপন্থী। বন্দুক-কামান হইতে

আরম্ভ করিয়া সাবমেরিণ, টর্পেডো, বোমা—সাম্প্রতিক যুগের আণবিক বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা—সবগুলিই মানুষের জীবনে সন্ত্রাস সঞ্চার করিয়াছে। বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে লাগাইয়া চলিলে মানবের ধ্বংস অনিবার্য—বিজ্ঞানকে কল্যাণকার্যে নিয়োগ করাই মানবসমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়।

তোমার শৈশব স্মৃতি

বড়ো হয়ে গেলে ছেলেবেলাকার কথা ভালো মনে থাকে না—কেবল দু'চারটে স্মৃতির টুকরো জেগে থাকে। ছেলেবেলায় কবে কী ঘটেছিল তার ইতিহাস বলা যায় না. শুধু দু'চারটে ছোটো বড়ো ঘটনার কথা বিস্মৃতির সাগরে দু'একখণ্ড দ্বীপের মতো জেগে আছে। আসলে আমাদের মনটা সব কিছু ধরে রাখতে পারে না—বেশীর ভাগই তাকে ভুলতে হয়, তা না হলে যা স্মরণীয় তাকে সে ধরে রাখতে পারে না।

সবচেয়ে ছোটো বেলাকার যে কথাটি মনে আছে সেটি হচ্ছে এই—আমার বয়স তখন বছর তিনেক হবে, আমার তখন খুব ফোড়া হয়েছিল. ঠাকুরমা সেই ফোড়াগুলো থেকে পুঁজ গেলে দিতেন আর আমি খুব কাঁদতাম! আমার বয়স যখন বছর চারেক তখন আমাদের বাড়ির সামনের দোকানদার একদিন মদ কি তাড়ি খেয়ে খুব চেঁচামেচি করেছিল। এই বছরেই তারকেশ্বর গিয়েছিলাম. ট্রেণের অগুণ্তি নরমুণ্ডের কথা একটু একটু মনে আছে—চারবছর চারমাস বয়সে হাতেখড়ির কথাও একটু মনে পড়ে—রামরূপ পণ্ডিত শ্লেটের উপর খড়ি দিয়ে অ-আ লিখিয়েছিলেন। সেই সময়কার আর একটা তুচ্ছ ঘটনা বেশ মনে আছে। আমাদের বাড়ীর সামনে একটা পুকুর কাটানো হয়েছিল, তখন ভাদ্রমাস; সেই পুকুরে বেশ জল হয়েছে। পাড়ার গোবরাকা'র বয়স তখন গোটা কুড়ি, তাঁরা মাঠে বল খেলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পথেই বল দিয়ে গোবরাকা' একটা হাইকিক করে আর একজনকে দিলেন। সে বলটা ধরবার আগেই ইলেকট্রিক পোস্টে লেগে বলটা পুকুরে পড়ে গেল; তারপর তীর থেকে ঢিল মেরে মেরে বলটা তীরে আনা হল। ঘটনাটা তুচ্ছ হলেও সেটা স্পষ্ট মনে আছে।

হাতেখড়ির পর বুড়ো মাস্টার নামে খ্যাত শ্রীপতি পণ্ডিত মশায় পড়াতে আসতেন। তাঁর একটু আফিঙের নেশা ছিল; বুড়ো মানুষ, পড়াতে পড়াতেই একটু ঝিমিয়ে নিতেন। কিন্তু তাঁকে আমি খুব ভয় খেতাম; তার কারণ তিনি প্রায়ই দু'চার ঘা দিতেন আর তাঁর হাতে আবার কাঠের একটা মোটা লাঠি ছিল। তবে আমার ছোটো ভাই একদিন তাঁর ঘুমানোর সুযোগে লাঠিটি লুকিয়ে রেখেছিল। তিনি যেভাবে 'লাঠিটা দে বাবা' বলে মিনতি করেছিলেন তা এখনও মনে আছে। আমি আদৌ দুধ খেতে চাইতাম না। ঠাকুরমা বুড়ো মাস্টার মশায়ের সামনে আমাকে দুধ দিয়ে যেতেন; আমাকে ভয়ে ভয়ে এক গ্লাস দুধ চোঁ চোঁ করে খেতে হত। শ্রীপতি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়িতে একটা পাঠশালা বসত; সেই পাঠশালাতে আমি বছর খানেক পড়েছিলাম। পাঠশালায় পঁচিশ তিরিশটির বেশী ছাত্র ছিল না; কিন্তু সকলেই কী আশ্চর্য রকমের ছিল। পাঠশালায় কিছুকাল পড়বার পর যখন আমি উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলাম তখন অনেক কিছু জিনিষ নূতন বলে মনে হলেও পাঠশালার বন্ধুদের মতো হরেক রকম বন্ধু এখানে পাই নি।

ছোটোবেলায় খাবার ঝোঁক ছিল না—ঠাকুরমা খুব খেতে দিতেন হয়তো তারই প্রতিক্রিয়ায়। ভাতের সঙ্গে তরকারি আদৌ খেতাম না—ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ আর পুঁটিমাছ ছাড়া অন্য কোনো মাছ খেতাম না—তবে ঝোল আর আলুভাজা অপছন্দের ছিল না। খাওয়ায় দিকে নজর ছিল না বলে অনেকদিন পর্যন্ত সকলের বকুনি খেয়েছি। তবে ছোটো বেলায় আমার খুব যে পেটের অসুখ করত এমন মনে হয় না—তবে সর্দিকাশি আর ম্যালেরিয়াতে খুব ভুগতাম। দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত কুইনাইনের বড়ি গিলে খেতে পারতাম না—কুইনাইন মিক্সচার খেতাম।

ছোটোবেলা থেকেই কয়েকটা খেলার দিকে আমার ঝোঁক ছিল। তার মধ্যে লাট্টুর নাম আগে করা যেতে পারে। আমার দশ-বারোটা লাট্টু ছিল—তার মধ্যে একটি বেগুনি রঙের লাট্টুর খুব দম ছিল। ডাণ্ডাগুলি আর মার্বেলের দিকেও কম ঝোঁক ছিল না। বাঘবন্দী আর মোগল-পাঠান—এই খেলা দুটো ছ-সাত বছর বয়সেই শিখেছিলাম। তবে দৌড়ঝাঁপের খেলায় বিশেষ উৎসাহ ছিল না—পরে অবশ্য অনেকরকম খেলাই খেলেছি।

বাড়ীর কাছেই গঙ্গা—সেখানে মস্ত বড়ো মাঠ ছিল—সেখানে বেড়াতে যেতাম প্রায় প্রতিদিন বিকেলেই। জেলেদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়েছিল—তবে তাদের নৌকোয় উঠতে সাহস হত না—ভয় হত পাছে জলে পড়ে যাই। তখনও গঙ্গায় ডুব দিতে পারতাম না। দশ-এগারো বছর বয়সে যখন প্রথম সাহস করে ডুব দিলাম, তার মাস দুয়েকের মধ্যেই সাঁতার শিখে ফেলেছিলাম। গঙ্গার ধারের মাঠে ফুটবল খেলা হত—শীতকালে স্পোর্টস্ হত। ডাঙার উপরে ভাঙা গাধাবোট ছিল—সেটা আমাদের খেলার আড্ডা ছিল। ছোটো বেলাতেই রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের রত্নদ্বীপ (ট্রেজার আইল্যাণ্ড) পড়েছিলাম—এটিকে একটি ছোটোখাটো জাহাজ বলে কল্পনা করতাম।

ছোটোবেলাকার আর একটি জিনিসের কথা বেশ মনে আছে—সেটি হচ্ছে গল্প শোনা। রাত্রে নামমাত্র পড়াশোনা করতাম, তারপর গল্প শুনতাম। ঠাকুরমা অনেক গল্প বলতেন—তবে তাঁর গল্পের ঝুলি খুব বড়ো ছিল না। আমাদের বাড়ীতে একজন কাজ করতেন—তাঁকে বীণা পিসি বলতাম। তিনি অসংখ্য রূপকথার গল্প বলতেন—রাক্ষস-খোক্কস, রাজপুত্র-রাজকন্যা, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর অনেক গল্প তাঁর কাছে শুনেছি। আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে এক ঠাকুরমশাই ছিলেন, তিনি ছিলেন গল্পের জাহাজ—তাঁর কাছেও হরেক রকম গল্প শুনেছি—বিশেষ করে মুসলমানী গল্প আর আরব্যোপন্যাস-পারস্যোপন্যাসের গল্প। তাছাড়া তিনি পুরীতে অনেক দিন ছিলেন, সেখানকার গল্পও তিনি অনেক করতেন। বিশেষ করে তাঁর সমুদ্রের মাছ খাওয়ার গল্প ভালো লাগত।

আমাদের বাড়ীর কাছেই পীরের একটা দরগা ছিল। সেই দরগাতে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অনেকে বাতাসা দিত। সেখানে একটি বুড়ো ফকির সাহেব থাকতেন—শোনা যায় এক সময় তিনি ডাকাতি করতেন, তারপর কী একটা হওয়ায় এই পীরের দরগায় আস্তানা করেছিলেন। তিনি আমাদের হাতে দুটো একটা করে বাতাসা দিতেন। একদিন শীতের সন্ধ্যায় সেখানে পাতা জড়ো করে আগুন জেলে আগুন পোয়ানোর জন্য বাড়ী ফিরতে দেরী হওয়ায় মার খেয়েছিলাম।—এই দরগাতে শীতের দিন সকালে পাঁচিলের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকতাম—হিন্দুস্থানী মেয়েরা পানিফল বিক্রি করতে যাবার পথে দুচারটে পানিফল পীরের উদ্দেশে ফেলে দিয়ে যেত—সেগুলো বেশ আগ্রহের সঙ্গে খেতাম! এই মজার চুরিতে সাথীও জুটত।

ছেলেবেলার কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়—হায় হায় সেই হারানো দিনগুলো যদি ফিরে পেতাম। তখনকার স্মৃতি এত মধুর। তখনকার সরলতা আর মাধুর্য আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। তখন যে সব দুষ্টুমি করেছি বা যে ভাবে পড়াশোনাতে ফাঁকি দিয়েছি তা মনে করলে একটু একটু অনুতাপ হয়। তবে আবার ছোটো হতে চাইলেও সুবলচন্দ্র সুশীলচন্দ্রের ইচ্ছাপূরণের গল্পটা ভুলিনি। ছোটোবেলার স্মৃতি এখন খুব ভালো লাগে—কিন্তু সত্যি সত্যিই ছোটো হয়ে গেলে কী যে হত তা বলতে পারি না।

একটি পল্লীর আত্মকথা

সীতারামপুর বললেই কি তোমরা আমাকে চিনে ফেলবে, তা নয়—বাংলা দেশে এই নামে কত গ্রাম আছে—সেগুলোর মধ্যে বলবার মতো কত কী আছে, আর আমি তো শহর থেকে অনেক দূরের একটা পাড়া-গাঁ। এখানে শহরের জীবনের এতটুকু ছোঁয়াচ নেই, এখান থেকে ক্রোশ চারেক দূরে পাকা রাস্তা আছে বটে, কিন্তু এখানে আসতে গেলে খেতের আল ধরে আসা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই। আগে পাল্‌কি চলত—এখনও কিছু কিছু চলে। তবে এখন সাইকেলের চল বেশ হয়েছে। চৌধুরীদের সেজো ছেলে সেবার একটা মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছিল, তা দেখবার জন্য চৌধুরীদের ঠাকুর দালানের সামনে গাঁ শুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছিল। এ সব জিনিস—কোন নতুন জিনিসই এখনকার বাসিন্দারা কখনও দেখে নি, এই বনজঙ্গলে ভর্তি দেশে চাষবাস করে সারা বছর ফসল ফলাতে ফলাতেই এদের জীবন কেটে যায়।

কিন্তু চিরকাল এ জায়গা এ রকম ছিল না। তিন শো বছর আগে তেজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী যখন এখানে রাজধানী স্থাপন করে সীতারামের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন' তখন এখানে দূর দেশ থেকে বহু লোক যাতায়াত করত ও পাশে যে সরস্বতী নদীটা মজে গেছে সেই নদীতে তখন সারাদিন অগুণতি নৌকা চলত। চৌধুরীদের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। চারিদিক থেকে লোক তখন নানা কাজে এখানে আসত। সীতারামের মন্দিরের সামনে যে মাঠটা এখন আগাছায় ভরে গেছে, সেই মাঠটায় রামনবমীর সময় মস্ত বড়ো মেলা বসত—পাঁচ সাত দিন ধরে একটানা উৎসব চলত।

দোর্দণ্ড-প্রতাপ ভূস্বামী হলেও চৌধুরীরা বৈষ্ণব ছিলেন। এই মেলাতে দূর দূর দেশ থেকে অনেক বৈষ্ণব আসতেন। শেষে চৌধুরী বংশের একটি ছেলে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কিছুকাল বৃন্দাবনে থেকে তারপর ফিরে এসে তিনি একটা আশ্রম তৈরি করিলেন। নিতাই দাসের আখড়া এখানকার একটা দর্শনীয় স্থান ছিল। এখনও সে আখ্ড়া আছে কিন্তু তার সে গৌরব নেই; একটা পোড়ো বাড়ীতে উৎকলের একজন বাবাজি থাকেন এইমাত্র।

চৌধুরীদের ছেলেরা একে একে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে আরম্ভ করার পর থেকেই এখানকার সমৃদ্ধি ধীরে ধীরে কমে যেতে আরম্ভ করল। শহরে চৌধুরীদের বাড়ী হয়েছে—কিন্তু এখানে তেজেন্দ্রনারায়ণের বিরাট প্রাসাদ ভেঙে পড়ছে। চৌধুরীদের ছেলেরা এখন কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল, কেউ ইন্জিনীয়ার আবার কেউ বা সরকারী চাকুরে। প্রৌঢ় সঞ্জীবনারায়ণ এখানে থেকে জমিজমা দেখেন। তাঁর মধ্যে চৌধুরী বংশের সে জৌলুষ নেই —তাঁকে বড়ো জোর একজন সম্পন্ন গৃহস্থ বলা যায়। মাত্র রামনবমীর সময় ছেলেরা যখন পাল্কি সাজিয়ে আসে তখন চৌধুরী বাড়ীর শ্রী কতকটা ফেরে।

অবশ্য তোমরা যাকে উন্নতি-অবনতি বলো তা আমি ঠিক বুঝতে পারি নে। চৌধুরীরা আসবার আগে এখানে জঙ্গল ছিল—তার জন্য কোনো দিন মনে এতটুকু খেদ ছিল না। যখন চারদিক জমজমাট তখনও খুব একটা আনন্দ হয় নি। আবার এখন গ্রাম অনেক নির্জন হয়ে এসেছে, তাতে এমন কি আর ক্ষতি হয়েছে। আগে সরস্বতী নদীতে নৌকোর সারি বয়ে যেত—এখন তার তীরে গোটা কতক বক পরম গম্ভীর হয়ে বসে মাছ ধরবার চেষ্টা করে। যেখানটায় ঘাট ছিল সেখানটায় বছর পঞ্চাশেক বয়সের একটা তরুণ বটগাছ আকাশের দিকে ডালপালা মেলে দিয়েছে। এখন আর হাজার মানুষের কোলাহল শোনা যায় না; কিন্তু নদীর ধারে গাছে গাছে লক্ষ পাখীর যে কলকাকলি সকালে সন্ধ্যায় শোনা যায় তার মাধুর্যই বা কম কি? আমার বুকে এখনও যে ফসল ফলে, তাতে আমার সন্তানদের বেশ ভালোই চলে যায়—বাড়তি ফসল নেবার জন্য মহাজনরা প্রতি বছর আসে। তবে অনেক চাষী টাকার লোভে খাবার মতো ফসল না রেখে সব বিক্রি করে দিয়ে শেষকালে মুশকিলে পড়ে।

এখানকার লোকেদের অনেকে রোগে ভোগে; কোথায়ই বা ভোগে না? চিকিৎসার তো আর তেমন ব্যবস্থা নেই। সাবেক আমলের রামগোপাল ডাক্তার বাদামি রঙের টাট্টুতে চড়ে রোগী দেখতে বার হন—তাঁর ডিসপেনসারিতে যে সব ওষুধ আছে তা যে কবেকার জিনিস তা তো আমি জানি। চৌধুরীদের যে ডাক্তার ছেলেটি সেবার মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছিল, তার মুখে এ যুগের চিকিৎসা-বিদ্যার উন্নতির কথা শুনেছি। একে ওষুধ জোটে না, তার উপর দারিদ্র্য, লোকের শরীর ভালো থাকবে কী করে? অস্বাস্থ্যকর বলে যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালায়, তারা গোড়াতেই ভুল করে।

কিছুদিন হল শ্রীমন্ত পালের বাড়ীর পাশের মাঠে একটা আটচালা বেঁধে পাঠশালা বসেছে। চারটি শ্রেণী আছে, পড়ুয়ার সংখ্যা চল্লিশ-পঞ্চাশের বেশী হয় না। শিক্ষক মোটে দুজন। পড়ুয়ারা সবাই মাইনে দিতে পারে না। রবিবারে হাট বসলে যারা হাটতলাতে আসে তাদের মধ্যে অনেকে দুপুরে চক্রবর্তীর দোকানে ভাত খেয়ে এই আটচালাতে শোয়। তারা সবাই চার আনা করে দেয়। এটাই স্কুলের সব চেয়ে বড়ো আয়। তবে মাস্টার মশাইদের কিছু কিছু ধানজমিও আছে—ছেলেদের অঙ্ক কষতে দিয়ে তাঁরা অনেক সময় ধান কাটাতেও যান।

তেজেন্দ্রনারায়ণ যে বিরাট দীঘিটা কাটিয়াছিলেন সেটা এখনও অতীতের গৌরবের সাক্ষী দেয়। সেটা এত গভীর যে তার মাঝখান থেকে রঘু জেলেও এক ডুবে মাটি তুলতে পারে না। বছর দশেক আগে গ্রামে গোটা চারেক নলকূপ বসেছে, তার আগে পর্যন্ত এই দীঘিটাই সারা বছরের খাবার জল যোগাত। সরস্বতী মজে যাবার পর থেকে এই দীঘিতেই ছেলে বুড়ো অনেকেই স্নান করে। এর বুকে দুরন্ত ছেলেরা যখন হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটে তখন আমার মনে হয় যে, এখানকার প্রাণের স্পন্দন কোনো দিনও থেমে যাবে না। আগের দিনের সে আড়ম্বর এখন নেই, কিন্তু প্রাণশক্তি কি বিলুপ্ত হতে পারে—সরস্বতীর তীরে প্রতি বর্ষায় গজিয়ে-ওঠা, নাম-না-জানা গাছের মতো তা বার বার নতুনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। অতীতকে আঁকড়ে থেকে লাভ নেই—নতুনকে বরণ করতে হবে।

একটি নদীর আত্মকাহিনী

আমি গঙ্গা। হাজার হাজার বছর আগে থেকে ভারতবাসী আমাকে চেনে। আমাকে পবিত্র বলে সে শ্রদ্ধা করে আসছে। আমার বাতাসের স্পর্শ লাগালেও উদ্ধার হয়ে যাওয়া যায়—ভারতের হিন্দুদের এই বিশ্বাস।

আমার জন্ম সম্বন্ধেও পুরাণে অনেক অলৌকিক কল্পনা আছে। দেবর্ষি নারদ নিজেকে খুব বড়ো গাইয়ে বলে মনে করতেন। ব্রহ্মলোকে একদিন গান শুনিয়ে ফেরবার সময় তিনি দেখলেন যে, পথের পাশে কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর দেবদেবী বিকৃতাঙ্গ হয়ে পড়ে আছে। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন তারা কে আর তাদের এরকম দশা কী করে হল। তারা জানাল যে, তারা রাগ-রাগিণী। নারদ নামে একজন মুনি নিজেকে বড়ো গাইয়ে বলে মনে করেন—কিন্তু তিনি এমন গান করেন যে রাগ-রাগিণীর বিকৃতি হয়। বিকৃতভাবে গাওয়ার ফলে তাদের এই রকম অঙ্গবিকৃতি হয়েছে।—তাদের কি করে আবার স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে তা জিজ্ঞাসা করে নারদ জানতে পারলেন যে, মহাদেব যদি রাগ-রাগিণী অবলম্বন করে সংগীত করেন, তা হলে তাদের আকৃতি স্বাভাবিক হতে পারে। নারদ মহাদেবের কাছে সব কথা নিবেদন করে তাঁকে শুদ্ধভাবে সংগীত করতে অনুরোধ করলেন। মহাদেব জানালেন যে, উপযুক্ত শ্রোতা পেলে তিনি গান শোনাতে পারেন। নারদ বুঝলেন যে, গাইয়ে হওয়া তো দূরের কথা, শ্রোতা হওয়ার যোগ্যতাও তাঁর নেই। মহাদেবের নির্দেশমতো তিনি ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে আমন্ত্রণ করে আনলেন। মহাদেব যে গান গাইলেন ব্রহ্মা তার একটুখানি বুঝেই আর বুঝতে পারলেন না; বিষ্ণু বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু কিছুটা শোনার পরেই তিনি এত মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে, তাঁর পা দুখানি গলে যেতে লাগল। ব্রহ্মা তখন সেই বিগলিত চরণকে কমণ্ডলুতে ধরে রাখলেন—সেই বিষ্ণুচরণ-স্রুত ধারাই আমার উৎস।—তারপরে সগররাজার ষাট হাজার সন্তানকে উদ্ধার করবার জন্য ভগীরথ আমাকে যেভাবে এনেছিলেন, রামায়ণ থেকে সে কাহিনী সবাইতো পড়েছ।

এখানকার লোকেরা কিন্তু পুরাণের কথায় তেমন আর বিশ্বাস করে না। তারা আমার উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে হিমালয়ের গাড়োয়াল প্রদেশের গিরিগুহা পর্যন্ত পৌঁচেছে। হিমালয়ের অফুরন্ত তুষাররাশি আমার আত্মাকে

প্রতিনিয়ত পুষ্ট করেছে—ত্রিশূল আর নন্দাদেবী এই দুটি গিরিশৃঙ্গের মধ্য দিয়ে আমি এসে পড়েছি গঙ্গোত্রীতে। এই আট মাইল পথ বরফে ঢাকা—আমার পায়ের নিচে ছোটো বড়ো শিলাখণ্ড, আমার গায়ের উপর ধোঁয়ার মতো তুষারকণা উড়ছে—এখানে আমার গতি সর্পিল—পাথরের পথ দিয়ে এঁকে বেঁকে আমি চলেছি। এখান থেকে খাড়া কিছুদূর নেমে এসে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে মিশলাম—এর আগে আমার ভাগীরথী আর জাহ্নবী নাম ছিল—এখান থেকে গঙ্গা নামেই সবাই আমাকে ডাকে।

পর্বতের অজস্র বাধা ভেদ করে আমি ত্বরিত গতিতে বয়ে চলেছি- সমুদ্রে পৌঁছতে হবে এই আমার লক্ষ্য। এ যুগের ভূতাত্ত্বিকরা বলতে চায় যে, যে-দিকে ঢালু সে দিকেই সব নদী যেতে বাধ্য হয়! কী আশ্চর্য! তা হলে সব নদীই তো এক জায়গায় মিশত! হিমালয়ের বন্ধুর পথের পালা শেষ হয় হরিদ্বারে—এখানে পাহাড়ের কোল ছেড়ে আমি সমতল মাটিতে এসে পড়েছি। পাথরের বাধা দূর হয়ে যাওয়ায় আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এখান থেকে একটু ধীর গতিতে আমার যাত্রা সুরু হয়েছে। আমি প্রথমে একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে মোড় ফিরে এলাম। এখানে আমার তীরে দেরাদুন, সাহারাণপুর, মজফর নগর—আরও কত শহর গড়ে উঠেছে। বুলন্দ শহরের কাছে রামগঙ্গার সঙ্গে দেখা। তারপর এলাহাবাদে কৃষ্ণতোয়া যমুনার সঙ্গে মিশলাম—আমাদের এই মিলনের ক্ষেত্রকে প্রয়াগ বলে। এর পর একটু পূর্ব-দিকে ঘুরে দক্ষিণমুখো হয়ে বারাণসীধামে গিয়েছি—হিন্দুদের এত পুণ্য তীর্থ আমার সলিলে যুগ যুগ ধরে অভিষিক্ত। এর পর গোমতী আর ঘর্ঘরা নদী আমার সঙ্গে এসে মিশেছে। তাদের মিলিত ধারাকে নিয়ে পাটলিপুত্র, রাজমহল, কুশী নদী, সকরিগলি পার হয়ে মুর্শিদাবাদে এসে পড়লাম। আমার একটা ধারা পদ্মা নাম ধরে পূর্ব বাংলায় চলে গেছে; আর আমি ভাগীরথী নামে ত্রিবেণী, হুগলী, নতুন মহানগরী কলকাতা পার হয়ে এসে পড়লাম সাগরে—সাগরের সঙ্গে আমার মিলনের ক্ষেত্র হিন্দুর পুণ্যভূমি।

আমার তীরদেশে এই ভারতবর্ষের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। আমার ধারায় শত শতাব্দীর ভাঙা-গড়ার কাহিনী মিশে আছে। সুদূর অতীতে আমার কূলে হারিয়ে-যাওয়া এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তারপর আর্যরা এল—আমার কূলে কূলে নতুন উপনিবেশ গঠন করে তারা এক নতুন

সংস্কৃতি সৃষ্টি করল। সেই সংস্কৃতি যুগে যুগে নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। বেদ-উপনিষদের সভ্যতার পর বৌদ্ধধর্মের প্লাবন এসেছে—মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত কত সাম্রাজ্য ভেঙেছে, গড়েছে—ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে—পাঠান-মোগল এসে আমার তীরে রাজ্য স্থাপন করে কয়েক শ' বছর শাসন করেছিল—আমারই তীরে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের অভ্যুদয়ে ভারতে আধুনিক যুগের উদ্ভব হয়েছে—সেই ইংরেজও বিলুপ্ত হয়ে গেছে—এখন স্বাধীন ভারতবর্ষ আমার জলধারাকে নিয়ে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করে আর একটা যুগান্তর আনতে চেষ্টা করছে।

আমার মধ্যে অতীত আর ভবিষ্যৎ একসঙ্গে মিশে আছে। এখন আমার স্রোতে বাঁধ দিয়ে শক্তি-উৎপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার কুম্ভ মেলায় লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী আমার জলে অবগাহন করে—দু' হাজার বছর আগে যে ভক্তি নিয়ে অবগাহন করত এখন তার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি। স্যাণ্ডহেডে আধুনিকতম বাণিজ্যপোত চলে—তারই পাশে গঙ্গাসাগরে প্রতি বছর অগণিত তীর্থযাত্রীরা সমবেত হয়। আমি যেখান দিয়ে বয়ে এসেছি সেখানে রেখে এসেছি আমার স্নেহস্পর্শ; স্নান-পানের জল দিয়েছি, মৃত্তিকাকে উর্বর করেছি, যাত্রার পথকে সুগম করেছি, জনগণের মালিন্য দূর করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি। হিমালয়ে আমি গিরিবালিকার মতো চঞ্চলা, লঘুচারিণী—এখানে জননীর স্নেহ নিয়ে কোটি কোটি সন্তানকে যুগ যুগ ধরে লালন করবার দায়িত্ব নিয়ে শান্ত ধীর গতিতে বয়ে চলেছি—বয়েই চলেছি।

একটি ভাড়াটে বাড়ীর আত্মকথা

কলকাতার উত্তরাংশে বাগবাজার অঞ্চলে একটি ছোটো গলি বাগবাজার স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে; গলিটির নাম রামকৃষ্ণ লেন—অত বড়ো একজন মহাপুরুষের নামে এমন একটা এঁদো গলির নাম রাখবার কি কারণ তা জানি না—এই গলিতেই আমার বাস। প্রায় প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার একজন করে অচেনা লোক নম্বর হাতড়াতে হাতড়াতে এসে আমার সামনে দাঁড়ায়—দু-একবার ইতস্তত করে কড়া নাড়ে। ভিতর থেকে হাফপ্যাণ্ট আর সাদা হাফশার্ট-পরা বছর দশকের একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে চান?' প্রতি-জিজ্ঞাসা হয়, 'উৎপল রায় আছেন কি—লেখক উৎপল রায়?'

লেখক উৎপল রায় আমার এখানেই থাকেন—তাঁর আগে শিল্পী মানব বসু এইখানে থাকতেন। ওদিকের ফ্ল্যাটটায়, যেখানে এখন ডাক্তার নৃপতি তলাপাত্র থাকেন, সেখানে তখন নামকরা নেতা জগদীশ রাহা থাকতেন। তারপর হেরম্ব সেন নামে একজন উকিল ছিলেন। উত্তর দিকের ফ্ল্যাটটায় এক দিকে জাত কেরাণী অর্থাৎ তিন-চার পুরুষ কেরাণী চক্রবর্তীরা থাকেন—বাকি অংশটায় গৃহস্বামী হরেন ঘোষ সপরিবারে থাকেন।

আমার বয়স হল একশো বছরের কাছাকাছি। কোন এক সাহেবি আপিসের মুৎসুদ্দি জগবন্ধু সরকার আমাকে গড়েছিলেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর ছেলে পতিতপাবন আমাকে বিক্রি করে ভাগলপুরে চলে গেল—সেখানে মামার বাড়ীর কাছে নতুন বাড়ী তৈরি করে ওকালতি সুরু করল। পতিতপাবনের কাছ থেকে হরেন ঘোষের ঠাকুরদাদা রাজেন ঘোষ আমাকে কিনেছিলেন। রাজেন ঘোষের আমলে ভাড়াটে কেউ ছিল না—তাঁর সংসার ছোটো হলেও চাকর-বাকর অনেকগুলি ছিল। তারপর তাঁর ছেলে নগেন ঘোষ কিছুটা ভাড়া দিলেন—তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই হরেন ঘোষ আমাকে চার টুকরো করে ভাড়া দিলেন। সেই সময় থেকেই চক্রবর্তীরা উত্তর দিকের ফ্ল্যাটের পিছু দিকটায় আস্তানা গেড়েছেন। সাবেক আমলের ভাড়াটে বলে তাঁর অংশের ভাড়া বাইশ টাকা থেকে বেড়ে মোটে চল্লিশ টাকা হয়েছে। অন্য ফ্ল্যাট দুটোর ভাড়া ষাট টাকা আর সত্তর টাকা—ডাক্তার বাবুর ফ্ল্যাটটার সঙ্গে একটা বাড়তি রোগী দেখবার ঘর থাকায় দশ টাকা বেশি ভাড়া—হেরম্ব সেনের মক্কেলরা এই ঘরেই বসতেন।

আমার ঘরগুলোতে খুব বেশি নতুন অতিথি আসে না। অন্য অনেক জায়গায় নতুন বাসিন্দা আসে আর দু-এক বছর থেকে চলে যায়—আবার সেখানে নতুন পায়ের চিহ্ন পড়ে। কিন্তু আমার এখানে যারা একবার আসে তারা অন্ততঃপক্ষে বছর দশেকের জন্য থেকে যায়—চক্রবর্তীরা তো গত পঁয়ত্রিশ বছর এখানে আছেন। তবুও আমার অঙ্গে বিচিত্রের ছোঁয়া লেগে আছে, আমার যারা এত পরিচিত, তাদেরও এমন আশ্চর্য লাগে!

লেখক উৎপল রায় একটি খামখেয়ালি ধরণের মানুষ। তিনি কখন যে কী করেন তার কোন স্থিরতা নেই। সকালে কখনও ছটায় ওঠেন, কখনও নটায় ওঠেন—তাঁর জন্য একটা বড়ো থার্মোফ্ল্যাস্কে চা করা থাকে—যখন

খুশি থান। তাঁর স্ত্রী নিবেদিতা স্কুলে পড়ান—তিনিই সংসারের সব কিছু দেখাশোনা করেন। তাঁর বড় মেয়ে এ বছর বেথুন কলেজে ভর্তি হয়েছে—সন্ধ্যায় সেতার শেখে। ছেলে থাকে শান্তিনিকেতনে। ছোটো মেয়েটি নিজেকে মেয়ে বলে পরিচয় দিতে চায় না—ছেলেদের মতো হাফপ্যান্ট আর হাফ শার্ট পরে থাকে—কোঁকড়ানো চুলগুলো ছেলেদের মতো করে কাটা। মেয়েদের স্কুলে যেতে হবে বলে স্কুলে যায় না। দুপুর বেলা রাজ্যের দৌরাত্ম্য করে—উৎপল রায় তাকে সামলাতে পারেন না—তবে সে অনেকক্ষণ ডাক্তার বাবুর ডিসপেনসারিতে থাকে এই যা রক্ষে। উৎপল রায় কোনো দিন সারা রাত লেখেন, কোন দিন পুরাণো খবরের কাগজ জড়ো করে পড়েন, কোনো দিন রাত নটার সময় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যান, মাঝখানে হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে সকালবেলা ব্যাণ্ডেল চলে গিয়েছিলেন—সেখানকার সব দেখবার জিনিষ দেখে তিনি ফিরলেন রাত্রি এগারোটার সময়—তাঁর স্ত্রী তো ভেবেই আকুল।

শিল্পী মানব রায় কিন্তু এ রকম এলোমেলো রকমের ছিলেন না। তিনি ভোর বেলা উঠে বাজার সেরে দুটো ডিমের অমলেট আর চা খেয়ে ক্যানভাসের সামনে এসে বসতেন সকাল সাতটায়। বেলা একটা পর্যন্ত তাঁর আঁকা চলত। তারপর স্নানাহার বিশ্রাম আড়াইটে পর্যন্ত। বেলা আড়াইটের সময় তিনি বার হতেন ছবির তাড়া বগলে করে—ফিরতেন সাড়ে ছটা-সাতটায়। তারপর জলযোগ করে ড্রাগ হাউসের সামনের বাড়িতে গিয়ে দাবা খেলতেন রাত নটা পর্যন্ত। এই একই নিয়মে তাঁর দশ বারো বছর কেটেছিল। তারপর কোথায় যেন চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। চলে যাবার আগের কদিন আমার একটা ঘরের দেয়ালে মোটা তুলি দিয়ে তেল রংযে রামকৃষ্ণের জীবনের আটটি ছবি এঁকেছিলেন।

নৃপতি ডাক্তারবাবুর ফ্ল্যাটের ওদিকটা চিরকাল জমজমাট। যখন জগদীশ বাবু থাকতেন তখন বড়ো বড়ো খেতাবধারী থেকে সুরু করে বাউণ্ডুলেরা পর্যন্ত অনেকেই সেখানে এসে জমায়েত হত। উচ্চ কণ্ঠের আলোচনা চলত প্রায় সারা দিনই। মাঝে মাঝে তর্ক এমন তুমুল হয়ে উঠত যে, অচেনা লোক ভয় পেয়ে পুলিশে খবর দিতে পারত। হেরম্ব সেনের আমলে আলোচনা সর্বক্ষণই চলত, তবে জোরে

নয়, বরং মাঝে মাঝে খুব নিচু গলায়। এখন যেখানে ডাক্তারবাবুর ছোট্ট ডিসপেনসারিটা রয়েছে, সেখানে হরনাথ মুহুরি বসত। হেরম্ব সেনের সেই ছিল ডান হাত। তাঁরই উৎসাহে সে মোক্তারি পাশ করে তাঁর সহকারী হয়ে কাজে লেগে গেল। ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার বিনোদ এই বছর সাতেক কম্পাউণ্ডারি করতে করতে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছে তাতে সে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ডাক্তার সেজে বসতে পারে। সকাল সাতটা থেকে দশটা, বেলা বারোটা থেকে দুটো আর বিকেল চারটে থেকে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত ওষুধ দিতে দিতে রোগ আর ওষুধের ঠিকুজি তার মুখস্থই হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু সাড়ে নটা নাগাদ রোগী দেখতে বার হন, ঐ সময়টাই যা একটু ভিড় কম থাকে।

চক্রবর্তীর অংশটাতে সকাল থেকেই সোরগোল লেগে থাকে। বুড়ো পঞ্চানন চক্রবর্তী বছর দশেক হল পেনসন পেয়েছেন—এখন তাঁর অর্ধেক সময় কাটে ক্রসওয়ার্ড পাজলের সমস্যাপূরণের চেষ্টায়। তাঁর দুই ছেলেই তাঁর আপিসে ঢুকেছে। এদের কাচ্চাবাচ্ছা গুটিসাতেক। তাঁর মেয়ে কিছুদিন হল বেড়াতে এসেছে—তারও তিনটি ছেলেমেয়ে। সুতরাং সকাল থেকেই দাঁত মাজা, খাওয়া, পড়তে বসার জায়গা নিয়ে খুনসুটি সুরু হয়—জন ছয়েকে প্রথমভাগ থেকে সুরু করে পাঠসংকলন পর্যন্ত যখন একসঙ্গে পড়তে বসে তখন সেখানে কাকচিল বসতে পায় না। তা ছাড়া ঝিয়ের সঙ্গে খিটিমিটি, দুই জায়ে হরেক রকম কথা, প্রতিবেশী ফ্ল্যাটের কুশল-প্রশ্ন, সংবাদ-চর্চা—কথার কি আর শেষ আছে? তার উপর বুড়ী চক্রবর্তী-গিন্নী বাতে পঙ্গু—তিনি নড়তে পারেন না বললেই হয়, কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে সকলের খবরাখবর নিচ্ছেন সর্বক্ষণ।

হরেন ঘোষের দিকটায় লোকজন নিতান্ত কম নয়—তাঁরও তিনটি ছেলে—বড়োটার বিয়ে হয়েছে—কিন্তু ছোটো ছেলেপুলে নেই। তাঁর ভাই বিয়ে করেন নি—তিনি একটু ধর্মঘেঁষা লোক—বেদান্ত মঠের শিষ্য। হরেন ঘোষের বড়ো ছেলে লোহার দোকানে সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বসে—মাঝখানে ঘণ্টা-তিনেক খাবার জন্য আসে এই যা। একটি টাইপিং শিখছে, আর একটি কলেজের ছাত্র—আড্ডাতেই তাদের বেশিক্ষণ কাটে। এই সব বিচিত্র মানুষ নিয়েই আমার দিন কেটে যায়।

কুটিরশিল্প

সংকেত—কুটিরশিল্প কাহাকে বলে—যন্ত্র-সভ্যতার প্রসারে কুটিরশিল্পের অবস্থা—শিক্ষার অভাব—কুটিরশিল্প ও বেকার সমস্যা - দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

কুটিরশিল্প কি তার পরিচয় দিতে গিয়ে রাজশেখর বসু বলেছেন, "কুটির-শিল্প বললে সাধারণতঃ বোঝায়—যে শিল্প গ্রামবাসী গৃহস্থের কুটিরে নিষ্পন্ন হয়, যেমন ধান ভানা, চরকায় সুতো কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, বাঁশের ঝুড়ি-চাঙারি তৈরি, কামার কুমোরের কাজ ইত্যাদি।… …এমন শিল্প যা গৃহস্থের বাড়িতে বা অন্যত্র অল্প জায়গায় চলতে পারে, যার জন্য বেশী লোক, বেশী দামী যন্ত্রাদি সরঞ্জাম এবং বেশী মূলধন দরকার হয় না এবং যার উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা পাওয়া দুর্ঘট নয়।"

বর্তমানে যন্ত্রসভ্যতার প্রসার বেড়ে যাওয়ায় চারদিকে বড়ো বড়ো শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তা না হলে কুটিরশিল্পই ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের একটা বড়ো অবলম্বন ছিল। তখন প্রায় সব গণ্ডগ্রামেই সবরকমের শিল্পী দেখা যেত—কোনো কোনো গ্রামে আবার এক একটা শিল্পকে কেন্দ্র করে এক একটা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। সেই সব জায়গায় কয়েকটি শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। এখনও সেগুলির কয়েকটি বিখ্যাত। যেমন ঢাকার কাপড়, সূচের কাজ ও শাঁখা, চন্দননগর, শান্তিপুর, ধনিয়াখালি প্রভৃতি জায়গার তাঁতের কাপড়, কাঞ্চননগর প্রভৃতি জায়গার ছুরি-কাঁচি, মুর্শিদাবাদের রেশম ও হাতীর দাঁতের জিনিস, বর্ধমান বা নাটোরের মিষ্টান্ন।

আমাদের দেশে বর্তমানে কুটিরশিল্পের যে অবনতি হয়েছে তার কয়েকটি কারণ আছে। যন্ত্রশিল্পের সুবিধা এই যে, তাতে অপেক্ষাকৃত কম লোক নিয়োগ করে প্রচুর জিনিস উৎপন্ন করা যায়; ফলে উৎপাদনের খরচ অনেক কম পড়ায় বাজারে যখন সেই জিনিসটা আসে তখন সেটা কম দামে বিক্রি হয়। সুতরাং অন্যান্য শিল্পীদের হটে যেতে হয়। এইভাবে যন্ত্রোৎপন্ন জিনিষে আমাদের দেশের বাজার ছেয়ে গেছে। ফলে কুটিরশিল্পীরা বৃত্তিহারা হয়ে পড়েছে। তারা কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বা অন্যত্র চাকুরির সন্ধানে ছুটেছে। কিন্তু চাকুরির সংখ্যা পরিমিত। সুতরাং এইভাবে একদিকে যেমন কুটির-

শিল্পের পরিধি দিন দিন ছোটো হয়ে আসছে, অন্যদিকে তেমনি দেশের বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

শিক্ষার অভাবও কুটিরশিল্পের অবনতির আর একটা কারণ। কুটির-শিল্পীরা এখনও সাবেককালের যন্ত্রপাতি নিয়েই সন্তুষ্ট। আজকাল ছোটো-খাটো কমদামের যে সব যন্ত্র প্রচলিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করলে উৎপাদন অনেকটা বেড়ে যায়, সুতরাং খরচাও অনেক কম পড়ে। তা ছাড়া কুটির-শিল্পজাত জিনিসের চাহিদা থাকলেও বিক্রীর ব্যবস্থার অভাবে শিল্পীদের অসুবিধায় পড়তে হয়। শিল্পী নিজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জিনিস বেচতে পারে না, তাকে কোনও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর শরণ নিতে হয়। ধূর্ত ব্যবসায়ী লাভের অল্প অংশ শিল্পীকে দিয়ে বাকিটা আত্মসাৎ করতে চায়, টাকা দিতেও ভোগায়। শহরের কাছে থাকলে শিল্পী বরং তাগিদ দিতে পারে কিন্তু গ্রামে থেকে তা করা সহজ নয়। অনেক ব্যবসায়ী শিল্পীকে আগে দাদন দিয়ে পরে নগদ দাম চুকিয়ে জিনিস নেয়, কিন্তু এ রকম ব্যবস্থায় শিল্পীর লাভাংশ সাধারণতঃ আরও কম হয়। এই অবস্থার প্রতিকার না হলে কোনও নতুন কুটিরশিল্পের পক্ষে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া শক্ত, পুরাতন শিল্পেরও উন্নতি অসম্ভব।

কুটিরশিল্পের এই অবনতি দূর করতে হলে সরকার আর জনসাধারণ, দুই পক্ষকেই সচেষ্ট আর সক্রিয় হতে হবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশপ্রেমিকরা বিদেশী জিনিস বর্জন করেছিলেন। এখন আমাদেরও যথাসম্ভব কুটিরশিল্পজাত জিনিস কেনার সংকল্প নিতে হবে। তা না হলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কুটিরশিল্প পিছু হটে যাবে। বর্তমান সরকার কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য হলেও প্রশংসনীয়। তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য মিলের কাপড়-উৎপাদনের সীমা নির্দেশ বা মিলের কাপড়ের উপর উৎপাদন শুল্ক চাপানোর কথা উল্লেখযোগ্য। সরকারের চেষ্টায় কয়েকটি তাঁতের কাপড়ের দোকান আর হস্তশিল্প প্রদর্শনীও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। গ্রামাঞ্চলের শিল্পীদের মূলধন নেই, তাদের যন্ত্র একবার বিকল হলে সেগুলো মেরামত করবার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা তাদের নেই। এক্ষেত্রে সরকার যদি সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করে তাহাদের সাহায্য করেন বা ন্যায্য মূল্যে যন্ত্র সরবরাহ করেন, সহজ কিস্তিতে টাকা আদায় করবার ব্যবস্থা

করেন, তাহলে অনেকটা অসুবিধা দূর হয়। গ্রামাঞ্চলে তড়িৎশক্তি প্রচলিত হলে অনেক কুটিরশিল্প উন্নততর হতে পারে। এদেশে সমবায়বোধের অভাব কুটিরশিল্পের অবনতির আর একটি বড়ো কারণ। সমবেতভাবে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করলে উৎপাদনের খরচ একটু কম হয়—জিনিসগুলি বাজারস্থ করার খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়। কুটিরশিল্পের উপযোগী নূতন উন্নতধরণের যন্ত্র কিনে সেগুলি ব্যবহার করলেও উন্নতির সম্ভাবনা।

কুটিরশিল্পের উন্নতি আর ব্যাপক প্রসার হলেই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হতে পারে।

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ

সংকেত—মধ্যবিত্ত কাহারা—মধ্যবিত্ত সমাজ—সৃষ্টির ইতিহাস-দেশের সামগ্রিক অভ্যুদয়ে মধ্যবিত্তের দান—যুগ পরিবর্তন—মধ্যবিত্তের সমস্যা—মধ্যবিত্তকে বাঁচাইতে হইবে।

মধ্যবিত্ত বলিতে সমাজের যে বৃহৎ অংশকে বোঝায়, তাহা পূর্বে আমাদের দেশে ছিল না। ইংরেজদের আগমনের পর হইতেই এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হইতে থাকে। ইংরেজরা প্রথমে এদেশে ব্যবসা করিতে আসে। সেই ব্যবসায়ের সূত্রে এদেশের অনেক ছোটখাটো ব্যবসাদার তাহার সহিত সংযুক্ত হয়। তাহাদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলিতেও অনেক কর্মচারী নিযুক্ত হয়। তাহার পর ইংরেজরা যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিল, তখন রাজকার্য পরিচালনা করিবার জন্যও অনেক এ-দেশীয় লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা-বৃত্তিরও যথেষ্ট অবকাশ হইল। ইহা ছাড়া অনেকেই ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। এই বৃত্তিগুলি মোটামুটি রকমের অর্থকরী কিন্তু প্রভূত ধন উপার্জন ইহাতে প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। এই ধরণের বৃত্তি শহর, শহরতলী বা মফঃস্বলে বহু ব্যক্তির জীবিকার উপায় হইয়া উঠে। এইভাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। পূর্বে আমাদের দেশে মাঝারি রকমের উপার্জনশীল পরিবার যে ছিল না এমন নয়—কিন্তু তাহার পরিধি তেমন বড়ো ছিল না বৃটিশ শাসনকালে দেশের অর্থনৈতিক জগতে এমন একটা ঘোরতর পরিবর্তন দেখা দিয়াছে যে, মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে।

বাংলার—কেবল বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের মূলে এই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রভাবই সর্বাপেক্ষা বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই দেশে যে নূতন ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল, এই মধ্যবিত্ত সমাজই তাহা সর্বাগ্রে লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করার ফলে এই মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্তে নূতন চিন্তা ও নূতন আদর্শ জাগ্রত হইয়াছিল। দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার একটা প্রেরণায় তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময় রামমোহন, দ্বারকানাথ, মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের কয়েকজন এবিষয়ে অগ্রণী হইলেও বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই মধ্যবিত্ত সমাজ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজ হইতে উদ্ভূত জাতীয় নেতৃবৃন্দই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনিসমাজকে স্বদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কয়েকজন মনীষীর প্রচেষ্টায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা সার্থকই হইত না, যদি না মধ্যবিত্ত সমাজ আগ্রহান্বিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে নূতন সংস্কৃতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রসারিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে মুষ্টিমেয় ধনীদের বাদ দিলে সমগ্র জাতিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—মধ্যবিত্ত সমাজ ও নিম্নবিত্ত সমাজ। শেষোক্ত সমাজ পূর্ববর্তী সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংস্কৃতির অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার দিকেই পূর্বতন সংস্কৃতির ধারাটি অগ্রসর হইতেছে। অল্প কয়েকটি ইউরোপীয় জীবনাদর্শের প্রভাবাচ্ছন্ন ধনি-পরিবারের কথা বাদ দিলে, সাধারণভাবে শিক্ষিত ধনি-সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোঝা যাইবে যে, মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্কৃতির পরিমার্জিত রূপই সেখানে আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে।

বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি এই মধ্যবিত্ত সমাজের উপর অনেকটা প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, ডাক্তার, উকিল, দক্ষ কারিগর, শিক্ষক-অধ্যাপক, বার্তাজীবী বা লেখক—ইহারা বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর একটা প্রধান অঙ্গ। ভূমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা মোটামুটিভাবে শতকরা ষাটজন

হইলে বাকি শতকরা চল্লিশ জনের উনচল্লিশ জনই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। উৎপন্ন দ্রব্য-বিতরণ ও কর্মকেন্দ্রের মূলে মধ্যবিত্ত সমাজই রহিয়াছে।

কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ বর্তমানে নানা কারণে দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছে। ইংরেজ আগমনে যে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব হইয়াছে তাহার বর্তমান অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রমথনাথ বিশী বলিয়াছেন, "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আবির্ভূত হইবার পূর্বেকার বাঙালীর পল্লীসমাজ কৃষিনির্ভর ছিল। কৃষিনির্ভর সমাজ স্বভাবতঃই আত্মকেন্দ্রিক। তাহার জগৎ ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের সীমার দ্বারা পরিমিত। বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে পরস্পর মিলিত হইবার যে উদার আসর, বাঙালী সমাজের কখনো সেখানে ডাক পড়ে নাই। পূর্বতন বাঙালী আপনার কৃষিক্ষেত্র, চণ্ডীমণ্ডপ ও ক্ষুদ্র পল্লীসমাজে জীবন যাপন করিতেছিল। এমন সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আসিয়া বৃহত্তর কর্মের ভূমিকা রচনা করিল। কিন্তু সেখানেও বাঙালী কর্মস্রোতে নামিল না, চাকুরি জীবনের সংকীর্ণ ও নিরাপদ পরিসরকে বাছিয়া লইল। চাকুরি-জীবিতার ফলে মানুষ সংকীর্ণ হইয়া পড়ে—সেটাও অনেক পরিমাণে কৃষিক্ষেত্রের নিরাপদ পরিমিতির অনুরূপ।..... ব্যবসায়ে নামিলে মানুষকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং এইভাবে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষে মানুষে বৃহত্তর মিলনের ভূমিকা রচিত হয়। কিন্তু চাকুরি-জীবী ব্যক্তিকে বৃহত্তর সমাজের উপরে নির্ভর করিতে হয় না, কেবল মনিবের উপর নির্ভর করিলেই চলে। বৃহৎ বাঙালী সমাজের তুলনায় অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই চাকুরিতে প্রবেশ করিয়াছে বটে কিন্তু শিক্ষিত সমাজের আদর্শতো ওই চাকুরি-লাভ। চাকুরি-জীবিতাই শিক্ষিত বাঙালী সমাজের আদর্শ। এই আদর্শের ধ্যান করিতে করিতে আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে।...আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ও সভ্যতার যুগ উনবিংশ শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে অবসিত হইয়াছে। বর্তমানকাল সমষ্টিগত সমাজের যুগ। আত্মকেন্দ্রিক বাঙালী সমাজের শ্রেষ্ঠতার দিন ছিল উনবিংশ শতক। বিংশ শতকে তাহার জের টানিয়া চলিবার আশা বৃথা। একথাটা আমরা এখনও বুঝি নাই বা বুঝিবার চেষ্টাও করিতেছি না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, ইতিহাসের হাতুড়ি নির্বোধের মাথা বলিয়া খাতির করে না।"

বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ এক

নিদারুণ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িয়া গেলেও চাকুরির সংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়ায় বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির তুলনায় চাকুরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায় মধ্যবিত্ত সমাজকে অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করিতে হইতেছে। উচ্চশিক্ষাও ক্রমশঃ দুর্মূল্য হইয়া পড়িতেছে। মোটকথা মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি এমনভাবে টলিয়াছে যে, তাহার সমগ্র জীবনই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে একটা ঘোর হতাশা ও অবসাদ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। নানা কারণে স্থৈর্য হারাইয়া ফেলায় বাঙালীর রাজনীতিও তুচ্ছ বাগাড়ম্বরে পরিণতি লাভ করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি এমনভাবে প্রসারিত হইয়াছে যে, চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ বাঙালী জাতির চরম অধোগতির আশঙ্কা করিতেছেন।

বাঙালী জাতিকে সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহার মধ্যবিত্ত সমাজকে প্রথমে বাঁচাইতে হইবে। এই শ্রেণীই জাতিকে উন্নতি বা অবনতির পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। নূতন কর্মব্যবস্থার মধ্য দিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নূতন পথ খুলিয়া দিয়া তাহার অর্থনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ প্রথমে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহার শক্তি সমস্ত বিকৃতি পরিহার করিয়া সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে পারিবে। আশা করা যায় যে, যে বাঙালী তাহার অদম্য প্রাণশক্তির বলে বহু বাধা কাটাইয়া উঠিয়াছে, জীবন-যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তাহার পরাজয় হইবে না।

খাদ্যসমস্যা

সংকেত—কৃষিপ্রধান দেশ তবু খাদ্যসমস্যা কেন—কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় নাই—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি—দেশ বিভাগ—চালের উৎকট অভাব—সমস্যা সমাধানের বহুবিধ উপায়ের আলোচনা—উপসংহার।

যে ভারতবর্ষ একদিন তাহার শস্যসম্পদের প্রাচুর্যের জন্য সোনার ভারত নামে বিশ্বজনের কাছে খ্যাত হইয়াছিল, সেই দেশে খাদ্যসমস্যা যে ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের খাদ্যসমস্যার অস্তিত্বই অনেকের কাছে অসংগত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা একদিনে ভারতবর্ষে আসে নাই—বহুদিন ধরিয়া ভারতবর্ষের এই উৎকট খাদ্যসমস্যার পূর্বাভাষ দেখা দিয়াছে।

শস্যশ্যামল বাংলা দেশে এক সময় এক টাকায় আট মণ চাল বিক্রয় হইয়াছে। কিন্তু এখানেই আবার দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর অভাবনীয় নয়। এদেশের মাটিতে সোনা ফলে—কিন্তু গত দুই হাজার বৎসরের পূর্বে কৃষির যে ব্যবস্থা ছিল, তাহার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। দেশের মধ্যে সেচের কিছুমাত্র ব্যবস্থা নাই—বৃষ্টি না হইলে চাষের ব্যাঘাত হয়; বন্যা-প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা নাই—অতিবৃষ্টি হইলে বন্যায় ফসল নষ্ট হইয়া যায়। জমিতে সার দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। ভাগ্যক্রমে শস্য উৎপন্ন হইলে তাহা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিবার উপযুক্ত বন্দোবস্তও নাই। তাহার উপর কৃষক সমাজ ঋণভারে জর্জরিত, ফসল জন্মাক বা না জন্মাক, করভারের বোঝা তাহাকে বহন করিতেই হয়। এ অবস্থায় কৃষির উন্নতি হইতেই পারে না। নবাবী আমলের পর হইতে ইংরেজ আমলের সূত্রপাত হইতেই বাংলার কৃষি দিন দিন অবনতির পথে চলিয়াছে। অথচ বাংলার লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার ফলে দেশের মধ্যে ঘোরতর খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। ইংরেজ শাসনের শেষ কুড়ি-পঁচিশ বৎসর ভারতবর্ষে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহা পর্যাপ্ত ছিল না—অন্নভোজীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাওয়ায় চালের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইত। ইংরেজ সরকার বর্মা ও সিয়াম হইতে প্রচুর চাল আমদানি করিয়া সেই অভাব পূরণ করিত।

স্বাধীন ভারতে খাদ্যসমস্যা, বিশেষ করিয়া চালের অভাব উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব-বাংলা ভারতের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় ভারত খাদ্য-উৎপাদনের একটা বড়ো কেন্দ্র হারাইয়াছে। বিদেশ হইতে চালের অবাধ আমদানিও সম্ভবপর নয়—তাহাতে ভারতের ধনভাণ্ডার নিঃশেষিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং স্বদেশেই খাদ্য-উৎপাদনের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে কৃষির উন্নয়ন ও বিস্তার করিতে গিয়া বিশেষজ্ঞমণ্ডলী কয়েকটি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। জলসেচ ও বন্যা-প্রতিরোধ ব্যবস্থার অভাবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বর্তমানে ভারত সরকার এই দুইটি অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে নদী হইতে খাল কাটা হইয়াছে। কয়েকটি নদীতে বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎ-উৎপাদন এবং সেচ ও বন্যা-প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ট্র্যাক্টর যন্ত্রের সাহায্যে

বৃহৎ পরিধিতে ক্ষেত্রকর্ষণ ও উপযুক্ত পরিমাণে সার দিয়া প্রচুর শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য যে প্রচুর মূলধন ও বিস্তৃত ভূখণ্ড দরকার তাহা এদেশের কৃষকদের নাই। কৃষকরা যদি সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া কৃষিকর্মে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইতে পারে। ভারতবর্ষের অনেক ভূখণ্ড অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। ঐ সব ভূখণ্ডের অধিকারীরা ধনোৎপাদনের জন্য ঐ পতিত ভূভাগ কর্ষণ করিতে আগ্রহ বোধ করে না—যাহাতে কেহ জমি ফেলিয়া না রাখে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এই সমস্ত অনাবাদী জমিতে চাষ করিলে কৃষির বর্তমান অবস্থাতেই ভারতবর্ষ কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে।

খাদ্যসমস্যা সরলতর করিবার জন্য অনেকে অন্নভোজী প্রদেশগুলিতে চালের খরচ কমাইয়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। বাংলার মতো প্রদেশে, যেখানে বহু শতাব্দী ধরিয়া চালই প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেখানে একেবারে চাল ছাড়া অসম্ভব। তবে অল্প চেষ্টা করিলে সকলেই রাত্রে চালের পরিবর্তে গমজাত খাদ্য ব্যবহার করিতে পারে। খাদ্যহিসাবে গম চাল অপেক্ষা কিছুটা পুষ্টিকরও বটে। শস্যখাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া ফলমূলের মাত্রা বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাবও অনেকে করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে কলা, টম্যাটো, বেল, শসা, শাঁক আলু, চীনাবাদাম, পেয়ারা, আম প্রভৃতি ফল এদেশে দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য নয়। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কিছু কিছু ফল খাওয়াও দরকার।

ইহা ছাড়া, যাহাদের সামান্যতম সুবিধা আছে তাহাদের কিছু কিছু শস্যোৎপাদন করিতে হইবে। অনেকে শখ করিয়া ফুলের চাষ করে—সেই সঙ্গে ফল বা সব্জির চাষ করিলে গৃহস্থেরও অনেক উপকার হয়, দেশের খাদ্য-সমস্যাও কিছু পরিমাণে মেটে।

অপরিমিত ভোজনও খাদ্যসমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। যাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাহারা অনেক সময় প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী খাদ্যে পাকস্থলী ভর্তি করিয়া প্রথমতঃ নিজের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়; দ্বিতীয়তঃ কিছু পরিমাণ খাদ্য নষ্ট করে। স্বাস্থ্যের জন্যও যেমন, দেশের খাদ্যসমস্যার কথা স্মরণ করিয়াও তেমনই পরিমিত আহার কর্তব্য।

বাস্তুহারা ও পুনর্বসতি

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি লাল তারিখ —তবে ইহা আনন্দের দিন নহে—সহস্র সহস্র নিরপরাধ নরনারীর শোণিত-ধারায় এই দিনটি রক্তাক্ত হইয়া আছে। এইদিন কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐতিহাসিক দাঙ্গা বাঁধে—ধর্মগত ভেদবুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় এবং তাহার অব্যবহিত পরেই নোয়াখালিতে যে মারণযজ্ঞ হইয়াছিল, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কেবলমাত্র অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা এই সময় মানুষের শুভবুদ্ধিকে বিকৃত করিয়াছিল—তাহার ফলে এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের লোকদের বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাহাদের বহুদিনের বাসভূমি ত্যাগ করিয়া নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য অন্যত্র গমন করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে এই ধরণের আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ছিল কল্পনাতীত। পূর্ব-বাংলার মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি ত্যাগ করিয়া হিন্দুরা দলে দলে পশ্চিম-বাংলায় আসিয়াছে। পূর্ব-পাঞ্জাব হিন্দুপ্রধান এবং পশ্চিম-পাঞ্জাব মুসলমানপ্রধান। এই দুই অঞ্চলেই বহুলোক বাস্তুহারা হইয়া অন্য অংশে আশ্রয়ের জন্য গমন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, মুসলমানদের প্রার্থিত পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলেই এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট পাঞ্জাব ও বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া যখন স্বাধীন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, এইবার বিরোধ দূর হইয়া যাইবে কারণ নবগঠিত পাকিস্তান আপনার আভ্যন্তরীণ উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখা গেল যে, পাকিস্তানে বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়াই চলিল। পাকিস্তান সরকার প্রত্যক্ষভাবে ইহাকে প্রশ্রয় না দিলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া সারা দেশের মধ্যে এরূপভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল যে, ইহার প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। ইহার ফলে হিন্দুরা দলে দলে

দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পূর্ব-পাঞ্জাব হইতেও অনেক মুসলমান উৎপীড়নের আশঙ্কায় পশ্চিম-পাঞ্জাবে চলিয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবের বাস্তহারা সমস্যা তেমন উগ্র নয়—কিন্তু বাংলায় ইহা অতি উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব-বাংলায় যাহাদের জীবিকা-অর্জনের পথ সুগম ছিল, যাহাদের যথেষ্ট পরিমাণ জমিজমা ছিল, যাহারা শিক্ষকতা, ওকালতি, অধ্যাপনা, চিকিৎসা প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিত, তাহারা এদেশে আসিয়া উদ্বাস্তু বা বাস্তহারা এই সাধারণ নামে অভিহিত হইয়া এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে—সেই সমস্যাটি বাসভূমি ও জীবিকার সমস্যা। পূর্ব-বাংলায় উগ্র মনোভাব-সম্পন্ন মুসলমানদের উৎপীড়ন ছিল—কিন্তু এখানে পশ্চিম-বাংলায় জীবন-সংগ্রামই নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন স্মরণাতীত কাল হইতে অখণ্ড—বর্তমান কালের কৃত্রিম বিভেদসত্ত্বেও পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ সাধিত হয় নাই। সুতরাং, যাহারা পূর্ব-বাংলা হইতে উদ্বাস্তু হইয়া পশ্চিম-বাংলায় আসিয়াছে তাহারা স্বভাবতঃই পশ্চিম-বাংলার কোনো জায়গায় বসবাস করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু যে অসংখ্য উদ্বাস্তু এদেশে আসিয়াছে এবং এখনও বাংলা দেশে আসিতেছে তাহাদের আশ্রয় দিবার মতো শক্তি পশ্চিম-বাংলার নাই। একেই এই প্রদেশ ঘনবসতি অঞ্চল, জনসংখ্যার তুলনায় কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ এখানে নিরতিশয় অল্প। তাহার উপর অসংখ্য নূতন লোকের সংস্থান হওয়া নিতান্ত কষ্টসাধ্য। ফলে আশ্রয়ের আশায় পূব-বাংলা হইতে আসিয়া অগণিত পরিবারকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

শ্রীজওহরলাল-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাস্তহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ভারত রাষ্ট্রের দায় ও দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আদর্শবাদী নেতারা যাহা ঘোষণা করেন, অক্ষম রাজকর্মচারীদের হাতে তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইতে গিয়া প্রহসনে পর্যবসিত হয়। পশ্চিম-বাংলার সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা অপর্যাপ্ত তো বটেই—সেই সামান্য ব্যবস্থার মধ্যে এত গলদ যে, সরকার যাহা ব্যয় করিয়াছেন তাহার একটা মোটা অংশ উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে অপব্যয়িত হইয়াছে, অপাত্রে পড়িয়াছে এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির উদরে গিয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। অপরিচিত স্থানে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে বাস করিতে কেহ চাহে না। বাংলার উদ্বাস্তুরা সেইজন্য অন্যত্র যাইতে না চাহিলেও অবশেষে প্রয়োজনের তাগিদে সেখানে গিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এত যৎসামান্য যে, তাহারা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়া দায় এড়াইতে উদ্যত পশ্চিম-বাংলার সরকারের বিরাগভাজন হইয়াছে।

বাস্তুহারা বাঙালীর সমস্যা যে উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। তবে আশার কথা এই যে, সহস্রবিধ বাধাসত্ত্বেও বাংলার শক্তি কোনো দিন বিপর্যস্ত হয় নাই। পর্বতপ্রমাণ বাধা সরাইয়া সে তাহার অদম্য প্রাণশক্তির বলে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবে।

পশ্চিম-বাংলার নদনদী

নদীমাতৃক বাংলার বেশীর ভাগ নদীই পূর্ব-বাংলায়—কিন্তু পশ্চিম-বাংলার নদনদীর পরিমাণও কম নয়। ছোটো বড়ো অসংখ্য নদী পশ্চিম-বাংলাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

পশ্চিম বাংলার নদীগুলির মধ্যে সকলের আগে ভাগীরথীর নাম করিতে হয়। ইহা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গারই শাখা। বাংলা দেশে প্রবেশ করিবার অল্প কয়েক মাইলের মধ্যেই গঙ্গা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একটি শাখা পদ্মা নামে পূর্ব-বাংলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অপর শাখাটি ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্বদিকে নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা এবং পশ্চিম দিকে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার পাশ দিয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ বণিক এই নদীর তীরে হুগলী শহরে কুঠি স্থাপন করিবার পর হুগলী হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অংশকে হুগলী নদী নামে অভিহিত করিয়াছে। বিদেশী বণিকমহলে এই নামই প্রচলিত— জনসাধারণ ইহাকে বিষ্ণুচরণ-সম্ভূতা গঙ্গা বলিয়াই জানে।

পশ্চিম-বাংলার সভ্যতার উপর ভাগীরথীর প্রভাব অসাধারণ। এই সুপ্রাচীন নদীর উপকূলে স্মরণাতীত কাল হইতে অগণিত জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নদীটি নাব্য হওয়ায় ইহা বাণিজ্যার্থীদের একটি প্রধান পথ ছিল। পাশ্চাত্ত্য বণিকেরা আসিয়া ইহার তীরেই কুঠি তৈয়ারী করিয়াছিল।

জলপথে বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এখনও এই নদীটি অন্তর্বাণিজ্যের একটি প্রধান পথ হইয়া রহিয়াছে। ইহার দুই পাশে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের নগরীর মধ্যে আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, কল্যাণী, ত্রিবেণী, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভাটপাড়া, শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, দক্ষিণেশ্বর, হাওড়া, মহানগরী কলিকাতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।—এইগুলির মধ্যে অনেকগুলিই দেবস্থান—তীর্থক্ষেত্র।

জলপথে মাল আমদানি-রপ্তানির সুযোগ থাকায় ভাগীরথীর দুই তীরে অগণিত শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে এই অঞ্চলগুলি ঘনবসতি স্থানগুলির অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে। বহু লোক সমাবেশের ফলে এই স্থানগুলি সংস্কৃতির এক একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রও হইয়া উঠিয়াছে। সব দিক দিয়াই ভাগীরথী-জনপদবিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই নদীর তীরেই মহানগরী কলিকাতা অবস্থিত। ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, এই নগরী ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরও বটে। হুগলী নদী দিয়া প্রতি বৎসরই যত মাল আমদানি-রপ্তানি হয়, পৃথিবীর আর দুই-তিনটি ব্যতীত অপর কোনো নদীতে তাহা হয় না। ডায়মণ্ড হারবার পশ্চিম-বাংলার একমাত্র পোতাশ্রয় এবং ভারতের পোতাশ্রয়গুলির মধ্যে অন্যতম।

ভাগীরথীর পরেই দামোদর নদের নাম করিতে হয়। সাঁওতাল পরগণার পর্বতগুলি হইতে উদ্ভূত হইয়া এই নদীটি বাঁকুড়ার উত্তর সীমা বাহিয়া পশ্চিম-বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পর বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগর হইতে কিছু উত্তরে হুগলী নদীতে মিশিয়াছে। এই নদীটি তাহার উচ্ছ্বসিত জলধারার তাণ্ডব লীলার জন্য সকলের সভয় সম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা প্রায় প্রতি বৎসরই আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে দুই কূল ভাসাইয়া দিত। বর্তমানে এই খেয়ালী নদে বাঁধ দিয়া বন্যা-প্রতিরোধ, সেচব্যবস্থা ও জলজ বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে চলায় এই নদটি পশ্চিম-বাংলার অশেষ কল্যাণের আকর হইয়া উঠিতেছে। ইহার তীরে বা তীর হইতে অদূরে সোনামুখী, কাঞ্চননগর, জামালপুর, তারকেশ্বর, আমতা, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি নগর প্রসিদ্ধ।

পশ্চিম-বাংলার অপরাপর নদীর মধ্যে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী বা কাঁসাই, বেহুলা, ব্রাহ্মণী, সরস্বতী, রসুলপুর, জলঙ্গী

প্রভৃতি নদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা নদীর একাংশ মেদিনীপুর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদীগুলি সব সময় নাব্য না হইলেও দেশের অন্তর্বাণিজ্যে বিশেষ সহায়তা করে। অধুনা মজিয়া গেলেও সরস্বতী নদী এক সময় একটি বাণিজ্য-নদী হিসাবে সুপরিচিত ছিল এবং এই নদীর তীরে সপ্তগ্রাম বাংলার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ দিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। জলঙ্গী নদীও বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য বিখ্যাত। অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব, রায়পুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। অজয় যেখানে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে তাহার অদূরে কাটোয়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান। দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ একটি দীর্ঘ নদী। ইহার তীরে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, আরামবাগ, ঘাটাল প্রভৃতি স্থান প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি ইহার মোহনায় গেঁয়োখালি নামক স্থানে নূতন একটি বন্দর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হইতেছে। কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর তীরে রায়পুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান উল্লেখ-যোগ্য। সুবর্ণরেখার তীরে গোপীবল্লভপুর উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়াও ছোটো ছোটো নদীগুলি বাংলার পল্লী জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই নদীগুলি পলিমাটি বহিয়া দুই কূলকে উর্বর করিয়াছে, সেচের জল যোগাইতেছে এবং অনেক স্থানেই এই নদীগুলিই স্নান-পানের একমাত্র উপায়। বাংলার প্রতিদিনের জীবনে নদী না হলে নয়—কৃষিপ্রধান এই দেশটির সংস্কৃতি নদীকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

তোমার প্রিয় গ্রন্থকার

তখন আমার বয়স দশ বারো বছর হবে। গল্পের বইয়ের নেশা তখনও তেমন হয়নি। এমন সময় একখানা বই হাতে এল—বইখানার নাম 'পথের পাঁচালী'। বইখানা পড়তে পড়তে কত ভালো যে লেগে গেল। ছোট্ট অপু আর দুর্গার গল্প। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন আমাদেরই কথা বলা হচ্ছে—অথচ এ যেন এক অন্য জগতের কথা। লেখক কি করে যে আমাদের মনের কথা জেনে নিয়ে সব ফাঁস করে দিয়েছেন তা ভেবেই পাওয়া যায় না। নিশ্চিন্দিপুরের পথ-ঘাট, বন-জঙ্গল সব যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। ছোটো বেলায় অপু আর দুর্গা যে সব দৌরাত্ম্য করেছে সে সব আমরাই

তো করে থাকি। অপুর মনে যে সব ভাবনা হয় সে সব তো আমাদেরই মনের স্বপ্ন। সর্বজয়াকে নিজেদের মা বলেই মনে হত।

তখন লেখকদের নাম নিয়ে ভাবতাম না, গল্পটাই পড়তাম। 'পথের পাঁচালী'র লেখকের নাম তখনই মনে করে রেখেছিলাম কি না মনে নেই। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নামটা মনের মধ্যে গেঁথে গেল। এরপর 'তালনবমী' নামে একটা গল্প পড়তে পড়তে মনে হল সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি 'পথের পাঁচালী'র লেখক বিভূতিভূষণ যিনি অপুর জীবনটা ছবির মতো এঁকে দিয়েছেন। এখানে তিনি একটি গরীব ঘরের ছেলের তালের বড়া খাবার ইচ্ছেটা কী সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন! মানুষের মনের কথা—বিশেষ করে ছেলে মানুষের মনের কথা—কিশোর-কিশোরীর মনের কথা তাঁর লেখায় কী অপরূপ হয়েই না ধরা পড়েছে।

এরপর বিভূতিভূষণের আর একখানি বড় বই হাতে এল—সেটির নাম 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। এই গল্পের নায়ক জিতুর জীবনটা যেন স্বপ্নের জীবন। প্রথম দিকে দার্জিলিং এর যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা কী মিষ্টি। তারপরে বাংলা দেশের গ্রামে ফিরে এসে জিতু, তার দাদা আর বোন সীতাকে কী কষ্টেই না পড়তে হয়েছে। জিতুর বুদ্ধি ছিল সরল—আর ছিল স্বপ্নদৃষ্টি, যা দিয়ে সে কত সব আশ্চর্য ঘটনা দেখত। অতীত, ভবিষ্যৎ সবই তার কাছে মাঝে মাঝে আশ্চর্য ইশারার মধ্য দিয়ে ধরা পড়ত। অথচ তাকে বুঝতে পারে এমন কেউ ছিল না—বিরূপ জগতের মাঝখানে থেকে তাকে কত কষ্ট কত দুঃখই না পেতে হয়েছে।

'পথের পাঁচালী'র শেষ অংশ 'অপরাজিত' পড়লাম। এখানে ছোট্ট অপুই যেন বড়ো হয়ে এসেছে বলে মনে হল। তার সেই স্বপ্ন, ভাবের আবেগ সবই সেই রকম আছে কেবল তার ক্ষেত্রটা পালটে গেছে এই যা। তার সরল জীবনে কত আঘাত এসেছে—কত লোক তাকে ভুল বুঝেছে—অথচ পৃথিবীর মতোই সে সব সহ্য করেছে—তার প্রাণ চির-সরস থেকে গেছে। অপুর ছেলে কাজলের মধ্যে ছোট্ট অপু আবার ফিরে এসেছে। বিভূতিভূষণ নিজেই বুঝি একটি বয়স্ক ছেলেমানুষ ছিলেন।

বিভূতিভূষণ যেন কবি হতে হতে গল্প-লিখিয়ে হয়েছিলেন। তাঁর দুই চোখে ছিল স্বপ্নের দৃষ্টি। তিনি দুচোখ ভরে দেখেছেন মানুষকে আর

প্রকৃতিকে। এই যে যন্ত্রের সভ্যতা, চারদিকে রুক্ষতা, কুটিলতা আর হাহাকার—এর মধ্যেই তিনি সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন, মাধুর্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অথচ তিনি যে কল্পনার গজদন্তমিনারে বাস করতেন এমন নয়—সামান্য একটু দুঃখে, সামান্য একটু বেদনায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। এই কঠোর ধরিত্রীর মাঝখানে তিনি চির-সরসতার স্পর্শ পেয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে মায়ের জীবন হাজার দুঃখময় হোক না কেন, সন্তানের জন্য স্নেহরস তো শুকিয়ে যায় না। বিভূতিভূষণ শিশুর মতো মানুষ আর প্রকৃতিতে গড়া জননী ধরিত্রীর স্নেহরসে আপনার প্রাণকে অভিষিক্ত করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর রচনায় এত সরসতা, তাই তা আমাদের মন এমন করে ভরিয়ে দিতে পারে।

'আরণ্যক' যখন পড়লাম তখন আর এক সৌন্দর্যের হিল্লোল চোখের সামনে উথলে উঠল। কোথাকার এক অজ পাড়াগাঁ লবটুলিয়া—কোনো ভূগোলের পাতায় যার নাম লেখা নেই, সেখানে বনভূমির মধ্যে এত সৌন্দর্য যে লুকিয়ে আছে তার ঠিকানা কে জানে? সেখানকার একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যেও বিচিত্রের স্বাদ কানায় কানায় উছলে পড়ে।—'দেবযান' পড়ে আর এক জগতের মধ্যে যেন দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। মৃত্যুর পরে আর একটা জগৎ আছে না কি? সেখানকার রূপ বিভূতিভূষণের কল্পনায় ধরা পড়েছে। আমরা মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু দেবযানে যে জগতের কথা বলা হয়েছে তা সত্য—কবির মনোভূমিতে যা গড়ে ওঠে তাই তো আসল সৃষ্টি। পুষ্প, যতীন আর আশার চরিত্র তিনি কী সুন্দর করেই না এঁকেছেন।—'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র হাজারী ঠাকুরের সরল জীবনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণ তাকে যেন জীবন্ত করে এঁকেছেন। 'ইছামতী'তে যেন অপু অধ্যাত্ম দৃষ্টি নিয়ে ফিরে এসেছে।

বিভূতিভূষণ যে এমন করে আমাদের মনকে ভুলিয়ে রাখেন, এর সব চেয়ে বড়ো কারণ এই যে তাঁর সত্যকার দরদ ছিল। ছোটো ছোটো গল্প-গুলোতেও বা 'দুই বাড়ী', 'কেদার রাজা' বা 'বিধু মাষ্টার'এর মতো অপ্রধান লেখাতেও কোথাও তাঁর দরদের এতটুকু কমতি হয় নি। মন ঢেলে প্রাণ ঢেলে শিশুর নিভাঁজ সরলতা আর মুগ্ধতা নিয়ে যিনি কথাকে অক্ষরের

মধ্যে প্রাণবন্ত করে তোলেন, তাঁর লেখা তো আমাদের মনপ্রাণ জয় করে নেবেই।

একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দর্শনের অভিজ্ঞতা

সেবার বড়দিনের ছুটিতে দিল্লীতে বেড়াতে যাবার সুযোগ হয়েছিল। আমার এক বন্ধুর কাকা নয়া দিল্লীতে থাকেন—তিনি সরকারি চাকরি করেন। বন্ধু তাঁর কাছে যাচ্ছে—আমি তার সঙ্গী হলাম। নয়া দিল্লী নূতন শহর—ইংরেজের আমলে সেটা তৈরি হয়েছে। কলকাতার আপিসপাড়ার মতো বড়ো বড়ো ইমারত ছাড়া আর বিশেষ কিছু নতুন জিনিস চোখে পড়ল না—স্বাধীন ভারতের সরকার যে সব বাড়ী-ঘর তৈরি করছে সেগুলোর মধ্যেও মৌলিকতা বিশেষ নেই। আসলে সেগুলোর সঙ্গে ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িয়ে না থাকায় সেগুলো ভাল লাগল না।

একদিন বিকেলে পুরোনো দিল্লী দেখতে গেলাম। এই পুরোনো শহরের দিকে চেয়ে অতীত যুগের কত কথা মনে পড়ল। ইতিহাসের পাতায় যত কথা পড়েছিলাম সব যেন এক নিমেষে আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। মনে পড়ল, কত হাজার বছর আগে পাণ্ডবরা এখানেই—ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ময়দানব যুধিষ্ঠিরের বিরাট সভাগৃহ তৈরি করেছিল। এখানে রাজসূয় যজ্ঞে ভারতের অসংখ্য রাজা কর নিয়ে এসেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সভার সমৃদ্ধি দেখে দুর্যোধনের মন ঈর্ষ্যাতুর হয়েছিল, তার ফলেই পাশাখেলা—বনবাস—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এখানেই শেষ হিন্দু রাজচক্রবর্তী বীর পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করতেন। তারপর দিল্লীর সিংহাসন বিদেশীদের হাতে চলে গেল।

অবশ্য দাস রাজারা বা অন্য পাঠান অধিপতিগণ ভারতবর্ষকে বিদেশ বলে মনে করেন নি; এই দিল্লীই হয়ে উঠেছিল তাঁদের বাসভূমি। কুতুব-মিনার দাস রাজবংশের কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। মোগলকেশরী বাবরের প্রাণ সমরকন্দের জন্য কাঁদত, কিন্তু তিনিও এই দিল্লীতেই সিংহাসন পেতেছিলেন। তাঁর কবর দিল্লীতে নেই। কিন্তু তাঁর ছেলে হুমায়ুনের কবর দিল্লীতেই ছিল। তাঁর কবরও দেখেছিলাম। তা ছাড়া নুরজাহান আর

জাহানারার কবর, তার উপর দুছত্র করে লেখার অর্থের সঙ্গে যখন পরিচয় হল তখন ভারি ভালো লাগল।

কিন্তু সব কবরের সেরা আগ্রার তাজমহল, যেখানে সম্রাট শাজাহানের প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের দেহ শায়িত ছিল। সেই অপূর্ব শিল্পমন্দির দেখতে আর একদিন গিয়েছিলাম। —একদিন ইতিহাস-বিখ্যাত লালকেল্লায় ঢুকলাম। এই লালকেল্লায় এখন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে। এর আগে বৃটিশদের আমলে এখানে অন্য পতাকা উড়েছিল। আবার এই লালকেল্লার মধ্যেই সম্রাট শাজাহানের দরবার ছিল। লালকেল্লার ভিতরে ঢুকে সেই অতীতের সাড়ম্বর দিনগুলোতে ফিরে গেলাম বলে মনে হল। এই দুর্গের মধ্যে যে দিকে ফিরে চাইলাম, প্রতি মহলেই একটা বিরাট সাড়ম্বরের ভাব চোখে পড়ল। এখানকার দেওয়ান-ই-আম আর দেওয়ান-ই-খাসের গর্ব করে সম্রাট শাজাহান একদিন বলেছিলেন,—পৃথিবীতে যদি স্বর্গ বলে কিছু থাকে তা হলে তা এইখানে। এখানকার বিরাট পরিমণ্ডল, অপূর্ব শিল্প-কলা দেখে মনে হল—শাজাহান যা বলেছিলেন তা অত্যুক্তি নয়। স্থাপত্যের এমন নিদর্শন পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে নেই। শাজাহান যে জুম্মা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর আওরংজেব যে মোতি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাও কম নয়।

কিন্তু দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্যও শেষ হয়ে গেল। মহম্মদ শাহের রাজত্বে মারাঠা এসে দিল্লীর তোরণে হানা দিল—নাদির শাহ এসে দিল্লীর পথঘাট রক্তরঞ্জিত করে অজস্র ধনরত্ন এমন কি শাজাহানের সাধের ময়ূরসিংহাসন নিয়ে চলে গেলেন—শিখেরা মোগল সম্রাটকে শক্তিহীন করে তুলল—মারাঠা দিল্লীর উপর আধিপত্য বিস্তার করল—তারপর ইংরেজ এসে দিল্লী অধিকার করল, সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলেন—সেই প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজের রাজত্বও ক্রমে শেষ হয়ে গেল, ভারত আবার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ পুরোনো দিল্লী থেকে তিন-চারক্রোশ উত্তরে নয়া দিল্লী স্থাপন করেছিলেন—সেটিই এখন ভারতের রাজধানী। এখানে পুরোনো দিল্লীর ঐশ্বর্য নেই—সরকারের কর্মশালা আর কর্মচারীদের আপিসের জন্যই এই শহরটি তৈরি হয়েছে। অতীত বা মধ্যযুগের আড়ম্বরের কল্পনা এখন

আমরা করতে পারি না। নয়া দিল্লীর পথ-ঘাট পরিকল্পনা করে তৈরি—এর একপ্রান্তে মন্ত্রীরা, এক অংশে সরকারের বড়ো বড়ো কর্মচারীরা আর এক অংশে কেরানীরা থাকেন—এমনই এর ব্যবস্থা। নূতন কালের নূতন বিধি।

অদূরে যমুনার শীর্ণ ধারা বয়ে চলেছে। এরই তীরে মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র ভস্মাবশেষ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'রাজঘাট'। পুরাতন দিল্লীর রাজকীয় ঐশ্বর্য, নূতন দিল্লীর কর্মব্যস্ততা উপেক্ষা করে ভারতের অহিংসা মন্ত্রে বিশ্বাসী সাধক এখানে যেন সমাধিমগ্ন হয়ে রয়েছেন। মানুষ যে সমৃদ্ধির 'দেহলী'কে স্বর্গ বলে কল্পনা করে তা যে মিথ্যা, তা যে মরীচিকা এই কথাটি জানাবার জন্য যেন এই আশ্রম নীরব ভাষায় বলছে, 'দিল্লী দূর অস্ত্—দিল্লী অনেক দূর।' এই দিল্লীও অতীতের কত সাম্রাজ্যের কত প্রতাপের সমাধিস্থান!

মহাত্মা গান্ধী

"মহাত্মা তিনিই—সকলের সুখ-দুঃখ যিনি আপনার করিয়া লইয়াছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলিয়াই জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালবাসা, সেই প্রেমের ঐশ্বর্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যাহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাকে আমরা মোটের উপর এই বলিয়া বুঝিয়াছি যে, তিনি হৃদয় দিয়া সকলকে ভালোবাসিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে সার্থক হইয়াছে। গান্ধীজীর জীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা প্রেম। অধুনা আমরা তাঁহাকে 'জাতির জনক' নাম দিয়া তাঁহাকে ভারতের জাতীয়তার মূর্ত প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে চাই—কিন্তু ইহা তাঁহার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় নয়। যে প্রেমের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে মহাত্মা আখ্যা দিয়াছিলেন, সেই প্রেমই তাঁহাকে সক্রেতিস, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতির সহিত এক সঙ্গে স্মরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি আঘাতের জন্য ফিরিয়া আঘাত করিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই—অথচ আপনার সুদৃঢ় বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে চাহেন নাই। ভারতের জনগণের জন্য যখন তাঁহার চিত্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তিনি

যখন তাহাদের দুঃখ দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃটিশ সরকার তখন তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য তিনি ইংরেজকে ঘৃণা করিতে বা প্রতিঘাত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহাকে অকথ্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল—কিন্তু তিনি অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংসার আদর্শ যে সম্ভবপর তাহা প্রমাণিত করিতে তিনিই একমাত্র উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালিত আন্দোলন যখনই অহিংসার সীমা পার হইবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যখন ঘোরতর সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধিয়াছিল, তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালিতে যখন ধর্মের নামে নৃশংসতা চরমে উঠিয়াছিল তখন তিনি নিজে গিয়া সকলের মধ্যে শান্তির বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। প্রেমের মন্ত্র প্রচার করিয়া যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সর্বমানবের মিলনের বাণী প্রচার করিয়া গান্ধীজী সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনায় উন্মত্ত মানুষের কাছে প্রাণবলি দিলেন। যে নাথুরাম গডসে রিভলবারের গুলিতে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, সে উপলক্ষ মাত্র। সত্যের সাধকগণ পৃথিবীতে যুগে যুগে এই প্রতিদানই পাইয়াছেন।

গান্ধীজী তাঁহার জীবনকেই তাঁহার বাণী বলিয়াছিলেন। তিনি যে আত্মজীবনী রচনা করিয়াছিলেন তাহাকে তিনি সত্যানুসন্ধান বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এযুগের তথাকথিত জননেতাদের মতো তিনি বড়ো বড়ো কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহাকেই জীবনে রূপায়িত করিতে চাহিতেন। বাক্, মন ও কাযের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে ইহা তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল না। তিনি সর্বত্র সত্যের সাধনা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত তাঁহার প্রায় আশী বছরের জীবন সত্যান্বেষীরই জীবন।

কাথিয়াওয়াড়ে—গুজরাটের পোরবন্দরে একটি জৈন পরিবারে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কাবা গান্ধী, মাতার নাম পুত্তলিবাঈ। জৈন পরিবারের সন্তান হওয়ায় অহিংসার আদর্শ তাঁহার

মজ্জাগত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি পিতার নিকট ধৈর্য ও মাতার নিকট ধর্মপরায়ণতা লাভ করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর আত্মকথা হইতে তাঁহার শৈশব ও বাল্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে সত্যের জন্য তাঁহাকে কী ভাবে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল এবং কী ভাবে নানা প্রলোভনে পড়িয়াও তিনি পরিশেষে উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্যকালে হরিশ্চন্দ্রের নাটক দেখিয়া তাঁহার অন্তরে সত্যানুরাগ দৃঢ়মূল হয়। ফলে তিনি বিদ্যালয়ে অপর ছাত্রের লেখা দেখিয়া নকল করিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই। জৈন পরিবারে নিষিদ্ধ মাংস খাইয়া তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ডে গিয়া প্রথমে তিনি পুরাদস্তুর সাহেব সাজিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই আত্মচিন্তা করিয়া সে পথ হইতে সরিয়া আসেন। পরিণত বয়সেও একাধিকবার তাঁহার ভ্রান্তি হইয়াছে, কিন্তু যখনই তাঁহার ভুল তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তখনই সেই ভুল সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

গান্ধীজীর ব্যবসায়িক জীবন তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন। ব্যারিস্টার হইয়া তিনি এদেশে আইন-ব্যবসায়ে যোগ দিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ লাজুকতার জন্য আইন-ব্যবসায়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। অসত্যের পক্ষ গ্রহণ করিবেন না এই আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করা তাঁহার পক্ষে দুরূহই হইয়াছিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি জটিল মোকদ্দমার ভার লইয়া আফ্রিকা যাত্রা করেন। এখানে তাঁহার ব্যবসায়িক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র কর্মময় জীবনের সূত্রপাত হয়।

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজরা ভারতীয় ও আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছিল—আইন করিয়া কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার হরণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। গান্ধীজী শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া আন্দোলন করেন—অথচ তিনি হিংসার পথ গ্রহণ করেন নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁহার নবাবিষ্কৃত 'আয়ুধ' সত্যাগ্রহ বিশ্বে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছে—ভারতের অহিংসার মন্ত্রের উপরই ইহার ভিত্তি। অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী

ছিলেন বলিয়াই গান্ধীজী বুয়র যুদ্ধে আহত বৃটিশ পক্ষের সৈনিকদের শুশ্রূষা করিতে পারিয়াছিলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া গান্ধীজী এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার সত্যাগ্রহের আদর্শ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপই পাল্টাইয়া দিল। অত্যাচারের প্রতিবাদে চম্পারণ সত্যাগ্রহ, রাউলাট বিলের প্রতিবাদে হরতাল, খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ নীতি গ্রহণ, বিলাতী বর্জন প্রভৃতি নানা আন্দোলন করিয়া তিনি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে জনতার মধ্যে বিস্তারিত করিয়া উহাকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে আইন অমান্য আন্দোলন করেন তাহা সমগ্র ভারতকে জাগ্রত করিয়া তুলে—১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট 'ভারত ছাড়' বলিয়া তিনি ইংরেজকে যে চরম পত্র দেন তাহাতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ গান্ধীজীর জীবনের একমাত্র কার্য ছিল না। ভারতের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক—সর্ববিধ সমস্যার সমাধান কল্পে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য বিলাতী বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বদেশী পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়াসী হন। প্রত্যেকেই কিছু কিছু কায়িক পরিশ্রম করিবে—ইহাই ছিল তাঁহার আদর্শ। শ্রম ও আত্মনির্ভরতার প্রতীকস্বরূপ তিনি চরকার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বৃহৎ শিল্পে শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া মালিক পুষ্ট হয় বলিয়া তিনি বিকেন্দ্রীকরণের পরামর্শ দেন ও কুটিরশিল্পের প্রসারের জন্য চেষ্টা করেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যতবার বিরোধ বাধিয়াছে ততবারই তিনি বিরোধ মিটাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য তিনি সারাজীবন অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন—ভাঙ্গি পল্লীতে তিনি আপনার আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। দেশে যখনই কোনো বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, তখনই পাপের আবির্ভাব আশঙ্কা করিয়া পাপমোচনের জন্য তিনি যে অনশন করিয়াছেন তাহা অভিনব ব্যাপার। সর্বধর্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল—প্রার্থনাসভায় তিনি গীতা-উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে কোরানও পাঠ করিতেন। রামায়ণের রামরাজ্য ছিল তাঁহার স্বপ্নের ধন—তাঁহার জীবনের শেষ দুটি শব্দ 'হা রাম'।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

'টাকা মাটি মাটি টাকা'—মুখে একথা বললেও কাজে কজন এটাকে সত্য করে তুলতে পারে? আমাদের মুখে অনেক তত্ত্বকথা বার হয়, কিন্তু মনে বিষয়লালসা থাকে। বুদ্ধিতে হয়তো অর্থকে অসার বলে জানি, কিন্তু অর্থের সন্ধান পেলে আর কিছুই চাই না। কিন্তু এ যুগেই মাত্র একশো বছর আগে এমন একজন মানুষ বাংলা দেশে এসেছিলেন যিনি মনেপ্রাণে বিষয়বিরাগী ছিলেন। হাতে টাকা দিলে তাঁর হাত বেঁকে যেত, বিছানার নিচে টাকা রাখলে তিনি তা না জেনেও বিছানাতে শুলে যেন বিছে কামড়েছে এরকম যন্ত্রণা পেতেন, একজন ভক্ত দামী শাল উপহার দিলে তিনি একমুহূর্ত গায়ে দিয়েছেন তারপর সেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন। এই মানুষটি যে ঐহিক সম্পদের চেয়ে অনেক বড়ো জিনিস পেয়েছিলেন—সেটি ভগবানের করুণা। তাঁর সেই পরম সম্পদেব রূপ দেখবার জন্য অসংখ্য ভক্ত আসত বাংলার পীঠস্থান দক্ষিণেশ্বরে—সেখানকার কালীবাড়ীর পুরুত কিন্তু এযুগের মহাসাধক ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখবার জন্য।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার একটা ছোট্ট গ্রাম কামারপুকুরে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে অবতীর্ণ হন—বাপ-মা তাঁর নাম রেখেছিলেন গদাধর। ছেলেবেলায় তাঁর পাঠশালার পড়াশোনা বিশেষ এগোয় নি—কিন্তু এই সময়ই তাঁর যে ভাবতন্ময়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তার স্বরূপ বুঝতে না পেরে অনেকেই তাঁকে পাগল বলত। ঘটনাচক্রে তিনি এসে পড়লেন দক্ষিণেশ্বরে—যেখানে রাণী রাসমণি কালীমন্দির স্থাপনা করেছিলেন। সাধারণ লোকে তাঁকে আধপাগলা পূজারী বলে জানত, কিন্তু এখানেই তাঁর আসল সাধনা হয়েছিল। 'যত মত তত পথ' এই সত্যটি উপলব্ধি করবার জন্য তিনি সব পথে সাধনা করলেন—বৈষ্ণব, শাক্ত, রামাইত, শৈব, বৈদান্তিক এমন কি মুসলমান আর খ্রীষ্টানের সাধনাও তিনি আপনার জীবনে করেছিলেন। তোতাপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ এই নাম পান। কিন্তু তিনি কোনো দিন সন্ন্যাসীর বেশ ধরেন নি। ঘরে থেকে তিনি কোনো বিষয়ে স্পৃহা না করে সকলকে উপদেশ দিতেন।

ঠাকুর ছিলেন কালীভক্ত। তাঁর কাছে সারা বিশ্ব ছিল জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। নারীর মধ্যে তিনি বিশ্বজননীকে মূর্ত দেখতেন। পত্নী সারদামণিকেও তিনি মাতৃভাবে দেখতেন। সংসারে সংসারীর মতো থেকেও যে ধর্মসাধনা করা যায় তা বিশ্বজনকে বোঝাবার জন্যই তিনি যেন সংসার পরিহার করেননি। নিছক ত্যাগ, নিছক জ্ঞানের জন্য তাঁহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তিনি তাঁর উপাস্যা দেবীর কাছে বার বার ভক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন, বলেছেন, মা যেন তাঁকে শুকনো সন্ন্যাসী করে না দেন। তাই গৃহীর কাছে সংসারীর কাছে তিনিই শরণ্য হয়েছিলেন।

তাঁর সৌরভে মুগ্ধ হয়ে সে যুগের শিক্ষিত সমাজ তাঁর কাছে ছুটে আসতেন তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর মুখের কথা শোনবার জন্য। তিনি তর্ক করে শাস্ত্র-মতে উপদেশ দিতেন না—প্রতিদিনকার ঘরোয়া কথায় তিনি চরম সত্যের কথা বলতেন। তাঁর নিজের সাধনা যতই দুরূহ হোক না কেন, তিনি সবার জন্য ভক্তির পথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। মনটা শুদ্ধ রেখে বিশ্বজননীকে ভক্তি করলেই সব তাপ দূর হয়ে থাকে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। ভক্তি যে কী তাঁকে দেখে তা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কাছেও ফুটে উঠত। তিনি যখন কথা বলতেন বা গান গাইতেন, তখন অনেক সময় তিনি ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে পড়তেন। ভাবের আবেশে জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন, এমন অবস্থাও একাধিকবার ঘটেছে। তাঁর এই ভাবাবেশ দেখে তাঁর ভক্তরা অনুভব করতেন যে, এত ভক্তি মানুষে কখনও সম্ভবে না—এ অলৌকিক—তাঁরা তাঁকে ভগবানের অংশ বলে মনে করতেন। বাস্তবিক তাঁর মধ্যে এমন একটা দিব্য প্রেম ছিল যার আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন বা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতো ব্রাহ্ম-চূড়ামণি, মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো ডাক্তার, গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো নটচূড়ামণি,—আর এসেছিলেন সত্য-সন্ধানী যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে—তাঁর বাবা কলকাতার সিমলের দত্ত বংশের বিশ্বনাথ দত্ত। ছোটো বেলা থেকেই তাঁর অসাধারণ মেধা, আশ্চর্যজনক স্মরণ-শক্তি, দুঃখীর জন্য বেদনাবোধ আর ধর্মানুসন্ধিৎসা ছিল। হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের রচনা পড়ে তিনি প্রথমে নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন—ব্রাহ্মদের সংস্পর্শে

আসবার পর তাঁর মনের সে ভাব কেটে যায়। তিনি ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিমূলক গান গাইতেন—তিনি নিজেই একজন গীতকার ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ তাঁর অধ্যাত্মপিপাসাকে শান্ত করতে পারল না। তিনি প্রথমেই ছুটে গেলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে—তাঁর মনে আকুল প্রশ্ন ঈশ্বরকে দেখা যায় কিনা। মহর্ষি এই তরুণের পিপাসার বারি দিতে পারলেন না। এর পর তিনি ছুটে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে—রামকৃষ্ণকে দেখে তাঁর মন শান্ত তৃপ্ত হল। এই দুই পুরুষের মিলন বিশ্বের ধর্মসাধনার ইতিহাসে এক অসাধারণ ব্যাপার। নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের ভক্তিতে মুগ্ধ, তাঁর ভাবে মুগ্ধ আর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের গানে মুগ্ধ। রামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের শেষ দুটি বৎসরে এই নূতন শিষ্যটির মধ্যে আপনার অজস্র সম্পদ ঢেলে দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটে।

গুরুর মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে ছ'বৎসর কাটান—এই সময়ে তিনি তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করেন। এই সময়ে তিনি খেতরী, রামনাদ প্রভৃতির রাজাদের দীক্ষিত করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় চিকাগো নগরে যে ধর্মমহাসভা হয় সেখানে তিনি হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে গিয়ে যে বক্তৃতা করেন তা সারা বিশ্বে আন্দোলন সৃষ্টি করে। হিন্দুধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য জগৎ ছিল একেবারে অজ্ঞ। বিবেকানন্দের বক্তৃতা আর প্রচার বহু পাশ্চাত্ত্য মনীষীকে হিন্দুধর্মের দিকে বিশেষ করে বৈদান্তিক মতবাদের দিকে আকৃষ্ট করে। অনেকে হিন্দুধর্মে দীক্ষাও গ্রহণ করেন। তাঁর বিদেশী শিষ্যদের মধ্যে অভয়ানন্দ, কৃপানন্দ, বিশেষ করে ভগিনী নিবেদিতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মহীয়সী মহিলা ভারতের জন্য আত্মদান করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের পত্নী সারদাদেবী বিবেকানন্দের ধর্মজীবনে চিরদিন প্রেরণা দিয়েছিলেন এই কথাটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীমার নির্দেশকেই শিষ্যগণ শিরোধার্য বলে [illegible]ণ করতেন।

বিবেকানন্দ ধর্মপ্রচারক বা দার্শনিক মাত্র ছিলেন না। রামকৃষ্ণ তাঁকে জনমুক্তির প্রেরণা দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন আর আলমোড়ায় মঠ স্থাপন করে একদল সন্ন্যাসীকে নিয়ে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেন। ভারতের সেবা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশনের মর্যাদা দিন

দিন বেড়েই চলেছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় এমন কি বিদেশেও তিনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে ধর্মচর্চা আর সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

রামকৃষ্ণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" দেশের অগণিত দুঃস্থ নরনারীর দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়েছিল। সারা দেশ কুসংস্কার আর জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তিনি কুসংস্কার দূর করে জাতিকে জাগ্রত করে তুলতে অগ্রসর হয়েছিলেন। সমস্ত ভারতবাসীকে জগন্মাতার সন্তান বলে ঘোষণা করে তিনি ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভক্তির আদর্শে যেমন এদেশের অগণিত নরনারীর অন্তরে ধর্মপিপাসা জেগেছে, তেমনই স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রগর্ভ বাণীতে এদেশের চিত্তের জড়তা কেটে গেছে—তাঁর আদর্শ ভারতের যুবসম্প্রদায়কে দেশকল্যাণে আত্মদান করতে অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে।

বাংলা শিশু-সাহিত্য

যারা সত্যি সত্যি শিশু—অর্থাৎ একেবারে কচি থেকে বছর পাঁচ ছয় বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই পড়তে পারে না। শিশু-সাহিত্য বলতে গেলে শিশুত্বের সীমাটা দশ বারো বছর বয়স পর্যন্ত টেনে দিই—অনেকে আবার কৈশোরের প্রথম দিকটার কথাও ভাবেন। যখন থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে শিখল, তখন থেকেই পড়ার বইয়ের বাইরের কিছু কিছু জিনিস দেওয়ার কথা শিক্ষাবিদ্‌রা বলে আসছেন—এতে তাদের মনটা স্বাধীনতা পেয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে পারে।

আগেকার দিনে আমাদের দেশে পুঁথির শিক্ষার খুব একটা চল ছিল না। যাঁরা বড়ো তাঁরা মুখে মুখে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বা রূপকথার গল্প ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের বলতেন। এতে গল্প শোনার যে আদিম কৌতূহল ছোটোদের আছে তা মিটত—সেই সঙ্গে অনেক শিক্ষাও তারা পেত। যখন থেকে লেখা পুঁথি পড়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হল তখন বিদ্যাসাগর মশাই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে সঙ্গে কথামালা আর আখ্যানমঞ্জরী লিখলেন, কিন্তু গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা শেখানোর অভিপ্রায়টা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠায় শিশুরা সেটাকে তেমন আগ্রহের সঙ্গে নিয়েছিল বলে মনে হয় না।

উনিশ শতকে যাঁরা বাংলা সাহিত্যকে নতুন রূপ দিচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ শিশুদের দিকে দৃষ্টি দেন নি—কেবল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 'কঙ্কাবতী', 'লুলু' এই সব গল্পের মধ্য দিয়ে ছোটোদের মনোহরণ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি যে আশ্চর্য গল্প তৈরি করেছিলেন তা বড়োদেরও কম ভালো লাগে না।

এই শতকের প্রথম দিকেই বাংলায় শিশু-সাহিত্যের প্রচার আর প্রসার আরম্ভ হয়েছে। যাঁর প্রচেষ্টায় বাংলায় শিশু-সাহিত্যের গোড়াপত্তন হল তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তিনি 'ছেলেদের রামায়ণ' আর 'ছেলেদের মহাভারত' রচনা করে এদেশের ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'সন্দেশ নামে একটি ছোটদের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। "সে সাধারণ পত্রিকা ছিল না, ছিল সাহিত্য গোষ্ঠীভুক্ত; ছবির, গল্পের, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর, জীবনীর কাব্যের, কৌতুকের, অনুবাদের সোনার খনি। লাভের জন্য কেউ সে পত্রিকায় হস্তক্ষেপ করেনি, লেখকরা ছিলেন বিনা পয়সার, সম্পাদক ছিলেন লোকসানের মালিক। ভালোবাসার কারবার ছিল সে, তাই সে পত্রিকার মধ্যে যাদু ছিল।" [ভাষণ—লীলা মজুমদার] এই সময়কার 'সখা', 'সাথী' পত্রিকাও উল্লেখযোগ্য। যোগীন্দ্রনাথ সরকার যে সব শিশুপাঠ্য বই আর কুলদারঞ্জন রায় যে সব পুরাণ-কাহিনীর সংকলন করেছিলেন, সেগুলোও অপূর্ব। সুবিনয় রায়চৌধুরীর লেখাও মনোজ্ঞ।

শিশু সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান কম নয়। মহাকবির প্রতিভার রশ্মি সহস্র দিকে বিকীর্ণ হয়েছে—শিশুর অন্তরের গোপন প্রদেশেও তার অবাধ-প্রবেশ সম্ভবপর হয়েছে। তাঁর 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যের কবিতাগুলোর মধ্যে শিশুমনের অপূর্ব বিশ্লেষণ রয়েছে—অথচ প্রায় সবগুলি কবিতাই শিশুরা উপভোগ করতে পারে। 'খাপছাড়া' আর 'ছড়া' কাব্য দুটিতে কৌতুক ছড়ানো—এগুলো ছোটোদের কাছে খুবই উপাদেয়। 'গল্প সল্পে'র অনেক গল্পই ছোটোদের ভালো লাগবে। তাঁর 'সহজপাঠ' দুই ভাগ ছোটোদের বিশেষ আনন্দ দেয়। এ ছাড়া তাঁর ছোটোদের মতো এত লেখা ছড়ানো আছে যার তুলনা নেই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গেই নাম করতে হয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি

নিজে ছিলেন শিল্পী—তাঁর লেখাও ছবি এঁকে চলে। তাঁর আশ্চর্য সুন্দর ভাষা শিশু মনের কল্পনাকে রূপ দিয়েছে। তাঁর 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি,' 'ক্ষীরের পুতুল', 'ভূত পাত্রীর দেশ', 'নালক', 'রাজকাহিনী' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য।

বাংলার শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে—সে দুটি নাম দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার আর সুকুমার রায়-এর। দক্ষিণারঞ্জন 'ফার্স্ট বয়', 'লাস্ট বয়', বা অন্য যে সব বই রচনা করেছেন সেগুলো তো ভালোই—এ ছাড়া তিনি আর একটি অমূল্য কাজ করেছেন—সেটি হচ্ছে প্রাচীন রূপকথার গল্প সঞ্চয়ন। আগেকার যুগে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে রূপকথার গল্প শুনত। এযুগে সেগুলো হারিয়ে যেতে বসেছিল। দক্ষিণারঞ্জন সেই গল্পগুলো সংগ্রহ করে ছোটদের জন্য রত্নের একটি ভাণ্ডার খুলে দিয়ে গেছেন। সুকুমার রায় ছোটদের জন্য হাসির ঝরণা বইয়ে দিয়ে গেছেন। ছোটদের জন্য তিনি যে সব কবিতা আর গল্প লিখেছেন তা ছোটদের চিরকাল আনন্দ দেবে। তাঁর 'আবোল তাবল', 'হ-য-ব-র-ল', 'ঝালা-পালা', 'পাগলা দাশু', 'হেসোরাম হুঁশিয়ারীর ডায়েরী' সবকটাই অপূর্ব গ্রন্থ। ছোটদের লিখিয়েদের মধ্যে সুকুমার রায়ই সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর বইয়ে লেখার সঙ্গে যে সব ছবি আছে সেগুলোও মনোহর।—সুকুমার রায়ের দিদি সুখলতা রাও দেশ-বিদেশের পুরানো গল্পকে ভেঙে ছোটদের জন্য নতুন করে লিখেছেন। তাঁর 'গল্প আর গল্প', 'আরো গল্প' ছোটদের আদরের জিনিষ। অন্য মহিলা শিশু-সাহিত্যিকদের মধ্যে জ্ঞানদা নন্দিনী দেবীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়—তাঁর 'টাক ডুমাডুম ডুম' আর 'সাত ভাই চম্পা' দুটি বইই সুন্দর। বিদেশী গল্প অবলম্বনে লেখা প্রিয়ম্বদা দেবীর 'পঞ্চুলাল' মনোহর রচনা।

ছোটোদের জন্য 'শিশুসাথী', 'মৌচাক', 'রামধনু', 'শুকতারা', 'কিশোর' (এখন লুপ্ত) বা আরও অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে শিশু-সাহিত্যের প্রসার অনেক বেড়ে গেছে। সে যুগে সুকুমার রায় যেমন এ যুগে সুনির্মল বসুও তেমনই ছোটদের জন্য লেখা হাসির কবিতায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'শিশুভারতী' নামে ছোটোদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আর গল্প কবিতার যে সঞ্চয়নটি করেছেন চারশো পাতার

দশটি খণ্ডে, তা বাংলার শিশুদের আর কিশোরদের অমূল্য সম্পদ। যোগেন্দ্রনাথের অন্য বইগুলোও উল্লেখযোগ্য। দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় 'ছোটদের ভক্তমাল', ছোটদের রাজতরঙ্গিনী,' 'নিমাই পণ্ডিতের গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে ছোটদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছেন। নলিনীভূষণ দাসগুপ্তের 'বুলবুল', 'পরিজাত' বা অন্য বইগুলোও সুপাঠ্য।

এ যুগে অনেক বড়োদের লেখক ছোটোদের জন্যও লিখেছেন। এঁদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র আর বুদ্ধদেব বসুর নাম সবার আগে করতে হয়। আশাপূর্ণা দেবী যে সব সরস গল্প লিখেছেন তা বড়োদেরও আনন্দ দেবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদার গল্প' বৈজ্ঞানিক কল্পনা আর কৌতুকের সমাবেশে অপূর্ব বই—তাঁর রোমাঞ্চমূলক রচনাও উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব বসুর গল্পগুলি মনোহর। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, জসীম উদ্দীন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শিবরাম চক্রবর্তী, গজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি অনেকেই ছোটোদের জন্য উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছেন।

কিছুকাল ধরে শিশু-সাহিত্যে ভেজাল চালানোর চেষ্টা চলেছে। শিশু-সাহিত্য বা কিশোর-সাহিত্যের নাম করে সস্তা রোমাঞ্চের গল্প আর ডিটেকটিবের কাহিনী পরিবেশন করা হচ্ছে। এগুলো সুকুমারমতি কিশোর-কিশোরীদের রুচিকে বিকৃত করে দেয়। —রহস্য বা রোমাঞ্চ অবলম্বনে সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টি সহজ নয়—এদেশে হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ দু'চারজন ছাড়া অন্য কেহ তা পারেন নি। তাঁর 'যখের ধন', 'আবার যখের ধন' বা প্রমদারঞ্জন রায়ের 'বনের খবরে'র পাশাপাশি এ যুগের বিভিন্ন 'সিরিজ'এর বইগুলো পাশাপাশি ধরলে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ধীরেন্দ্রলাল ধর আর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ছোটোদের উপযোগী করে মহাপুরুষদের জীবনকথা বা দেশবিদেশের কাহিনী রচনা করেছেন—এগুলো শিক্ষামূলকও বটে। এ যুগের শিশু-সাহিত্যিকদের মধ্যে ননীগোপাল চক্রবর্তী, ভীমপদ ঘোষ, মনীন্দ্র দত্ত, রবিদাস সাহা রায়, অমিতাকুমারী বসু, বিভূতিভূষণ গুপ্ত, সুনীল সরকার, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মৌমাছি বা বিমল ঘোষ আর স্বপনবুড়ো বা অখিল নিয়োগী শিশুপ্রেমিক সাহিত্যিক।

ভারতের ভাষা সমস্যা

ভারতবর্ষ একটি উপ-মহাদেশ বিশেষ। তার পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত, দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত জীবনযাত্রার, আচার-আচরণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। একই মাতৃভূমিতে অজস্র-বৈচিত্র্য পাশাপাশি একটি ফুলের মত বিরাজিত। সেই বৈচিত্র্য তার প্রাকৃতিক শোভায়, সেই বৈচিত্র্য তার সামাজিক আচার বিচারে, সেই বৈচিত্র্য তার নৃতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে। কিন্তু সমস্ত মনীষীরাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতের এই অসংখ্য বৈচিত্র্যকে গেঁথে রেখেছে একটি নিহিত ঐক্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষ শিক্ষা। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে তাই ভাষার বৈচিত্র্যও খুব স্বাভাবিক।

অতি প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের আগে ভারতবর্ষের ভাষা ছিল কোনস্থানে দ্রাবিড়, কোথাও বা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর। সেই ভাষা আজও আছে। দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় জাতীয় ভাষা প্রচলিত। তেলেগু, তামিল ইত্যাদি ভাষা মূল দ্রাবিড় ভাষাজাত। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলি সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা থেকে উদ্ভূত। আর্যরা ভারতবর্ষে এসে যে ভাষায় বেদ লেখেন তার নাম বৈদিক ভাষা। সেই ভাষা ক্রমশ লোকমুখে বদলাতে থাকে। কারণ সাধারণ মানুষ কঠিন শব্দ উচ্চারণের চেয়ে সোজা করে উচ্চারণ করতে চায়। ফলে শব্দ ও ধাতু ও ভাষার গঠনে নানা পরিবর্তন হল। সেই ভাষাকে বলা হত প্রাকৃত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মানুষের বিভিন্ন উচ্চারণের ফলে প্রাকৃতও নানা রূপ ধরেছিল। বিভিন্ন স্থানের নাম অনুসারে তাদের নাম দেওয়াও হয়েছিল। তারপর সেইসব প্রাকৃত থেকে হল অপভ্রংশ—তাদের থেকে হল আধুনিক আর্যভাষাগুলি। যেমন, ধরা যাক মাগধী প্রাকৃত থেকে হল মাগধী অপভ্রংশ। তার থেকে সৃষ্টি হল বাংলা ভাষার। যেমন সৌরসেনী প্রাকৃত থেকে হল সৌরসেনী অপভ্রংশ। তার থেকে হল হিন্দী ভাষার জন্ম।

এখন এ ত' গেল আধুনিক আর্যভাষাগুলির উদ্ভবের কথা। ভারতের ভাষা সমস্যা অন্যত্র। ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা প্রায় তিনশ। ভারতীয় সংবিধান মোট চোদ্দটি ভাষাকে স্বীকার করেছেন ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা হিসেবে।

যেমন হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, তামিল ইত্যাদি। সমস্যাটা হল এই যে, ভারতবর্ষ একটি এত বড় দেশ যে, সেখানে বহুভাষা থাকবে এত স্বাভাবিক ব্যাপার। ভারতবর্ষ ত' আর ইংলণ্ডের মত ছোট দেশ নয়। সুইট্জারল্যাণ্ডের মত ছোট দেশেও তিনটি ভাষা চলে—ফরাসী, জার্মান আর ইতালিয়। দ্বিতীয় কথা হল এই যে, ভারতবর্ষে বৈচিত্র্য যতই থাক ঐক্য রাখতে হবে। সেই ঐক্যসূত্র হল জাতীয়তাবোধ বা ইংরেজী করে বললে Nation বোধ। আমরা একটি নেশান। তার নাম হল ভারতীয়। আমরা বাঙালী বা মারাঠি বা উত্তর-প্রদেশী এটা বড় কথা নয়, অনেক বড় কথা আমরা একটি nation আর তা হল ভারতীয়। সেই nation-hoodকে বজায় রাখতে হ'লে চাই একটি ঐক্য। রাষ্ট্রীয় ঐক্য আমাদের আছে। আমাদের সবকয়টি প্রদেশ মিলে গোটা দেশ। প্রদেশের শাসন কেন্দ্রীয় সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক ঐক্য সম্ভব নয়। ধর্মীয় ঐক্যও ভারতবর্ষে অসম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঐক্যেরই প্রয়োজনে এমন একটি ভাষা চাই যে ভাষায় ভারতবর্ষের আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্য বজায় থাকে আর আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিও দিনে দিনে পূর্ণতা পায়।

সে জন্যই চাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা। আর সেই সঙ্গে আছে ইংরেজি ভাষার সমস্যা। ইংরেজি ভাষা পৃথিবীর একটি অতি শক্তিশালী ভাষা। তারই মধ্য দিয়ে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতুল ঐশ্বর্যকে পেয়েছি এবং আমাদের সুপ্ত চৈতন্যের নবজাগরণ ঘটেছে। আমরা তারই আলোয় চিনেছি জগৎকে এবং আমাদের নিজস্ব সত্তাকেও অনেকটা। কাজেই ভারতের বর্তমান সমস্যা দাঁড়াল—রাষ্ট্রভাষা, মাতৃভাষা ও ইংরেজি ভাষার। হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে এ রকম একটা ধারণা বহুদিন থেকেই চালু ছিল এবং এ পর্যন্ত তা স্বীকৃত হয়েছে। যদিও তার বিরুদ্ধে জনমতও আজ প্রবল হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন হিন্দী ভাষা অপরিণত। তার ব্যাকরণ জটিল। অথচ বাংলা ভাষা অনেক শক্তিশালী। বাংলা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলির মধ্যেও সাহিত্যের ঐশ্বর্যে তার স্থান আছে। কিন্তু হিন্দীর আছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ভারতবর্ষের চৌদ্দকোটি লোক হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে যদিও তাদের মধ্যে সকলের মাতৃভাষা হিন্দী নয়। এই প্রচলিত হিন্দীকে বলা হয় বাজার হিন্দী বা খাড়ী বোলী।

অথচ হিন্দী যদি সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক থেকে রাষ্ট্র ভাষা হয় তাহলে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, হিন্দীভাষীরা অনেক বেশী সুযোগ পাবেন। অথচ অ-হিন্দী ভাষীরা অনেক অসুবিধা ভোগ করবেন। কাজেই ইংরেজি রাখাই শ্রেয়। সত্যি সত্যি ইংরেজিকে এখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভারতের একটি প্রধান ভাষা-রূপে চালু করে রাখতে হবে। কারণ ভারতের কোন ভাষাই এত পরিণত হয়নি যাতে সমস্ত উচ্চশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। হিন্দী-ভাষা অত্যন্ত অপরিণত। বাংলা ভাষার সাহিত্য উন্নত। কিন্তু শুধু সৃজনধর্মী সাহিত্য নিয়েই ভাষা গঠিত হয় না। মননধর্মী সাহিত্য যাকে Literature of knowledge বলে তার বিকাশ না হলে ভাষা অপূর্ণ থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কোন ভারতীয় ভাষাতেই সম্ভব নয়। কাজেই ইংরেজি থাকবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়। কারণ আমাদের nation যখন আছে তখন national languageও চাই। কিন্তু সেটা কালের হাতে ভার দেওয়া যেতে পারে আপাতত। ভারতের চৌদ্দটি প্রধান ভাষাই ইতিমধ্যে পরিণতি লাভ করবে। তখন হয়ত সহজেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও শক্তিমত্তার দিক থেকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্ণয় করা শক্ত হবে না।

কবিতার ভবিষ্যৎ

মানুষের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম স্তরেই কবিতার জন্ম। পৃথিবীর সবদেশেই গদ্যের আগে জন্ম নিয়েছে কবিতা। তাই আমাদের দেশে বৈদিক ঋষিরা প্রথম কবিতাতেই বন্দনা করেছেন ভগবানের। গ্রীসে প্রথম সাহিত্য-রচিত হয়েছে আদিকবি হোমারের মুখে। যুগে যুগে কবিতা মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করেছে, আশাকে ভাষা দিয়েছে। কবিতায় মানুষ যুগে যুগে মানুষের প্রাণে এনে দিয়েছে জীবনের পরম প্রাপ্তির বাণী—জীবনকে ভালবাসাই জীবনের চরম কথা। জীবনের বিচিত্র রংএ পূর্ণ হয়ে উঠেছে কবির চিত্ত। তারই প্রকাশ কবিতায়। একদিন ক্রৌঞ্চবধূর বিলাপে ঋষির চিত্ত ব্যাকুল হয়ে অসীমের দিকে ধাবমান হয়েছিল; একটি পাখীর বিরহ-বেদনাকে তিনি নিখিল মানবের বেদনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারই মধ্যে থেকে জন্ম হয়েছিল কাব্যের। ব্যক্তির অনুভব যখন লৌকিক বন্ধনে

বন্দী না থাকিয়া অলৌকিকতার আলোকে মুক্তি পায় তখনই হয় সার্থক শিল্পের সৃষ্টি। আর সেই শিল্পবন্ধন যদি হয় শব্দে অর্থে ছন্দে তালে, তাহলেই তাকে বলি কবিতা।

কবিতা যেমন ব্যক্তির চিত্তের সহস্র আনন্দ-বেদনাকে মূর্তি দিয়েছে অপার বিস্ময়ে, সৌন্দর্যলোকে, তেমনই সে সমাজজীবনের সামনে এনে দিয়েছে জীবনের অলিখিত নীতির রূপ। চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ব্যাস বাল্মীকি-হোমার-সেক্সপীয়ার মানুষকে দেখিয়েছেন জীবনের নিয়ত-তরঙ্গিত ভীষণ-মধুর কুটিল-জটিল সুন্দর-কোমল দিকগুলি। তাঁরা দেখিয়েছেন লেলিহান লোভের জলন্ত শিখা, দেখিয়েছেন হিংসার ক্রূর-কুটিল সর্পিল-বঙ্কিম গতি, দেখিয়েছেন প্রেমের অনির্বাণ জ্যোতি, প্রেমিকের অবিস্মরণীয় ত্যাগ। মানুষের সামনে কবিরা সৃষ্টি করেছেন মানবিক আদর্শের এক বিশাল দিক। তাই শেলি বলেছিলেন যে, কবিরা হলেন পৃথিবীর যথার্থ, যদিও অস্বীকৃত, নিয়ম-প্রণেতা—Unknown legislators of the world.

ব্যাস-বাল্মীকি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, এবং তারপরেও মানুষের সেই কাব্যের সাধনা অবিরত চলেছে। সেই সাধনার মধ্যে অসংখ্য সাধক অগ্রণী। দেশে বিদেশে সর্বত্র। তবু মাঝে মাঝে কোন কোন মহলে ভয় দেখা দেয় যে, হয়ত কবিতা আর বেশীদিন বাঁচবে না। কারণ আজ কবিতা লোকে পড়ে না। কবিতার বই বিক্রি হয় না। মাসিক, সাপ্তাহিক কাগজে কবিতার অনাদর। অতএব লোকে আর কবিতা চায় না।

এই সঙ্গে মনে পড়ে মেকলের কথা। মেকলে বলেছিলেন যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক অহি নকুলের। যতই বিজ্ঞান উন্নত হবে, যতই যন্ত্র প্রসারিত হবে ততই কবিদের পক্ষে দুর্দিন। শেষ পর্যন্ত মানুষের সমস্ত অনুভূতিই যান্ত্রিক হয়ে যাবে। তখন কেউ আর কবিতা পড়বে না। কিন্তু এ সমস্ত যুক্তি বেশ ভালো করে বিচার করতে হবে। শুধুমাত্র শোনাই যথেষ্ট নয়।

মেকলের কথাটি ঠিক নয়। হয়ত বিজ্ঞানের প্রসারে মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সহজ ও স্বাভাবিক বিচ্ছেদ ঘটছে—কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, কবিতার অবলুপ্তি আসন্ন। কারণ কবিতার প্রাণ জীবন—শুধু প্রকৃতি নয়—কেবল ফলফুল পাখীর গান আর আকাশের আলো নয়।

মানুষের হৃদয়ের প্রতিমুহূর্তের উত্থান-পতন, তার জীবনচিন্তার গূঢ় ও গাঢ় অনুভূতিই কবিতার কেন্দ্রভূমি। কাজেই কবি চিরকাল কবিতা লিখবেন।

বিজ্ঞান উন্নত হবে, তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের সমস্ত চিন্তা যান্ত্রিক হয়ে উঠবে। তাহলে ত' সমগ্র সমাজেরই অপমৃত্যু। মানুষ যন্ত্রের প্রভু। যান্ত্রিকতা দিয়ে তার মন যদি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে তবে সামাজিক আত্মহত্যার দিকেই মানুষ এগিয়ে যাবে। কিন্তু সভ্যতাকে মানুষ কখনও এমন ধ্বংসের পথে দিয়ে যাবে না। মানুষ বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করবে বাইরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। কিন্তু তার মন থাকবে স্বাধীন। কবিতা সেই মন থেকে জন্ম নেবে। কবিতার প্রেরণা আসে মনের ভেতর থেকে, বাইরে থেকে নয়। বিজ্ঞান কিংবা উন্নত সমাজ-ব্যবস্থা হয়ত আমাদের জীবনের বাইরের দ্বন্দ্বগুলি থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে। হয়ত আর সামাজিক ব্যবধান থাকল না, ফলে তজ্জনিত দ্বন্দ্বের অবসান হল। কিন্তু মানুষের চরমদ্বন্দ্ব তার মনে। মনের সঙ্গে অন্য মনের। এক মনের সঙ্গে সমগ্র সমাজের মনের। এমন কি নিজের মনই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দ্বন্দ্ব সূচিত করে। সেখান থেকে কবিতার জন্ম হবে। অর্থাৎ কবিতার প্রেরণা চিরকালীন। কবিতা অমর।

কবিতার বড় লোকে পড়ে না তাই কবিতা মরে যাবে একথা ঠিক নয়। বিশুদ্ধ কবিতার পাঠক চিরদিনই কম। কিন্তু প্রতি মানুষের অন্তরেই কবিতা শোনার বৃত্তি আছে, বাসনা আছে। কারণ কবিতার অর্থটুকু যেমন অনেক কথা তেমন তার সুর, তার ছন্দ, তার দোলার মধ্যে যে আদিম যাদু আছে তা মানুষের প্রাণের কাছাকাছি। আর তার অর্থাতীত ব্যঞ্জনা মানুষকে অকারণ আনন্দে পরিপ্লুত করে। মানুষের শিক্ষা যতই সম্পূর্ণ হবে, যতই উন্নত হবে, ততই সে কবিতার মধ্যে আনন্দ পাবে। কারণ কবিতা মানুষের জীবনে প্রয়োজন—ধর্মের মত, প্রেমের মত। মানুষ শুধু অন্নে বাঁচে না। তাই তার শিল্পক্ষুধা। সেই ক্ষুধার পরম নিবৃত্তি কবিতায়। যুগে যুগে একদল মানুষের মনে এই ভয় এসেছে যে, কবিতার অবসান হবে, যুগে যুগে কবিরা তার উত্তর দিয়েছেন—প্রতি বসন্তেই বনভূমি রক্তপুষ্পে ভরে ওঠে—কবিরা ঘোষণা করেন—The Poetry of the Earth is never dead.

ভারতীয় সিপাহী অভ্যুত্থানের শতবার্ষিকী

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে লর্ড ক্লাইভ যে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করল, তা ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্ব। এর পর বৃটিশ শাসকবর্গ কতকটা সৈন্যদের শৌর্যবলে এবং প্রধানত তাদের শক্তিশালী কূটনৈতিক চাল প্রয়োগ করে অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিকার করে ফেলল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্তটাই আপনাদের কুক্ষিগত করে। এই সময় ভারতের তৎকালীন সামন্তমণ্ডলী বৃটিশ শক্তির সর্বগ্রাসী ক্ষুধা উপলব্ধি করতে পারে। বিদেশী জাতির কঠোর শাসনে জনগণও উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। সামন্ত সম্প্রদায় আর জনগণের অসন্তোষ একবার বাস্তব রূপ ধারণ করে—এই বাস্তব রূপটি সিপাহী বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহ-প্রসঙ্গে শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেছেন, "ভারতের এই সামন্ত সম্প্রদায় ইংরেজের রাজ্য-বিস্তার-প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্যে একবার চরম প্রয়াস করে। বিদেশীর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে। একেই বলা হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহ। তখন দেশের সর্বত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে নিদারুণ অসন্তোষ পুঞ্জীভূত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল টাকা রোজগার; একদিকে তাদের শোষণ-নীতি, অন্যদিকে অধিকাংশ ইংরেজ কর্মচারীর ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অর্থলিপ্সা—এই দুয়ের সংমিশ্রণে একটি শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এমন কি ভারতস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদলের মধ্যেও একটা তিক্ততা ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে ও ছোটোখাটো অনেকগুলি সেনাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সামন্ত রাজন্য ও তাঁদের বংশধরদের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা সামরিক বিদ্রোহ তো ছিলই। এইভাবে একটা বিরাট রাজদ্রোহ সকলের অলক্ষ্যে তলায় তলায় রূপায়িত হতে থাকে। এই বিদ্রোহের আগুন সবচেয়ে দ্রুত বিস্তারলাভ করে যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে। অথচ ভারতবাসীরা কী করে, কী ভাবে, এসব বিষয়ে ব্রিটিশ মহাপ্রভুরা এমনি উদাসীন ছিলেন যে, তলায় তলায় এমন একটা বৃহৎ ব্যাপার যে সংঘটিত হচ্ছে তা সরকার বাহাদুর ঘুণাক্ষরেও টের পান নি। ভারতের সর্বত্র যাতে একসঙ্গে

একই দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা হয়, তার জন্যে একটি বিশেষ তারিখও নির্দেশ করে দেওয়া হয়। অধৈর্যবশত মীরাটের একদল ভারতীয় সৈন্য যথানির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই ১৮৫৭ সালের ১০ই মে তারিখে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই অকাল অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় লোকদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ও তাঁদের কার্যসূচীতে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে, সরকারও সাবধান হবার সুযোগ পান। সে যাই হোক, বিদ্রোহ অতি সত্বর যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লীতে এবং মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিস্তৃত হয়। এটাকে কেবল সেনাবিদ্রোহ বললে ভুল বলা হবে, এ বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযান। মোগলবংশের শেষ নৃপতি বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌কে কেউ কেউ সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন, ঘৃণিত বিদেশীর কবল থেকে মুক্তিসংগ্রামের রূপ নিল এই সেনাবিদ্রোহ। কিন্তু এই স্বরাজ-সাধনার মূলে ছিল স্বৈরতন্ত্রী সম্রাটকে পুরোভাগে রেখে সামন্ত-শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। জনসাধারণের স্বরাজ লাভ এই বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য যদিচ ছিল না, তবু কাতারে কাতারে বিদেশী-বিতাড়ন-যজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। এর কারণ ছিল মূলত দুটি—জনসাধারণ বুঝতে পেরেছিল, তাদের দুঃখ-দুর্গতির মূলে হল ইংরেজশাসন; দ্বিতীয়ত, ভারতের নানাস্থানে জমিদারদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। এ ছাড়া ছিল বিধর্মী-ধ্বংসের জন্য একটা স্বাভাবিক প্ররোচনা। এর ফলে দেখি যে, হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে যোগদান করেছিল এই জনযুদ্ধে।" [বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ]

এই গণ-অভ্যুত্থান নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছিল। ইংরেজের শৌর্য-বীর্যের চেয়ে সংগঠনের শক্তি আর কূটনীতিই তাদের বিজয়ের গৌরব দিয়েছিল। উপযুক্ত নেতা আর সংগঠন-শক্তির অভাবে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই প্রথম বিদ্রোহ সার্থক হতে পারে নি।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করবার পর ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্যাদা দিয়ে এই সিপাহী-অভ্যুত্থানের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় বিদ্রোহকে প্রকৃত মুক্তি-সংগ্রাম বলা চলে কি না সে বিষয়ে একটা বিতর্কও হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এটিকে ভারতের বিভিন্ন সামন্তমণ্ডলীর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটা আক্রোশমূলক অভিযানমাত্র বলেন। তাঁহাদের মতে, তখনও ভারতের

জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় নি—সুতরাং একটা বিদেশী রাজশক্তি কীভাবে ধীরে ধীরে এই বিরাট দেশকে গ্রাস করছে তা অনুভব করবার মতো শক্তি তখন জনসাধারণের ছিল না। নানা কারণে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠায় অনেক সিপাহী বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল—সেই সময় নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপী প্রভৃতি নেতা ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করায় সিপাহীরা ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপ করেছে—একটা অরাজক অবস্থায় তারা ইংরেজদের উপর উৎপীড়ন করেছে। কিন্তু তখন দেশাত্মবোধ এদেশে অস্ফুটভাবেও জাগ্রত হয় নি—সামন্ত-অধিনায়কদের মধ্যে একটা উগ্র স্বাধীনতা-প্রেম ছিল এইমাত্র।

স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হবার পর ভারতবাসীর অন্তরে অবশ্য এই ধরণের সূক্ষ্ম বিচার স্থান পায় নি—যে বৃটিশরাজ তার শাসনের চাপে সারা দেশকে নিষ্পেষিত করছিল তার বিরুদ্ধে অগণিত সিপাহীর অস্ত্রধারণকে সে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান বলেই গ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্ত-প্রমুখ সমসাময়িক লেখকদের রচনায় সিপাহী বিদ্রোহ একটা অবাঞ্ছিত বিপৎপাত বলে মনে হলেও পরবর্তীকালে এই সিপাহী বিদ্রোহ স্বদেশপ্রেমিকদের প্রেরণা দিয়েছে। এই বিদ্রোহের অন্যতম নায়িকা ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কথা স্মরণ করে নেতাজী তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নারীবাহিনীর নাম 'ঝাঁসির রাণীবাহিনী' রেখেছিলেন।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সেই প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের শতবার্ষিকী শ্রদ্ধার সঙ্গে, উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়েছে। ভারতবাসীরা প্রধানত শান্তিকামী—কিন্তু বীরপূজায় ভারতবাসী কোনো দিন পশ্চাৎপদ হয় নি। কলিকাতা, মীরাট, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নানা স্থানে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। শতবর্ষ আগে যে বীর সিপাহীর দল সচেতনভাবে হোক, অচেতনভাবে হোক ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল, ব্রিটিশের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও অবশেষে বিপর্যস্ত হয়েছিল, আজকের দিনে ব্রিটিশের শাসনযন্ত্র থেকে মুক্ত ভারতবাসী সেই প্রথম শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি সমর্পণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কূট ভেদনীতির ফলে হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ প্রবলতর হতে হতে পাকিস্তানের উদ্ভব হয়েছে।

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময় কেউ মনে রাখেনি সিপাহীরা হিন্দু ছিল না মুসলমান ছিল, যাঁরা সে সময় নেতৃত্ব করেছিলেন, তাঁরা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে বীরের, শহীদের কোনো জাত নেই। সেইজন্য সিপাহী বিদ্রোহে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন—প্রথম বলি মঙ্গল পাণ্ডে বা তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব বা লক্ষ্মীবাই—সকলে ভারতবাসীর সমান শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। সে যুগের প্রখ্যাত বা অজ্ঞাতনামা শহীদদের কথা স্মরণ করে আজও ভারতবাসীদের চিত্ত গর্বে ভরে যায়। শতবর্ষ পরের ভারতবাসী শতবর্ষ পূর্বের বীর সেনানী ও বীর সিপাহীদের উদ্দেশে প্রণতি জানায়।

গ্রহান্তর যাত্রা

মানুষ যখন হইতে আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই মহাশূন্যে উধাও হইবার কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য গ্রহে যাইবার ইচ্ছা তাহার মনে জাগিয়াছে। কল্পনাপ্রবণ সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিকরা চন্দ্রে ও শুক্র বা মঙ্গল গ্রহে যাত্রার কাহিনীও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি উর্বরমস্তিষ্ক লেখকের উদ্ভট কল্পনা বলিয়াই গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ সত্য সত্যই গ্রহান্তরে যাত্রার জন্য মাত্র গত কুড়ি-পাঁচশ বৎসর ধরিয়া নানারূপ পরিকল্পনা করিতেছেন এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বৈজ্ঞানিকগণ স্পুৎনিক নামক যে কৃত্রিম উপগ্রহ-দ্বয় আকাশে নিক্ষেপ করিয়া ঐ দুইটিকে চন্দ্রের মতো নির্দিষ্ট অক্ষপথে ঘুরাইয়াছেন, ইহাতে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করিবার কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বলিয়া অনেকে আশা করেন।

বর্তমানে আকাশপথে উড়িবার জন্য বিমানপোতই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিমানপোত বাতাস না থাকিলে উড়িতে পারে না। ভূ-পৃষ্ঠের একশত মাইল উপরে বায়ুস্তরের চাপ ও ঘনত্ব এত কম যে, সেখানে যাওয়া বর্তমানের বিমানপোতের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার—দেড়শত মাইল উপরে তো বায়ুস্তর নাই-ই। সেই বায়ুশূন্য মহাশূন্যে বিচরণ করিবার উপযোগী কোনো যন্ত্রের কল্পনা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এখনও করিতে পারেন নাই।

আমরা সকলেই রকেট বা হাউই দেখিয়াছি। কালীপূজার রাত্রে যে হাউই নিক্ষেপ করা হয় তাহা বড়ো জোর একশত ফুট পর্যন্ত উঠিয়া থাকে।

স্পুৎনিক নিক্ষেপ করিবার সময় একটি বিরাট হাউইয়ের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। ভূ-পৃষ্ঠে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাইয়া তাহার বেগে হাউই-সমেত কৃত্রিম গ্রহটিকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে উহাকে পৃথিবীর চারিদিকে নির্দিষ্ট বেগে পরিভ্রমণশীল করা হইয়াছে। অধিকতর বেগে কোনো রকেট নিক্ষেপ করিলে তাহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন। তাহা হইলে অন্য গ্রহে যাত্রা করা হয়তো অসম্ভব হইবে না। তবে যদি নিক্ষিপ্ত রকেটটির গতি নিয়ন্ত্রণ করিবার কোনো ব্যবস্থা না থাকে বা উহাকে অন্য গ্রহে অবতরণ করাইবার বা পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিবার কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে সকলই পণ্ডশ্রম হইবে।

মহাশূন্যে যাওয়ার জন্য বাহনের সমস্যা মিটিলেও আরও অনেক সমস্যা থাকিয়া যায়। শূন্যে কোথাও বায়ু নাই—অন্য কোনো গ্রহেও বায়ু আছে বলিয়া জানা যায় না। সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য চালাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু সঙ্গে লইতে হইবে। বায়ুমণ্ডল না থাকায় বায়ুর চাপও থাকিবে না—অথচ মানুষের শরীরে যে বায়ু আছে তাহার চাপ অব্যাহত থাকিবে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ বায়ুর চাপে মানুষের দেহ ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে। সেজন্য শরীরের উপর কৃত্রিম চাপের সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ধাতব বর্ম নির্মাণ করিয়া তাহা দিয়া দেহকে আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত বলিয়া বায়ুমণ্ডলের যে উত্তাপ আছে তাহা মহাশূন্যে থাকিবে না—সুতরাং উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমা ছাড়াইয়া গেলে চলাফেরা হইতে সুরু করিয়া সব কাজই দুঃসাধ্য হইবে। বিমানের মধ্যে অবস্থান কালে চলিবার সময় পা তোলা সহজ হইবে না—পা একবার তুলিলে তাহা আবার নামানো প্রায় অসাধ্য হইবে—কারণ নিচের দিকে তো আকর্ষণ-শক্তি থাকিবে না। এ জন্য কেহ কেহ বিমানের মেঝেতে চৌম্বক শক্তি প্রয়োগ করিয়া লোহার জুতার পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সব সমস্যার সমাধান হইবে না। এক গ্লাস জল মুখের কাছে ধরিয়া গ্লাসটি উপুড় করিয়া দিলেও তাহা হইতে বিন্দুমাত্র জল পড়িবে না—নল দিয়া জল চুষিয়া খাইতে হইবে।

অন্য কোনো গ্রহ মানুষের অবতরণযোগ্য হইবে কি না সে বিষয়ে কিছু নির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই। তবে বৈজ্ঞানিকরা আশা করেন যে, মঙ্গল গ্রহ বা শুক্র গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থা পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থার কাছাকাছি হইবে। —বৈজ্ঞানিকরা যাহা বলেন অতি উৎসাহী কল্পনা-বিলাসীরা তাহা শতগুণ বাড়াইয়া দেখেন। স্পুৎনিক নিক্ষিপ্ত হইবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে জমি ক্রয়ের ইচ্ছা সম্পর্কে নানাপ্রকার সংবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর জীবনযাত্রায় বিতৃষ্ণ হইয়া গ্রহান্তরে যাইবার বাসনা পোষণ করে এমন লোকেরও নাকি অভাব নাই। বাস্তবিক পক্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে অবলম্বন করিয়া যখন একটা হুজুগ পড়িয়া যায়, তখন সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতার প্রশ্নটা যেন অবান্তর হইয়া ওঠে।

কর্মী ও মনীষী—কে বড়ো

পৃথিবীতে কাজের প্রয়োজন যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজ না করিলে কেহ এই পৃথিবীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না। যে নিরতিশয় অলস, তাহাকেও কিছু কিছু কাজ করিতে হয়।

কিন্তু কর্মী বলিলে আমরা এমন একজন লোককে বুঝি যিনি অক্লান্তভাবে কর্মের সাধনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে করিবার মতো কাজের অভাব নাই—চারিদিকে অসংখ্য কাজ পড়িয়া আছে। নিছক ব্যক্তিগত আর্থিক বা অন্যপ্রকার উন্নতির জন্য ছাড়াও আরও অনেক কাজ পৃথিবীতে আছে—সেগুলিকে সাধারণভাবে মঙ্গল-কর্ম বলা যাইতে পারে। দেশের মধ্যে এমন অনেক পুরুষ আছেন যাঁহারা সমাজের মঙ্গলসাধন-কর্মে আপনাদিগকে উৎসর্গ করেন। পল্লী-সংস্কার, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা বা বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন, চিকিৎসাগার-প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থাগার-স্থাপন, ব্যায়ামাগার বা ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, দুর্ভিক্ষ বা বন্যার সময় ত্রাণকার্য, নিরক্ষরতা-দূরীকরণ অভিযান—কর্মী বহুদিকে আপনার কর্মধারাকে প্রসারিত করিয়া দেন। 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'—এই পৃথিবীতে কাজ করিয়া শত বর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে—ঈশোপনিষদের এই শ্লোকাংশটি অনুসরণ করিয়াই যেন তাঁহারা কর্মব্রতে দীক্ষিত হন।

আর একদল মানুষ আছেন, যাঁহারা কর্মযজ্ঞে আপনাদের উৎসর্গ করিতে পারেন নাই, কিন্তু আপনাদের মনস্বিতার দ্বারা মানুষকে পথের নির্দেশ দিয়াছেন। ইঁহারা মনীষী—ইঁহাদের চিন্তাশক্তি এত গভীর ও সুবিস্তৃত যে, ইঁহারা মানুষের পক্ষে কোন্‌টি ভালো, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি করা উচিত, কোন্‌টি করা অনুচিত তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। মধ্যে মধ্যে মানুষ যখন সুকঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, তখন এই মনীষীরাই আপনাদের চিন্তাশক্তি দ্বারা মানুষকে সত্যপথের সন্ধান দেন। কর্মশক্তি কর্মীর অবলম্বন, জ্ঞানশক্তি মনীষীকে প্রেরণা দান করে।

যাঁহারা কর্মী তাঁহারা অনেক সময় মনীষীদের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে ব্যক্তি কাজ করে না সেই কেবল আপনাদের অলসতাকে ঢাকিবার জন্য জ্ঞানের কথা বলিয়া থাকে। কর্মের পথেই মঙ্গলসাধন করা যায়, জ্ঞানের কথা প্রচুর পরিমাণে বলিলেও তাহাতে বিন্দুমাত্র উপকার সাধিত হয় না। হাজার হাজার উপদেশ দিয়া যাহা করা যায় না, কিছুক্ষণ পরিশ্রম করিলে তাহা করা যাইতে পারে। এইভাবে মানুষকে কর্মজীবী ও বুদ্ধিজীবী—এই দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করার একটা প্রয়াসও দেখা গিয়াছে।

যাঁহারা মনীষী, তাঁহারাও জ্ঞানশূন্য কর্মাচরণের দোষ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কী করা উচিত, কী করিলে ভালো হয়, কোন্ কাজের কী পরিণাম তাহা না জানিয়া কেবল কাজ করিয়া গেলেই মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে অনেক কাজ ভালো বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা পরিণামে হানিকর হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং কাজ করিতে হইলে জ্ঞানিজনের নির্দেশ বা উপদেশ লওয়া কর্তব্য। তাহা ছাড়া মানুষ যন্ত্র নয় যে, সে জ্ঞানবৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল কাজই করিয়া চলিবে।

বাস্তবিকপক্ষে কর্মী ও মনীষী উভয়েরই প্রয়োজন আছে। সকলেই কর্ম করিলে জ্ঞানদৃষ্টির অভাবে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। আবার সকলেই মনীষী সাজিয়া বসিলে চলে না। কর্মী ও মনীষী এই দুইয়ের মধ্যে কাহার প্রয়োজন বেশী বা কে বড়ো সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। তবে এই পৃথিবীতে কর্মীর সংখ্যাই বেশী—মনীষীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। বস্তুত কর্মে সকলেরই অধিকার, জ্ঞানে অধিকার সকলের নাই। কিন্তু কর্মী ও মনীষী এই

দুইজনের মধ্যে কে কতটা পরিমাণে এই জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া উভয়ের পারস্পরিক উৎকর্ষ বিচার অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রত্যেককেই কল্যাণ-কর্মের দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে—শ্রীনিকেতনের কর্মশালা, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী তাঁহার সেই কর্মব্রতের দৃষ্টান্ত। মহাত্মা গান্ধী প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কায়িক শ্রম করিবার নির্দেশ দিয়াছেন—তাঁহার কর্মময় জীবন তাঁহার বাণীরই প্রতিচ্ছবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজীকে আমরা কর্মী বলিয়াই শ্রদ্ধা করি না—তাঁহারা আমাদের কাছে তাঁহাদের অতুলনীয় মনীষার জন্যই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। বস্তুত যাঁহারা মহামানব তাঁহাদের মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান এই দুইটির মিলন সাধিত হয়—এই মিলন-সাধনের মূলে রহিয়াছে প্রেম। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনীষী তাঁহারা জগতের প্রতি গভীর প্রেমের বশবর্তী হইয়া কর্মের মধ্য দিয়া আপনাদের জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করিতে চাহেন। কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ই প্রাচীন ভারতীয় সাধনার বাণী।

আধুনিক যুদ্ধের ভয়াবহতা

এককালে যুদ্ধ হ'ত একটা নির্দিষ্ট দিনে। দুপক্ষ সেজেগুজে সৈন্যসামন্ত নিয়ে, তাঁবু ফেলে রাত কাটিয়ে একটা মাঠে এসে অপেক্ষা করত। তারপর দুপক্ষের সেনাপতিরা আলোচনা করে যুদ্ধ আরম্ভ করত। যে তরবারী চালায় তার সংগে তরবারী যুদ্ধ হ'ত। যে গদা চালায় তার সংগে গদা। স্ত্রীলোক হ'লে তার সংগে পুরুষ যুদ্ধ করত না। যুদ্ধ করতে করতে অসুস্থ হ'লে বীরপুরুষরা তার গায়ে হাত তুলত না। লড়তে লড়তে তরবারী ভেঙে গেলে যতক্ষণ না সে অন্য তরবারী পায় ততক্ষণ কেউ তার সংগে লড়ত না। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে ক্লান্ত হ'লে শিঙা বাজত। সবাই তখন ক্লান্ত দেহে যে যার শিবিরে ফিরে যেত। খেয়ে দেয়ে সবাই ঘুমোতো। পরের দিন সকাল বেলায় উঠে আবার যুদ্ধের জন্য তৈরি হ'ত। এই যুদ্ধ আবদ্ধ ছিল দুটো রাজার মধ্যে। একটা মাঠের মধ্যে। কয়েকটা দিনের মধ্যে। ভারতবর্ষের প্রাচীনকালে সবচেয়ে বড় যুদ্ধই আঠারো দিনের। যুদ্ধে সাধারণ মানুষের কোন ক্ষয়ক্ষতিই হ'ত না। ফাঁকা মাঠে কি নদীর ধারে শিবির ফেলে যুদ্ধ হ'ত। সাধারণ মানুষ আপন মনে বসে থাকত।

প্রাচীনকাল ছেড়ে দিলাম। ধরা যাক পলাশীর যুদ্ধ। এই সেদিনের কথা। ঐতিহাসিকরা বলেছেন যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সূর্য গঙ্গায় ডুবছে তখন পরপারে চাষীরা ঠিকই গরু চালাচ্ছিল অর্থাৎ সাধারণ মানুষের তাতে কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ আর সেই রূপ নিয়ে আসে না। তার চেহারা গেছে পালটে।

আজ জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র তার অভিযান। ফলে কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। যুদ্ধের কোন নিয়ম নেই। বিমান থেকে বোমা ফেলে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে সমগ্র নগর। তার সুস্থ, শান্ত, গৃহজীবন-পরিতৃপ্ত মানুষেরা হয়ত তখন নিদ্রাচ্ছন্ন—হয়ত তখন শিশুপুত্র কোলে নিয়ে জননী ঘুমে মগ্ন, হয়ত ভাইবোন গলা জড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে, হয়ত নীরব রাত্রিতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রুগ্ন বৃদ্ধা লেপটা টেনে নিচ্ছে, তখন একটি মৃত্যুবাণ ছেড়ে দেওয়া হ'ল বিমান থেকে। একটা প্রবল শব্দ আর বিস্ফোরণ। তারপর বাড়ীটা ধূলিসাৎ। কয়েকটা আর্তনাদ। কতকগুলি ধুলোবালি চাপা মৃত শিশু-যুবা-বৃদ্ধা।

হয়ত বোমা পড়ল একটা পাঠাগারের ওপর। পুড়ে ছাই হোল মানুষের সহস্র বৎসরের সাধনা, পরিশ্রমের ঐশ্বর্য। মানুষের চিন্তা আর পরিশ্রমের ফলে হয়ত হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছিল একটি গ্রন্থাগার। একদিন অকস্মাৎ তার ওপর নেমে এল কালবজ্র। আর শতাব্দীর পূর্ণ ফসল ভস্মরেখায় আপন সমাপ্তি চিহ্ন এঁকে গেল।

হয়ত বোমা পড়ল একটি সুন্দর নগরীর ওপর। সেখানে মানুষের শতশত বৎসরের কর্ম ও স্বপ্নে কত সৌধমালা রচিত হয়েছে, কত সেতু, কত পথ নির্মিত হয়েছে। প্লেনে মুহূর্তের মধ্যে আকাশ থেকে নেমে এল অস্ত্র। এমনই করে কত নগর বিধ্বংস হয়ে গেছে। জার্মানীর শহর। ইটালির শহর। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ডের শহর সব ধ্বংস হয়েছে এইভাবে।

পরপর দুটি মহাযুদ্ধ মানুষের জীবনে এনেছে নানা ভয়াবহ সর্বনাশ। একদিন ছিল বন্দুকের গুলিতে, গোলার ধোঁয়ায় দিগন্ত আচ্ছন্ন করে দেওয়া। তারপর বেরুল ট্যাঙ্ক, টর্পেডো, জাহাজ ডোবানোর জন্য সাবমেরিন। আবার সাবমেরিন মারবার জন্য টর্পেডো। তারপর ব্রেনগান, স্টেনগান, মেসিনগান। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আনল ভয়াবহতম অস্ত্র। সে হ'ল আনবিক বোমা।

আমেরিকা যেদিন আনবিক বোমা ফেলল জাপানের ওপর, নাগাসাকি ও হিরোসিমা দুটি শহর শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল। শুধু যে শত সহস্র মানুষের রক্তে, আর্তনাদে, দীর্ঘশ্বাসে দিগন্ত ভরে গিয়েছিল তাই নয়, শত সহস্র বিকলাঙ্গ মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণায় পূর্ণ হয়েছিল আকাশ-বাতাস। কারো হয়েছিল দুরারোগ্য ব্যাধি। কারো মাথার চুল উঠে যেতে লাগল, কারো বিভিন্ন শারীরিক পীড়ায় মৃত্যু হ'ল। এই বোমার ফলে মানুষের জীবনে ব্যাধি এক পুরুষেই শেষ নয়—চলবে জন্মজন্মান্তর ধরে। অর্থাৎ পুরুষানুক্রমিকভাবে রোগ ছড়িয়ে যাবে। এইভাবে মানুষের সভ্যতা, সমাজ সমস্ত যাবে মহাশ্মশানের শূন্যতার দিকে।

অথচ সাধারণ মানুষ কোনদিন যুদ্ধ চায়নি। কেন যুদ্ধ হয় তারা তাও জানে না। ফরাসীদেশের সৈন্য তবু জার্মানীর সৈন্যদের গুলি করে মারে—কারো সঙ্গে কারো কোন শত্রুতা নেই। তবুও প্রতাপমত্ত রাষ্ট্রপতিদের হাতের মুঠোয় মানুষের জীবন। মানুষের সংখ্যা চাই। কামানের খাদ্য হয়ে তারা চলেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ যৌবনের অপচয় দেখে সেদিন এক তরুণ কবি লিখেছেন—

Their senses in some scorching cautery of battle
Now long since ironed
Can laugh among the dying, unconcerned

সৈন্যদের সমস্ত চেতনাকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়। পশু করে দেওয়া হয়। তাই যুদ্ধের সময় মানুষের জীবনের সমস্ত আদর্শবাদ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। যুদ্ধশেষে বিকলাঙ্গ পুরুষেরা ফিরে আসে অসংখ্য রোগ নিয়ে, শক্তিহীন হ'য়ে। নারী-পুরুষের হাহাকারে আদর্শহীন শূন্যগর্ভ সমাজ গুমরে গুমরে কাঁদে।

আজ জীবাণু-যুদ্ধও সম্ভব। আকাশ থেকে রোগের ব্যাক্‌টিরিয়া ছড়িয়ে মানুষকে নৃশংসভাবে মারার কৌশল আজ মানুষের হাতে। হাইড্রোজেন বোমায় বড় বড় শহর, দেশ মুহূর্তে বিধ্বংস হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে সমস্ত তরুণেরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন লিখেছেন যে, আমরা বলি শিশুহত্যা পাপ কিন্তু কই এত সহস্র মানুষকে মেরে ত আমাদের পাপ হয় নি—

Killing children is a crime but killing grown-ups is a prerogative of national honour.

যুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে মানুষের শেষগর্ব—তার মনুষ্যত্ব। আর ব্যর্থ মনুষ্যত্ব শক্তিহীন দুটি হাতে আকাশে অসহায় মুষ্টি তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

সুবিধাবাদ

পৃথিবীতে একদল মানুষ আছে যারা নিজেদের আদর্শের জন্য জীবনকে তুচ্ছ মনে করে। সেই সমস্ত আদর্শবাদী মহাপুরুষ দেশ ও দশের জন্য নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ-দুঃখে আগুন জ্বেলে সংগ্রাম করে। তাঁরাই ইতিহাসের নায়ক। কিন্তু আরো একদল মানুষ আছে তারা ঠিক উল্টো। আদর্শবাদকে তারা কখন স্থির মনে করে না। নিঃসঙ্গ ধ্রুবতারার মত জীবনাদর্শের দিকে ইঙ্গিত করা তাদের ধর্ম নয়। তাদের কাছে বড় কথা স্বার্থ। তাই তারা সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে পরলোকের কথা, পাপপুণ্যের গভীর সমস্যা, জীবনমৃত্যুর গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে আলোচনা করে। আবার একদিন যখন সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরলোক-চর্চায় নিজের স্বার্থ যথেষ্ট পুষ্ট হয় না, তখন হয়ত শঠ-প্রবঞ্চকদের দলে ভিড়ে পড়ে। তখন মানুষকে প্রবঞ্চনা, অবমাননাই চরম ধর্ম বলে গ্রহণ করতে তারা নিতান্ত কুণ্ঠিত হয় না। তাদের বলা চলে সুবিধাবাদী।

ইতিহাসে এই রকম সুবিধাবাদীর সংখ্যা প্রচুর। ঘরে ঘরে। সমাজে সমাজে এই রকম লোকের সঙ্গে প্রতি মানুষের পরিচয় আছে। তাদের জীবনে কোন আদর্শ নেই। স্বার্থের প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত লাভের আশায় জীবনে যে-কোন পন্থাকে সুবিধামত গ্রহণ করাই সুবিধাবাদ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, একদিন যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষ, যখন সমগ্র জাতি মর্মে মর্মে পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করেছে তখন একদল মানুষ আপন স্বার্থে, উন্নতির আশায় ইংরেজের তাঁবেদারি করেছে। আবার যখন দেখা গেল, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ইংরেজকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হ'ল তখন সেই সমস্ত ইংরেজভক্ত মানুষ রাতারাতি স্বদেশভক্ত হয়ে উঠল। কারণ তখন তাদের লক্ষ্য—অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি। ইতিহাসে দেখা গেছে যে, যে মানুষ একদিন হয়ত একটি আদর্শকে বিশ্বাস করেছে, সে আবার

কাল অন্য আদর্শকে গ্রহণ করেছে। মানুষের মনের বা চিন্তার পরিণতিগত পরিবর্তন অন্য জিনিষ। এই যে নিত্য পরিবর্তন, এর ধারা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, কোন আদর্শের প্রতি অনুরাগ নেই। নেই বলেই অবহেলায় তাকে একদিন ঠেলে ফেলে চলে যাওয়া যায়। রাজনৈতিক অনেক নেতা আছেন—যাঁরা দেশকে ভালোবাসার ভান করেন, সমাজ-সেবা করার অছিলা খোঁজেন। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা। গাড়ি-বাড়ির স্বপ্নে তাঁরা বিভোর; তাই একদিন পার্কে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে যিনি একদলের পক্ষে বক্তৃতা দিলেন, তিনি অন্যদিন অন্য জায়গায় কেন সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিপক্ষ পক্ষের স্তুতি গাইলেন। ব্রাউনিং একদিন ওয়ার্ডসোয়ার্থকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন যে, তিনি টাকার লোভে রাজকীয়তাকে বরণ করেছেন। একদিন বায়রণ কবি সাদিকে ব্যঙ্গ করেছিলেন তাঁর সুবিধাবাদী আচরণের জন্য।

তাই সুবিধাবাদ নিন্দিত। কারণ তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তা আদর্শভ্রষ্ট। প্রত্যেকেই জীবনে এই রকম মানুষের সংস্পর্শে এসেছে। আজ যিনি পরম কংগ্রেসভক্ত, হয়ত কালই কোন স্বার্থের প্রয়োজনে তিনি অন্য দলভুক্ত। আজ যিনি আদর্শগত কারণে সাম্যবাদী, হয়ত কালই তিনি যশগত কারণে পুঁজিবাদী। মানুষ মনে মনে একটি আদর্শকে গ্রহণ করে—কিন্তু সেই আদর্শকে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ জীবনে লোভের গূঢ়ফণা, হিংসার ক্রূরতা সর্বদা পথে পথে। তাই মানুষ নিজেকে সব সময় একটি দর্শনের সাহায্যে রক্ষা করে। চুরি করার পিছনে চোরও একটি philosophy আবিষ্কার করতে পারে। সুবিধাবাদীও সেই রকম দর্শন তৈরি করতে পারে। কিন্তু তাতে তার আদর্শভ্রষ্ট ব্যক্তিস্বার্থলোলুপ চিত্তকে অন্তরাল করা অসম্ভব। শুধু যে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই জিনিষ লক্ষ্য করা যায় তা নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই একটি মহান বাদের লীলা। বঙ্কিমচন্দ্র নব্য বাঙালিকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন যে, যিনি পিতার কাছে হিন্দু, কেশববাবুর কাছে ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব ভিক্ষুর কাছে নাস্তিক, তিনিই বাবু। একথাটি সুবিধাবাদীর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যিনি ধার্মিকের কাছে ধর্মজিজ্ঞাসু, যিনি মার্কসবাদীর কাছে মার্কসভক্ত, যিনি কংগ্রেসের নিকট তার সভ্যপদপ্রার্থী, তিনিই সুবিধাবাদী। চিরকাল ধরে এই একটি বাদ বেঁচে আছে। বহু আদর্শ জন্মায়। মরে।

কিন্তু সুবিধাবাদ চিরঞ্জীব। বিভীষণের মত অমর। সুবিধাবাদ বলতে পারে,
Man may come and man may go, but I go on for ever.

অর্থপুস্তক পাঠ করা কি ক্ষতিকর ?

কোনো একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের অর্থপুস্তকে দেখা গিয়াছিল যে 'বৃষ্টি' শব্দটির অর্থ 'আকাশ হইতে নির্গত জলধারা।'—শব্দার্থটি অনিন্দনীয় না হইলেও মোটামুটি রকমের ভাব-প্রকাশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যে সব শিশুর জন্য ঐ অর্থটি বলা হইয়াছিল তাহাদের জ্ঞানের পক্ষে উহা কিছুমাত্র সহায়ক হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই অর্থপুস্তকের বিরোধী—কেহ কেহ আইন করিয়া অর্থপুস্তক প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাবও করেন। তাঁহারা বলেন যে, অর্থপুস্তকের বহুল প্রচারের ফলে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নের গভীরতা কমিয়া আসিতেছে। যখন কোনো অর্থপুস্তক ছিল না তখন কোনো একটি শব্দের অর্থ জানিবার জন্য তাহাকে অভিধান দেখিতে হইত। অভিধান দেখিয়া শব্দের বিশেষ অর্থটি বাছিয়া লওয়ায় তাহা তাহার মনে গাঁথিয়া যাইত। অধীত বিষয়ের কোনো অংশ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় তাহারা শিক্ষক বা অধ্যাপকের নিকট জানিয়া লইত—শিক্ষক বা অধ্যাপকই জ্ঞানের একমাত্র পথপ্রদর্শক হওয়ায় তাহারা সশ্রদ্ধচিত্তে ও মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কথা শুনিত এবং তাহা মনে রাখিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিত। এখন অর্থপুস্তক খুলিলেই কোনো শব্দের অর্থ বিনা আয়াসে পাওয়া যায়; যে কোনো কঠিন অংশের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ বা আনুষঙ্গিক টীকা বা টিপ্পনী অর্থপুস্তক হইতেই পাওয়া যায়—তাহার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আদৌ পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু যাহা তাহারা হেলায় ফেলায় পায় তাহার প্রতি তাহাদের মনোযোগ গভীর হয় না। ফলে তাহারা যাহা পাঠ করে তাহা তাহাদের অধিগত হয় না; অধীত বিষয় সম্পর্কে একটা ভাসাভাসা জ্ঞান হয় এই মাত্র।

অর্থপুস্তক সম্পর্কে সব চেয়ে মারাত্মক অভিযোগ এই যে, ইহা ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুখস্থ করিতে প্ররোচিত করে। পরীক্ষার জন্য আদর্শ প্রশ্নোত্তর, সারাংশ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি যে সব বিষয় অর্থপুস্তকে সন্নিবেশ করা হয়,

ছাত্রছাত্রীরা প্রায়ই সেগুলি মুখস্থ করে। ইহা ছাড়া কয়েকটি অর্থপুস্তক আবার কেবলমাত্র পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যই রচিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, পরীক্ষার্থীরা মূলগ্রন্থ পাঠ না করিয়াই অর্থপুস্তক, সহায়িকা প্রভৃতির অংশ-বিশেষ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। ইহাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যই ইহাতে ব্যর্থ হইয়া যায়। অর্থপুস্তকের এই প্রকার ব্যবহার শিক্ষার পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে অর্থপুস্তক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার একটা অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূল উদ্দেশ্য যে পাঠ্য বিষয়কে বিশ্লেষণ করিয়া ছাত্রদের অধ্যয়নে সহায়তা করা, তাহা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা অর্থপুস্তক মাত্রই ক্ষতিকর হইতে পারে না। ভেরিটি-প্রমুখ লেখকের সেক্সপীয়ারের টীকা, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী উচ্চশ্রেণীর অর্থপুস্তক। এই গ্রন্থগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইবার বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত হয় নাই। ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানপিপাসাকে তৃপ্ত করা ও পাঠ্যবিষয়টি উপলব্ধির সহায়তা করাই এইগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যটি মনে না রাখিলে অর্থপুস্তক ক্ষতিকর হইয়া উঠে।

অর্থপুস্তক যাহাতে ক্ষতিকর না হইয়া উঠে সেজন্য অর্থপুস্তক-লেখক ও ছাত্র-ছাত্রী উভয়কেই সতর্ক থাকিতে হইবে। অর্থপুস্তক এমনভাবে লিখিতে হইবে যাহাতে তাহা ছাত্রছাত্রীর অর্থবোধ ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করে এইমাত্র—পরীক্ষার উপযোগী করিয়া বিশেষভাবে অর্থপুস্তক প্রণয়ন করিলে তাহা ছাত্রদের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। ছাত্রদেরও কেবল গ্রন্থপাঠের সময় অর্থ-পুস্তকের সাহায্য লইতে হইবে—পাঠ্য বিষয়টি অধীত হইলে তাহার পরও অর্থপুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করা অসমীচীন। অর্থপুস্তকে যে 'সারাংশ', 'ব্যাখ্যা', 'প্রশ্নোত্তর' প্রভৃতি দেওয়া থাকে তাহা আদর্শ বা নির্দেশক মাত্র—ছাত্রছাত্রীরা ঐগুলি মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে ইহা কখনই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। মূল বিষয়টির বোধের জন্যই কেবল অর্থপুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা ইহা ক্ষতিকর হইয়া উঠিবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার স্থান এত বড়ো হইয়া উঠিয়াছে যে, জ্ঞানতৃষ্ণা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কমিয়া যাইতেছে। ফলে অর্থ-পুস্তককে পাঠ্যপুস্তকের সহায়করূপে না দেখিয়া বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই

সেগুলিকে কেবল পরীক্ষার সহায়করূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থার আশু অবসান একান্ত প্রয়োজন। দৃষ্টিকে পরীক্ষার পরিবর্তে জ্ঞানান্বেষণের দিকে নিবদ্ধ করিতে হইবে।

নয়া পয়সা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে যে বিপ্লব ঘটেছিল তা কেবল রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনই সাধন করেনি—তা ফরাসী দেশের মানস ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছিল। এই সময় বা বিপ্লবের পরবর্তীকালে ঐ দেশে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে গণিতের ক্ষেত্রে দশমিকের ব্যাপক ব্যবহার একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই নূতন রীতি—যেটাকে সংক্ষেপে মেট্রিক প্রণালী বলে নির্দেশ করা হয়ে থাকে, সেটা হিসাবের পক্ষে অনেক পরিশ্রম আর গোলমালের আশঙ্কা দূর করে দিয়েছে।

আমাদের দেশে টাকা আনা গণ্ডা কড়া বা মণ সের ছটাক কাঁচ্চা—সবই চার আর পাঁচের হিসাবে ভাগ করা। গুণ বা ভাগ করবার সময় একটা থেকে আর একটাতে নিয়ে যাবার সময় গুণভাগ করতে হয়। ইংলণ্ডে পাউণ্ড শিলিং পেনি ফার্দিং বা টন হন্দর কোয়ার্টার পাউণ্ড আউন্স ড্রাম দুটোতেই গুণভাগের ব্যবস্থা আরও বেশি। ফরাসীরা ঠিক করলেন যে মুদ্রা, ওজন আর দৈর্ঘ্যের এক একটা নির্দিষ্ট মান স্থির করে তারপর সেটাকে দশের হিসাবে গুণ বা ভাগ করলেই চলবে। তা হলে একটা মান থেকে আর একটা মানে নিয়ে যাবার বাড়তি খাটুনিটা কমে যায়।

ভারতবর্ষেও অনেক দিন ধরে ফরাসীদের এই মেট্রিক প্রণালীর অনুসরণ করবার কথা চলছে। কিন্তু ভারত তো ইংরেজের অধীন ছিল আর ইংরেজের মতো রক্ষণশীল জাত পৃথিবীতে আর নেই—সেইজন্য কোনো কাজ এতদিন হয় নি। শেষে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একটা আইন করে ভারতে দশমিক প্রথা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

The standards of Weights and Measures Act, 1956 এদিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের ইতিহাসে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা —এটাকে যুগান্তকারী ঘটনা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এই আইনে স্থির করা হয়েছে যে, মিটারকে দৈর্ঘ্যের, কিলোগ্রামকে

ওজনের, সেকেণ্ডকে সময়ের, সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারের এক এক ডিগ্রীকে উত্তাপের, আর টাকাকে মুদ্রার একক বলে ধরা হবে। এই একক গুলোকে আবার ভাঙবার দরকার হলে দশ বা একশো দিয়ে ভাগ করা হবে। এতে গুণভাগের জটিলতা থাকবে না—শুধু দশমিক বিন্দু যথাস্থানে বসাইলেই একটা মান থেকে আর একটা মানে নিয়ে যাবার পরিশ্রম দূর হয়ে যাবে।

দশমিক মুদ্রা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার এই আইন কার্যকরী করবার প্রথম ধাপ এগিয়ে গেছেন। এর আগে এক টাকাকে ষোলো আনা, চৌষট্টি পয়সা বা একশো বিরানব্বই পাইয়ে ভাগ করা হত। তার বদলে এক টাকাকে একশোটি মুদ্রায় বিভক্ত করে নতুন মুদ্রার প্রচলন করা হয়েছে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা এপ্রিল থেকে। পরে এই মুদ্রাটির নাম 'পয়সা'ই রাখা হবে—এখন বুঝতে ভুল হবার ভয়ে এই মুদ্রাটির নাম রাখা হয়েছে নয়া পয়সা। এই নতুন মুদ্রামানে প্রথম পর্যায়ে এক নয়া পয়সা, দুই নয়া পয়সা, পাঁচ নয়া পয়সা আর দশ নয়া পয়সার মুদ্রা চালু করা হয়েছে; পরে পঁচিশ নয়া পয়সা আর পঞ্চাশ নয়া পয়সার মুদ্রা চালু করা হবে—এগুলোর দাম আগেকার সিকি আর আধুলির মতোই থাকবে।

নতুন কিছু করতে গেলেই এক দিকে যেমন বেশ একটা হুজুগ পড়ে যায়, অন্য দিকে আবার নতুন জিনিষকে মেনে নিতে অসুবিধার জন্য একটা প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও দুটোর কোনটারই অসদ্ভাব হয় নি। পুরানো মুদ্রাগুলো একেবারে তুলে দিয়ে নতুন মুদ্রা একেবারে প্রবর্তন করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য তিন বছরের জন্য দুরকম মুদ্রাই চালু রাখা হয়েছে। সরকারী হিসেব পুরোপুরিভাবে নয়া পয়সাতে করা হয় বটে, কিন্তু সাধারণ লোক এখনও পুরানো পয়সাতেই হিসেব করে—বড়ো জোর পুরানো পয়সার হিসেব করবার পর সেটাকে নয়া পয়সায় পরিবর্তিত করে তারপর লেনদেন করে।

ভারতবর্ষে অশিক্ষিতের সংখ্যা খুবই বেশী। তারা অনেক ক্ষেত্রেই এই নয়া পয়সার হিসেবটা বুঝতে পারে না। দোকানে বা বাজারে নয়া পয়সা চালাতে গেলে প্রথমে তারা হিসেব বুঝতে না পেরে ধাঁধায় পড়ে যায়; তারপর যদিও বা হিসেবটা বুঝতে পারে, তবুও নয়া পয়সা নিয়ে নয়। ঝামেলা পোয়াবার ইচ্ছা তাদের কারোরই থাকে না—তারা যতদূর সম্ভব

নয়া পয়সা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। নয়া পয়সা দিতে গেলে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে এমন লোকেরও বিশেষ অভাব নেই।

পুরানো পয়সার সঙ্গে নয়া পয়সার হিসেব মেলাতে গেলে তফাৎ হওয়ার জন্যই নয়া পয়সার বিরুদ্ধে একটা মৃদু প্রতিক্রিয়া সাময়িকভাবে দেখা দিয়েছে। পুরানো এক পয়সা দশমিক মুদ্রার হিসাবে ১.৫৬২৫ নয়া পয়সা হয়, তার বদলে দু নয়া পয়সা দিতে হয়; অথচ পুরানো দু পয়সার দাম ৩.১২৫ নয়া পয়সা হলেও তার বদলে তিন নয়া পয়সা দিতে হয়। বিনিময়ের হিসাব এক আনা=৬ নয়া পয়সা; দু আনা=১২ নয়া পয়সা; কিন্তু তিন আনা=১৯ নয়া পয়সা। একটা সিকি দিয়ে দু' আনার জিনিষ কিনিলে, বারো নয়া পয়সা দাম নিয়ে তেরো নয়া পয়সা ফেরত দেওয়া হবে না, ফেরতের দরুণ দু আনার বদলে বারো নয়া পয়সা দেওয়া হবে সেও এক সমস্যা। আনা প্রতি ছয় নয়া পয়সা হিসাবে ষোলো আনায় ছিয়ানব্বই নয়া পয়সায় এক টাকা হয়—অথচ একটাকা=একশো নয়া পয়সা।—পুরানো হিসাবের সঙ্গে গরমিল অনেক জায়গাতেই। যাঁরা নয়া পয়সার ব্যাপারটা বোঝেন তাঁদের অনেকেও হঠাৎ সাড়ে ছ' আনায় কত নয়া পয়সা বা সত্তর নয়া পয়সা পুরোনো কত পয়সার সমান তা বলতে পারবেন না। সুতরাং নয়া পয়সার হিসাব নিজের ঘাড়ে না নিয়ে পরের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সবলেই করে থাকেন।

সংস্কারের প্রথম ধাপে নয়া পয়সার প্রচলন এক রকম গা-সওয়া হয়ে গেছে—এটার জন্য কিছু কিছু প্রহসনাত্মক ঘটনা ঘটলেও মারাত্মক কিছু হয় নি। কিন্তু মিটার আর কিলোগ্রাম যখন প্রচলিত হবে তখন সাধারণ লোকের মনোভাব যে কী রকম হবে তা কল্পনাও করা শক্ত।

জমিদারী প্রথার বিলোপ

আমাদের দেশের জমিদারী প্রথার একটা ইতিহাস আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে বাংলা বিহার, ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করিয়াছিলেন। প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের ছিল। কিন্তু সোজাসুজি প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায়

করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অনেককাল নানাপ্রকার অসুবিধা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাইয়া ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণোয়ালিস্ চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত প্রবর্তন করিলেন। এই সময় হইতে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হইল। জমিদারগণ নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিতেন এবং প্রজাগণের মধ্যে জমি বিলি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতেন। জমিদারগণ প্রজাগণের নিকট হইতে যে পরিমাণ খাজনা আদায় করিতেন তাহার অনুপাতে তাহাদিগকে রাজস্ব দিতে হইত অনেক কম। খাজনার এই উদ্বৃত্ত অংশই ছিল জমিদারের লাভ। বলা বাহুল্য যখন এই প্রথা প্রবর্তিত হয় তখন ইহার প্রয়োজন ও কার্যকারিতা ছিল। দেশের অকর্ষিত ভূমির পরিমাণ ছিল অধিক। প্রথম অবস্থায় নামমাত্র খাজনায় জমির পত্তন করিয়া জমিদারগণ দেশের শস্যসম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছিলেন প্রচুর। কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল. দেশের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। কর্ষণযোগ্য ভূমির চাহিদা বাড়িতে লাগিল, জমিদারগণ নজর-খাজনা বাড়াইতে লাগিলেন। জমির কাগজপত্র অনেক সময় ভালভাবে রাখা হইত না। নিরক্ষর চাষিদিগের নিকট হইতে একই জমির খাজনা বছরে দুইবার আদায় করা হইত। প্রজাগণের অবস্থা অনেকটা ক্রীতদাসের মত হইয়াছিল। খাজনা দিয়া জমিতে বাস করিবে, অথচ প্রজারা গাছ কাটিতে পারিবে না, পুকুর কাটাইতে পারিবে না, পাকা ইমারত তুলিতে পারিবে না। পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্যও জমিদারের অনুমতি প্রয়োজন ছিল। জমিদারগণ জমির উন্নতির জন্য কিছুই করিতেন না। আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় প্রজাদের পক্ষেও জমির কোন স্থায়ি উন্নতি করা সম্ভব ছিল না। প্রজারা খাজনা দিত ও জমি চাষ করিত, কিন্তু জমিকে কখনও আপনার বলিয়া মনে করিতে পারিত না। তাহাদের সর্বদা ভয় ছিল যে, কোন অজুহাতে বা অছিলায় জমিদার তাহাদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিতে পারেন।

দেশের উৎপন্ন শস্যসম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন উৎকৃষ্ট ভূমির ব্যবস্থা। কৃষককে তাহার জমির উপর মমতাবান করিয়া তুলিতে হইবে।—কায়েমী স্বার্থ না থাকিলে কৃষক কখনও পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া জমির পরিচর্যা করিবে না। কৃষকের মনে যদি এই আশঙ্কা থাকে—যে

এক বৎসর বা দুই বৎসর পরে জমি হইতে জমিদার তাহাকে উচ্ছেদ করিয়া দিবেন তবে চাষবাসে তাহার মন থাকে না—। স্বত্ব স্থায়ী হইবে ও খাজনার হার যথাসম্ভব কম হইবে এই দুইটি বিষয় ভূমি সংস্কারের মূল কথা—অথচ এই দুই দিক হইতেই জমিদারী প্রথার গুরুতর ত্রুটি ছিল। জমিদারগণ একটা অপরিবর্তনীয় রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে সরকারের নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লইতেন এবং উচ্চহারে সেই জমি খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রজাগণের মধ্যে বিলি করিতেন। নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াইবার জন্য জমিদার ও জমিদারের কর্মচারিগণ যথাসম্ভব উচ্চহারে প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা ও আনুসঙ্গিক অনেক কিছু আদায় করিতেন।

এই জন্যই অনেক দিন হইতেই আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে একটা মনোভাব দেখা দিয়াছিল যে, আমাদের দেশে কৃষির উন্নতির পক্ষে জমিদারী প্রথা একটা বড় বাধা। কৃষক পরিশ্রম করিয়া মাঠে যে ফসল উৎপন্ন করিবে—জমিদার ঘরে বসিয়া, বিলাসে কাল কাটাইয়া তাহার একটা মোটা অংশ কেন গ্রহণ করিবেন? জাতীয় কংগ্রেসের এই মনোভাব ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস যখন ক্ষমতা পাইল তখন এই প্রথাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ—এই কয়টি প্রদেশের জমিদারী বিলোপের কাজ আরম্ভ হইল। জমিদারগণ কিছু কিছু ক্ষতিপূরণ পাইলেন। তাঁহাদের নিকট আয়ের দুইগুণ হইতে বিশগুণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। যাঁহাদের আয় কম তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের হার বেশী এবং যাঁহাদের আয় বেশী তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের হার কম। এই ক্ষতিপূরণের টাকা বার্ষিক ৩৲ সুদের বণ্ডে দেওয়া হইতেছে। সকলেই মনে করেন এই ক্ষতিপূরণের টাকা ছোটখাট নানারকম ব্যবসায়ে নিয়োগ করিয়া জমিদারগণ নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

জমিদারগণ এইভাবে তাঁহাদের বহুকালের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি হারাইলেন। প্রায় সমগ্র দেশ জুড়িয়া একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া গেল। প্রায় সকলেই এই পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানাইলেন। জমিদারগণও তাঁহাদের দিন ফুরাইয়াছে মনে করিয়া এই বিপ্লবকে মানিয়া লইলেন।

জমিদারীপ্রথার সহিত বিভিন্ন স্বার্থে জড়িত ব্যক্তিগণ ছাড়াও কিছু নিরপেক্ষ ব্যক্তি এইভাবে জমিদারী বিলোপের সমর্থন করেন নাই। বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রদায়কে রাতারাতি উচ্ছেদ করিয়া দেওয়ায় ভারতের মত রক্ষণশীল দেশে একটা যুগান্তকারী সামাজিক বিপ্লব ঘটানো —ভবিষ্যতে ইহার প্রতিক্রিয়া কিভাবে দেখা দিবে তাহা কে বলিতে পারে? অনেকে বলেন মিলের মালিক ও শিল্পপতিগণ লক্ষ লক্ষ মজুর খাটাইয়া যে কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছেন সরকার তাহাদিগকে সহ্য করিতেছেন অথচ যাঁহারা একসময়ে দেশের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন, যাঁহাদের বদান্যতা, মহানুভবতা ও সহানুভূতি একসময়ে দেশের অনেক সৎকার্য সাধন করিয়াছিল তাঁহাদিগকে একেবারে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া সবদিক দিয়া হয়ত সঙ্গত হইল না। কথাগুলি একেবারে মিথ্যা নয়। সামাজিক পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে কায়েমি স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতেই হইবে। এই সংস্কারকার্যে জমিদারশ্রেণী প্রথম বলি—পুঁজিপতিগণ যে চিরকাল সুখ-সুবিধা ভোগ করিয়া যাইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

জমিদারী প্রথা বিলোপের পর আবার নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। জমিদারগণের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া সরকারী রাজস্ব কয়েক কোটি টাকা বৃদ্ধি করাই বড় কথা নয়। জমিদারগণের উপর আয়কর বসাইয়া এই কয়েকটি টাকা পাওয়া যাইত। আসল কথা প্রজা-সাধারণের সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগের প্রতি সহানুভূতিশীল সরকার ও সরকারের কর্মচারিবৃন্দ যথার্থ প্রজাহিতৈষী হইয়া দেশের কৃষককুলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবেন কিনা। ইহা যদি সম্ভব না হয় তবে প্রজাগণের পক্ষে কেবল মনিব বদলানই সার হইবে।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ

সাময়িকভাবে সব দেশেই পণ্যের মূল্য বাড়ে, কমে। চাহিদা ও সরবরাহ এই স্বাভাবিক নিয়মের বশে বাজার দর ওঠে নামে। আমাদের দেশে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না—কিন্তু প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন যুদ্ধ ব্রহ্মদেশে ও ভারতের উপকূলে সম্প্রসারিত হইল, তখন হঠাৎ বিদেশী জিনিষের আমদানি বন্ধ হইল। এই সময় আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী সম্প্রদায় বাজার হইতে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে লাগিলেন, ইহাতে পণ্যমূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ১৯৪১, ১৯৪২ সাল হইতে মূল্যস্তর যে ভাবে বাড়িল আজ পর্যন্ত তাহার হ্রাস হইল না। যুদ্ধের সময় মূল্যের সূচক সংখ্যা যদি একশো ধরা হয় তবে বর্তমান সময়ে অর্থাৎ যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়ার ১২, ১৩ বৎসর পরেও সূচক সংখ্যা ৪২৫এ আসিয়া পৌঁছিয়াছে—ইহার সহজ অর্থ এই যে, কাজ করিতে বা যে পরিবারের খরচ চালাইতে যুদ্ধের পূর্বে ১০০৲ টাকা লাগিত সেখানে আজ ৪২৫৲ লাগিবে—যুদ্ধের আতঙ্কে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি সব দেশেই হয়। কিন্তু সমস্ত সভ্য দেশেই এই মূল্যবৃদ্ধি যাহাতে স্থায়ী না হয় সরকার তাহার জন্য চেষ্টা করেন। আমাদের দেশেও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। কমিশন প্রতিষ্ঠা, সম্মেলন আহ্বান ইত্যাদি ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বাজার হইতে জিনিষ উধাও হইতে লাগিল। সকলের চোখের উপর ধীরে ধীরে কালোবাজার ফাঁপিয়া উঠিল। এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে দেখা দিল—ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ মিটিবার পর পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা আসিতে দিল না—কোন সুযোগ বা অজুহাত পাইলেই হয়—নানারকম উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া নানা গুজব রটাইয়া ইহারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিল। কোরিয়ার যুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তান হইতে আগত শরণার্থীর সমস্যা, আন্তর্জাতিক অনিশ্চিত পরিস্থিতি, আবার একটা বড় রকমের যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা—এইগুলিকে নানাপ্রকারে জিয়াইয়া রাখিয়া দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। পণ্যমূল্য আর স্বাভাবিক হইল না। ১২, ১৩ বৎসর হইল যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু খাদ্যমূল্য পূর্বের তুলনায় এখনও চারগুণ।

এই অস্বাভাবিক অবস্থা ভারত সরকারকে প্রচুর সমালোচনার সম্মুখীন করিয়াছিল—প্রধান প্রধান কর্মকর্তাগণকে বিচলিতও করিয়াছিল কিন্তু সরকারী ব্যবস্থায় কোন ফল হয় নাই। এই অবস্থায় প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণের—প্রয়োজনীয় দ্রব্য যখন বাজারে কম ও অসাধু ব্যবসায়িগণ যেখানে দ্রব্য-

সামগ্রী লুকাইয়া রাখিয়া বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতেছে, বিত্তশালী সম্প্রদায় নিজেদের সুখ-সুবিধা ও আরামের জন্য যে কোন মূল্য দিয়া বাজার হইতে জিনিষ কিনিয়া লইতেছে, তখন সবদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। খাদ্য-সামগ্রী দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তাহা কোন সরকারের পক্ষেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যাহাদের অল্প আয় তাহারা অতিরিক্ত মূল্য দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যও সংগ্রহ করিতে পারে না। জনসাধারণ ন্যায্য মূল্য দিয়া যাহাতে খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধপত্র পায় সরকারকে সেদিকে সচেষ্ট হইতে হইবে। ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা, বেশী মূল্যে বিদেশ হইতে খাদ্য আনিয়া ক্ষতি স্বীকার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা সরকারের কর্তব্য। ইহার জন্য প্রয়োজন সরকারের নিজস্ব একটি মজুত ভাণ্ডার। সরকারের ভাণ্ডারে কোন দ্রব্য-সামগ্রী নাই অথচ মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইল ইহার অর্থ সে সমস্ত জিনিস বাজার হইতে উধাও হইয়া যায়। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তখন কেবল কুফলই ফলিতে দেখা যায়।

চোরাকারবারীরা অনেক বেশী সঙ্ঘবদ্ধ ও অনেক শক্তিশালী। বার বার দেখা গিয়াছে সরকারী পারমিট চোরাকারবারীদের হাতে আসিয়া সাধারণের অবস্থা ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

গান্ধীজী মনে করিয়াছিলেন যে, কণ্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে দুর্নীতি ও চোরাকারবার দূর হইবে। ভারত সরকারও এই নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ধীরে ধীরে সমস্ত জিনিসের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু ব্যবসায়ীগণকে শেষ পর্যন্ত আয়ত্তে রাখা গেল না। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া দেশের সমস্ত চাল সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায়িগণ চালের মূল্য দেড়গুণ বাড়াইয়া দিল—তাহা আজও কমে নাই। সরকার বাধ্য হইয়া পুনরায় আংশিক রেশন প্রথা প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরকারী কর্মচারিগণের অদূরদর্শিতা ও অযোগ্যতা ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দুঃখ-দুর্দশার অশ্রুসিক্ত ইতিহাস।—তবু মোটামুটি এই কথা বলা যায় যে, খাদ্যের ব্যাপারে ভারতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতকটা সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে। ন্যায্যমূল্য দিয়া ভারতের এক তৃতীয়াংশ লোক এখনও চাল, গম ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে

পারিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছেন। পঁচিশকোটি টাকার একটি মজুত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠিয়াছে। যখন যে অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিবে এই মজুত ভাণ্ডার হইতে সেখানে খাদ্য প্রেরিত হইবে। ব্যাঙ্কগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে যাহাতে খাদ্যশস্যের ফাট্‌কা বাজার অসাধু ব্যবসায়ীগণ করিতে না পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্থিরীকৃত মূল্যে ন্যায্যমূল্যের দোকান হইতে চাল, গম প্রভৃতি বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খাদ্যশস্যের সঙ্গে আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে অনেকখানি কড়াকড়ি করা হইয়াছে। আমেরিকা ও ব্রহ্ম-দেশের সহিত নূতন করিয়া চুক্তি করা হইয়াছে—প্রয়োজন পড়িলেই এই উভয় দেশ হইতেই প্রচুর খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যাইবে। খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর পুনরায় যদি দেখা দেয় তবে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি বান্‌চাল হইয়া যাইবে। সেইজন্যই ভারত সরকার খাদ্যসরবরাহের ব্যাপারে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং এইদিকে তাহাদের নিয়ন্ত্রণের নীতি খানিকটা সাফল্যলাভ করিয়াছে।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গে সমাগত শরণার্থীগণের পুনর্বাসনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় রূপ লাভ করিতেছে। ইহার ইতিহাসটুকু এবং যে পরিস্থিতির চাপে এই পরিকল্পনা রূপ লাভ করিয়াছে তাহা জানা দরকার।

বেসরকারী হিসাবে দেখা যায় পূর্ব-পাকিস্তান হইতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে এই অর্দ্ধকোটী লোককে বাসের স্থান, চাষের জমি ও কর্মের সংস্থান করিয়া তাহাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে সাহায্য করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিমবঙ্গে কর্ষণযোগ্য পতিত জমি প্রচুর নাই। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল পরিবারকে কাজ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায় এমন শিল্প উন্নতিও পশ্চিমবঙ্গে ঘটে নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে ঘটিবার সম্ভাবনাও নাই। কাজে কাজেই পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্‌বাস্তুগণের মধ্যে একটি বিরাট অংশকে বাংলার বাহিরে প্রেরণ করা ছাড়া উপায় নাই।

কিন্তু বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি কিছু কিছু অঞ্চলে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবার প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহারা সেখানে টিকিতে পারে নাই। উদ্বাস্তুগণ যত বিপন্ন ও দুর্গত হউক না কেন বাংলাদেশ ছাড়িয়া, ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধন ছাড়িয়া, বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া বাংলার বাহিরে চিরকাল বাস করিতে ইচ্ছা করে না—। অর্থনীতিগত যে সুবিধা তাহাদিগকে দেওয়ার কথা ছিল তাহাও এমন কিছু লোভনীয় নয়। সুতরাং সরকারী পুনর্বাসন দপ্তর দেশের জনমত এবং হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার সকলেই চাহিতেছিল যে একটি অঞ্চলে বাঙ্গালীর উদ্বাস্তুগণকে পুনর্বাসিত করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা এই প্রয়োজনের তাগিদে রূপ লাভ করিয়াছে।

এই পরিকল্পনা সৃষ্টি করিয়াছেন মাদ্রাজ সরকারের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী এ, ভি, রামমূর্তি। এই পরিকল্পনায় কেবল পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাগণের বসবাস করিবার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথাই আলোচনা হয় নাই। এই সুবিস্তৃত অঞ্চলটিতে সর্বতোমুখী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আয়তন তেত্রিশ হাজার বর্গমাইল। দণ্ডকারণ্য আশী হাজার বর্গমাইল—। এই আশী হাজার বর্গমাইলের মধ্যে যদি ত্রিশ-বত্রিশ হাজার বর্গমাইল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের মতন একটি অঞ্চল এখনই গড়িয়া উঠিবে এবং বাঙ্গালী উদ্বাস্তুগণ প্রধানভাবে সেই অঞ্চলে বাস করিবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বর্গমাইলে আটশত লোকের বাস। দণ্ডকারণ্যে লোক বাস করে প্রতি বর্গমাইলে একশত। পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটি চাষী পরিবারকে পাঁচ একর জমি দেওয়া দুঃসাধ্য। দণ্ডকারণ্যে প্রত্যেকটি চাষী পরিবারকে সেচের সুবিধাযুক্ত পাঁচ একর জমি দেওয়া হইবে এবং যেখানে সেচের সুবিধা নাই সেখানে প্রতি পরিবার দশ একর জমি পাইবে। পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যার অনুপাতে এবং প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন কম। দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে চাষবাস প্রাচীন পদ্ধতিতে চলিলেও উহা এখনও খাদ্যশস্যের দিক দিয়া উদ্বৃত্ত অঞ্চল। দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে বৎসরে সত্তর ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং আবহাওয়া ও বারিপাতের দিক দিয়াও দণ্ডকারণ্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে খুব বিভিন্ন হইবে না। দণ্ডকারণ্যের নদীগুলিতে বহু বৎসর অল্প ব্যয়ে সেচের ব্যবস্থা করা

অসম্ভব হইবে না। দণ্ডকারণ্যের খনিতে বহু মূল্যবান সম্পদ আছে। উন্নয়নের কাজ অগ্রসর হইতে থাকিলে খনিজদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ছোট বড় বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার কোন বাধা নাই। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে একশ আশীটি গ্রাম লইয়া একটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিবে। প্রতিটি গ্রামে একশ আশীটি পরিবার বসবাস করিবে তন্মধ্যে একশ পঞ্চাশটি উদ্বাস্তু পরিবার স্থান পাইবে। দণ্ডকারণ্যে ম্যালেরিয়া নাই। স্বাস্থ্যরক্ষার যুগোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। দাতব্য চিকিৎসার্থ প্রসূতি সদন ও হাসপাতাল ছাড়াও কতকগুলি মেডিক্যাল ইউনিট সর্বদা সজাগ থাকিবে। ইট ও টালির কারখানা স্থাপিত হইতেছে। তাঁত ও বস্ত্র শিল্প চালাইবার জন্য উদ্বাস্তু তন্তুবায় পরিবার নিযুক্ত হইতেছে। ছুতার মিস্ত্রী, মেসিনম্যান, ফিটার প্রভৃতির জন্য ওয়ার্কসপ্ খোলা হইতেছে। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে যে তিন লক্ষ লোক আছে তাহাদিগকে ধীরে ধীরে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করা হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে আরও বহু বাঙ্গালীকে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করা অসম্ভব হইবে না। বাঙ্গালীর নিকট দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা একটি আশা ও সমৃদ্ধির বাণী লইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালী সঙ্কুচিত হইতে হইতে এমন একস্থানে উপনীত হইয়াছে যে, সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করা ছাড়া তাহার বাঁচিবার আর উপায় নাই। দণ্ডকারণ্য একটি অবহেলিত অঞ্চল। ইহার অরণ্যবহুল অংশে বহুকাল কোন সভ্য মানুষ বাস করে নাই সত্য কিন্তু মালয়, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ও মহাদেশ অরণ্যাবৃতই ছিল কিন্তু এই সব দেশের সমৃদ্ধি এখন বিশ্ববিদিত।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে অত্যন্ত তিক্ত। কম্যুনিষ্ট পার্টি এই বিরুদ্ধ সমালোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারা বলেন, দণ্ডকারণ্যে বহুকাল মানুষ বাস করে নাই, রাস্তা-ঘাট প্রস্তুত করিয়া ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া অঞ্চলটিকে চাষ ও বাসের যোগ্য করিয়া তুলিতে অনেক সময় লাগিবে। গরু, ছাগল, হাঁস প্রভৃতি পোষা এবং কাঠের কারবার ও ইট, টালি প্রভৃতি ছাড়া উদ্বাস্তুগণের কোন কাজ থাকিবে না। ইহারা সরকারী তাঁবুতে থাকিবে ও কাজের বিনিময়ে মজুরী পাইবে। ইহাদের বক্তব্য যে, পশ্চিমবাংলাতেই বহু জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি রহিয়াছে—বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি

অঞ্চলে এখনও বহু পতিত জমি আছে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় প্রতি পরিবারের জন্য সরকার দশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইহার অর্ধেক ব্যয়ে উদ্বাস্তুগণকে পশ্চিমবঙ্গের অনুন্নত অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা যাইতে পারে। কল-কারখানা নির্মাণ ও বিবিধ শিল্প উন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গেও হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রীক উন্নতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহাতে কেবল বাস্তুহারার পুনর্বাসনই নয় পশ্চিমবঙ্গের জমিহীন কৃষক, বেকার শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত চাকরীজীবীর সমস্যারও সমাধান হইবে।

পুনর্বাসন দপ্তর ও ভারত সরকার এই সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা ধৈর্যের সহিত শুনিয়াছেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। দণ্ডকারণ্য ব্যতীত ভারতের আর কোন স্থানে—পশ্চিমবঙ্গেত নয়ই এমন ব্যাপক পুনর্বাসন পরিকল্পনা চলিতে পারে না। উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

নব-প্রবেশিকা রচনা ও অনুবাদ

(উচ্চতর মাধ্যমিক সংস্করণ)

তৃতীয় ভাগ

উপপাঠ্য সহায়িকা

বাড়াইতে হইবে—কল্পনাশক্তির সাহায্যে যুক্তি-প্রমাণ-দৃষ্টান্ত প্রভৃতি যোগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধের আকার দিতে হইবে। ভাব-সম্প্রসারণের ইহাই মূলকথা।

এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর লিখিবার সময় উদ্ধৃত অংশটি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া বার বার পড়িতে হইবে—যতক্ষণ পর্যন্ত অংশটির অন্তর্নিহিত ভাব মনের মধ্যে বেশ দানা বাঁধিয়া না উঠে ততক্ষণ বার বার পড়িতে হইবে। সমগ্র-ভাবে অংশটির অর্থ পরিষ্কার হইয়া উঠিলে তখন সরল ভাষায় লিখিতে হইবে। ভাব-সম্প্রসারণে মূলের কোনও কথা বাদ দেওয়া উচিত নয়, আবার মূল-বহির্ভূত বা মূলের সহিত সম্পর্ক নাই এমন কোনও বিষয় উল্লেখ করাও বাঞ্ছনীয় নহে।

ভাব-সম্প্রসারণ লিখিতে একটি বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন। যে গদ্য বা পদ্য অংশটির ভাব-সম্প্রসারণ করিতে হইবে তাহার প্রত্যেকটি পংক্তি বা ছত্রের বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বাড়াইয়া গেলে চলিবে না—প্রদত্ত অংশের অন্তর্নিহিত ভাবটির সম্প্রসারণ করিতে হইবে। একটি অংশে একটি ভাবই (Central idea) থাকিবে, ঐ ভাবটিকেই বাড়াইয়া লিখিতে হইবে। প্রত্যেক পংক্তি ধরিয়া বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গেলে অনেক সময় মূল ভাবটির উপর তেমন জোর (emphasis) পড়ে না।

এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর কত বড় হইবে? সাধারণতঃ এক পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ১৫।১৬ হইতে ২০।২২ ছত্রের মধ্যেই উত্তরটিকে শেষ করিবার চেষ্টা করা উচিত। বেশী লিখিলে ভুল বেশী হইবার সম্ভাবনা—একই কথার পুনরাবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা—দুই তিনবার পুনরাবৃত্তি ঘটিলেই পরীক্ষক বিরক্ত হইবেন—তিনি মনে করিতে পারেন পরীক্ষার্থী মূল ভাবটি ধরিতে পারে নাই বলিয়াই এত আবোল-তাবোল লিখিয়াছে।

মূল ভাবটি অবশ্যই উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গীর সরলতা ও সৌষ্ঠব না থাকিলে উত্তরটি সমাদৃত হইবে না এবং উপযুক্ত মূল্য ও মর্যাদা পাইবে না।

ভাবার্থ লিখন—ভাবার্থলিখন বা সারাংশ-লিখন ভাব-সম্প্রসারণের বিপরীত। ইহাকেই ইংরাজীতে Substance-writing বলা হয়। মূল অংশটি পড়িয়া অপ্রধান ভাবগুলি বাদ দিয়া প্রধান বা মূল ভাবটি অল্পকথায় প্রকাশ করার নাম ভাবার্থলিখন। মূল রচনাটি বার বার পড়িতে পড়িতে

প্রধান বক্তব্য বিষয়টি যখন স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন সেই ভাবটি নিজের ভাষায় লিখিতে হয়। মূল রচনা হইতে যত অল্প শব্দ লওয়া যায় ততই ভাল।

ভাব-সংক্ষেপ করিতে গিয়া দুই-তিন ছত্রের মধ্যে প্রধান ভাবটিকে বিবৃত করিয়া শেষ করা ভাল নয়—পরীক্ষার ক্ষেত্রে উহা বিপজ্জনক।

বর্ণনামূলক বিষয়ে উত্তর মূলের চেয়ে অনেক ছোট হইবে—কিন্তু চিন্তামূলক বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা যায় না। উত্তরটি শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় যেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সৌষ্ঠব লাভ করে।

ভাবার্থ বা সারাংশ লিখিবার পূর্বে প্রধান ভাবগুলি চিহ্নিত করিয়া লওয়া ভাল: এই চিহ্নিত অংশগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উত্তর লিখিলে উত্তরটি নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা বেশী।

সার-সংক্ষেপ, সারমর্ম বা সংক্ষেপকরণ—সার-সংক্ষেপ বা সংক্ষেপকরণ আপাতদৃষ্টিতে যতখানি সহজ মনে হয় আসলে ইহা তত সহজ নয়।

আজকাল মানুষের হাতে সময় কম—সে এক কর্ম হইতে কর্মান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। সমস্ত কথা ধীরভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার শুনিবার সময় নাই অথচ রাজকার্য পরিচালনায় বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাঁহারা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত তাঁহাদিগকে সবদিকে সজাগ থাকিয়া সব কথাই জানিয়া লইতে হয়। একজন হয়তো কোন জনসভায় দুইঘণ্টাব্যাপী একটি বক্তৃতা করিলেন—বক্তা কি বলিলেন তাহা মন্ত্রিসভার জানা প্রয়োজন—সেইজন্য বক্তার বক্তৃতাটির একটি চুম্বক প্রস্তুত করিতে হয়—তাহা মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়—এই চুম্বক বা সংক্ষেপ দেখিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং বক্তৃতাটি 'যেন তেন প্রকারেণ' কাটিয়া-ছাঁটিয়া ছোট করিয়া দিলেই 'সংক্ষেপকরণ' হইল না! তথ্যগুলি বাদ দিলে চলিবে না, নির্ভুলভাবে প্রয়োজনীয় সব কথাই দিতে হইবে, বক্তা যে বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন তাহাও চুম্বকের মধ্যে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

প্রয়োজনীয় অংশ বাদ না দিয়া সমস্ত তথ্যের সংক্ষেপে বর্ণনার নামই সংক্ষেপকরণ।

ভাব-সম্প্রসারণে মূল ভাবটি বাড়াইতে হয়, **ভাবার্থলিখনে** মূল ভাবটি সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিতে হয় আর **সংক্ষেপকরণে** মূলের কোন তথ্য বা বিষয় বাদ না দিয়া বিষয়টি ছোট করিতে হয়।

সংক্ষেপকরণের আয়তন মূলের অনুপাতে কতখানি হইবে তাহার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। এ-সম্বন্ধে প্রশ্নপত্রে নির্দেশ দেওয়া থাকে। যেখানে কোনও নির্দেশ থাকে না সেখানে সংক্ষেপকরণ মূলের অর্ধেকের কম ও এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে। মূলে যদি ৬০০ শব্দ থাকে তবে উত্তরটি ২০০ হইতে ৩০০ শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংক্ষেপকরণ সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রয়োজনীয় কথা মনে রাখা প্রয়োজন :

(ক) সংক্ষেপকরণে সর্বদা অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

(খ) প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহার না করিয়া পরোক্ষ উক্তিতেই সমস্ত বিষয়টি লিখিতে হইবে—উত্তম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষ ব্যবহার না করিয়া প্রথম পুরুষের বাচনভঙ্গীতেই সমস্তটা লিখিত হইবে।

(গ) সংক্ষেপকরণ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ রচনা। বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে, কিন্তু যেন লক্ষ্য থাকে মূলের কোন তথ্য বাদ না যায়। এই জাতীয় রচনায় নিজের কোন কল্পনা বা মতামত সন্নিবিষ্ট করা চলে না।

নবম শ্রেণী

কুরুপাণ্ডব, গল্পে উপনিষদ, গাথাঞ্জলি

কুরুপাণ্ডব

ভাব-সম্প্রসারণ

(১) নিম্নলিখিত অংশগুলির ভাব-সম্প্রসারণ কর ঃ—

(ক) ক্ষুদ্র মানবীয় সুখ-দুঃখের উপর কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ভর করে না।

ভাব-সম্প্রসারণ—মানুষ সচরাচর তাহার স্বকীয় সুখ-দুঃখের অনুভূতি দিয়াই বিশ্বের সব কিছুর বিচার করিতে অগ্রসর হয়। যাহা সে ভালো বলিয়া মনে করে তাহা যে সব সময় সে জ্ঞানের দৃষ্টিতে বা বুদ্ধির কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া ভালো বলে এমন নয়। তাহার ভালো লাগাই তাহার শ্রেয় নিরূপণের সবচেয়ে বড়ো কারণ।

কিন্তু যাহা ভালো লাগে তাহা করাই কর্তব্য এবং যাহা ভালো লাগে না তাহা পরিহার্য এরূপ ধারণা পোষণ করিলে অসত্যকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যাহাতে আমার স্বার্থ রক্ষিত হইবে এবং সুখবৃদ্ধি হইবে তাহাই আমার কর্তব্য এবং যাহাতে আমার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং দুঃখলাভ হইবে তাহা আমার অকর্তব্য এইরূপ বিচার ভুল। যাহা করণীয় তাহার সহিত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বা স্বার্থের কোনও সম্বন্ধ নাই। যাহা শ্রেয় তাহা মানুষের সুখ-দুঃখের উপর নির্ভর করে না। মানুষ যে সকল সুখকর কার্য করে তাহার সবগুলিই যে কর্তব্য এমন নয়, আবার তেমনই মানুষ যে সব দুঃখদায়ক কাজ করে সেগুলি যে তাহার অকর্তব্য ছিল একথাও বলা চলে না। বস্তুতঃ যথার্থ কল্যাণকর কার্য করিতে গেলে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। যথার্থ সৎকর্ম করিতে গিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে—মহামানবগণের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এমন অজস্র দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। যাহার যেটি স্বধর্ম তাহা রক্ষা করাই কর্তব্য—সুখ পাইলাম কি দুঃখলাভ হইল ইহা বিচার্য নহে। কর্তব্য পালন করিতে গিয়া মৃত্যুবরণও শ্রেয়—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

সুতরাং সুখ-দুঃখকে কর্তব্য-অকর্তব্যের মানদণ্ড না করিয়া মানুষের শুভ-বুদ্ধির উপর সে বিচারের ভার ছাড়িয়া দিতে হইবে। মানুষ যদি কোনো কাজ করিবার পূর্বে তাহা তাহার পক্ষে প্রীতিকর কি দুঃখকর হইবে তাহা চিন্তা না করিয়া তাহা কল্যাণকর হইবে কিনা সে বিচার করে তাহা হইলে সে যাহা শ্রেয়, যাহা কর্তব্য তাহাই করিবে, যাহা অকর্তব্য তাহা পরিহার করিবে।

(খ) তোমার পক্ষে যখন ধর্ম আছে, তখন অবশ্যই তোমার জয় হইবে।

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ—এই ধারণা কিছুকাল হইল ভারতবাসীদের মনে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম শব্দের অর্থই বা কি আর কাহাকেই বা জয় বলে সে সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ থাকার জন্য যেখানেই ধর্ম সেখানেই জয় হইবে—বর্তমান যুগে অনেকেই একথা মানিতে চাহেন না। সর্ব-অবস্থায় মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া চলাই ধর্ম এবং মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া যিনি চলিতে পারেন, শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়লাভ করিতে পারেন।

সাময়িক সাফল্যের নাম জয় নহে। প্রচুর অর্থ, ঐশ্বর্য করায়ত্ত করা—যুদ্ধ বা কূটনীতির সাহায্যে ক্ষমতা-প্রতিপত্তি অর্জন করা, সহস্র সহস্র লোককে নানাভাবে বশীভূত করিয়া তাহাদের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করা—এই-গুলিকে আমরা জয় বলিয়া মনে করি না। পুরাণ ও ইতিহাসে আমরা এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যেখানে ঐশ্বর্যের অহংকারে ও শক্তির মত্ততায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বহুলোকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া মানুষ একটা সাময়িক সাফল্য এবং তদনুযায়ী একটা মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই-গুলির পরিণাম ইহাদের পক্ষে শুভ হয় নাই। কারণ শাঠ্য ও প্রবঞ্চনার দ্বারা যাহা অর্জিত হইয়াছিল তাহা মরীচিকার মত মিলাইয়া গিয়াছে। পশুবলের দ্বারা যে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভ করা হইয়াছিল তাহা প্রবলতর শক্তির সংঘাতে বিধ্বস্ত হইযা গিয়াছে, মানুষ যতকাল পর্যন্ত ক্ষমতার আসনে সমাসীন ছিল ততকাল পর্যন্ত সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া ইহাদের স্তবগান করিয়াছে, ইহাদিগকে অভিনন্দন জানাইযাছে।

মানুষের অন্তরে স্থান লাভ করা, তাহার ভক্তি-প্রীতি, সহানুভূতি অর্জন করা, জীবনে ও জীবনান্তে মানবমনে শাশ্বত স্থানলাভ করা ইহাই প্রকৃত জয়, এবং এই জয় মনুষ্যত্ব বর্জন করিয়া, ধর্ম পরিহার করিয়া অপর কোন উপায়েই

লাভ করা যায় না। মানুষের শুভাশুভ সমস্ত কর্মের চরম পরিণামের দিকে লক্ষ্য করিয়াই মহাভারতের এই অমর বাণী—যেখানেই ধর্ম সেখানেই জয়—ঘোষিত হইয়াছিল।

*(গ) নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইলেও নিজ দুষ্কর্ম বিস্মৃত হইয়া দৈবকে নিন্দা করে।

ভাব-সম্প্রসারণ—যে সকল ব্যক্তি প্রকৃতিতে অসৎ তাহারা সচরাচর আত্মসর্বস্ব হইয়া থাকে। নিজের কিসে সুখ হইবে, নিজে কিসে বড়ো হইবে, নিজের স্বার্থ কিভাবে সাধিত হইবে—এই চিন্তাতেই তাহারা সর্বক্ষণ মগ্ন হইয়া থাকে। এমন কি, নিজের প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সে পরের স্বার্থহানি ঘটাইতে বা পরের উপর উৎপীড়ন করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া সে অনেক সময় অপরের ক্ষতি সাধন করিবার জন্য দুষ্কর্ম করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু এ পৃথিবীতে নিরতিশয় পাপ কখনও চিরকাল জয়ী হইতে পারে না। যে দুষ্কর্মকারী তাহাকে তাহার কৃতকর্মের জন্য একদিন না একদিন ফলভোগ করিতেই হয়। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়নায় দুষ্কর্ম করে তাহার অন্তরে অনুতাপ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু যে আত্মপরায়ণ ব্যক্তি সে আপনার প্রকৃতিগত নীচতার জন্য অসৎকর্মের অনুষ্ঠান করে এবং তাহার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ বা পরিতাপ কিছুই হয় না। সে যখন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে তখনও দৈবকেই দায়ী করিয়া আপনাকে কেবলমাত্র ভাগ্যহত বলিয়া মনে করে। অন্তরে সৎ বা অসতের বোধ প্রবল না হওয়ায় দুষ্কর্মের ফলভোগকারী নীচাশয় ব্যক্তি ভাগ্যকেই নিন্দা করে।

*(ঘ) বিপৎকালে সকলেই ধর্মচিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু সম্পদের সময় পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে।

মানুষের জীবন কখনও একভাবে যায় না। সম্পদ-বিপদের বিচিত্র পথে তার জীবন চলে, পতন, অভ্যুদয় তার জীবনে থাকিবেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিভিন্ন সময়ে তাহার মনোভাব বিভিন্নরূপ ধারণ করে। যখন সাফল্যের পর সাফল্য আসে, যখন অর্থ-ঐশ্বর্যে তাহার গৃহ ভরিয়া যায়, সম্মান-প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়—তখন তাহার ভগবানের কথা একবারও মনে হয় না। চরম উন্নতির সময় সে মনে করে, এই উন্নতি-

অভ্যুদয় তাহার আত্মশক্তি বা পুরুষকারের জন্যই সম্ভব হইতেছে। ইহার উপর দৈবের বা ভগবানের কোন হাত নাই। রক্তের তেজ যতদিন থাকে ততদিন মানুষ এইভাবে চিন্তা করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখ-বিপদ-দুর্ভাগ্য দেখা দিলেই তাহার মনের প্রতিক্রিয়া অন্য আকার ধারণ করে। বিপদের পর বিপদ যখন ঘনাইয়া আসে তখন আত্মশক্তিতে তাহার পূর্বের বিশ্বাস আর থাকে না, তাহার পুরুষকারের প্রতি আস্থাও ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন অবস্থার পরিবর্তনে বাধ্য হইয়া সে দৈব বা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে চায়। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস তাহার যতই কমিতে থাকে, দৈব শক্তির উপর নির্ভর, দৈবানুগ্রহ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। মানবমনের ইহা সাধারণ ধর্ম। উপর্যুপরি সাফল্যলাভ করিতে করিতে মানুষ ভগবানের কথা ভুলিয়া যাইবে কিন্তু দুঃখ-দুর্ভাগ্য যখন উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে ততই দৈবানুগ্রহ লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। স্বাস্থ্যে ও উৎসাহে যখন মানুষের দেহমন ভরপূর তখন তাহার মনের যে অবস্থা, জরা-কম্পিত-দেহ ও শোক-তাপ-বিদীর্ণ মন লইয়া সে অবস্থা সে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে।

ভাবার্থ

(২) নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলির ভাবার্থ লিখ :—

A

(১) অনন্তর কর্ণ অজ্ঞাতভ্রাতা অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে করিতেছ একমাত্র তুমিই এই সকল স্তুতির অধিকারী, কিন্তু বিস্মিত হইয়ো না, আমিও এই সমস্ত অদ্ভুত কর্ম সাধন করিব।"

দুর্যোধন এতক্ষণ অর্জুনের অজস্র প্রশংসাবাদে অতিশয় ঈর্যান্বিত হইতেছিলেন, এক্ষণে তাহার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় অনুরূপ হর্ষযুক্ত হইলেন। লোকসমক্ষে রূঢ় বাক্য-শ্রবণে অর্জুনের একান্ত লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল।

কর্ণ স্বীয় অঙ্গীকার অনুসারে অর্জুনকৃত সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিলে দুর্যোধন আনন্দের উচ্ছ্বাসে থাকিতে না

পারিয়া কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিলেন, "হে বীরবর, তোমার অদ্ভুত কৌশল দেখিয়া অদ্য আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম।"

কর্ণ বলিলেন, "প্রভো, বোধ করি আমি অর্জুনকৃত সর্বপ্রকার কার্যই সম্পাদন করিয়াছি, এক্ষণে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।"

কর্ণের স্পর্ধায় ও দুর্যোধনের অনুমোদনে অর্জুনের রোষের আর সীমা রহিল না। তিনি কর্ণকে সম্বোধনপূর্বক দুর্যোধনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "হে সূতপুত্র, যাহারা অনাহূত সমক্ষে উপস্থিত হয়, এবং অযাচিত বাক্য-বিন্যাস করে, তাহারা যে-লোকে গমন করে, অদ্য আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া তুমি সেই লোকে গমন করিবে।"

কর্ণ উত্তর করিলেন, "হে অর্জুন, এই রঙ্গভূমি যোদ্ধামাত্রেরই অধিকৃত, ইহাতে কাহাকেও আহ্বান বা নিবারণ করা সম্বন্ধে তোমার কোন প্রভুতা নাই।"

অনন্তর অর্জুন দ্রোণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এবং ভ্রাতৃগণকর্তৃক উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থে কর্ণের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সভাস্থ সকলেই মনে মনে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন, দ্রোণ, কৃপ ও পাণ্ডবভ্রাতৃগণ অর্জুনের পক্ষ এবং ধার্তরাষ্ট্র শতভ্রাতা ও অশ্বত্থামা কর্ণের পক্ষ লইলেন।

ভাবার্থ—কর্ণ যে অর্জুনের ভ্রাতা তাহা কর্ণ জানিতেন না। তিনি অর্জুনকে বলিলেন যে, অর্জুন মনে করিয়াছেন যে, কেবল তিনিই এইরূপ প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু কর্ণও এইরূপ কাজ করিতে পারেন। অর্জুনের প্রশংসায় ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন অর্জুনের এইরূপ প্রতিপক্ষ আসিয়াছে দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন। কর্ণের পরুষ বাক্যে অর্জুন লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। কর্ণ অর্জুনের মতোই সমস্ত কাজ করিলে দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইল এবং দুর্যোধন সহর্ষে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন যে, তিনি কর্ণের আশ্চর্য কৌশল দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। কর্ণ বলিলেন যে, এখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্জুনের শক্তির প্রকৃত পরিচয় পাইতে চাহেন। কর্ণের উক্তিতে ও দুর্যোধনের আচরণে একান্ত রুষ্ট হইয়া অর্জুন বলিলেন যে, যাহারা অনাহূত হইয়া আসে এবং বিনা আহ্বানে বাক্য

বলে তাহারা যে-লোকে যায় অর্জুনের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া কর্ণও সেই লোকে গমন করিবেন। কর্ণ বলিলেন যে, রঙ্গভূমিতে প্রত্যেক যোদ্ধারই সমান অধিকার। সুতরাং কাহাকেও আহ্বান বা নিবারণ করার অধিকার অর্জুনের নাই। অর্জুন দ্রোণের অনুজ্ঞা লইয়া যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কর্ণের দিকে গেলেন। তখন দ্রোণ, কৃপ ও পাণ্ডবগণ মনে মনে অর্জুনের পক্ষ লইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও অশ্বত্থামা কর্ণের পক্ষ লইলেন।

(২) ময়দানব পূর্বোত্তর দিগ্‌বিভাগে প্রস্থান করিয়া কৈলাসের উত্তরাংশে মৈনাক-সন্নিধানে দানবরাজ্যান্তর্গত এক সুমহান্ পর্বতে উপনীত হইল। অদূরস্থিত বিন্দুনামক সরোবরের নিকটে পূর্বে দানবগণ এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তদুপলক্ষে রচিত সভামণ্ডপের অত্যাশ্চর্য দ্রব্যসম্ভার তথায় রক্ষিত ছিল।

ইহা হইতে ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যজাত আহরণপূর্বক ময় খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার দ্বারা যথেষ্ট সৎকৃত হইয়া পুণ্যদিবসে সভাভূমির পরিসর পঞ্চসহস্র হস্ত পরিমাপ করিয়া কৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে কতক দিব্য, কতক মানুষ, কতক আসুরচ্ছন্দে এক অলোকসামান্য সুবর্ণময় অত্যুন্নত বৃক্ষাকার-স্তম্ভ-রক্ষিত মণিখচিত সভামণ্ডপ নির্মাণকার্য আরম্ভ করিল।

ক্রমে মণ্ডপস্থ বিবিধ স্ফটিক মণিমাণিক্য-অলংকৃত কুট্টিম ও ভিত্তি অপূর্ব শোভা ধারণ করিতে লাগিল: সভার মধ্যে স্ফটিকময় সোপান-বিশিষ্ট ও রত্নমণ্ডিত-পরিসর-বেদিকা-শোভিত এক স্বচ্ছজল কৃত্রিম সরোবর সন্নিবেশিত হইল। মণ্ডপের চতুর্দিকস্থিত ভূমি—পদ্মবিশিষ্ট বিবিধ পুষ্করিণী, ছায়াসম্পন্ন তরুরাজি ও সুরভি কাননের দ্বারা অলংকৃত হওয়ায় জলজ স্থলজ পুষ্পগন্ধযুক্ত সমীরণে সভাস্থলী আমোদিত হইয়া উঠিল।

এদিকে চতুর্দশ মাস অবিশ্রান্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অবশেষে ময়দানব যুধিষ্ঠিরকে সভাসমাপ্তির সংবাদ প্রেরণ করিলে ধর্মরাজ প্রীত হইয়া নানাদিগ্‌দেশাগত ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত পায়স ফলমূল মৃগমাংসাদি ভোজন ও বস্ত্র-মাল্যাদিদানে পরিতৃপ্ত করিয়া সভাপ্রবেশ করিলেন।

তথায় গগনস্পর্শী পুণ্যাহধ্বনিতে উদ্‌বোধিত হইয়া গীতবাদ্যপুষ্পাদির দ্বারা দেবার্চনা ও দেবস্থাপনা করিলেন।

ভাবার্থ—কৃষ্ণের অনুজ্ঞায় ময়দানব সভাগৃহ নির্মাণের আয়োজন করিতে লাগিল। সে পূর্বোত্তর দিকে কৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্বতের নিকটে সুমহান্ পর্বতে গিয়া বিন্দুসরোবরের নিকট হইতে দানবদের মহাযজ্ঞ উপলক্ষে নির্মিত সভামণ্ডপের উপকরণাদি আহরণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহার পর একটি পুণ্যদিনে পাঁচ হাজার হাত মাপিয়া লইয়া তাহার উপর স্বর্ণনির্মিত মণিখচিত বৃক্ষের মতো স্তম্ভধৃত সভাগৃহ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে মণ্ডপের স্ফটিক ও মণিমাণিক্যখচিত কুট্টিম ও ভিত্তি অপূর্ব শোভাময় হইয়া দেখা দিল। সভার মধ্যে স্ফটিকের সোপানযুক্ত ও রত্নখচিত প্রশস্ত বেদিকাযুক্ত এক কৃত্রিম সরোবর রচিত হইল। মণ্ডপের চারিদিকে পদ্মযুক্ত পুষ্করিণী, ছায়াশীতল বৃক্ষ ও সুগন্ধি উদ্যান স্থাপিত হওযায় সভাগৃহ সুরভিত হইয়া উঠিল। চৌদ্দ মাস ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে কাজ করার পর সভাগৃহনির্মাণ শেষ হইলে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে ভোজন ও দানে পরিতৃপ্ত করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন ও বিপুল সমারোহে দেবার্চনা ও দেবমূর্তি-স্থাপনা করিলেন।

(৩) দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও স্খলিতার্ধবসনা কৃষ্ণা এককালে লজ্জা ও ক্রোধে দগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "রে দুরাত্মন্, এই সভা-মধ্যে আমার ইন্দ্রতুল্য গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সমক্ষে তুই কোন্ সাহসে আমাকে এই অবস্থায় আনিলি। স্বয়ং ইন্দ্র তোর সহায় থাকিলেও রাজপুত্রগণ তোকে ক্ষমা করিবেন না।"

কিন্তু দুঃশাসনকে কেহই নিবারণ করিতেছেন না দেখিয়া অভি-মানিনী পাঞ্চালী পুনরায় বলিলেন, "হায়, ভরতবংশীয়গণের ধর্মে ধিক্, অদ্য বুঝিলাম ক্ষত্রচরিত্র নষ্ট হইয়াছে, যেহেতু সভাস্থ সকলে বিনা প্রতিবাদে কুলধর্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন।"

এই বলিয়া রোরুদ্যমানা কৃষ্ণা স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। রাজ্য ধন মান সম্ভ্রম সমস্ত যাওয়ায় তাঁহাদের যাহা না হইয়াছিল, দ্রৌপদীর এই সকরুণ কটাক্ষে তাঁহাদের মনে দুর্নিবার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল।

কর্ণ পূর্ব অপমান স্মরণ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলেন, শকুনিও দ্রৌপদীর অবমাননায় যোগদান করিলেন, দুঃশাসন "দাসী দাসী" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিল।

ভীমসেন প্রিয়তমার এ অবমাননায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে যুধিষ্ঠির, দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিগণ গৃহস্থিত দাসীকেও পণ রাখিয়া কখনও ক্রীড়া করে না, তাহাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। দেখো, তুমি বহুকষ্টলব্ধ ধনসকল এবং তোমার অধীন আমাদিগকে একে একে পরবশে বিসর্জন দিলে, আমি তাহাতেও ক্রোধ প্রকাশ করি নাই। কিন্তু তোমার এই শেষ কার্য যৎপরোনাস্তি গর্হিত হইয়াছে। তোমারই অপরাধে ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ এই অসহায় বালাকে ক্লেশ দিতে সাহসী হইল। তোমার দ্যূতাসক্ত হস্তদ্বয় ভস্মসাৎ করিলে তোমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। সহদেব, ত্বরায় অগ্নি আনয়ন করো।"

অর্জুন এই কথায় অগ্রজকে তিরস্কারপূর্বক কহিলেন, "হে আর্য, তুমি পূর্বে তো কখনো ঈদৃশ দুর্বাক্য প্রয়োগ করো নাই। মনের আবেগে শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়ো না। দেখো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষত্রধর্মানুসারেই ক্রীড়া করিয়াছেন, ক্ষত্রধর্মানুসারেই অবনতমস্তকে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।"

ভাবার্থ :—প্রচণ্ড আকর্ষণে কেশবাস স্রস্ত হওয়ায় কৃষ্ণা লজ্জা ও ক্রোধে দগ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে দুরাত্মা সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, সভামধ্যে তাঁহার গুরুজনগণ আছেন, সেখানে যে তাঁহাকে এইভাবে আনিয়াছে স্বয়ং ইন্দ্রও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু কেহই তাঁহার রক্ষায় আগাইয়া আসিতেছেন না দেখিয়া তিনি অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া ভরতবংশকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন যে, ক্ষত্রধর্মের বিচ্যুতি হইয়াছে, কারণ সভার সকলে কুলধর্মের এই ব্যতিক্রম বিনা প্রতিবাদে দেখিতেছেন। এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামী পাণ্ডবদের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। কৃষ্ণার এই অবমাননায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, দ্যূতক্রীড়ায় দয়াপরবশ হইয়া গৃহের দাসীকেও পণ রাখা হয় না।

যুধিষ্ঠির যে রাজ্যধন বা ভ্রাতাদের বিসর্জন দিয়াছেন ইহাতে তিনি ক্ষুব্ধ হন নাই, কিন্তু কৃষ্ণাকে দ্যূতক্রীড়ায় বিসর্জন গুরুতর অন্যায় হইয়াছে। তাঁহারই জন্য অসহায়া কৃষ্ণাকে কৌরবদের হাতে এই নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্ত হাত দু'টিকে অগ্নিতে ভস্ম করিলে উপযুক্ত শাস্তি হয় বলিয়া তিনি সহদেবকে অগ্নি আনিতে বলিলেন। অর্জুন ভীমকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, ভীম পূর্বে কখনও এরূপ কটুবাক্য বলেন নাই। তিনি যেন ভাবাবেগে শত্রুর ইচ্ছাপূরণ না করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্মানুসারে ক্রীড়া করিয়া ক্ষত্রধর্মানুসারে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।

(৪) অনন্তর বিরাটনন্দন পার্থের আদেশানুসারে দ্রোণাচার্যের প্রতি রথচালনা করিলেন। তুল্যবীর গুরুশিষ্যের সংঘটন সকলে বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং সৈন্যগণ হইতে তুমুল শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল। অর্জুন প্রথমে গুরুদর্শনে মহানন্দসহকারে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্বক বিনয়বাক্যে কহিলেন, "হে সমরদুর্জয়, আমরা বনবাস-জনিত বহু কষ্ট ভোগ করিয়া এক্ষণে কৌরবগণের শত্রুপক্ষের মধ্যে গণ্য হইয়াছি; অতএব আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন না। আপনি প্রথমে প্রহার না করিলে আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না, অতএব আপনি বাণত্যাগ করুন।"

অনন্তর দ্রোণ অর্জুনের প্রতি বাণত্যাগ করিলে অর্জুন পথেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণার্জুনের সমরকৃত্য আরম্ভ হইল। উভয়েই মহারথী, উভয়েই দিব্যাস্ত্রবিশারদ, সকলে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের অদ্ভুত কর্ম দর্শন করিতে লাগিল।

কৌরবগণ বলিলেন, "অর্জুন ব্যতীত কেহই আচার্যের সমকক্ষ হইতে পারিত না, ক্ষত্রিয়ধর্ম কি ভয়ানক যে, পার্থকে গুরুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।"

এ দিকে বীরদ্বয় সম্মুখবর্তী হইয়া পরস্পরকে শরজালে সমাবৃত ও ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য অর্জুনের অভ্রান্ততা, লঘু-হস্ততা ও দূরপাতিতা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সব্যসাচী ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া দুই হস্তে এত বেগে বাণবর্ষণ আরম্ভ

করিলেন যে, কখন শরগ্রহণ করিতেছেন, কখন নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। সৈন্যগণ আচার্যকে অর্জুন-বাণে একান্ত সমাচ্ছন্ন দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তখন অশ্বত্থামা সহসা অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিয়া দ্রোণাচার্যকে প্রস্থান করিবার অবসর প্রদান করিলেন।

ভাবার্থ—অর্জুনের আদেশে বিরাট পুত্র তখন দ্রোণাচার্যের দিকে রথ লইয়া গেলেন। গুরু ও শিষ্য সম্মুখীন হইয়াছেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং সৈন্যরা শঙ্খধ্বনি করিল। অর্জুন গুরুকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন যে, তাঁহারা বনবাসের কষ্ট ভোগ করিবার পর এখন কৌরবদের শত্রু হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তিনি যেন তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হন। দ্রোণ প্রথমে আঘাত না করিলে তিনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। দ্রোণ শরক্ষেপ করিলে অর্জুন পথেই তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথা দিব্যাস্ত্রধারী এই দুই বীরের যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল সকলে তাহা সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল। কৌরবরা বলিল যে, অর্জুন ছাড়া আর কেউ আচার্য দ্রোণের সমকক্ষ নয়। ক্ষত্রধর্মের অনুরোধে অর্জুনকে গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছে।

এদিকে বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অস্ত্রবর্ষণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য অর্জুনের শরনিক্ষেপনৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ক্রমে সব্যসাচী দুই হস্তে এত বেগে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন যে, তিনি কখন বাণ গ্রহণ করিতেছেন আর কখন নিক্ষেপ করিতেছেন তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। দ্রোণকে অর্জুনের বাণে আচ্ছন্ন দেখিয়া সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন অশ্বত্থামা অর্জুনের দিকে ধাবমান হইয়া তাঁহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিলে দ্রোণাচার্য প্রস্থান করিলেন।

(৫) প্রভাতে সুমধুর-স্বর-সম্পন্ন বৈতালিকের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া মহাত্মা কৃষ্ণ জপ ও হোমান্তে বসনপরিধানপূর্বক নবোদিত আদিত্যের উপাসনা করিলেন। ইত্যবসরে দুর্যোধন ও শকুনি তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া সংবাদ দিলেন, "হে কেশব, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবগণ এবং অন্যান্য ভূপালবৃন্দ সভায় সমুপস্থিত হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

বাসুদেব তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে সৎকার করিয়া দারুক-সারথি-সমানীত রথে আরোহণ করিয়া অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া রাজসভায় গমন করিলেন।

যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ প্রবিষ্ট হইবামাত্র কুরুবৃদ্ধগণ আসন পরিত্যাগ-পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র উত্থিত হইলে তত্রস্থ সহস্র সহস্র ভূপতি গাত্রোত্থান করিলেন। কৃষ্ণ হাস্যমুখে সকলকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন।

তখন সভাস্থ সকলে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কর্ণ এবং দুর্যোধন অনতিদূরে একাসনে অবস্থিত হইলেন এবং বিদুর কৃষ্ণের পার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর সকলে কৃষ্ণের প্রস্তাবের প্রতীক্ষায় তাঁহার প্রতি চাহিয়া নীরব রহিলেন। তখন ধীমান্ বাসুদেব জলদ্‌গম্ভীর স্বরে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, "হে ভরতবংশাবতংস, আমার বিবেচনায় কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধিস্থাপনপূর্বক বীরগণের বিনাশ নিবারণ করা কর্তব্য। এই প্রার্থনা করিতেই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে কুরুপ্রবীর, পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্ধ-প্রদানপূর্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন ভিন্ন আমার আর অন্য প্রস্তাব করিবার নাই। উপস্থিত সভাসদের মধ্যে কাহারও যদি অন্য কোনো সংগত প্রস্তাব থাকে, তবে তাহা শ্রবণ করা যাক।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে কৃষ্ণ, তোমার বাক্য ধর্মানুমোদিত তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু দেখিতেছ যে, আমি স্বাধীন নহি। আমার প্রিয়-কার্য অনুষ্ঠিত হয় না; অতএব তুমি দুর্যোধনকে বুঝাইবার নিমিত্ত যত্ন করো, সে আমাদের কাহারও বাক্য গ্রাহ্য করে না। তুমি তাহাকে শান্ত করিতে পারিলে যথার্থ বন্ধুজনোচিত কার্য হইবে।"

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যানুসারে বাসুদেব দুর্যোধনের অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মৃদুবচনে কহিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ, তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতেছ, তাহা তোমার বংশের উপযুক্ত হইতেছে না। সেই

বিপরীত-ব্যবহার-জনিত অনর্থ-পরিহারপূর্বক নিজের ভ্রাতৃগণের ও মিত্রসকলের শ্রেয় সাধন করো। হে দুর্যোধন, পাণ্ডবদের সহিত সন্ধিস্থাপন করা তোমার গুরুজন সকলেরই অভিপ্রেত; অতএব তাহা তোমারও অনুমোদিত হউক।"

ভাবার্থ—প্রভাতে কৃষ্ণ বৈতালিকদের গানে জাগিয়া উঠিয়া জপ ও হোমের পর সূর্যের উপাসনা করিলেন। ইতিমধ্যে দুর্যোধন ও শকুনি তাঁহার কাছে আসিয়া জানাইলেন যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরব ও অন্যান্য রাজারা সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কৃষ্ণ তাঁহাদের অভিনন্দিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সৎকারপূর্বক দারুক পরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া রাজসভায় গেলেন। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিলে কুরুবৃদ্ধগণ ও সমাগত রাজবৃন্দ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে সকলকে প্রত্যভিনন্দিত করিলেন। সভার সকলে আসনে বসিলে কৃষ্ণ গম্ভীরকণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার মতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিয়া বীরনাশ রোধ করাই সংগত। তিনি পাণ্ডবদের প্রাপ্য অর্ধরাজ্য দান করিয়া সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া সভায় অপরের কোনো সংগত প্রস্তাব আছে কিনা জানিতে চাহিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন যে, কৃষ্ণের বাক্য ধর্মসংগত কিন্তু তিনি স্বাধীন নন। সুতরাং কৃষ্ণ যেন দুর্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। দুর্যোধনকে শান্ত করিলেই যথার্থ বন্ধুর কাজ করা হইবে। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধ অনুসারে কৃষ্ণ দুর্যোধনকে সম্বোধন করিয়া মৃদুভাবে বলিলেন, তাঁহার কার্য বংশের উপযুক্ত হইতেছে না; তিনি যেন অসমীচীন আচরণ পরিত্যাগ করিয়া সকলের কল্যাণ সাধন করেন। পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই গুরুজনদের ইচ্ছা—দুর্যোধন তাহাতে সম্মত হউন।

সংক্ষিপ্তসার

(৩) নিম্নলিখিত অংশগুলির সংক্ষিপ্তসার (Precis) লিখ :—

(৬) তথায় দেখিলেন, স্বীয় আত্মজ সত্যপরায়ণ মহাতেজা কর্ণ পূর্বমুখে বসিয়া বেদপাঠ করিতেছেন। পৃথা কর্ণের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা থাকিয়া তাঁহার জপাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ পর্যন্ত কর্ণ পূর্বমুখে অবস্থান করিয়া পরিশেষে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমাভিমুখে

আবর্তিত হইবামাত্র কুন্তী তাহার নয়নপথে পতিত হইলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "ভদ্রে, অধিরথ ও রাধার পুত্র আপনাকে অভিবাদন করিতেছে। আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন। আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে।"

কুন্তী কহিলেন, "বৎস, তুমি অধিরথ বা রাধার পুত্র নহ, সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমারই সূর্যদত্ত পুত্র, কন্যাবস্থায় আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তুমি শাস্ত্রানুসারে মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র হইয়া মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্য না করিয়া দুর্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি ভালো হইতেছে। তুমি সর্বগুণসম্পন্ন এবং আমার পুত্রগণের অগ্রজ, অতএব তোমার সূতপুত্র-সংজ্ঞা তিরোহিত হওয়া কর্তব্য।"

কুন্তীর বাক্যাবসানে কর্ণ কহিলেন, "হে ক্ষত্রিয়ে, আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না, উহাতে আমার ধর্মহানি হইবে। আপনার কর্মদোষেই আমি সূতজাতিমধ্যে গণ্য হইয়াছি, আপনি জন্মমাত্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ক্ষত্রিয়জন্ম বৃথা করিয়াছেন, কোন্ শত্রু ইহা অপেক্ষা আমার অধিক অপকার করিতে পারিত! ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ আমার সর্বপ্রকার সৎকার করিয়া আসিতেছেন, আপনার অনুরোধে তাঁহাদের প্রতি কী প্রকারে কৃতঘ্ন হইব। অতএব দুর্যোধনের হিতার্থে আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিব, ইহা অনিবার্য। তবে, হে পুত্রবৎসলে, আপনার প্রীতির নিমিত্ত আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আপনার এই চারি পুত্রের সহিত আমার কোন বৈর নাই, ইহাদিগকে আমি সংহার করিব না। সুতরাং আপনার পঞ্চপুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না—হয় অর্জুন নয় আমি জীবিত থাকিব।" (২৩০ শব্দ)

সংক্ষিপ্তসার—পূর্বদিকে মুখ করিয়া বেদপাঠরত কর্ণের পশ্চাতে কুন্তী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ হইয়া গেলে কর্ণ মুখ ফিরাইয়া কুন্তীকে

দেখিতে পাইলেন এবং নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুন্তী বলিলেন যে, কর্ণ অধিরথ বা রাধার পুত্র নন—কুন্তী কন্যা অবস্থায় সূর্যের বরে তাঁহাকে পাইয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুর পুত্র। কর্ণ বলিলেন যে, কুন্তীর বাক্য গ্রহণ করিলে তাঁহার ধর্মহানি হইবে। জন্মমাত্রে পরিত্যক্ত হওয়ায় তাঁহার ক্ষত্রিয়জন্ম ব্যর্থ হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সর্বদাই তাঁহার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, তিনি কৃতঘ্ন হইতে পারিবেন না, তিনি দুর্যোধনের পক্ষে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। তবে তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, অর্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডবদের সহিত তাঁহার বৈরভাব না থাকায় তিনি তাঁহাদের সংহার করিবেন না। (১০১ শব্দ)

(৭) অর্জুন কহিলেন, "হে কৃষ্ণ, মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করা আমার শতগুণে শ্রেয় বোধ হইতেছে। ইহারা বিনষ্ট হইলে আমরা জীবনধারণেই কোন সুখ পাইব না, তবে রাজ্য লইয়া কী করিব।...হে সখে, আমি কাতরতা-বশতঃ ধর্মান্ধ হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আমাকে উপদেশ দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।"

তখন কৃষ্ণ সস্মিতবচনে অর্জুনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ, যে সকল যুক্তির দ্বারা তুমি আত্মপীড়ন করিতেছ তাহা প্রথম দৃষ্টিতে সুসম্বদ্ধ বটে, কিন্তু তুমি ধীরভাবে বিবেচনা করিলে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। ক্ষুদ্র মানবীয় সুখদুঃখের উপর কর্তব্যাকর্তব্য নির্ভর করে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি-অনুসারে ফলাফল বিচার করিতে গেলে সংশয়শূন্য ও স্থিরসঙ্কল্প হইয়া কোনো কার্যই করা যায় না। সেই নিমিত্ত ফলাফল ও স্বীয় সুখদুঃখ নগণ্য করিয়া স্বশ্রেণীর নির্দিষ্ট ধর্মানুসারে কর্তব্য পালন করিতে হয়। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, তুমি হৃদয় দৃঢ় করিয়া ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তোমাকে কিছুমাত্র পাপ স্পর্শ করিবে না। হে পার্থ, যে চিরন্তন ঘটনাপরম্পরার ফলে এই সুমহান্ কুলক্ষয় আজি উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তোমার বা কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রভুতা বা দায়িত্ব নাই; অতএব হে স্বজনবৎসল, তুমি

এই সান্ত্বনা লাভ কর যে, তুমি কাহারও মৃত্যুর কারণস্বরূপ হইতে পার না। কার্যকারণ প্রবাহে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে। তন্মধ্যে তুমি স্বীয় কর্তব্য অকাতরে পালন করিলে তোমার ধর্মরক্ষা ও পরিণামে শাশ্বত মঙ্গল লাভ হইবে।"

কৃষ্ণের এই উপদেশ-শ্রবণে অর্জুনের করুণাজনিত মোহ অপসৃত হইল এবং তিনি স্বীয় কুলধর্ম স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া মনঃসংযমপূর্বক কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে বাসুদেব, তোমার অনুগ্রহে আমার মোহান্ধকার নিরাকৃত হইল। তুমি আমাকে যুদ্ধানুষ্ঠান করিবার যে উপদেশ প্রদান করিলে আমি অবশ্যই তাহা সাধ্যানুসারে পালন করিব।" (২৩০ শব্দ)

সংক্ষিপ্তসার—অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন যে, গুরুজনগণকে যুদ্ধে নিহত করার চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ভালো। তিনি এই অবস্থায় কৃষ্ণের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন যে, অর্জুনের যুক্তি আপাতদৃষ্টিতে সংগত বলিয়া মনে হইলেও আসলে এই যুক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ। নিজের সুখদুঃখের ভিত্তিতে কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার না করিয়া স্বধর্মের উপর ভিত্তি করিয়া কর্তব্য পালন করিতে হয়। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অর্জুন যেন ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন—তাহা হইলে তাঁহার পাপ হইবে না। এই কুলক্ষয়ের ব্যাপারে অর্জুনের দায়িত্ব নাই, তিনি কাহারও মৃত্যুর কারণ হইতে পারেন না। কার্যকারণ পরম্পরায় ঘটনা ঘটিতেছে—তাহার মধ্যে অর্জুন আপনার কর্তব্য পালন করিলেই ধর্মরক্ষা হইবে। কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের চিত্ত স্থির ও মোহ দূর হইল। (৯৬ শব্দ)

(৮) সৈন্যগণ নিবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ কবচ ও অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক ভীষ্মের নিকট সমাগত হইয়া অভিবাদন করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন কুরুপিতামহ সকলকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "হে মহাভাগগণ, তোমাদের স্বাগত, আমি তোমাদের দর্শনে অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম।"

ক্ষণকাল পরে ভীষ্ম পুনরায় কহিলেন, "হে ভূপতিগণ, আমার মস্তক লম্বমান হইতেছে ; অতএব আমাকে উপাধান প্রদান করো।"

রাজগণ তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে বহুবিধ মহামূল্য সুকোমল উপাধানসকল আনয়ন করিলেন, কিন্তু ভীষ্ম তাহা গ্রহণ না করিয়া অর্জুনের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "হে মহাবাহো, হে বৎস, তুমি আমাকে উপযুক্ত উপাধান প্রদান করো।"

তখন সাশ্রুলোচন ধনঞ্জয় পিতামহের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া গাণ্ডীব আনয়নপূর্বক ভীষ্মের মস্তকের নিম্নদেশে তিনটি শর নিক্ষেপ করিলে ভীষ্ম শরশয্যার উপযোগী উপাধান প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্টচিত্তে অর্জুনকে আশীর্বাদ করিলেন।

পরে শস্ত্রসন্তাপিত ভীষ্ম ধৈর্যগুণে বেদনা সংবরণপূর্বক পানীয় প্রার্থনা করিলেন। তখন সকলে চতুর্দিক হইতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী ও সুশীতল জলপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিলেন, কিন্তু পিতামহকে ইহাতে অসন্তুষ্ট দেখিয়া অর্জুন পুনরায় তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া বরুণাস্ত্র দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভূমি বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে অতি শীতল বিমল দিব্য স্বাদু-জলের উৎস উত্থিত হইল, তদ্দ্বারা ভীষ্ম অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া অর্জুনকে ভূরিভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শল্যোদ্ধারকুশল সুশিক্ষিত বৈদ্যগণ সর্বপ্রকার উপকরণ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম তাহা দেখিয়া কহিলেন, "হে দুর্যোধন, তুমি ইহাদিগকে উপযুক্ত সৎকার করিয়া বিদায় করো। আমি ক্ষত্রিয়বাঞ্ছিত পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছি, চিকিৎসার আর প্রয়োজন নাই। আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে এই শরশয্যার সহিত আমার শরীর দগ্ধ করিয়ো।"

সংক্ষিপ্তসার—উভয় পক্ষের বীরগণ অভিবাদন করিয়া ভীষ্মকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার মাথা ঝুলিয়া পড়িতেছে, সুতরাং উপাধান প্রয়োজন। রাজগণের আনীত বহুমূল্য কোমল উপাধান গ্রহণ না করিয়া অর্জুনকে উপযুক্ত উপাধানের জন্য অনুরোধ করিলে অর্জুন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ভীষ্মের মাথার নীচে তিনটি শর নিক্ষেপ করিয়া ভীষ্মকে উপযুক্ত উপাধান দিলেন। আনন্দিত হইয়া ভীষ্ম অর্জুনকে আশীর্বাদ করিলেন। তৎপর অস্ত্র-পীড়িত ভীষ্ম পানীয় চাহিলেন। সকলে তখন কূপের শীতল জল আনিল। কিন্তু ভীষ্মকে অসন্তুষ্ট দেখিয়া অর্জুন বরুণাস্ত্রে তাঁহার ডান পাশের মাটি ভেদ করিলে সেখান হইতে শীতল নির্মল পানীয়ের উৎস বাহির হইল।

পরিতৃপ্ত ভীষ্ম অর্জুনকে আশীর্বাদ করিলেন। শল্যচিকিৎসকগণকে বিদায় দিয়া ভীষ্ম বলিলেন যে, তাঁহার চিকিৎসা নিষ্প্রয়োজন—তিনি ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যেন তাঁহার দেহ শরশয্যা-সমেত দগ্ধ করা হয়।

(৯) এইরূপ কথোপকথনে কৃষ্ণ ও অর্জুন শিবিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পাণ্ডবগণ নিতান্ত বিমর্ষ ও বিচেতনপ্রায় হইয়া বসিয়া আছেন। দুর্মনায়মান ধনঞ্জয় শিবিরমধ্যে ভ্রাতা ও পুত্রগণের সকলকেই অবলোকন করিলেন; কিন্তু অভিমন্যুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, "হে বীরগণ, তোমাদের সকলেরই মুখ বিবর্ণ দেখিতেছি এবং তোমরা কেহই আমাকে আজি অভিনন্দন করিতেছ না। বৎস অভিমন্যু কোথায়। সেই অদীনাত্মা প্রত্যহ প্রত্যুদ্‌গমনপূর্বক আমাকে অভ্যর্থনা করে। আজ আমি শত্রু-সংহার করিয়া আগমন করিতেছি; কিন্তু সে কেন হাস্যমুখে আমাকে সম্ভাষণ করিতেছে না। শুনিলাম, আজ আচার্য চক্রব্যূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তোমরা অভিমন্যুকে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দাও নাই তো? এ ব্যূহ সে ভেদ করিতে জানে মাত্র, আমি তাহাকে নিষ্ক্রমণের কৌশল উপদেশ করি নাই।"

অনন্তর সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া অর্জুন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অসহ্য শোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা পুত্র, তোমাকে বার বার নিরীক্ষণ করিয়াও তৃপ্ত হইতাম না, এক্ষণে কাল এই ভাগ্য-হীনের নিকট হইতে তোমাকে হরণ করিল। আমার হৃদয় বজ্রসারবৎ কঠিন সন্দেহ নাই, এইজন্যই সেই দীর্ঘবাহুর অদর্শনে এখনও ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না। এক্ষণে বুঝিলাম কী নিমিত্ত গর্বিত ধার্তরাষ্ট্রগণ সিংহনাদ করিতেছিল। কৃষ্ণও আগমনকালে কৌরবগণের প্রতি যুযুৎসুর এই তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, "হে অধার্মিকগণ, তোমরা অর্জুনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া এক বালকের প্রাণসংহার করিয়া বৃথা আনন্দিত হইতেছ।"

মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া তাঁহার সান্ত্বনার্থে কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়, এরূপ ব্যাকুল হইয়ো না। শূরগণের এই গতিই বাঞ্ছনীয়। অভিমন্যু বীরজনাকাঙ্ক্ষিত দিব্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তোমার ভ্রাতা ও বন্ধুগণ তোমার শোক-সন্দর্শনে একান্ত সন্তপ্ত ও অভিভূত হইতেছেন, অতএব তুমি আত্মসংযমপূর্বক তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করো।"

সংক্ষিপ্তসার—কৃষ্ণ ও অর্জুন শিবিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পাণ্ডবগণ শোকার্ত হইয়া বসিয়া আছেন। অভিমন্যুকে না দেখিয়া অর্জুন ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র অভিমন্যু কেন প্রত্যহের মতো হাসিমুখে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে আসিতেছে না। তিনি শুনিয়াছেন যে, আচার্য সেদিন চক্রব্যূহ নির্মাণ করিয়াছেন—অভিমন্যু কেবল সে ব্যূহভেদের কৌশল জানে, নিষ্ক্রমণের কৌশল জানে না। পাণ্ডবগণ তাহাকে সেই ব্যূহে প্রবেশ করিতে দেয় নাই তো!

সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া অর্জুন প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া শোকাহত হইয়া বিলাপ করিয়া বলিলেন যে, নয়নানন্দদায়ক পুত্রকে নিষ্ঠুর কাল অপহরণ করিয়াছে। তাঁহার হৃদয় বজ্রবৎ কঠিন সেইজন্য অভিমন্যুকে না দেখিয়াও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই। তিনি এখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সিংহনাদের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

কৃষ্ণ শোকাকুল অর্জুনকে ব্যাকুল হইতে নিষেধ করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, অভিমন্যু বীরোচিত গতি পাইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা ও বান্ধবরাও শোকগ্রস্ত; সুতরাং তিনি যেন নিজে সংযত হইয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা দান করেন।'

(১০) ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ সেই হ্রদকূলে উপনীত হইলে যুধিষ্ঠির লুক্কায়িত দুর্যোধনকে সম্বোধন-পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে কুরুরাজ, তুমি স্বপক্ষের সমস্ত ক্ষত্রিয় ও স্বীয় বংশ বিনষ্ট করিয়া এক্ষণে কী নিমিত্ত নিজ জীবন-রক্ষার্থে জলাশয়ে প্রবেশ করিয়াছ। তোমাকে সকলে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে, কিন্তু আজি তোমাকে প্রাণভয়ে লুক্কায়িত দেখিয়া তাহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে;

অতএব তুমি অচিরাৎ সলিল হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক হয় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্যলাভ করো না হয় আমাদের হস্তে পরাজিত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও।"

এই কথা-শ্রবণে দুর্যোধন জলমধ্য হইতে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ, প্রাণীমাত্রেরই যে প্রাণভয় থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু আমি সেজন্য পলায়ন করি নাই। আমি রথ ও অস্ত্র-হীন অবস্থায় একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এখানে শ্রমাপনোদন করিতেছি মাত্র। তুমি অনুচরবর্গের সহিত কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করো, পরে আমি সলিল হইতে উত্থিত হইয়া যুদ্ধ করিব।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দুর্যোধন, আমরা যথেষ্ট বিশ্রান্ত রহিয়াছি এবং বহুক্ষণ তোমাকে অনুসন্ধান করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।"

তখন দুর্যোধন বলিলেন, "মহারাজ, আমি যাহাদের জন্য রাজ্যলাভ অভিলাষ করিয়াছিলাম, আমার সেই ভ্রাতৃগণ সকলেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অতএব তুমিই এই হস্ত্যশ্বশূন্য বন্ধুবান্ধবহীন ভূমিখণ্ড ভোগ করো। আমার সদৃশ নৃপতি এরূপ রাজ্য-শাসনে অভিলাষ করে না।"

তদুত্তরে যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দুর্যোধন, তুমি জলমধ্যে অবস্থান-পূর্বক বৃথা বিলাপ করিতেছ, উহাতে আমার কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইতেছে না। আর তোমার রাজ্যদানের ভান করিয়াই বা লাভ কী। তোমার দান করিবার অধিকারই বা কোথায় এবং তোমার প্রদত্ত রাজ্য আমিই বা গ্রহণ করিব কেন। অতঃপর তুমি ও আমি, দুইজনের জীবিত থাকিবার আর উপায় নাই; অতএব অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়া হয় রাজ্য না হয় স্বর্গ লাভ করো।"

তখন রাজা দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারবাক্য আর সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা জলমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া কহিলেন, "হে কুন্তী-নন্দন, তোমাদের বন্ধুবান্ধব রথ ও বাহন সমস্তই রহিয়াছে, আমি একে

পরিশ্রান্ত, তাহাতে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র-বিহীন হইয়া কিরূপে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব। এক ব্যক্তির সহিত অনেকের যুদ্ধ কোনোক্রমেই ধর্মসংগত হয় না। হে পাণ্ডবগণ, আমি তোমাদের দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইতেছি না, একে একে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হইলে আমি সকলকেই বিনাশ করিতে পারি।"

সংক্ষিপ্তসার—যুধিষ্ঠির হ্রদের মধ্যে প্রাণভয়ে লুক্কায়িত দুর্যোধনকে জল হইতে উঠিয়া যুদ্ধ করিয়া জয় অথবা বীরলোক লাভ করিতে বলিলেন।

দুর্যোধন উত্তর করিলেন প্রাণীমাত্রেরই প্রাণভয় আছে। কিন্তু তিনি পলায়ন করেন নাই, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছেন মাত্র।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যে, তিনি বহুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছেন। এখন জল হইতে উঠিয়া যুদ্ধ করুন। দুর্যোধন বলিলেন যে, তাঁহার আপনার জন সকলেই স্বর্গে গিয়াছে। সুতরাং তাঁহার রাজ্যশাসনে অভিরুচি নাই—যুধিষ্ঠিরই যেন রাজ্য গ্রহণ করেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যে, দুর্যোধনের রাজ্যদানের অধিকার নাই। আর তিনিও দুর্যোধনের দান গ্রহণ করিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্যোধন জল হইতে বাহির হইয়া বলিলেন যে, পাণ্ডবদের রথ ও অশ্ব আছে—তিনি নিরস্ত্র ও সৈন্যহীন। একজনের সঙ্গে অনেকের যুদ্ধ ধর্মসংগতও নয়। তিনি পাণ্ডবদের সহিত একে একে যুদ্ধ করিয়া সকলকে সংহার করিতে পারেন।

গল্পে উপনিষদ

ভাব-সম্প্রসারণ

১। নিম্নলিখিত অংশগুলির ভাব সম্প্রসারণ কর ঃ

(ক) যাহাতে আমি অমৃত হইব না, তাহা দিয়া আমি কি করিব ?

সাধারণ মানুষ এই পৃথিবীর সুখ-সম্পদেই পরিতৃপ্ত থাকে। বৈভব, বিলাস, উৎসবময় জীবনই সাধারণ মানুষের কাম্য। মানুষের সুখের অনুভূতি সাধারণতঃ ভোগ্যবস্তুকে অবলম্বন করিয়াই জাগ্রত হয়। যাহাতে প্রতিদিন আরামে ও সুখে কাটিয়া যায় তাহাই মানুষ চায়। পরিবার, পরিজন এবং পর্যাপ্ত ধনসম্পদ লইয়া সুখময় জীবনযাপনই সাধারণ মানুষের লক্ষ্য।

কিন্তু এমন এক একজন মানুষ পৃথিবীতে আসে যাহারা সাধারণ সুখকর বস্তুতে বিশেষ আনন্দ পায় না। তাহারা জীবনের গভীরতর সত্য অনুসন্ধানের জন্য উৎসুক হয়। ধন-জন মানুষকে সুখ দেয় বটে, কিন্তু তাহার অন্তরকে অফুরন্ত আনন্দে পরিপ্লাবিত করিয়া দিতে পারে না। মানুষ সুখ-সম্পদ ও আরাম পাইলেই তাহার সব কিছু পাওয়া হয় না। ধন-জন নশ্বর, তাহা হইতে যে সুখ পাওয়া যায় তাহাও অচিরস্থায়ী। মানুষের অন্তরে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে যাহা চিরস্থায়ী আনন্দের জন্য ব্যাকুল। মানুষ দেহে অমর হয় না— কিন্তু জীবনের পরম সত্য, আনন্দের পরম উৎস যখন তাহার গোচর হয় তখন তাহার সমগ্র সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যাহার অন্তর সেই চির আনন্দকে লাভ করিবার জন্য একবার উৎসুক হইয়াছে, পার্থিব সব সম্পদই তাহার কাছে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(খ) কর্তব্য করিতে হইলে কর্তব্য সাধনে সুখ পাওয়া চাই।

মানুষের যাহা কর্তব্য তাহা অনেক সময়েই তাহার কাছে আরামের হয় না। সেইজন্য এমন হইতে পারে যে, কর্তব্য-পালনের জন্য তাহাকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে কর্তব্যমাত্রের মধ্যেই কঠোরতা আছে, অবিচলিত নিষ্ঠার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু তাই বলিয়া কর্তব্য যে নিরানন্দজনক এমন নয়। যাহা কর্তব্য তাহার লক্ষ্যে একটা শ্রেয় বস্তু আছে—বর্তমানকালের কঠোর সাধনার শেষে

একটি বৃহৎ আনন্দ থাকে। সেই আনন্দই মানুষকে কর্তব্যপালনের সব দুঃখ অপসারিত করিয়া তাহাকে কর্তব্যসাধনে উৎসাহিত করে। কর্তব্যের পথে চলিতে চলিতে লক্ষ্যের কথা যখন মনে আসে তখন অগ্রসর হওয়া যেন সহজ হইয়া পড়ে।

কর্তব্যপালনে যেখানে কেবল নিরানন্দ সেখানে বুঝিতে হইবে যে, হয় লক্ষ্য বস্তুটি স্পষ্ট নয়, কিংবা কোথাও পথ ভুল হইয়াছে। কর্তব্যপালন করিবার সময় সেই কর্তব্যপালন হইতে যখন আনন্দ পাওয়া যায় তখনই কর্তব্যপালন সহজ হয়, তখনই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ সুগম হইয়া যায়। অন্তরে ঐ আনন্দটুকু না পাইলে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তখন কর্মে শিথিলতা, ত্রুটি ও আগ্রহের অভাব জন্মিতে পারে। সুতরাং কর্তব্যপালন করিবার সময় অন্তরে আনন্দ জাগ্রত হইতেছে কি না তাহা দেখা প্রয়োজন।

(গ) সংশয়ই তো সত্যের জনক। সংশয় না হইলে জিজ্ঞাসা আসে না, জিজ্ঞাসা না আসিলে সত্য লাভ হয় না, তাই সংশয় বরণীয়।

অধ্যাত্ম পথে সাধারণ লোক সংশয়কে ভাল চক্ষে দেখে না। আমরা শুনিয়া থাকি বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। সুতরাং অধ্যাত্ম জগতে সাধারণ লোক সংশয়ীকে শ্রদ্ধা করে না।

ভক্তিপথের অনুশীলনে বিশ্বাস বা আত্মসমর্পণ নিতান্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞানের পথে, পরম সত্য আবিষ্কারের পথে, মনের মধ্যে তীক্ষ্ণ ও তীব্র ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সত্যের স্বরূপটি অবগত হইতে হয়। কোন জিনিষকে জানিবার ইচ্ছার নাম জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা জাগে নাই অথচ সত্যের পূর্ণ স্বরূপটিকে অবগত হওয়া গেল এরকম ব্যাপার সাধারণত ঘটে না। যে সমস্তই বিশ্বাস করিয়া গেল, যাহার মনে কোনই প্রশ্ন জাগিল না তাহার জ্ঞানলাভ হইবে কি করিয়া? সাধারণ জ্ঞানানুশীলন ব্যাপারে যেমন অধ্যাত্ম পথে চলিতে গেলেও তেমনি। সংশয় হইতেই জানিবার ইচ্ছা, সংশয় আছে বলিয়াই মনের ভিতর নানা ভাবে বাদানুবাদ করিতে করিতে সত্যের রূপটিকে বুঝিতে পারা যায়। সত্যের অনুসন্ধান না করিলে সত্যলাভ হয় না। মনের ভিতর সংশয় দেখা না দিলে এই অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিও আসে না। সুতরাং সংশয়কে অধ্যাত্ম পথে শত্রু মনে করিতে নাই, সংশয় অধ্যাত্ম পথে অন্তরায় না হইয়া অনেক ক্ষেত্রেই সহায় হয়।

(ঘ) ধনের নিমিত্তই ধন লোকের প্রিয় হয় না। লোকের নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই ধন প্রিয় হইয়া থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে আত্মদর্শন ও আত্মপোলব্ধির উপদেশ দিতে দিতে এই কথাগুলি বলিয়াছেন। সংসারে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, অর্থ-সম্পদ এই সমস্তই প্রিয় বস্তু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা মানুষের নিজ আত্মার প্রয়োজন সাধন করে বলিয়াই প্রিয় হয়। নিজ আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য পতি পত্নীর প্রিয় হন, পত্নীও পতির প্রিয় হন। নিজের তৃপ্তির জন্যই পিতা মাতা সন্তানকে ভাল বাসিয়া থাকেন। অর্থ বা সম্পদ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করে বলিয়াই মানুষের প্রিয় হয়। এমনকি সর্বলোকের অধীশ্বর যে ভগবান মানুষ তাহাকেও প্রিয় বলিয়া মনে করে নিজ আত্মার পবিতৃপ্তির জন্য। বস্তুর মধ্যে এমন কোন গুণ নাই যাহাতে তাহা মানুষের প্রিয় হইতে পারে। মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন হয় বলিয়া বস্তু মানুষের প্রিয় হয়। সুতরাং আত্মাই সব—আত্মার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নিজস্ব এমন কোন মূল্য নাই যাহাতে তাহাকে প্রিয় মনে করা যাইতে পারে। আমাদের প্রয়োজন অনুসারে বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ পথিকের নিকট একখানি মূল্যবান কাশ্মীরী শাল অপেক্ষা একপাত্র শীতল পানীয় জল অধিকতর প্রিয় ও মূল্যবান হইয়া দেখা দেয়।

ভাবার্থ

২। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলির ভাবার্থ লিখ:—

(ক) আজ যে দেব-ভাগ্যে বড় শুভদিন। সূর্যের শেষ রশ্মিমালার স্বর্ণ আভাটুকু গগনের কোলে মিলাইতে না মিলাইতেই ঐ যে শরতের পূর্ণচন্দ্র দিগবক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া উদিত! ইন্দ্র আজ আর নিজের জগতে নাই। অদূরে দেবগণ তাঁহারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। সম্মুখে মহান্ আশ্চর্যের শেষ জ্যোতি-রেখা আকাশের গায়ে বিলীন হইয়া যাইতেছে। বিস্ময়ে সম্ভ্রমে ইন্দ্রের শির লুটাইয়া পড়িতেছে। ইন্দ্রের নয়নে বিদ্যুৎ-ঝলক খেলিয়া এ আবার কেমন দৃশ্য! ইন্দ্র চাহিলেন, ইন্দ্র দেখিলেন, আকাশের গায়ে এক আশ্চর্য রমণী মূর্তি! রমণী বহুশোভমানা, অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার হেম আভরণ, দেহ জ্যোতিতে দিক্

উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে। কল্যাণকারিণী জননীর মত সেই পরমরমণীয় মূর্তি দর্শনেই বরাভয় বিতরণ করিয়া ইন্দ্রের মনে আনন্দের সঞ্চার করিলেন। ইন্দ্রের মনের অন্ধকার একটু একটু করিয়া দূর হইতে লাগিল। ইনিই উমা! ইনি মা! ইনি দেবমাতা, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মের নির্মল প্রসাদ! ব্রহ্মের অহৈতুকী করুণা ইনিই! নির্মল অন্তঃকরণে এই ব্রহ্মবিদ্যা উমা আপনিই উদিত হইয়া থাকেন। ইনি যাহাকে করুণা করেন, তাহারই শুধু ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়। পরম দেবতা প্রকাশের পূর্বে তাঁহার প্রসাদস্বরূপ মূর্তিমতী করুণা এই উমা আবির্ভূতা হ'ন, এবং সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিয়া সেই মহান্ পুরুষের আবির্ভাব সূচনা করেন।

ভাবার্থ—দেবতাদের ভাগ্যে সেদিন একটি মঙ্গলকর দিন। যেন সূর্যাস্তের পরই চন্দ্রের উদয় হইল। ইন্দ্র আজ নিজের জগতে নাই—দেবতারা অদূরে তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে সেই জ্যোতির রেখা যখন শেষ হইয়া যাইতেছে, ইন্দ্র সম্ভ্রমে মাথা নত করিতেছেন এমন সময় তাঁহার সম্মুখে আকাশের গায়ে এক দিব্য রমণীমূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিলেন। রমণী বহু শোভায় সজ্জিতা, তাঁহার দেহে স্বর্ণালংকার, অঙ্গজ্যোতিতে দশদিক উজ্জ্বলিত। কল্যাণদায়িনী মাতার সেই অপূর্ব মূর্তি আবির্ভূতা হইয়াই যেন বরাভয় দান করিয়া ইন্দ্রের অন্তর আনন্দে ভরিয়া দিলেন। ইন্দ্রের মনের তমসা ধীরে ধীরে বিদূরিত হইতে লাগিল। ইনি দেবমাতা, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মের করুণা। বিমল চিত্তে ইনি স্বতঃই আবির্ভূতা হন। ইনি যাঁহার প্রতি প্রসন্না হন কেবল তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারেন। পরম ব্রহ্মের প্রকাশের পূর্বে অবির্ভূতা হইয়া তাঁহার প্রসাদস্বরূপিণী সাক্ষাৎ করুণা উমা চিত্তের সমস্ত সংশয় দূর করিয়া তাঁহার আবির্ভাবের সূচনা করেন।

(খ) সত্যকাম চলিয়া গেলেন দূরে নিবিড় অরণ্য মধ্যে, সেখানে লোকালয়ের কোন খবর পোঁছে না, এমন কি গুরু গৌতমের আশ্রমেরও কোন সংবাদ যায় না। সেখানে আছে মাঠভরা কোমল কচি ঘাস, আর পার্শ্বেই নদীর শীতল স্রোত। বনে ফুল আছে, ফল আছে, আর আছে শান্ত নীরবতা এবং ধ্যানময় জীবনযাত্রার অপূর্ব

সুযোগ। বালক সত্যকাম একেলা ঐ গভীর বনে চারিশত গাভীর পরিচর্যা করিয়া দিন কাটান, আর গুরুর আদেশমত সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যা-বন্দনা, তপস্যা ও হোম করেন। চারিশত গাভী শিশুর উপর ভারি খুশি, দেখিতে দেখিতে তাহারা স্বচ্ছন্দে চরিয়া ঘাস জল খাইয়া বেশ সুন্দর মোটা-সোটা হইয়া উঠিল। গাভীদের আনন্দ দেখিয়া সত্যকামের মনেও আনন্দ হইতে লাগিল। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা লইয়া সত্যকাম যদি গোধনের পরিচর্যা দ্বারা আচার্যের সন্তোষ জন্মাইতে পারেন, তবেই যে শুধু তাঁহার ব্রত সার্থক হইতে পারে। গুরু প্রসন্ন হইলে তাঁহার সঞ্চিত সমুদয় জ্ঞানই সত্যকাম গুরুর আশীর্বাদে লাভ করিবেন। গুরুর ইচ্ছা হইলে তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার ক্ষণেকের দিব্য আলোকে কাটিয়া যাইবে; নিখিল তত্ত্ব তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইবে।

সত্যকাম কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। কি ভাবে যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, তাঁহার হুঁস নাই। তরুণ তপস্বী প্রাণপণ করিয়া এই দুর্গম অরণ্যে চারিশত ধেনুর সেবা করিতে লাগিলেন।

মাঝে মাঝে নিস্তব্ধ রজনীতে অনন্তনক্ষত্র-খচিত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে পড়িত দুঃখিনী জননীর কথা। তারপরে বুঝি সত্যকাম মা'র কথাও ভুলিয়া গেলেন; সহস্র ধেনু লইয়া তাঁহাকে যে ফিরিতে হইবে, বুঝি সেকথাও ভুলিয়া গেলেন! কিন্তু দেবতাগণ আকাশে থাকিয়া সত্যকামের এই একনিষ্ঠ সেবা ও তপস্যা দেখিয়া প্রীত হইলেন।

ভাবার্থ—সত্যকাম লোকালয় হইতে বহুদূরে বনের মধ্যে চলিয়া গেলেন। গুরু গৌতমের আশ্রম হইতেও তাহা বহুদূরে। সেখানে মাঠের কচি ঘাস, নদীর শীতল জল, বনের ফুল-ফল ধ্যানময় জীবনযাপনের অবসর করিয়া দিয়াছে। বালক সত্যকাম সেখানে চারিশত গোরুর পরিচর্যা করিয়া গুরুর উপদেশ অনুসারে তপশ্চর্যা করেন। সত্যকামের যত্নে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া গোরুগুলি

তাহার উপর খুশি হইল—তাহাদের আনন্দে সত্যকামও আনন্দিত হইল। নিষ্ঠাভরে গো-সেবা করিয়া তিনি যদি গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে পারে। গুরুর প্রসাদে তিনি জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। গুরু যদি কৃপা করেন তাহা হইলে সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র তত্ত্ব তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইবে।

সত্যকাম মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তরুণ তপস্বী এই দুর্গম বনে চারিশত ধেনুর সেবা করিয়া চলিলেন। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধ নিশীথে তারকাময় আকাশের দিকে চাহিয়া তাঁহার নিজের দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়িত। তারপর তিনি বুঝি বা মায়ের কথাও ভুলিয়া গেলেন—সহস্র গাভী লইয়া ফিরিবার কথাও বুঝি ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু দেবতারা আকাশে থাকিয়া তাঁহার এই একনিষ্ঠ সেবা ও তপস্যা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

(গ) আজ ঋষির আশ্রমে বিপুল উৎসব। ঋষির পিতা জীবন ভরিয়াই অন্নদান করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁর নামই হয় সেইজন্য বাজ-শ্রবা। বাজ-শ্রবার পুত্র বাজশ্রবস তাঁহার পিতার অপেক্ষাও এক বড় কীর্তি রাখিতে চাহিলেন। তিনি মহাফল কামনা করিয়া এক আশ্চর্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন—যজ্ঞের নাম বিশ্বজিৎ। এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞে ঋষিকে তাঁহার যথাসর্বস্ব দান করিতে হইবে।

যজ্ঞের আগুন সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে। রাশি রাশি ঘৃত আগুনে আহুতি দেওয়া হইতেছে। পবিত্র ঘৃতের গন্ধে যজ্ঞভূমির আকাশ বাতাস ভরপূর। যজ্ঞের চারিদিকে ঋত্বিক্‌গণ কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন; সোনার মত শ্মশ্রু তাঁহাদের বুকের উপর ঝল্‌মল্ করিতেছে। তাঁহারা কেহ বা মধুর সামগান করিতেছেন, কেহ বা গম্ভীরভাবে ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কেহ আবার স্বরসংযোগে পবিত্র যজুর্বেদ আবৃত্তি করিতেছেন। ভারতবিখ্যাত মুনিঋষিগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ দেখিতেছেন। আজ সকল দিকেই আনন্দ, উৎসব, উল্লাস, কোলাহল। আজ বাজ-শ্রবার পুত্রের সর্বস্ব-দক্ষিণ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। যজ্ঞের দেবতারা তৃপ্ত হইবেন, পুরোহিতগণ তৃপ্ত

হইবেন, মুনিঋষিগণ তৃপ্ত হইবেন, ভূ-ভারতে সকল জীবেরই তৃপ্তি মিলিবে।

কিন্তু একি! এ আনন্দের মধ্যে একটি শিশু সুকুমার-কায় বিষণ্ন কেন? যখন বৃদ্ধেরাও পরম নিশ্চিন্ত হইয়া উৎসব-রত, তখন এই শিশু কেন বিজ্ঞের মত ভাবনায় কাতর? যজ্ঞ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঋষি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এইবার দক্ষিণা দেওয়া হইতেছে একপাল গাভী, পুরোহিতগণ সকলে ভাগ করিয়া লইবেন। গো-দক্ষিণা সকল দক্ষিণার শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এই গাভীগুলি যে একেবারে বুড়া, রুগ্ণ, শীর্ণ; মনে হয়, ইহাদের আয়ু যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। শিশুর বুকে এই দৃশ্য বড় বাজিতেছে। শিশু যে বাজশ্রবসেরই শিশু, বাজ-শ্রবার নাতি! নচিকেতা তার নাম। পিতা কত ফল আশা করিয়া এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিলেন; আর শেষে কিনা দক্ষিণা দিলেন এই বুড়া রোগা অকর্মণ্য গাভীগুলিকে! ঋষিকুমার ভাবিতেছেন, "এরকম দক্ষিণা দিয়া কেহ তো আনন্দলোকে যায় না! যে লোকে যায়, সে অ-নন্দ লোক, আনন্দ লোকের বিপরীত লোক, সেখানে সুখ নাই, কেবল শোক, কেবল দুঃখ!" পিতার মঙ্গলের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া বালক নচিকেতা আবার গাভীগুলির দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই হতভাগ্য জীবগুলির জন্য বিধাতা যে ঘাস-জল মাপাইয়াছিলেন, তাহা জন্মের মত ফুরাইয়া গিয়াছে; দুধ সব জন্মের মত দোহাইয়া রাখা হইয়াছে, গাভীদের শরীরে আর শক্তি নাই, একেবারেই বুড়া।

ভাবার্থ—বাজ-শ্রবা ঋষি সারাজীবন অন্ন দান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বাজশ্রবস পিতার চেয়েও বড়ো কীর্তি রাখিবার জন্য বিশ্বজিৎ নামে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। এই যজ্ঞে সর্বস্ব দান করিতে হয়। ঋষির আশ্রমে বিরাট উৎসব। যজ্ঞের অগ্নি সপ্তজিহ্বা বিস্তার করিয়াছে। আহুতিদত্ত পবিত্র ঘৃতের গন্ধে যজ্ঞভূমি সুরভিত। যজ্ঞের চারিদিকে ঋত্বিক্‌গণ কেহ বা দণ্ডায়মান, কেহ বা সামগানরত, কেহ বা ঋক্ বা যজুর্বেদের মন্ত্র

উচ্চারণ করিতেছেন। ভারতখ্যাত সকল মুনি এই যজ্ঞে আমন্ত্রিত—বাজশ্রবসের এই বিশ্বজিৎ যজ্ঞের চারিদিকেই আনন্দ-কোলাহল। যজ্ঞে দেবতাগণ, পুরোহিতগণ, মুনিগণ—সকল জীবই তৃপ্তিলাভ করিবে।

কিন্তু এই আনন্দোৎসবের মধ্যে একটি শিশু বিষণ্ণ। যজ্ঞ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে ঋষি সর্বস্ব দান করিয়াছেন। এইবার দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতগণকে ধেনুদান করা হইতেছে—ধেনুদান সকল দক্ষিণার শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই গাভীগুলি বয়োপ্রভাবে জীর্ণ ও শীর্ণ। ইহা দেখিয়া বাজশ্রবসের পুত্র শিশু নচিকেতা অত্যন্ত কাতর। পিতা মহাফল কামনা করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন—তাহার দক্ষিণা এই অকর্মণ্য গাভীগুলি! তিনি ভাবিলেন যে, এইরূপ দক্ষিণা দিলে আনন্দলোকের পরিবর্তে দুঃখশোকময় লোকেই যাইতে হইবে। পিতার মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া তিনি জীর্ণ গোধনগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

(ঘ) সংশয়ই তো সত্যের জনক। সংশয় না হইলে জিজ্ঞাসা আসে না, জিজ্ঞাসা না আসিলে সত্য লাভ হয় না, তাই এ সংশয় বরণীয়। এ সংশয়—এ মহান্ প্রশ্ন সাধনারই মাপকাঠি। ভৃগুর এই বরণীয় জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, ভৃগু সাধনার অভ্যন্তর হইয়াছেন, ভৃগু আজ অন্তর্মুখী, তাঁহাকে ফিরায় কে? তিনি আবার পিতার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন,—"আমি ব্রহ্মকে ঠিক জানিতে পারিলাম না, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন।" বরুণ ভৃগুর তপঃশ্রীমণ্ডিত মুখখানি দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন। পুত্র আজ সাধনা-জগতে যতই তপস্যা করিতেছে, ততই তাহার ব্রহ্মকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়িতেছে এবং ব্রহ্মের জন্য যতই ব্যাকুলতা বাড়িতেছে, তপস্যায় ততই তাহার ধীরতা আসিতেছে, চিত্তে ততই স্থিরতা জন্মিতেছে। পথের দুর্গমতা, সংশয়ের কাঁটা কিছুতেই তাহার ভয় বা অবসাদ জন্মাইতে পারিতেছে না। পিতা পুত্রের তপশ্চর্যা ও অধ্যবসায় দেখিয়া পুত্রের সহজ সাধনাকে নষ্ট করিতে চাহিলেন না। তপস্যা-নির্মল চিত্তে উপদেশ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান জন্মান সম্ভবপর হইলেও বরুণ ভৃগুকে এই পথেই চালাইলেন। নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু। বরুণ

ভৃগুকে উপদেশ করিলেন, "তুমি নিজেই নিজের বন্ধু হও। তপোবলের তুল্য বল নাই, এই 'তপঃ'—তপস্যাদ্বারাই তুমি ব্রহ্মকে জান।" বারবার পূর্ণজ্ঞানলাভে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি নিরাশার কথা বলিলেন না, পরাজয় কিছু মনে করিলেন না, অসমতা কোথাও দেখিতে পাইলেন না। সত্যই তো ভৃগু তপস্যা করিয়া এবার তিনি সিঁড়ি পার হইয়াছেন, ব্রহ্মের প্রথম তিনরূপ দেখিতে পারিয়াছেন, তপস্যার তেজ আজ তাঁহার দেহ-মনে অপূর্ব স্নিগ্ধ শোভা দান করিয়াছে। বরুণ আনন্দিত হইয়া তপস্যাকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া ভৃগুকে নবীন প্রেরণা দিলেন,—"বাছা, তপস্যাই ব্রহ্ম, যাও তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষ-ভাবে জান,—'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি'।"

ভাবার্থ—সত্যের মূল সংশয়। সংশয় হইতেই জিজ্ঞাসা—জিজ্ঞাসা হইতে সত্যলাভ। ভৃগুর সংশয় তাঁহার সাধনারই অঙ্গ—তিনি অন্তর্মুখী হইয়া সত্যের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। পিতা বরুণের নিকট গিয়া তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই জানাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ চাহিলেন। বরুণ পুত্রের মুখশ্রী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন—পুত্র যতই তপস্যা করিতেছে ততই তাঁহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রবলতর হইতেছে। পথের দুর্গমতা ও সংশয় তাঁহার মনে অবসাদ বা ভয় জন্মাইতে পারে নাই। তাঁহার তপস্যা ও অধ্যবসায় দেখিয়া তিনি উপদেশ দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার না করিয়া ভৃগুকে পুনরায় তপস্যার পথেই চালাইলেন। তিনি ভৃগুকে নিজেই নিজের বন্ধু হইতে বলিলেন—তপোবলের মতো বল নাই, তপস্যা দ্বারাই তিনি ব্রহ্মকে জানুন। বারবার পূর্ণজ্ঞানলাভে ব্যর্থ হইলেও তিনি নিরাশা বা পরাজয়ের কথা বলিলেন না। ভৃগু তপস্যা করিয়া ব্রহ্মের তিন মূর্তি জানিতে পারিয়াছেন—তপস্যার তেজে তাঁহার দেহমন স্নিগ্ধ, শোভাময়। বরুণ তপস্যাকেই শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া ভৃগুকে তপস্যা করিতে বলিলেন—তপস্যা করিয়াই ভৃগু যেন ব্রহ্মকে জানেন—তপই ব্রহ্ম।

(ঙ) এইবার ব্রাহ্মণ-সভা হইতে উঠিলেন একজন নারী। মূর্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায় আপন পবিত্রশ্রীতে ব্রাহ্মণ সমাজ আলোকিত করিয়া মহীয়সী নারী-ঋষি ক্রমাগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই নারী ছিলেন বচক্নু ঋষির দুহিতা, নাম গার্গী, পিতার নামানুসারে কন্যা

বাচক্লবী নামেও পরিচিতা ছিলেন। সেই স্বাধীন পবিত্র বৈদিক যুগে নারী-পুরুষের অধিকার এখনকার সমাজের অন্যায় শাসনে কোথাও এমন করিয়া স্বতন্ত্র ছিল না। আমরা এই বৃহদারণ্যক উপনিষদেই ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর কথা পড়িব। বেদের অনেক সূক্ত এবং অনেক মন্ত্রের রচয়িতা নারী-ঋষি; এবং এই নারী-ঋষিগণ সকলেই যে ব্রাহ্মণ বা তাদৃশ উচ্চবর্ণের ছিলেন, তাহাও নয়। চণ্ডীর মূল শক্তি যে দেবীসূক্ত, তাহারও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অম্ভৃণ-ঋষির কন্যা বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষী। সে যুগে ঋষিপত্নী বা ঋষি-কন্যাগণ বেদবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়া শুধু যে ঋষি হইতেন, তাহা নয়, ঋষি-সমাজে এবং বড় বড় যজ্ঞসভায় তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইতেন; এবং আবশ্যকমত সে সমুদয় সভায় তর্কবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে প্রবাণ পুরুষ-ঋষিগণকে জর্জরিত করিয়া তুলিতেন। বিদ্যার ক্ষেত্রে নারীর এবং পুরুষের সমান অধিকার ছিল। কোথাও সঙ্কীর্ণতা, সঙ্কোচ বা বন্ধন ছিল না, অবরোধ তো দূরের কথা।

ভাবার্থ—ইহার পর ব্রাহ্মণ-সভা হইতে একজন নারী উঠিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই নারী-ঋষি বচক্লু ঋষির দুহিতা গার্গী—পিতার নামানুসারে বাচক্লবী নামেও অভিহিতা। বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের অধিকার এখনকার মতো অন্যায়ভাবে স্বতন্ত্র ছিল না। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই আমরা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর পরিচয় পাই। অনেক নারী-ঋষি বেদের অনেক সূক্ত ও অনেক মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই সব নারী-ঋষিদের মধ্যে সকলেই যে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণজাতা ছিলেন এমন নয়। চণ্ডীর মূল মন্ত্র যে দেবীসূক্ত তাহার রচয়িতা বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী। সে যুগে ঋষিপত্নী, ঋষি-কন্যাগণ বেদ ও উপনিষৎ চর্চা করিয়া ঋষি হইতেন এবং ঋষি সমাজে এবং যজ্ঞসভায় আমন্ত্রিত হইতেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সে সভায় তর্কবিচারে অগ্রসর হইয়া পুরুষ-ঋষিদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করিতেন। বিদ্যানুশীলনে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার ছিল—কোথাও সংকীর্ণতা বা কোনোরূপ বাধা ছিল না—অবরোধ তো ছিলই না।

সংক্ষিপ্তসার

(৩) নিম্নলিখিত অংশগুলির সংক্ষিপ্তসার লিখ :—

(১) যাজ্ঞবল্ক্য আগে আপনাদের পতিপত্নী-সম্পর্কের মূলতত্ত্ব উল্লেখ করিয়াই উপদেশ আরম্ভ করিলেন,—'মৈত্রেয়ী, পতির প্রয়োজনের নিমিত্তই পতি কাহারও প্রিয় হ'ন না, আত্মার প্রয়োজনের নিমিত্তই—পতিকে ভালবাসিলে নিজ আত্মা সুখী হয় বলিয়াই পতি পত্নীর প্রিয় হ'ন। আবার পত্নীর প্রয়োজনের নিমিত্তই পত্নী পতির প্রিয় হ'ন না, কিন্তু পতির নিজ বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্তই পত্নী পতির প্রিয় হইয়া থাকেন। পুত্রের নিমিত্তই পুত্র কাহারও প্রিয় হয় না, পিতার নিজের নিমিত্তই পুত্র পিতার প্রিয় হইয়া থাকে। এইরূপ ধনের নিমিত্তই ধন আর লোকের প্রিয় হয় না, লোকের নিজ নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্তই ধন প্রিয় হইয়া থাকে। দেবতাদের নিমিত্তই দেবতা আর মানুষের প্রিয় হ'ন না, কিন্তু মানুষের নিজ নিজ ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্তই দেবতা মানুষের প্রিয় হইয়া থাকেন। সংসারে পতি বল, পত্নী বল, পুত্র বল, আর বিত্ত বল, এমন কি স্বর্গ বা দেবতার কথা, অথবা যাহা কিছু বল—সকলই নিজ নিজ আত্মার প্রীতির নিমিত্তই লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। এই আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে—উপলব্ধি করিতে হইবে। আত্মার কথা আগে আচার্যের মুখে শ্রবণ করিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ মন দিয়া বিচার করিতে হইবে, তারপরে নির্জনে ধ্যান করিতে হইবে; তবে তো আত্মার দর্শন মিলিবে। ওগো মৈত্রেয়ী, এই আত্মাকে শ্রবণ, মনন ও দর্শন করিলে—এই আত্মাকে জানিলেই এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানা হয়।—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ; মৈত্রেয়ি, আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্। এই আত্মাই সে সকল! দেবতা হউন, আর দেবলোক হউক, অথবা এই পৃথিবীর যে কোনও জীব বা বস্তুই হউক, সমুদয়ই যে এই বিশাল আত্মা! আত্মা ভিন্ন তো কিছুই নাই।'

সংক্ষিপ্তসার—যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে নিজেদের স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের মূলকথা বিশ্লেষণ করিয়া মৈত্রেয়ীকে বলিলেন যে, পতির জন্যই যে পতি প্রিয় এমন নয়, আত্মার জন্যই পতি প্রিয় ; পত্নীর জন্যই পত্নী প্রিয় নন, আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয়। পতি বা পত্নীকে ভালবাসিলে আত্মা সুখী হয় বলিয়াই পত্নী বা পতি প্রিয়। ঐভাবে পিতার নিজের জন্যই পুত্র প্রিয়। ধন কেবল ধন বলিয়াই লোকের প্রিয় এমন নয—তাহা নিজ প্রযোজন সিদ্ধ করে বলিয়াই লোকের কাছে প্রিয। দেবতারাও মানুষের স্বীয় ইষ্টসিদ্ধির জন্যই মানুষের প্রিয। পতি, পত্নী, পুত্র, ধন, স্বর্গ বা দেবতা—সকলেই আত্মার প্রীতির জন্য মানুষের প্রিয হয। এই আত্মাকেই দর্শন ও উপলব্ধি করিতে হইবে। আত্মাকে প্রথমে আচার্যমুখে শ্রবণ, পরে মন দিয়া বিচার, তারপর নির্জনে ধ্যান করিতে হইবে—তবেই আত্মার দর্শন পাওয়া যাইবে! এই আত্মাকে শ্রবণ, মনন ও দর্শন করিলে এই বিশ্বের সমস্ত কিছুকেই জানা যায। এই আত্মাই সব। দেবতা বা দেবলোক, পৃথিবীর জীব বা বস্তু—সবই আত্মা ; আত্মা ভিন্ন আর কিছু নাই।

(২) ইন্দ্র ভাবিলেন, এবার এই স্থূল দেহ এড়াইয়া জাগ্রৎ অবস্থা কাটাইয়া স্বপ্নাবস্থায় এক সূক্ষ্ম দেহের সন্ধান মিলিয়াছে ; এবং এই সূক্ষ্ম দেহ বা স্বপ্নপুরুষই আত্মা! আত্মা তো অভয়। কিন্তু কই এখানেই বা অভয় কোথায়? শরীর অন্ধ হইলে এই স্বপ্নপুরুষ অন্ধ হ'ন না বটে, শরীরের ব্যাধি বা গ্লানি হইলেও এই পুরুষ গ্লানিযুক্ত হ'ন না বটে ; এমন কি শরীর মৃত হইলেও হয়ত এই পুরুষের মরণ হয় না বটে ; মনস্বরূপে ইনি বাস করেন, কিন্তু—। স্বপ্নকালে যখন নিদ্রা আসিয়া শরীর আচ্ছন্ন করে, হাত পা কাজ করে না, চক্ষু দেখে না, কর্ণ শোনে না, মুখ কথা বলিতে পারে না, দেহ সত্য সত্যই যেন মরিয়া যায়, তাহার অস্তিত্ব বিশ্বের নিকট একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় তখন একেশ্বর পুরুষ যিনি বিরাজমান থাকেন, তিনিই তো মন, অথবা সূক্ষ্ম দেহ? প্রজাপতি বলিতেছেন ইনিই আত্মা, অমৃত, অভয়। কিন্তু ইন্দ্র ভাবিতেছেন, কই এই পুরুষেই বা অভয় কোথায়? এই যে স্বপ্নকালেই মনে হয়, এই পুরুষকে যেন সকলে হত্যা করিল, এই

পুরুষকে যেন তাড়না করিল, এই পুরুষ যেন পলাইয়া গেলেন, মরিয়া গেলেন. এই পুরুষ যেন অপ্রিয় বিষয় জানিতেছেন, যেন কত দুঃখ বোধ করিতেছেন, দুঃখে যেন নিজে নিজে বসিয়া কাঁদিতেছেন ;—এতো অভয়, অমৃত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প পুরুষের লক্ষণ নয়! ইন্দ্র আবার বলিয়া উঠিলেন,—"নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি—আমি এখানেও ভোগের কিছুই দেখি না!" তারপর? তারপর?

সংক্ষিপ্তসার—ইন্দ্র ভাবিলেন যে, তিনি এই স্থূল দেহ ও জাগ্রৎ অবস্থা পার হইয়া স্বপ্নাবস্থায় যেন এক সূক্ষ্ম দেহের সন্ধান পাইয়াছেন ; এই স্বপ্নপুরুষই আত্মা। আত্মা অভয়স্বরূপ, কিন্তু এখানে অভয় নাই। শরীরের অন্ধতা, ব্যাধি, গ্লানিতে এই স্বপ্নপুরুষের কোনো আবরণ হয় না—এমন কি শরীরের মৃত্যু হইলেও এই স্বপ্নপুরুষের মৃত্যু হয় না, মন-স্বরূপে তিনি বর্তমান থাকেন বটে, কিন্তু স্বপ্নের সময় দেহ যখন সত্য সত্যই যেন মরিয়া যায় তখন যে একেশ্বর পুরুষ বিরাজ করেন তিনি মন না সূক্ষ্ম দেহ? প্রজাপতি ইঁহাকেই অমৃত ও অভয় আত্মা বলিয়াছেন। কিন্তু এই স্বপ্নপুরুষে তো অভয় নাই। স্বপ্নকালে মনে হয় যে, এই পুরুষকে যেন হত্যা বা তাড়না করা হইতেছে, এই পুরুষ যেন নানা অপ্রিয় বিষয় ভোগ করিতেছেন, যেন দুঃখে কাঁদিতেছেন। ইহা তো অভয়, অমৃত, সত্যময় পুরুষের লক্ষণ নয়। ইন্দ্র এখানেও আনন্দের কিছু দেখিতে না পাইয়া আরও জানিতে চাহিলেন।

(৩) রাজা অশ্বপতি তখন ঋষিগণকে কহিলেন—"তোমরা সকলেই বৈশ্বানর আত্মাকে জান, অথচ কেহই পূর্ণস্বরূপ জান না, এবং এই জন্যই বৈশ্বানর আত্মা তোমাদের নিকট পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া মনে হইতেছে! যিনি তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে জানিতে পারেন, তিনি তোমাদের ন্যায় শুধু যে বিবিধ ভোজ্যবস্তুই ভোগ করেন, তাহা নয় ; তিনি দ্যুলোক, ভূলোক, সমস্ত চরাচর, সমস্ত জীব এবং সমস্ত আত্মায় বিরাজ করিয়া বহুবিধ ভোগ করিয়া থাকেন। সমস্ত লোক, সমুদয় জীব, সকল আত্মা লইয়াই যে বিশ্ব-আত্মা, বিরাট্ বৈশ্বানরপুরুষ!" রাজা তারপরে সেই বৈশ্বানর আত্মার বিশ্বমূর্তির পরিচয় দিলেন—"জ্যোতির্ময় দ্যুলোক এই বৈশ্বানরপুরুষের মস্তক, নিখিলরূপের আধার সূর্য তাঁহার চক্ষু,

দিগন্তপ্রবাহী বায়ু তাঁহার প্রাণ, সর্বব্যাপী আকাশ তাঁহার দেহের মধ্যভাগ, এবং বিপুল জলরাশিই তাঁহার বস্তি! পৃথিবী এই পুরুষের চরণযুগ, আর যে অগ্নিতে তোমরা নিত্য আহুতি দিয়া যজ্ঞ কর, সেই আহবনীয় অগ্নিই বৈশ্বানর আত্মার মুখ! এইজন্য যখনই কোনও সাধুপুরুষ অন্ন গ্রহণ করেন, পূর্বে তাহা বৈশ্বানর আত্মার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করেন! বৈশ্বানরপুরুষের তৃপ্তিই যে বিশ্ব-আত্মার তৃপ্তি! এই সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ, দ্যুলোক এবং এই পৃথিবী-লোক, সকল দিক, সকল মন—আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সমুদয় সৃষ্টিই সেই আত্মার তৃপ্তিতে তৃপ্তি লাভ করে!

সংক্ষিপ্তসার—(রাজা অশ্বপতি দেখিলেন যে, প্রত্যেক ঋষি সেই বৈশ্বানর-পুরুষের এক একটি অঙ্গের উপাসনা করিতেছেন—সমগ্র আত্মা তাঁহাদের অজ্ঞাত। ব্যাপারটি অন্ধদের হাতী দেখার মতো। কয়েকজন অন্ধ হাতী দেখিতে গিয়াছিল। তাহারা কেহ বা হাতীর পায়ে, কেহ বা হাতীর কানে, কেহ বা শুঁড়ে, কেহ বা পেটে, কেহ বা লেজে হাত বুলাইয়া পরস্পর হাতী সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলিতে লাগিল। তাহারা কেহ বলিল হাতী থামের মতো, কেহ বা কুলোর মতো, কেহ বা কলাগাছের মতো, কেহ বা জালার মতো, কেহ বা সাপের মতো বলিল। কেহই সমগ্র হাতীটি যে কিরূপ তাহা অনুভব করে নাই।)

রাজা অশ্বপতি তখন ঋষিদের বলিলেন যে, তাঁহারা সকলেই বৈশ্বানর আত্মার অংশ মাত্র জানেন বলিয়া বৈশ্বানর আত্মা তাঁহাদের নিকট পৃথক্ বলিয়া বোধ হইতেছে। যিনি তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে জানেন তিনি দ্যুলোক, ভূলোক, সমগ্র বিশ্ব ও সমস্ত আত্মায় বিরাজিত হইয়া বহুবিধ ভোগ করিয়া থাকেন। সমস্ত লোক, সমস্ত জীব, সমস্ত আত্মা লইয়াই বিশ্বাত্মা বৈশ্বানর-পুরুষ। সেই বৈশ্বানর-পুরুষের মস্তক দ্যুলোক, সূর্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহের মধ্যভাগ এবং জলরাশি তাঁহার বস্তি। পৃথিবী তাঁহার চরণ, আহবনীয় অগ্নিই তাঁহার মুখ। এইজন্য সাধুপুরুষ অন্নগ্রহণের পূর্বে বৈশ্বানর আত্মার উদ্দেশ্যে আহুতি দান করেন—তাঁহার তৃপ্তিতে বিশ্ব-আত্মার তৃপ্তি। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ, দ্যুলোক, ভূলোক, দিক ও মন—সমগ্র সৃষ্টিই সেই আত্মার তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত।

(৪) তখন ঋষি আদেশ করিলেন,—"পুত্র, তুমি আজ হইতে পনের দিন উপবাস কর। কিছুই খাইবে না, ইচ্ছা হইলে কেবল জলপান করিতে পার। জলময় প্রাণ, জলপান না করিলে প্রাণই যে বাহির হইতে পারে।"

পুত্র শ্বেতকেতু পিতার আদেশ জানিয়া কঠোর উপবাস আরম্ভ করিলেন, কেবল পিপাসার সময় জলপান করিতেন। এই অবস্থায় একদিন, দুইদিন করিয়া ১৫ দিন চলিয়া গেল। শ্বেতকেতু শুষ্ক শীর্ণ হইয়া গেলেন, বর্ণ কালিমাময় হইয়া গেল। কিন্তু পিতা তাঁহাকে তত্ত্ব-জ্ঞান শিক্ষা দিবেন, এই আনন্দে যুবক সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া রহিলেন। ১৬ দিনের দিন, প্রভাতে শ্বেতকেতু অতিকষ্টে আসিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা পুত্রকে দেখিয়াই আদেশ করিলেন,—"হাঁ, বৎস, ঋক্, যজু, সাম এই সমস্তই তো অনেক কাল হইতে তোমার কণ্ঠস্থ। তুমি এক এক করিয়া সমস্ত আবৃত্তি কর।"

শ্বেতকেতু পিতার আদেশ শুনিয়া সমস্ত মন্ত্রই স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই তাঁহার মনে আসিল না। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ঋষিকে বলিলেন,—"ভগবন্, কিছুই তো আর মনে পড়িতেছে না।

ঋষি পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—"বাছা, কাতর হইও না। প্রকাণ্ড একটা আগুনের যদি সব নিবিয়া শুধু জোনাকি-প্রমাণ একটি কণা পড়িয়া থাকে, তাহা দিয়া আর কতটুকু কাজ চলে! তাহা দিয়া কি কোনও বস্তু দগ্ধ করা যায়? ঠিক এইরূপেই তুমি ১৫ দিন উপবাস করিয়া মনের ১৫ কলা নষ্ট করিয়াছ, বাকি আছে এক কলা। ইহা দিয়া তুমি বেদমন্ত্ররাশি কিভাবে অনুভব করিবে? আচ্ছা বৎস, যাও, এইবার ভাল করিয়া চারটি খাইয়া আইস।"

সংক্ষিপ্তসার—ঋষি পুত্র শ্বেতকেতুকে পনের দিন উপবাস করিতে বলিলেন। এই পনের দিন তিনি কিছুই খাইবেন না—কেবল প্রাণধারণের জন্য জলপান করিবেন। পিতার আদেশে শ্বেতকেতু কঠোর উপবাস আরম্ভ

করিলেন, কেবল পিপাসার সময় জলপান করিতেন। এইভাবে পনের দিন কাটিয়া গেল। শ্বেতকেতু শীর্ণ, শুষ্ক ও মলিন হইয়া গেলেন, কিন্তু পিতার নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞানলাভের আনন্দে তিনি সব দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি অতি কষ্টে পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, পিতা তাঁহাকে ঋক্, যজু ও সাম স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতে বলিলেন—এগুলি পূর্বে তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। পিতার আদেশে শ্বেতকেতু সমস্ত মন্ত্র স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মন্ত্রই তাঁহার মনে না আসায় তিনি লজ্জিত হইয়া ঋষিকে সে কথা জানাইলেন। পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া ঋষি তাঁহাকে কাতর হইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, প্রকাণ্ড আগুনের সমস্ত নিবিয়া গিয়া কেবল এক কণা থাকিলে তাহা দিয়া কোনো বস্তু দগ্ধ করা যায় না। পনের দিন উপবাস করিয়া শ্বেতকেতু দেহের পনের কলা ক্ষয় করিয়াছেন, মাত্র এক কলা অবশিষ্ট —ইহা দিয়া তিনি বেদমন্ত্র স্মরণ করিতে পারিবেন না। ঋষি পুত্রকে ভাল করিয়া খাইয়া আসিতে বলিলেন।

(৫) আশ্রমের মধ্যে ঋষিবরের সম্মুখভাগেই আদরযত্নে সংবর্ধিত শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত প্রকাণ্ড একটি প্রাচীন বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষটির অদূরে আশ্রমের প্রান্তদেশে আর একটি বৃহৎ বট বৃক্ষ ছিল। হাজার হাজার ছোট ছোট লাল ফলে বট বৃক্ষটি পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। ঋষি সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড বৃক্ষটিকে দেখাইয়া পুত্রকে পরম আশ্চর্য তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বৎস, ঐ ত সম্মুখেই একটি প্রকাণ্ড গাছ দেখিতেছ, কেহ যদি গাছটির মূলদেশে কুঠারদ্বারা একবার মাত্র আঘাত করে, সেই আঘাতেই গাছটি আর শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায় না, গাছটি হইতে রস ক্ষরিত হয় মাত্র, কিন্তু গাছটি বাঁচিয়া থাকে। যদি সে গাছটির মধ্যভাগে আঘাত করে, তাহা হইলেও রস ক্ষরিত হয় বটে, কিন্তু গাছটি ঠিক বাঁচিয়া থাকে। সে যদি মাথায় আঘাত করে, তাহা হইলেও রস ঝরিতে থাকে, কিন্তু গাছটি বাঁচিয়া থাকে। ইহার অণুতে অণুতে জীবাত্মা বিরাজ করেন! গাছটির জ্ঞান আছে, চৈতন্য আছে, তাই পত্রে পুষ্পে শোভমান হইয়া সে আনন্দে ক্রমাগত রসপান করিতেছে, এবং আনন্দেই বাঁচিয়া আছে।"

ঋষি অন্তর্দৃষ্টির সহিত আপন আনন্দে বলিয়া চলিলেন,—"যদি বৎস, গাছটির একটি শাখা একেবারে কাটিয়া ফেলা হয়, জীব শাখাটি পরিত্যাগ করে, শাখাটি শুখাইয়া মরিয়া যায়। জীব যদি এইভাবে দ্বিতীয় আর একটি শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সেটিও শুখাইয়া মরিয়া যায়। জীব যদি তৃতীয় আর একটি শাখা পরিত্যাগ করে, তবে সে শাখাটিও শুখাইয়া মরিয়া যায়! জীবাত্মা যদি সমস্ত গাছটিকেই পরিত্যাগ করে, হায়! হায়! সমস্ত গাছটিই শুখাইয়া মরিয়া যায়! বৎস, এই রকমই সকল বিষয় জানিবে, জীবাত্মাই জীবনের মূল কারণ। জীবাত্মা পরিত্যাগ করিলে, জীবাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হইলে শরীর মৃত হয়, কিন্তু জীবাত্মা নিজে মৃত হ'ন না। এই আত্মাই সূক্ষ্ম তত্ত্ব, এই আত্মায় সমুদয় জগৎ বিধৃত আছে। ইহাই সত্য, ইহাই আত্মা! ওগো শ্বেতকেতু, তুমিই সেই আত্মা—তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!"

সংক্ষিপ্তসার—আশ্রমের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল—তাহার অদূরে আশ্রমপ্রান্তে রক্তাভ ফলযুক্ত আর একটি বৃহৎ বট বৃক্ষ ছিল। ঋষি সম্মুখের বৃহৎ বৃক্ষটি দেখাইয়া পুত্র শ্বেতকেতুকে পরমতত্ত্ব উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, সেই গাছটির মূলদেশে যদি কেহ কুঠার দিয়া আঘাত করে তবে সেই আঘাতে গাছ হইতে রস ক্ষরিত হইলেও গাছটি বাঁচিয়া থাকে। গাছের মধ্যভাগে আঘাত করিলে রস ক্ষরিত হয়, কিন্তু গাছটি বাঁচিয়া থাকে। গাছটির মাথায় আঘাত করিলেও সেইরূপই হয়। গাছটির প্রতি অণুতে জীবাত্মা বর্তমান। গাছটির জ্ঞান ও চৈতন্য আছে বলিয়া তাহা পত্র-পুষ্প-শোভিত হইয়া আনন্দে রসপান করিয়া বাঁচিয়া আছে। ঋষি বলিতে লাগিলেন যে, গাছটির একটি শাখা কাটিয়া ফেলিলে গাছটির জীবাত্মা সেই শাখাটিও পরিত্যাগ করিলে সেই শাখাটি শুখাইয়া মরিয়া যায়। জীবাত্মা দ্বিতীয় বা তৃতীয় অপর শাখা পরিত্যাগ করিলে সেটিও মরিয়া যায়। জীবাত্মা সমগ্র গাছটিকে পরিত্যাগ করিলে সমগ্র গাছটি মরিয়া যায়। সর্বত্রই জীবাত্মা জীবনের মূল কারণ। জীবাত্মা পরিত্যাগ করিলে, জীবাত্মার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইলে শরীর মৃত হয়, কিন্তু জীবাত্মার মৃত্যু নাই। এই আত্মাই সূক্ষ্মতত্ত্ব—সমগ্র জগৎ এই আত্মাতেই বিরাজমান। ইহাই সত্য—শ্বেতকেতুই সেই আত্মা।

গাথাঞ্জলি

ভাবসম্প্রসারণ

(১) নিম্নলিখিত অংশগুলির ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ

(ক) যোগি-ঋষিগণ জ্ঞানে ধ্যানে তপে দেখিতে না পায় যাঁরে,
সহজ সরল প্রেম ভক্তিতে গৃহে পাওয়া যায় তাঁরে।

ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য মানুষ অনেক সাধনা করিয়াছে। ঈশ্বরপ্রাপ্তির আশায় মানুষ সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছে। যোগিগণ ও ঋষিগণ প্রতিনিয়ত জপতপ করিয়া জ্ঞানদৃষ্টিতে বা ধ্যানযোগে সেই পরম সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যোগী বা ঋষির ধ্যান বা তপস্যায় সর্বদাই লব্ধ নন—ক্বচিৎ কোনো সাধক ধ্যানযোগে বা তপস্যার দ্বারা বা জ্ঞানযোগে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। বস্তুত জ্ঞানের পথে ভগবৎ-দর্শন নিরতিশয় কঠিন।

ভক্তির পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুগম। মানুষ যদি যথার্থই ভক্তিমান হয় তাহা হইলে সে ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। যাঁহার অন্তরে সহজ সরল ভক্তি জাগ্রত হইয়াছে, যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি কুণ্ঠাহীন প্রেম আবির্ভূত হইয়াছে ঈশ্বর তাঁহার গৃহেই যেন অধিষ্ঠিত থাকেন। ঈশ্বর জ্ঞানের অতীত কিন্তু ভক্তির বাঁধনে ধরা দিতে তিনি নিয়ত ব্যাকুল।

অবশ্য যথার্থ ভক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। মানুষের অন্তরে সংশয় ও জড়তার সীমা নাই—তাহা মানুষের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাবকে প্রতিনিয়ত ব্যাহত করিতেছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া অন্তরে যথার্থ ভক্তির আবির্ভাব হইলে ঈশ্বরের কৃপালাভ সম্ভবপর হইবে।

(খ) অনেক কৃপণই দেশের বন্ধু যোগী ও ভোগীর চেয়ে।

যাহারা প্রতিপদে অর্থের অপব্যয় পরিহার করিয়া কেবল স্থূল প্রয়োজনটুকু স্বীকার করিয়া লইয়া জীবন-যাপন করে তাহাদের আমরা কৃপণ বলিয়া অভিহিত করিয়া অবজ্ঞা করি। আমাদের জীবনে বিলাস এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার বিন্দুমাত্র হানি দেখিলেই আমরা কার্পণ্য বলিয়া মনে করি। কেবলমাত্র যাহা প্রয়োজন তাহাকে অবলম্বন করিয়াই জীবনযাত্রা আমাদের কাছে অহেতুক কৃপণতা বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু যাহারা কৃপণ বলিয়া অভিহিত তাহারা অনেক সময় দেশের প্রকৃত বন্ধু। ভোগীরা বিলাসময় জীবনে প্রচুর অর্থ ছড়ায় বটে কিন্তু তাহারা যে জীবনের আদর্শ প্রচার করে তাহা গ্রহণযোগ্য নয়। নিছক বিলাসব্যসনে তাহারা যে অর্থব্যয় করে তাহা জগতের অনেক প্রয়োজনে লাগিতে পারে। যোগীরা সংসার ছাড়িয়া নির্জন স্থানে গিয়া যে সাধনা করে তাহাতে বিশ্বজনের কোনো উপকারই হয় না। কৃপণ আপনার মিতব্যয়ী জীবনে যে অর্থ সঞ্চয় করে, তাহা দেশেরই অর্থ—দেশের অর্থকে অপব্যয় হইতে বাঁচাইয়া সে দেশের কল্যাণ সাধন করে। অনেকে সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করিয়া কৃপণ নামে অভিহিত হইলেও গোপনে দান করে এমন কি মৃত্যুর পর যথাসর্বস্ব দেশের কল্যাণকর কাজে উৎসর্গ করিয়া যায়। এইসব ব্যক্তিই দেশের প্রকৃত বন্ধু।

(গ) ধর্মের তরে দুঃখ স্বীকার তপ বই কিছু নয়,
ব্যর্থ হয় না কোনো তপস্যা, ধর্মেরই হয় জয়।

ধর্ম মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ধর্মের জন্য করিতে পারে না এমন কাজ মানুষের পক্ষে নাই। ধর্মের জন্য মানুষ যে দুঃখ স্বীকার করে তাহা তপস্যারই নামান্তর। তপ কথাটার অর্থই তাপ—দুঃখের তাপ। ধর্মের জন্য মানুষের দুঃখস্বীকার তপঃ-সাধনার গৌরব লাভ করে।

ধর্মের জন্য মানুষ যে দুঃখ স্বীকার করে তাহা কখনও ব্যর্থ হইবার নয়। ধর্মের উদ্দেশ্যে মানুষের চিত্তের উদ্‌বোধন—তাহার সর্ব সুবৃত্তির বিকাশ-সাধন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মানুষ যাহা কিছু করে তাহার লক্ষ্য বাহ্যত দৃষ্ট না হইতেও পারে, কিন্তু তাহা অলক্ষ্যে থাকিয়াও মানুষের জীবনকে অন্তহীন কল্যাণের পথে চালিত করে। বস্তুত সাধারণ কোনো কাজ করিবার সময় তাহার ফল যেমন সহজে পাওয়া যায়, ধর্মের ক্ষেত্রে তেমন হইবার নয়। ধর্মের পথ সহজ নয়। ধর্ম যাহা দেয় তাহা মানুষের চরম প্রাপ্তি—সুতরাং ধর্মের জন্য মানুষ যে সাধনা করে তাহার সিদ্ধি দুর্লভ। ধর্মের জন্য মানুষ যেটুকু দুঃখ স্বীকার করে, যেটুকু তপঃসাধন করে তাহা তাহাকে ধর্মের পথে অগ্রসর করিয়াই দেয়। মানুষের কোনো সাধনাই ব্যর্থ হয় না—মানুষ সত্যকে লাভ করিবার জন্য, কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে দুঃখ বরণ করে তাহার সার্থকতা আছেই।

(ঘ) মান হ'তে আর প্রাণটা বড় নয়।

মানুষের কাছে জীবনের মূল্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল বাঁচিয়া থাকাই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানুষ আপনার জীবনে সুখ-শান্তি চায়, ধনজন-বৈভব চায়—তাহারও চেয়ে বেশী করিয়া চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা। এমন মানুষ নাই যাহার মধ্যে 'অহং' চেতনা আদৌ নাই—যাহাদের মধ্যে এই চেতনা প্রবল তাহারা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে-কোনো দুঃখ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকে।

বস্তুত মান মানুষের কাছে একটা নিরতিশয় মূল্যবান সম্পদ। মানের অর্থ ব্যক্তিত্বের মর্যাদাবোধ। যে ব্যক্তি আপনার মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, সে আপনার মান রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যক্তিগত মান রক্ষা করিবার জন্য অসংখ্য ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, স্বদেশের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য অগণিত দেশপ্রেমিক অকাতরে আত্মবিসর্জন দিযাছে। মানুষের অন্তরে সম্মানের জন্য, গৌরবের জন্য এমন একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে যে, সে তাহার জন্য যে-কোনো মূল্যপ্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় না।

তবে মানরক্ষার প্রবৃত্তি যেন আত্মম্ভরিতায় পরিণত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সম্মানের সঙ্গে যেন কল্যাণবোধ যুক্ত থাকে, তাহা না হইলে তাহার ফল শুভপ্রদ হয় না।

(ঙ) শুধু আপনারি দেশে সমাদর রাজা বাদশার
গুণীর আদর মান সব ঠাঁয়ে এই দুনিয়ার।

'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে'—সংস্কৃত এই সুভাষিতটি গুণের প্রকৃত মর্যাদা যে সর্বত্র তাহাই ব্যক্ত করে। বিদ্যা দেশ বা কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। সুদূর অতীতকাল হইতে অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত চিরকালই বিদ্যা বিশেষ গৌরব লাভ করিয়া আসিতেছে ও আসিবে। যে ব্যক্তি কোনো বিদ্যার অধিকারী তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার বিশিষ্ট গুণ আর পাঁচজনের মধ্যে তাঁহার বিশেষ স্থান নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধার অধিকারী করিয়া তোলে।

গুণীর গৌরব রাজার গৌরবের চেয়ে অনেক বেশী। রাজার গৌরব, রাজার সমাদর দেশ ও কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। রাজা তাঁহার রাজকীয়

ক্ষমতার জন্য যাহাদের উপর তাঁহার ক্ষমতা বিস্তৃত তাহাদের নিকট হইতে সম্ভ্রম পাইয়া থাকেন। রাজার সমাদর প্রধানত রাজশক্তির প্রতি ভীতিজনিত—তাহার মূলে প্রীতি কচিৎ থাকে। কিন্তু গুণীর সমাদরের মূলে গুণের প্রতি মানুষের চিরকালীন সশ্রদ্ধভাব ও প্রীতি বর্তমান। গুণের প্রতি এই সার্বিক মনোভাবের জন্যই গুণী সর্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার সমাদর যথার্থই মানুষের অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের হৃদয়ের অকুণ্ঠ প্রীতি ও শ্রদ্ধালাভের সৌভাগ্য রাজশক্তির নাই।

(চ) একনিষ্ঠ ভাবাবিষ্ট তপস্যার ফল
ভোগ্য নয় শিল্পীরই কেবল,
বিশ্ববাসী সে ফলের হয় অধিকারী
সৃষ্টি তার দেশে কালে দিগন্তপ্রসারী।

শিল্পীর অন্তরে সৌন্দর্যের যে ভাব-মূর্তিখানি নিহিত থাকে তাহাই রূপ পাইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। শিল্পী যাহা রচনা করেন তাহার মূল শিল্পীর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে, তাঁহার চেতনার মধ্যে থাকে। তিনি যাহা সৃষ্টি করেন, তাহা বিশেষ করিয়া তাঁহারই মনের গহন প্রদেশের সৃষ্টি—শিল্পীর অন্তঃপ্রকৃতি যে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত, তাঁহার সৃষ্ট শিল্পকর্মের মধ্যে তাহাই প্রকাশিত হয়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে শিল্পসৃষ্টিকে শিল্পীর একান্তভাবে নিজস্ব ধন বলা যাইতে পারে।

কিন্তু শিল্পের আর একটা দিক আছে। শিল্পী যে মুহূর্তে তাঁহার অন্তরের ভাবনাকে বাহিরের কোনো বিষয়কে অবলম্বন করিয়া মূর্ত করিয়া তোলেন, সেই মুহূর্ত হইতে তাহা আর কেবলমাত্র তাঁহার থাকে না—তাহা তখন হইতে বিশ্বের সমস্ত মানুষের সম্পদ হইয়া যায়। শিল্পীর মনোলোক হইতে তাহা যেন বিশ্বলোকে জন্মগ্রহণ করে। কবি একনিষ্ঠ সাধনা দিয়া যাহা সৃষ্টি করেন বিশ্ববাসী তাহার মাধুর্য-ভোগের অধিকারী হয়। তখন তাঁহার সাধনালব্ধ বিষয়টি সমগ্র বিশ্ববাসীর সমাদরের বস্তু হয়। শিল্পী কোনো বিশেষ দেশে বা বিশেষ কালে যাহা রচনা করেন তাহা সেই দেশ বা কালকে অতিক্রম করিয়া সর্বদেশের এবং সর্বকালের আনন্দের বস্তু হইয়া উঠে। বস্তুত বিশ্ববাসীর হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিতে পারিলেই শিল্পীর সৃষ্টি সার্থক হয়।

(ছ) পাষাণ মূর্তির মাঝে দেবতা সুষুপ্ত হয়ে রয়।
জাগায় তাঁহারে তাতে ভক্তিশুচি সরল হৃদয়।

মানুষ দেবতার যে মূর্তি নির্মাণ করে তাহার মূলে তাহার অন্তরের ধ্যান বর্তমান। যে দেবমূর্তি আমরা চোখে দেখি তাহা মানুষের অন্তরের সেই প্রতীক। অন্তরে যাহা ধ্যানরূপে ছিল তাহাই বাহিরে দেবমূর্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু দেবমূর্তিদর্শন ক্রমে যখন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে মানুষ তখন অন্তরের ধ্যানের কথা বিস্মৃত হইয়া বাহিরের মূর্তিটাকেই সর্বস্ব বলিয়া মনে করে। তখন সেই প্রতিমামাত্রকে অবলম্বন করিয়া পূজা-অর্চনা করিয়া চলে, জড় অনুষ্ঠানের মধ্যে সাধকের বা ভাবুকের অন্তরের ধ্যানমূর্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। দূর দেশ হইতে অনেকেই সেই দেবমূর্তি দেখিতে আসে। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বাহির হইতে কেবল পাষাণমূর্তি দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়—দেবতার যথার্থ রূপের পরিচয় পায় না।

কিন্তু কাহারও অন্তরে যদি প্রকৃত ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই পাষাণ মূর্তির মধ্যে সে দেবতার স্বরূপের পরিচয় পায়। যথার্থ ভক্তের অন্তরে দেবতার ধ্যানমূর্তি নবভাবে সঞ্জীবিত হয়। ভক্তিহীনের চোখে যাহা পাষাণ প্রতিমামাত্র, ভক্তের চোখে তাহাই দেবতা। ভক্তের অন্তরে যে দেবতার উদ্‌বোধন হয় তাহাই পাষাণমূর্তিকে যেন জাগ্রত করিয়া তোলে। বস্তুত ধর্মের ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তি না থাকিলে সবই নিষ্ফল। দেবতা ভক্তের নিকটই আত্মপ্রকাশ করেন।

(জ) জীবনবসনখানি জীব-রক্তবিন্দু-দাগে লাঞ্ছিত মলিন, অহিংসার সাধনায় করিতে হইবে তায় নির্মল নবীন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হিংসা ও হানাহানির অবধি নাই। স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য মানুষ অপরের উপর হিংসাত্মক আচরণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। মানুষের সহিত মানুষের স্বার্থের যখন সংঘাত হয় তখন বিরোধের প্রজ্বলিত অগ্নিতে কত মানুষের জীবন যে আহুতি প্রদত্ত হয় তাহার সীমা নাই। আমাদের জীবনের বস্ত্রখানি যেন প্রতিনিয়ত হিংসার ফলে আহত ও নিহত মানুষের রক্তের দাগে ভরিয়া গিয়াছে।

অহিংসার সাধনা করিয়া মানুষের এই জীবনবস্ত্রের দাগ অপসারিত করিয়া তাহাকে শুচি করিয়া তুলিতে হইবে। অন্তর হইতে হিংসার বোধ দূর করিয়া দিলেই মানুষের জীবন কল্যাণে ভরিয়া যাইবে। বর্তমানে মানুষ যে পরস্পর

হিংসায় হানাহানি করিতেছে তাহা তাহার জীবনে পরম অকল্যাণ বহন করিয়া আনিতেছে। মানুষ যদি হিংসার মনোভাব পরিহার করিয়া অন্তরে মৈত্রীর ভাবগ্রহণ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয় তাহা হইলে তাহার জীবন মঙ্গলময় হইয়া উঠে। অন্তর হইতে হিংসার ভাব দূর করিয়া মৈত্রীর ভাব পোষণ করা সকলের একান্ত কর্তব্য। জীবে প্রেমই মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের প্রধানতম অবলম্বন।

ভাবার্থ

(২) ভাবার্থ লিখ ঃ—

(১) বিজয়গর্বে তূর্য বাজায়ে পণ্ডিত যায় ফিরে,
সূর্য তখন মাথার উপরে উঠিতেছে ধীরে ধীরে।
পথের জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে ছ'ধারে দাঁড়ায় সরি,
সিক্তবসনে শ্রীজীব তখন ফিরিছেন স্নান করি।
সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জীব শুনিয়া আস্ফালন—
'বিনা বিচারেই হার মেনেছেন রূপ আর সনাতন!'
শুনি শ্রীজীবের ধৈর্য টলিল, বলিলেন, "পণ্ডিত,
এসো, আমি দিব দম্ভের তব প্রতিফল সমুচিত।
যাঁদের কুঞ্জে তুমি দিগ্‌গজ করেছিলে অভিযান,
তাঁদের আমি তো চরণাশ্রিত শিষ্য ও সন্তান;
পেয়েছি তাঁদের জ্ঞানসাগরের শুধু এক অঞ্জলি,
মোরে জিনি তবে জয় গৌরবে ব্রজ থেকে যাবে চলি।"
তরুণ কণ্ঠে শুনি অকুণ্ঠ রণে আহ্বান-বাণী
অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী;
বলিল, "মূর্খ, কেশরী কি কভু ক্ষুদ্র শশকে বধে?
পারাবার পার হয়ে এসে শেষে ডুবিব কি গোষ্পদে?"
বাহকবৃন্দে বলিল সে, "চল, কেন র'য়ে গেলি থেমে।"
জীব বলিলেন, "তিষ্ঠ কেশরী, দোলা হতে এসো নেমে!"
তর্ক বাধিল যমুনার তীরে—দলে দলে সেথা আসি
দুই মল্লেরে দাঁড়াইল ঘিরে কুতূহলী পুরবাসী।

হানিতে লাগিল পণ্ডিত যত শাণিত প্রশ্নবাণ,
হেলায় সে-সব করিলেন জীব খণ্ডিত খানখান।
দুই দণ্ডেই হল দণ্ডিত পণ্ডিত দাম্ভিক,
শুনিতে পাইল জনতায় শুধু ধ্বনিতেছে "ধিক্ ধিক্"।
অবনতশির বিতণ্ডাবীর পাণ্ডুর মুখে ধীরে
ধ্বজা গুটাইয়া সোজা পলাইল মথুরার দিকে ফিরে।

ভাবার্থ—তখন মধ্যাহ্ন সমাগতপ্রায়। বিজয়গর্বিত পণ্ডিত তূর্যধ্বনি করিতে করিতে যাইতেছেন। জনতা সসম্ভ্রমে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। শ্রীজীব তখন যমুনা হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। রূপ-সনাতন বিনা বিচারেই পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন—পণ্ডিতের এই আস্ফালন শুনিয়া শ্রীজীব ধৈর্য হারাইয়া ফেলিয়া পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন; তিনি জানাইলেন যে তিনি রূপ-সনাতনের জ্ঞানের সামান্য অংশমাত্রই পাইয়াছেন। পণ্ডিত তাঁহাকে বালক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহিলেন না—কিন্তু শ্রীজীবের আগ্রহাতিশয্যে যমুনার তীরে অবশেষে দুইজনে তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হইল। নগরবাসীরা কৌতূহলী হইয়া দুই পণ্ডিতকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। পণ্ডিত যে সমস্ত প্রশ্ন করিলেন শ্রীজীব সহজেই তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। পণ্ডিত দুই দণ্ডেই পরাজিত হইলেন—সকলে তখন তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তিনি তখন লজ্জিত হইয়া মলিনমুখে মথুরা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(২) অমাবস্যার রাতে

পূজাশেষ হ'ল বহুশত ছাগ মেষের শোণিতপাতে।
সবশেষে হবে বালকের বলি, আসিল তাহার পালা
যূপে হাত রাখি' দাঁড়াল বালক কণ্ঠে জবার মালা।
খড়্গ হস্তে দাঁড়াল ঘাতক বিলম্ব নাই আর,
বালক হাসিয়া উঠিল সহসা একে একে চারিবার।
বিস্মিত হ'য়ে নৃপতি শুধালো "কখনো দেখিনি হেন,
খড়্গের তলে দাঁড়ায়ে বালক, কি সুখে হাসিছ, কেন?"

বলিল বালক, "শোন মহারাজ, মৃত্যুরে নাহি ডরি,
হাসিলাম আমি চারিবার তাই চারিটি বিষয় স্মরি'।
বিশ্বে কেহ ত আপনার নাই জনকজননী সম,
অর্থের লোভে বেচিল তাহারা এমনি ভাগ্য মম।
হেন বিচিত্র দেখেছ জগতে ? অন্যায় প্রতিকার
করিবার তরে আছে এ দেশের যাঁহার হস্তে ভার
তিনিই দিলেন বধের বিধান। দেশরক্ষক রাজা
নিখিল প্রজার যিনি আশ্রয় তাঁরি তরে মোর সাজা।
সর্বজীবের যিনি শরণ্যা বিশ্বজননী যিনি
বিনা অপরাধে এই বালকের জীবন নেবেন তিনি।
হেন বিচিত্র ব্যাপার রাজন বিশ্বে দেখেছ কবে ?
এতে যদি হাসি নাহি পায়, বল' কিসে হাসি পাবে তবে।
মরণ যখন অনিবার্যই হাসিয়াই চলে যাই,
রক্ষক যেথা ভক্ষক সেথা মরা সে ত বাঁচিয়াই।"
রাজা বলিলেন, "ঘাতক, বালকে মুক্ত করিয়া দাও,
বালক, এখনি তব জননীর নিকটে ফিরিয়া যাও।
এ নিরপরাধ বালকে বধিয়া জীবন যদি বা পাই,—
অমর ত নই, ক'দিন বাঁচিব ?—সে জীবনে কাজ নাই।"

ভাবার্থ—অমাবস্যার রাত্রে বহুশত ছাগ ও মেষ বলির পর বালকের পালা আসিল। সে গলায় জবার মালা পরিয়া যূপে হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। ঘাতক খড়্গ লইয়া প্রস্তুত হইল। সহসা বালক একে একে চারবার হাসিয়া উঠিল। মৃত্যু সন্নিকট হইলেও বালক কিসের জন্য হাসিতেছে রাজা কৌতূহলী হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিল যে, সে মৃত্যুকে ভয় করে না—সে চারিটি বিষয় স্মরণ করিয়া হাসিতেছে। বিশ্বে পিতামাতার মতো আপনার কেহ নাই, সেই পিতামাতা অর্থলোভে সন্তান বিক্রয় করিলেন; অন্যায় দূর করা যাঁহার কর্তব্য তিনিই বধের বিধান দিয়াছেন; যে রাজা প্রজাকুলের রক্ষক সেই রাজার জন্যই তাহার মৃত্যু ঘটিবে, সর্বজীব যে দেবীর শরণ লয় সেই

জগন্মাতা তাহার জীবন গ্রহণ করিবেন—এই চারটি বিষয় স্মরণ করিয়া সে হাসিয়াছে। মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন সে হাসিয়াই মরিতে চায়।

বালকের কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য ঘাতককে আদেশ দিলেন। তিনি বালককে তাহার মাতার কাছে ফিরিয়া যাইতে অনুজ্ঞা দিয়া বলিলেন যে, তিনি যখন অমর নন তখন একটি নিরপরাধ বালকের জীবনের বিনিময়ে বাঁচিতে চাহেন না।

(৩) কহিলেন ব্রাহ্মণী—

"আহা রে বাছারা, আহা মোর যাদুমণি।
তোমাদের মত সোনার ছেলেরে দুধের বাছারে ধরি'
এই দুর্যোগে এত ভার তিনি চাপালেন, মরি, মরি
মিশ্রঠাকুর এত পাষণ্ড জানি নাই কোন দিন!
তপ জপ তার সকলি মূল্যহীন।"
কেঁদে এই কথা ব'লে
দোঁহারে টানিয়া বসালেন তিনি কোলে।
চাপিয়া ধরিয়া বুকে, চুমা খেয়ে চাঁদমুখে
নিজ চুল দিয়ে মুছালেন তিনি তাদের গায়ের জল।
জীর্ণবাসে তো নাই তাঁর অঞ্চল।
সহসা চক্ষে পড়িল ইহার পর
পিঠ দু'টি হতে রক্তের ধারা ঝরিতেছে দরদর।
চমকি' উঠিয়া কহিলেন তিনি—"একি!
পিঠ দিয়ে একে রক্ত ঝরিছে দেখি—
কে আঘাত দিল গায়ে
এমন করিয়া, বল'ত বাছারা মায়ে।
কেমন করিয়া র'ব বাছা আমি স'য়ে?"
এত বলি তিনি রক্ত মুছান কাঁদেন ব্যাকুল হ'য়ে।
কহিল দু'ভাই—"বলি মা তোমায় কী যে,
মিশ্রঠাকুর আমাদের পিঠ চিরিয়া দিলেন নিজে।"

"বল' কি ! বল' কি !"—বলিতে বলিতে ভাসিয়া অশ্রুজলে
মিশ্র-গৃহিণী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িলেন ভূমিতলে।

ভাবার্থ—ব্রাহ্মণী বালক দুইটিকে স্নেহ সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, মিশ্রঠাকুর যে এত পাষণ্ড তাহা তিনি জানিতেন না, তিনি তাহাদের মতো বালকদের দুর্যোগের সময় এত ভার বহাইযাছেন ; তাঁহার জপতপ সব মিথ্যা হইবে। তিনি দুইজনকে কোলে টানিয়া মুখে চুমা খাইয়া চুল দিয়া তাহাদের গায়ের জল মুছিয়া দিলেন—তাঁহার জীর্ণ বস্ত্রে তো আঁচল ছিল না। সহসা তিনি দেখিলেন যে, তাহাদের পিঠ দিয়া দরদর করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। তিনি চমকিয়া উঠিয়া কে এমন করিয়া তাহাদের আঘাত করিয়াছে যে পিঠ দিযা রক্ত ঝরিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কেমন করিযা তাহাদের এ বেদনা সহ্য করিবেন তাহা ভাবিযা পাইলেন না। তিনি ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রক্ত মুছাইতে লাগিলেন।

দুইভাই তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিযা বলিল যে, মিশ্রঠাকুর নিজে তাহাদের পিঠ চিরিয়া দিয়াছেন। তাহাদের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া মিশ্র-গৃহিণী মূর্চ্ছিতা হইযা মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

(৪) ভীমসেনে ডাকি ইন্দ্রপ্রস্থে কহিলেন মহারাজ,
'বাজাও শঙ্খ, বাজাও ঘণ্টা, যাগ সমাপ্ত আজ।'
প্রাণপণ বলে ঘণ্টা নাড়িয়া ফুঁ পাড়িল ভীম শাঁখে,
কেউ বাজিল না, দিলনাকো সাড়া কেউ তার হাঁক ডাকে।
যুধিষ্ঠিরের শুকাইল মুখ, আঁখি তাঁর ছলোছলো
শুধালেন তিনি, "বলো যদুপতি, কি বিঘ্ন হলো, বলো।"
কহিলেন হরি, "রাজসূয় তব হয়নি উদ্‌যাপিত।
খুঁত রয়ে গেছে, তোমার যজ্ঞে বৈষ্ণব বঞ্চিত।
শত শত লোক করেছে ভোজন, একজনো বৈষ্ণব—
তোমার অন্ন করেনি গ্রহণ অপূর্ণ তাই সব।"
রাজা কহিলেন—"কি বলিছ তুমি, অবাক করিলে ভাই,
এত লোক এল, তাদের মাঝারে কেহ বৈষ্ণব নাই ?"

কহিলেন হরি—"নামে বৈষ্ণব অনেকেই ছিল প্রভু,
খাঁটি বৈষ্ণব যজ্ঞ-অন্ন স্পর্শ করে কি কভু ?
প্রকৃত ভক্ত মাধুকরী করে, ভূরি ভোজে উদাসীন,
যজ্ঞসত্রে রসনাতৃপ্তি করে নাকো কোনদিন।"
নৃপ কহিলেন—"তুমিই স্বয়ং রয়েছ চক্রপাণি,
তোমার ভক্তে কিবা প্রয়োজন ? কি তাতে অঙ্গহানি,
কহিলেন হরি—"আমার ভক্তে ছোট ভাব' মহারাজ,
তাই ত তোমার শঙ্খঘণ্টা কেহ বাজিল না আজ।
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণে তুমি ভূরিভোজ্যে না তুষি'
একটিও যদি ভক্তে তুষিতে আমি হইতাম খুশী।"

ভাবার্থ—রাজসূয় যজ্ঞের শেষে যুধিষ্ঠির ভীমকে ডাকিয়া যজ্ঞ সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইতে বলিলেন। ভীম সথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ঘণ্টা নাড়িয়া শাঁখে ফুঁ দিলেন,. কিন্তু কোনো শব্দ হইল না। যুধিষ্ঠির তখন ম্লানমুখে কৃষ্ণকে এই বিঘ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এখনও উদ্‌যাপিত হয় নাই কারণ এই যজ্ঞে বৈষ্ণব বাদ পড়িয়াছে। এই যজ্ঞে অসংখ্য লোক ভোজন করিলেও কোনো বৈষ্ণব ইহাতে অন্ন গ্রহণ করে নাই।

যুধিষ্ঠির বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এত লোক এই যজ্ঞে যোগদান করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কি কেহ বৈষ্ণব ছিল না ? কৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন যে, নামে বৈষ্ণব অনেকে থাকিলেও প্রকৃত বৈষ্ণব যজ্ঞের অন্ন স্পর্শ করে নাই। যথার্থ বৈষ্ণব ভূরিভোজ উপেক্ষা করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করে।

যুধিষ্ঠির তখন বলিলেন যে, স্বয়ং কৃষ্ণ যখন রহিয়াছেন তখন ভক্তে কী প্রয়োজন। কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি ভক্তকে ছোটো বলিয়া মনে করেন বলিয়াই তাঁহার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে নাই। লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণের পরিবর্তে একজন ভক্ত তৃপ্ত হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন।

(৫) বোগদাদ পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত,
জীর্ণবসন শীর্ণশরীর কদাকার কুৎসিত।

নিজ পলাতক ক্রীতদাস ভেবে একজন নাগরিক,
গৃহে নিয়ে এসে তাঁহারে প্রহার করিল অত্যধিক।
সপ্তাহ ধরি' বন্দী রাখিয়া অন্ধকূপের মাঝে,
অবশেষে তাঁরে নিয়োজিল নিজ গৃহ নির্মাণ কাজে।
রোদে জলে জাড়ে লাঞ্ছনা সয়ে অবিরত দিনরাত
খাটিতে লাগিল সুধী লোকমান করিয়া শরীরপাত।
আসল নফর ধরা পড়ে গেল, বছরও আসিল ঘুরে,—
তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রান্তি যাইল দূরে।
লজ্জিত হয়ে জোড় হাতে কয় নাগরিক সদাগর,
"ক্ষমা করো মোরে, কে তুমি অতিথি, কোথায় তোমার ঘর?"
লোকমান কয়, "ওগো নির্দয়, মিছে চাও আজ ক্ষমা,
গোটা বছরের লাঞ্ছনা ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা।
মম শ্রমজল হয়নি বিফল, বছরটি গেল কেটে,
যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তা দামী, তোমার দুয়ারে খেটে।
বুঝেছি সত্য,—ক্রীতদাসত্ব কত যন্ত্রণাময়,
মানুষেরি হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সয়!
পরের বেদনা সেই বুঝে শুধু যে জন ভুক্তভোগী,
রোগ যন্ত্রণা সে কভু বুঝে না হয়নি যে কভু রোগী।
এ জ্ঞানের ভাগ, কিছু লও তুমি, হয়োনাক নির্মম,
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তারে ক্ষম'।
গৃহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত করিব আমি,
বোগদাদে এসে যে জ্ঞান পেলাম সব হতে তাহা দামী।"

ভাবার্থ—লোকমান পণ্ডিত হইলেও কুদর্শন ছিলেন। তিনি একদিন জীর্ণবস্ত্রে বোগদাদের পথে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে তাহার পলাতক ক্রীতদাস বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার উপর উৎপীড়ন করিল ও অবশেষে তাঁহাকে গৃহনির্মাণ কাজে নিযুক্ত করিল। লোকমান বহু কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এদিকে প্রায় বর্ষকাল পরে আসল দাস ধরা পড়িয়া গেলে গৃহস্বামীর ভ্রান্তি দূর হইল। সে তখন তাঁহার পরিচয় চাহিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। লোকমান বলিলেন যে, বর্ষব্যাপী লাঞ্ছনার পর ক্ষমাভিক্ষা নিরর্থক। তবে তাঁহার শ্রম নিরর্থক হয় নাই—এই এক বৎসরে তিনি প্রচুর শিক্ষা পাইয়াছেন। ক্রীতদাসত্বের যে কী দুঃখ, মানুষের হাতে মানুষের যে কত লাঞ্ছনা তাহা তিনি নিজে দুঃখ ভোগ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি গৃহস্বামীকে তাঁহার জ্ঞানের অংশ লইয়া পলাতক দাসকে মুক্তি দিতে অন্ততপক্ষে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া আপনার দাসদের মুক্তি দিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন—তিনি বোগদাদ হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহার কাছে তাহা অমূল্য বলিয়া মনে হইল।

সংক্ষিপ্তসার

(৩) সার সংক্ষেপ লিখ ঃ—

(৬) প্রথম প্রহর রজনী অতীত। তখন অকস্মাৎ
পাণ্ডবদের আশ্রমে হ'ল মহা অনর্থপাত।
দুর্বাসা ঋষি সহসা হাঁকিল—"কোথায় যুধিষ্ঠির ?
সন্ধ্যাস্নান বন্দনা তরে চলিনু সিন্ধুতীর,
দশ সহস্র শিষ্য রয়েছে সাথে
তাদের ভোজ্য প্রস্তুত রাখ, ফিরিব অর্ধরাতে।"
পাদ্য অর্ঘ্যে তুষিয়া ঋষিরে কহেন ধর্মরাজ,
"চরণের ধূলি পড়িল কুটীরে পরম ভাগ্য আজ।
ভয়ে ভয়ে প্রভু করিতেছি নিবেদন
কি কারণে তব অসময়ে আগমন ?"
কহিলেন ঋষি, "হস্তিনাপুরে ছিলাম একটি মাস
হ'লো তোমাদেরে দেখিবার অভিলাষ।
তাই আসিলাম, নাই কোন প্রয়োজন।
ক্ষুধায় কাতর, কর সত্বর ভোজনের আয়োজন।"
যুধিষ্ঠিরের মাথায় হৈল সহসা বজ্রপাত,
এখন গভীর রাত,

কেমন করিয়া দশ সহস্র ঋষিশিষ্যের মুখে
অন্ন দিবেন রহিয়া বনের বুকে।
ফিরিয়া আসিয়া মুনি
কোপে অভিশাপে ভস্ম করিবে আহার্য নাই শুনি'।
হরি ছাড়া আর এ বিপদে কেবা ত্রাতা ?
ডাকিতে লাগিল আর্তকণ্ঠে তখন পঞ্চ ভ্রাতা,
"ডাকি তোমা, হরি, মহাসঙ্কটে পড়ি,
পাণ্ডবদের বিপৎ-সাগরে তোমার কৃপাই তরী।
স্মরিলেই তুমি আসিবে বলেছ,—স্মরি তোমা বারবার,
একবার এসে কাণ্ডারী হ'য়ে সঙ্কটে কর পার।"

সংক্ষিপ্তসার—রাত্রি প্রথম প্রহর হইয়া গিয়াছে। তখন অকস্মাৎ দুর্বাসা ঋষি পাণ্ডবদের আশ্রমে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে তিনি সিন্ধুতীরে সন্ধ্যাস্নান ও বন্দনা করিতে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে দশ সহস্র শিষ্য আছে। তাঁহারা মধ্য রাত্রে ফিরিবেন, যুধিষ্ঠির যেন তাঁহাদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন।

যুধিষ্ঠির দুর্বাসাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দানে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে তাঁহাদের কুটীরে ঋষির আগমন হইয়াছে। তিনি সশঙ্কভাবে ঋষির অসময়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষি বলিলেন যে, তিনি একমাসকাল হস্তিনাপুরে ছিলেন এখন তাঁহাদের দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় আসিয়াছেন, অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। তাঁহারা ক্ষুধার্ত, সুতরাং যুধিষ্ঠির যেন সত্বর তাঁহাদের আহার্যের ব্যবস্থা করেন।

যুধিষ্ঠির ভাবিয়া আকুল হইলেন। এই গভীর রাত্রে বনের মধ্যে তিনি কী করিয়া দশ সহস্র শিষ্যকে অন্ন দিবেন। মুনি ফিরিয়া আসিয়া আহার্য নাই শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপে সকলকে ভস্ম করিয়া দিবেন। কৃষ্ণ ব্যতীত এই বিপদে রক্ষা করে এমন আর কেহ নাই। পঞ্চপাণ্ডব তখন একমনে কৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন, বলিলেন যে, এই ঘোর বিপদে কৃষ্ণই একমাত্র গতি। তিনি স্মরণ করিলেই আসেন—তিনি এই সংকট মোচন করুন।

(৭) লালাবাবু ফিরে যান, ভেবে খুঁজে নাহি পান,
দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক সূত্র ?
যায় কোন্ ফুটা দিয়া সবি তাঁর বাহিরিয়া,
কোন্ গ্লানি জীবনের দুগ্ধে গো-মূত্র !

সারা পথ আঁখি-জলে তিতাইয়া লালা চলে,
নয়নে নাহিক নিদ—রুচেনাক অন্ন,
শেঠেদের বাড়ীটার পাশ দিয়ে যেতে তাঁর,
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য।
সহসা ভাবেন থামি, "কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মৃদঙ্গে ?
এই শেঠেদের বাড়ী ? রেশারেশি আড়া-আড়ি,
চলিয়াছে কত দিন—ইহাদের সঙ্গে,
ব্রত দান খয়রাতে কতই এদের সাথে,
প্রতিযোগিতায় আমি ছিনু রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য তরে দর-ডাকাডাকি ক'রে
যশ-পিপাসারে মোর করিয়াছি তৃপ্ত।
মনের কুহর মাঝে আজো অভিমান রাজে।
হায়, হায়, অধমের হলো নাক' শিক্ষা !
এ ব্রজের দ্বার-দ্বার গেছি আমি বারবার,
পারি নাই এ দুয়ারে মাগিতে-তো ভিক্ষা।"
এত ভাবি একেবারে শেঠের তোরণ-দ্বারে,
হাঁকিলেন লালাবাবু, "শ্রীরাধে গোবিন্দ।"
শেঠেদের ঘরে ঘরে সে ধ্বনির সাড়া পড়ে,
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ।

সংক্ষিপ্তসার—লালাবাবু ভাবিয়া পাইলেন না ইহলোকের কোন্ বিষয় তাঁহার দীক্ষার পথে বাধা হইয়া রহিয়াছে। তিনি সারা পথ কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন—তাঁহার চোখে ঘুম নাই, মুখে অন্ন রুচে না। শেঠেদের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার মনে নূতন জ্ঞানের উদয় হইল! তাঁহার মনে পড়িল যে, শেঠেদের সহিত তাঁহার বিস্তর আড়াআড়ি চলিয়াছিল—ব্রতপালনে ও দানে শেঠেদের সহিত তিনি তুমুল প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। পুণ্যের নাম করিয়া তিনি আপনার যশের আকাঙ্ক্ষাই

মিটাইতে চাহিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার মনে সেই অভিমান রহিয়াছে। তিনি ব্রজের সর্বত্র ভিক্ষা চাহিতে গেলেও প্রতিদ্বন্দ্বী শেঠদের দ্বারে একবারও ভিক্ষার জন্য যাইতে পারেন নাই!

এই কথা মনে হইতেই তিনি শেঠদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া রাধাগোবিন্দের নাম করিয়া দাঁড়াইলেন। শেঠদের ঘরে ঘরে তাঁহার নামগান প্রতিধ্বনিত হইল—সকলে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল।

(৮) কহিলেন নৃপ "শুন যথার্থ রাজধর্মের বিধি—
বিধাতার নয়, রাজা চিরদিন প্রজাদেরই প্রতিনিধি।
ন্যাসরক্ষক রাজা শুধু, তার ধনে নাই অধিকার।
বেতনমাত্র পেতে পারে রাজা বহি দায়িত্বভার।
সে বেতন হতে দীনভাবে চলি—যদি কিছু মোর বাঁচে,
তাই শুধু দান করিবার মোর অধিকারটুকু আছে।
পরধন শুধু হাতে ক'রে দেওয়া দান কভু তাহা নয়।
পাপে অর্জিত ধনের অংশী পাপেরও অংশী হয়।
আপনার শ্রমে অর্জিত ধন যতই স্বল্প হোক
তারই দান জেনো মিলায় স্বর্গলোক।
রাজভাণ্ডার হ'তে যত দান হবে,
তাহার পুণ্যফলের অংশী হবে প্রজাগণ সবে।
পাপে অর্জিত সামান্য ধনও যদি রয় রাজকোষে
দুগ্ধকলস দূষিত হইবে গোমূত্র-কণা-দোষে।
এই কথা রাখি মনে,
প্রজা-কল্যাণ সাধিতে হইবে তাহাদেরি দেওয়া ধনে।"

সংক্ষিপ্তসার—রাজা মন্ত্রীদের রাজকোষের অধিকারী কে জিজ্ঞাসা করিলে প্রধান মন্ত্রী বলিলেন যে, রাজাই রাজ্যের সমস্ত ধনের অধিকারী—রাজাই বিধাতার প্রতিনিধি।

তখন রাজা প্রকৃত রাজধর্ম শুনাইয়া বলিলেন যে, রাজা বিধাতার প্রতিনিধি নন, তিনি প্রজাদেরই প্রতিনিধি। রাজা প্রজাদের ধন রক্ষা করেন

মাত্র, সেই ধনে তাঁহার অধিকার নাই—কেবল দায়িত্ব বহনের জন্য তিনি বেতন লইতে পারেন এইমাত্র। সেই বেতনের অর্থ লইয়া দীনভাবে চলিয়া যদি তিনি কিছু রক্ষা করিতে পারেন কেবলমাত্র তাহাই দান করিবার অধিকার তাঁহার আছে। পরের ধন দিলে তাহা দান হয় না। পাপের সহায়তা লইয়া অর্জিত ধনের অংশ গ্রহণ করিলে পাপের অংশ ভোগ করিতে হয়। নিজের উপার্জিত ধন স্বল্প হইলেও তাহা দান করিলে অক্ষয় পুণ্য। রাজভাণ্ডার হইতে দানে প্রজারই পুণ্য হয়।

(৯) গঙ্গার জলে প্রয়াগে কুম্ভ ভরি'
সাধু চলেছেন দক্ষিণাপথে দক্ষিণ পথ ধরি'।
রামেশ্বরের গায়
গঙ্গার জল ঢালিবেন বলি' চলেন এ ভরসায়।
পড়িল সে পথে সুবিশাল প্রান্তর,
সেই প্রান্তরে দেখিলেন সাধুবর—
গর্দভ এক করে ছটফট, বালুতে পড়িয়া আছে।
দেখিয়া তা' সাধু গেলেন তাহার কাছে।
পড়েছে নয়নে তার মরণের ছায়া
তারে হেরি হ'ল মায়া,
অঙ্গে তাহার বুলালেন করতল
অঞ্জলি ভরি মুখে তার সাধু দিলেন গঙ্গাজল।
মুখ বিস্ফারি আরো জল পশু চায়,
কলসী উজাড়ি সমস্ত বারি ঢালিয়া দিলেন তায়।
সুস্থ হইয়া তৃষিত পশুটি জীবন পাইল ফিরে,
কান ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াল ধীরে।
কহিল শিষ্য—"এতদূর প্রভু এসে—
তীর্থযাত্রা বিফল করিলে শেষে?"
কহিলেন সাধু—"দেখ ভাই, মোর প্রভুর করুণা কত,
আমারে জানিয়া ক্লান্তকাতর কলসীর ভারে নত,

আগায়ে এলেন, নিলেন আমার দান
দীর্ঘ পথের ঘটালেন অবসান।
জীবের মাঝারে শিবের বাস যে, পাপী সেই ভুলে যেবা
জাবের সেবাই তাইত শিবের সেবা।"

সংক্ষিপ্তসার—জীবের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান—জীবের সেবাই যে ঈশ্বরের আরাধনা একথা বিস্মৃত হইলে অকল্যাণ ঘটে। মানুষ ধর্মসাধনার জন্য যাহা করে তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়, যদি জীবের প্রতি তাহার দৃষ্টি না থাকে। যিনি জীবের মধ্যে শিবকে প্রত্যক্ষ করেন তিনিই প্রকৃত সাধক, তিনিই প্রকৃত ভক্ত।

একবার এক সাধু প্রয়াগের পুণ্য গঙ্গোদকে একটি কলস পরিপূর্ণ করিয়া রামেশ্বর শিবের মাথায় ঐ জল ঢালিয়া দিবার জন্য দক্ষিণাপথ দিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় সাধু দেখিলেন যে, একটি গাধা বালুতে পড়িয়া ছটফট করিতেছে। তাহা দেখিয়া সাধু কাতর হইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অঞ্জলি করিয়া তাহার মুখে গঙ্গাজল দিলেন। গাধাটি হাঁ করিয়া জল খাইতে চাহিলে তিনি ধীরে ধীরে সমস্ত জলই তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। পশুটি তখন প্রাণ ফিরিয়া পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সাধুর শিষ্য বলিল যে, সাধুর তীর্থযাত্রা বিফল হইল। সাধু বলিলেন যে, প্রভুর করুণার সীমা নাই—কলসীর ভারে তিনি ক্লান্ত হইয়াছেন জানিয়া শিব আগাইয়া আসিয়া তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া তাঁহার ক্লেশ দূর করিয়া দিয়াছেন।

(১০) দূরতীর্থে পাষাণমন্দিরে
হেরিতেছি দেবমূর্তি দাঁড়াইয়া যাত্রীদের ভিড়ে।
চেয়ে রই দেবতার শ্রীআনন পানে,
ভক্তি মোর জাগেনাক প্রাণে।
পাশে দেখি বৃদ্ধা এক ন্যুব্জ পৃষ্ঠ তার
যষ্ঠিতে রাখিয়া দেহভার,
একদৃষ্টি মূর্তিপানে রহে সে চাহিয়া
ঝরিতেছে অশ্রু তার লোলচর্ম কপোল বাহিয়া।

সহসা উল্লাসভরে কহিল সে নিজ পুত্রটিরে,
শীর্ণ পাণিখানি তার বুলাইয়া স্নানসিক্ত শিরে,
"ওরে বাছাধন,
সার্থক করিলি তুই আমার জীবন।"
সেই জনতার মাঝে পুত্র তার তিতি অশ্রুজলে
লুটায়ে পড়িল সেই জননীর চরণযুগলে।
সহসা হইল যেন বিদ্যুৎসঞ্চার,
জাগিয়া উঠিল জড় প্রতিমায় দেবতা আমার।
সহসা নামিল ঢল এ শুষ্ক নয়ানে
অঙ্কুরিল ভক্তিবীজ পাষণ্ডের এ পাষাণ-প্রাণে।
ধূপগন্ধে আমোদিত মন্দির-চত্বর,
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কাঁসর ঝাঁঝর,
ঘন ঘন হয় শঙ্খনাদ,
দেবতার মুখে হেরি বিগলিত পরম প্রসাদ।
পাষাণ মূর্তির মাঝে দেবতা সুষুপ্ত হ'য়ে রয়।
জাগায় তাঁহারে তাতে ভক্তিশুচি সরল হৃদয়।

সংক্ষিপ্তসার—দূরদেশে তীর্থে গিয়া কবি একদিন যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেবদর্শন করিতেছিলেন—কিন্তু হৃদয়ে ভক্তিভাব জাগে নাই। তাঁহার পাশে একটি বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া—তাহার পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে, একটি লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে দেবমূর্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তাহার শীর্ণ গাল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সহসা আনন্দের আবেগে সে পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল যে, তাহার পুত্র তাহার জীবন সার্থক করিয়াছে। পুত্র অশ্রুসিক্ত চোখে সেই জনতার মধ্যেই মায়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

এই দৃশ্য দেখিয়া কবির চিত্ত শিহরিয়া উঠিল—তিনি জড় প্রতিমার মধ্যে দেবতাকে মূর্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহার দুই চোখ অশ্রুতে ভরিয়া গেল, হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হইল। সেই উৎসবমুখরিত মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তিনি দেবমূর্তির মুখে সীমাহীন করুণা অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, পাষাণ প্রতিমার মধ্যে দেবতা সুপ্ত থাকেন—ভক্তের সরল এবং নির্মল হৃদয়ই তাঁহাকে জাগাইয়া তোলে।

অনুশীলনী

(নবম শ্রেণীর জন্য)

১। নিম্নলিখিত অংশগুলির **ভাবসম্প্রসারণ** কর :—

(ক) তুমি একখণ্ড সৈন্ধব লইয়া নির্মল জলে ফেলিয়া দাও। দেখিবে সমস্তটাই জলে গলিয়া গিয়াছে, একেবারে বিলীন হইয়াছে। আর তাহা পৃথক করিয়া উঠান যায় না। কিন্তু যেখান হইতেই ঐ জল আস্বাদ কর, দেখিবে লবণ।

(খ) যে দীন ভিখারী নির্জন মাঠে জীর্ণ কুটীরে রয়
মোর দুর্ভোগে দিতে পারে সেও রাত্রির আশ্রয়।

(গ) কার্যকারণপ্রবাহে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে। তন্মধ্যে তুমি স্বীয় কর্তব্য অকাতরে পালন করিলে তোমার ধর্মরক্ষা ও পরিণামে শাশ্বত মঙ্গল হইবে।

(ঘ) মর্ত্যলোকের সকলে জন্মিয়া, শস্যের মত—ধানের মত পাকিয়া বুড়া হইয়া মরিতেছে, মরিয়া আবার ঐ শস্যেরই মত নূতন করিয়া জন্মিতেছে। যখন অনিত্য এই সংসার, তখন সত্যপালনের ভয় কি, আর মিথ্যা আচরণেই বা লাভ কি ?

(ঙ) ধর্মের তরে দুঃখ স্বীকার তপ বই কিছু নয়,
ব্যর্থ হয় না কোন তপস্যা, ধর্মেরই হয় জয়।

(চ) যদি নিজের অধর্ম বুদ্ধিকেই না জয় করিতে পারিলে তবে রাজ্য জয় বা রাজ্য রক্ষা করিবার আশা কিরূপে করিবে ?

২। নিম্নলিখিত অংশগুলির **ভাবার্থ** লিখ :—

(ক) তখন যুধিষ্ঠির পিতামহকে অভিবাদনপূর্বক আচার্য দ্রোণের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। দ্রোণাচার্য কহিলেন —হে সৌম্য, তুমি গুরুর অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধারম্ভ করিলে আমি নিশ্চয়ই রুষ্ট হইয়া তোমার পরাজয় কামনা করিতাম। কিন্তু তুমি যখন আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তখন আমি প্রীতমনে আশীর্বাদ করিতেছি তোমার জয় হউক। আমি ধর্ম দ্বারা তোমার বিপক্ষে আবদ্ধ আছি, অতএব অতি দীনের ন্যায় তোমাকে বলিতেছি, তোমার পক্ষাবলম্বন ব্যতীত আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করো। তখন যুধিষ্ঠির যাচ্ঞা করিলেন—হে গুরো, আপনি

কৌরব পক্ষে সংগ্রাম করুন কিন্তু আমার হিতার্থে মন্ত্রদান করুন। তদুত্তরে দ্রোণ কহিলেন—হে রাজন্, মহাত্মা বাসুদেব তোমার মন্ত্রী থাকিতে আমি আর কি উপদেশ প্রদান করিব। হে ধর্মরাজ, তোমার পক্ষে যখন ধর্ম আছে, তখন অবশ্যই তোমার জয় হইবে, সে বিষয়ে শঙ্কা করিও না। তবে আমি যতক্ষণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিব, ততক্ষণ তোমার জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে শীঘ্রই আমাকে সংহার করিতে যত্নবান হইও।

(খ) কর্ণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন—হে বৃষ্ণিপ্রবর বাসুদেব, আমি অবগত আছি যে কুন্তীর কন্যাবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় আমি শাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুপুত্ররূপেই গণ্য। কিন্তু হে জনার্দন, আমি জন্মিবামাত্র আমার কিছুমাত্র কুশলচিন্তা না করিয়া কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে সূতজাতীয় অধিরথ দয়াপরবশ হইয়া আমাকে তাঁহার পত্নী রাধার নিকট পালনার্থ সমর্পণ করিলেন। হে কৃষ্ণ, স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ আমার মাতৃরূপিণী রাধার স্তনযুগলে ক্ষীরসঞ্চার হইয়াছিল। তদবধি উভয়ে আমাকে পুত্রনির্বিশেষে পালন করিলেন। যৌবনপ্রাপ্ত হইলে আমি সূতজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিলাম এবং তাহা হইতে আমার পুত্রপৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের উপরই আমার সমস্ত প্রণয় আবদ্ধ হইয়াছে, অপরিমেয় ধনরত্ন বা অনন্ত প্রাপ্ত হইলেও আমার ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ হয় না। তাহা ছাড়া হে বাসুদেব, আমি এতকাল দুর্যোধনের প্রদত্ত রাজ্য অকপটে ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমাকে তিনি সর্বদাই প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমার উপর নির্ভর করিয়াই পাণ্ডবদের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে লোভে বা ভয়ে বিচলিত হইয়া তাঁহার প্রতি মিথ্যাচরণপূর্বক তাহাকে নিরাশ করিতে পারিব না। তদ্ব্যতীত এই যুদ্ধে যদি আমি সব্যসাচীর সম্মুখীন না হই, তবে আমাদের উভয়েরই ভূয়সী কীর্তি থাকিয়া যাইবে। হে যাদবনন্দন, তুমি আমার হিতার্থে এই সকল প্রস্তাব করিয়াছ সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার অনুরোধ এই যে, তুমি আমার জন্মবৃত্তান্ত পাণ্ডবদের নিকট প্রকাশ না করো। হে অরিন্দম, ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীপুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ রাজ্য পরিত্যাগ করিবেন। সে রাজ্য আমি প্রাপ্ত হইলে দুর্যোধনকে না প্রদান করিয়া থাকিতে পারিব না। কিন্তু এরূপে দুর্যোধনের রাজ্যপ্রাপ্তি উচিত হইবে না ; অতএব যুধিষ্ঠিরই চিরকাল রাজ্য শাসন করুন।

(গ) পর ধন কভু হাতে করে দেওয়া দান কভু তাহা নয়।
পাপে অর্জিত ধনের অংশী পাপেরও অংশী হয়।
আপনার শ্রমে অর্জিত ধন যতই স্বল্প হোক
তারই দান যে জেনো মিলায় স্বর্গ লোক।
রাজভাণ্ডার হতে যত দান হবে
তাহার পুণ্যবলের অংশী হবে প্রজাগণ সবে।
পাপে অর্জিত সামান্য ধনও যদি রয় রাজকোষে
দুগ্ধ কলস দূষিত হইবে, গোমূত্র চনা দোষে।
এই কথা রাখি মনে
প্রজা কল্যাণ সাধিতে হইবে তাহাদেরই দেওয়া ধনে।

(ঘ) দাতার প্রধান জাফর সদাই দান করে দীনজনে
তাদের সমান দাতা নেই আর এ ধারণা তার মনে।
একদা সহসা বুস্তানে তার সান্ধ্যভ্রমণ কালে
হেরে তার দান ক্ষুধায় কাতর বসে আছে আলবোলে।
দিবস শেসের তিনখানি রুটি প্রাপ্য আহার তার
দিল একে একে কুকুরের মুখে, বিচিত্র ব্যবহার।
কহিল জাফর, ওরে ও নফর, সারাদিন উপবাসী
দিবস শেসের খানা তোর তাও কুকুরের দিলি হাসি?
চমকি বান্দা জোড় হাতে কয়—মরদ হয়েছি ভবে
আজিকে নহিলে না হয় রসদ কালি পুনরায় হবে
খোদার এ জীবে আহার কে দিবে ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা?
মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে তাহারই জীবের সেবা।

(ঙ) পিতা বলিলেন,—"বাছা, মাটির জিনিস পৃথিবীতে কতই না আছে—কলস, ঘট, সরা; আবার এক কলসই না কত রকমের আছে! পৃথক্ পৃথক্ করিয়া কি ইহাদের সকল জানা যায়? অথচ খালি মাটিকে জানিলে মাটির সকল জিনিষই জানা হয়। কারণ, যে কোনও রকমের কলস বল, ঘট বল, অথবা সরাই বল, সকলই মাটির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র; শুধু মাটি দিয়াই তৈরি, মাটি ছাড়া তাহাতে আর কিছুই নাই। একমাত্র মাটিই সেখানে সত্য, ভেদ

কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ লইয়া। এই প্রকার বাছা, একখণ্ড সোনাকে জানিলে সোনার তৈরি হার, কুণ্ডল, বলয় সমস্ত জিনিষই জানা হয়। একখানি ছোট নরুনকে জানিলে লোহার তৈরি তাবৎ বস্তুর তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়। হে বৎস শ্বেতকেতু, এইরূপই সেই 'আদেশ'—এককে জানিলেই তাহাদ্বারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে জানা হয়।"

(চ) যিনি সত্যে স্থিত, তিনিই ব্রাহ্মণ। সত্য এবং সরলতাই ব্রাহ্মণের পরিচয়। গোত্রধর্ম অপেক্ষা স্বভাবধর্ম যে অনেক বড়। সে যে নিজ শাশ্বত ব্রাহ্মণ গোত্রের জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিয়াছে। চক্ষু থাকিতে তাহা তো অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞান থাকিতে তাহাকে তো সম্মান না করিয়া পারা যায় না। শাশ্বত নিত্যধর্মকে, ব্রহ্মস্বভাবকে লাঞ্ছিত করিবে কে? এত মূঢ়, এত নীচ, এত সঙ্কীর্ণ দীন আত্মা তো ঋষি নহেন। ঋষি যে আকাশের মত উদার, সমুদ্রসদৃশ গভীর, গৌরীশঙ্করের মত উন্নত, তিনি যে সূর্যসদৃশ জ্যোতির্ময়।

৩। নিম্নলিখিত অংশগুলির **সারসংক্ষেপ** লিখ :—

(ক) দুই পুত্রের মধ্যে আসন্ন সাংঘাতিক যুদ্ধ সম্ভাবনায় কুন্তী মনের আবেগে একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। কুশলী কৃপাচার্য সমূহ বিপদ বুঝিয়া যুদ্ধ নিবারণ কামনায় কর্ণকে বলিলেন—"হে বসুসেন, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত রাজকুমারের তো যুদ্ধ করিবার নিয়ম নাই। তোমাকে সকলে সূতপালিত বলিয়া জানে, সূতপুত্রের সহিত রাজপুত্র কিরূপে যুদ্ধ করিবেন। তবে হে মহাবাহো, তুমি যদি তোমার প্রকৃত পিতামাতার নামোচ্চারণপূর্বক কোন্ রাজবংশকে তুমি অলংকৃত করিয়াছ তাহা আমাদের নিকট জ্ঞাপন করো, তাহা হইলে, পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অনায়াসেই তোমার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারেন।"

এইরূপে অভিহিত হইলে কর্ণ স্বীয় কুলশীল না জানায় লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। দুর্যোধন স্বীয় শরণাগত বীরের অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তর প্রদান করিলেন, "হে আচার্য, আমি তো জানিতাম যে বীরের সহিত বীরমাত্রই যুদ্ধের অধিকারী। যাহা হউক অর্জুন যদি রাজা ব্যতীত অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন তবে আমি এক্ষণেই বসুসেনকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণপীঠ আনয়নপূর্বক তদুপরি কর্ণকে উপবিষ্ট করাইয়া, মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানপূর্বক লাজ-কুসুম-সুবর্ণদ্বারা তাঁহাকে যথাবিধি অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

দারুণ অবমাননাকালে এইরূপ মর্যাদা রক্ষা হওয়ায় কর্ণ দুর্যোধনের প্রতি যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হইলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, রাজ্যদানের তোমার কোন প্রত্যুপকার করিবার আমার সাধ্য নাই। তবে আমার সাধ্য অনুসারে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

দুর্যোধন প্রীতিসহকারে বলিলেন—"হে অঙ্গরাজ, এক্ষণে তোমার সহিত চিরসখ্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা করি।"

কর্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন এবং যাবজ্জীবন ক্ষণকালের নিমিত্তও এ প্রতিজ্ঞার তিনি অন্যথাচরণ করেন নাই।

(খ) ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিতান্তই মোহাবিষ্ট দেখিয়া কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন।—"হে কৌরবগণ, আমি বারবার বিলাপ করিতেছি। তথাপি মন্দমতি পুত্রগণ যুদ্ধসংকল্প পরিত্যাগ করিতেছে না। বৎস দুর্যোধন, তুমি কি নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবার দুরভিলাষ পোষণ করিতেছ। তদপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের প্রাপ্যাংশ প্রত্যর্পণ করিয়া সুখে আপন রাজ্য পালন করো। পাপযুদ্ধে লিপ্ত হইলে, কুরুকুল সমূলে ধ্বংস হইবে। হে পুত্র, আমি অহোরাত্র এইরূপ চিন্তায় বিহ্বল হইয়া নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইতেছি। এই নিমিত্তই আমি সন্ধি স্থাপনে সমুৎসুক।"

মহাবীর কর্ণ ধার্তরাষ্ট্রগণের হর্ষোৎপাদন করিয়া কহিলেন—"হে মহারাজ, আমি দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাত্মা পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি। আমিই এই যুদ্ধে পাণ্ডবপ্রধানগণকে বিনাশ করিবার ভার গ্রহণ করিলাম।"

কর্ণের এই আত্মশ্লাঘাই দুর্যোধনের দুঃসাহস এবং তজ্জনিত সমস্ত অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া মহামতি ভীষ্ম অনিবার্য ক্রোধে কর্ণকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে কালবুদ্ধিস্ত কর্ণ, পাণ্ডবদিগকে সংহার করিবে বলিয়া তুমি সর্বদাই অহংকার করিয়া থাক। বিরাট নগরে যখন ধনঞ্জয় তোমার প্রিয় ভ্রাতাকে সংহার করিলেন তখন তুমি কি করিতেছিলে? যখন অর্জুন সমস্ত কৌরবগণকে অচেতন করিয়া তাঁহাদের উত্তরীয় সকল হরণ করিলেন, তখন তুমি কি সে স্থানে ছিলে না? এখন তুমি বৃষের ন্যায় আস্ফালন করিতেছ। তোমার ন্যায় ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তির আশ্রয়ের প্রতি নির্ভর করিয়াই এ ঘোর যুদ্ধে ইহারা কালকবলে পতিত হইবে।

(গ) জনক-রাজার পুরোহিত ছিলেন অশ্বল। তাঁহার ডাক নামই ছিল হোতা অশ্বল। রাজপুরোহিত, তাই তাঁর দম্ভের আর সীমা ছিল না। নিজে

ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার বেশ অভিমানও ছিল, এবং তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, ও গোধন তাঁহারই! কিন্তু একি! জনক-রাজার যজ্ঞসভায় জনক-রাজার পুরোহিতের সম্মুখে এই গোধন লইল অপর একজন ব্রাহ্মণ! দম্ভে দিশাহারা, ক্রোধে ক্ষিপ্ত, ব্রহ্মিষ্ঠাভিমানী, ধৃষ্ট হোতা অশ্বল সকলের অগ্রবর্তী হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে, তুমিই নাকি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?" কিন্তু আশ্চর্য ঋষি এই যাজ্ঞবল্ক্য! হোতা অশ্বল যত উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তত বিনীত হইয়া ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ আকাশে স্থিরশৃঙ্গ গৌরীশঙ্করের ন্যায় প্রশান্তভাবে তিনি উত্তর করিলেন,—"ব্রহ্মিষ্ঠের চরণে কোটি কোটি প্রণাম! আমার ধেনুর প্রয়োজন ছিল মাত্র।" যাজ্ঞবল্ক্যের স্নিগ্ধ স্বরে তাঁহার প্রশান্ত বিনয়মহিমায় সকলেই অবাক হইলেন, মুহূর্তের মধ্যে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সেই সংক্ষুব্ধ কোলাহল প্রায় শান্ত হইয়া গেল। রাজা জনক প্রসন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মিষ্ঠই গোধন গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু হোতা অশ্বল কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেও থামিলেন না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সভায় দাঁড়াইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। একে পুরোহিতের প্রশ্ন, আবার সে পুরোহিত গিয়াছিলেন অভিমানে অহংকারে ক্ষিপ্ত হইয়া! কাজেই প্রশ্নগুলি ছিল কেবল যাগ-যজ্ঞের পরিভাষার উল্লেখে কণ্টকিত। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য একটির পর একটি করিয়া ধীরভাবে সমস্ত প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেওয়ায় হোতা অশ্বল বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত অহংকারই চূর্ণ হইয়া গেল, এবং অবশেষে তিনি নতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

(ঘ) পিতা এইবার একদিন রাত্রে একখণ্ড লবণ আনিয়া পুত্রকে বলিলেন,—"বৎস, এই লবণখণ্ড কোনও এক জলপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া রাখিও। কাল প্রাতে উহা লইয়া আমার নিকট আসিবে।"

শ্বেতকেতু সেই লবণখণ্ডটি জলে ফেলিয়া রাত্রে নিদ্রা গেলেন। প্রভাত হইল। শ্বেতকেতুও কৌতূহলভরে ঠিক সময়ে আসিয়া আচার্য পিতার চরণ অভিবাদন করিলেন। ঋষি বলিলেন,—"কাল রাত্রে জলে যে লবণ রাখিয়াছিলে, তাহা তুলিয়া আন দেখি!" শ্বেতকেতু বিশেষ করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু লবণখণ্ড কোথাও পাইলেন না। লবণখণ্ড জলে গলিয়া গিয়াছিল, তিনি তাই পিতার নিকট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঋষি পুত্রকে এইরূপ

অপ্রস্তুত দেখিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, পাত্রের উপরিভাগ হইতে একটু জল লইয়া আস্বাদ কর।"

শ্বেতকেতু উপর হইতে একটু জল পান করিলেন। উদ্দালক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন লাগিতেছে ?"

শ্বেতকেতু—"লবণ।"

উদ্দালক—"আচ্ছা, এইবার মধ্যভাগ হইতে একটু আস্বাদ কর দেখি।"

শ্বেতকেতু মধ্য হইতে একটু জল পান করিলেন।

উদ্দালক—"আচ্ছা, তল হইতে একটু আস্বাদ কর দেখি।"

শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন।

উদ্দালক—"কেমন লাগিতেছে।"

শ্বেতকেতু—"লবণ।"

কাজ হইয়াছে দেখিয়া উদ্দালক বলিলেন,—"এই জল ফেলিয়া দেও এবং হাত ধুইয়া আমার নিকটে আইস।" শ্বেতকেতু জল ফেলিয়া দিয়া শুচি হইয়া পিতার নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন,—"'লবণ তো দেখিতেছি জলে সব সময়েই বিলীন হইয়াছিল।"

পুত্রের এই অভিজ্ঞতা বুঝিয়া পিতা আদর করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"সৌম্য, তুমি দেখিতে পাইতেছ না সত্য, কিন্তু ঠিক এইরূপেই সৎস্বরূপ নিত্যই দেহে বিদ্যমান আছেন! এই যে সূক্ষ্ম বস্তু, ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা! তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা! হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি—তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!"

(ঙ) দিন শেষ হয়ে এল—ব্যথাতুর শোক রক্তচ্ছবি
কুরুক্ষেত্র শ্মশানের পরপারে অস্তপ্রায় রবি।
হেনকালে ধনঞ্জয় উপনীত শিবিরের দ্বারে
রজ্জু বড় পশুসম লয়ে বন্দী অপত্য হন্তারে।
অগ্রসরি ভীমসেন ধরি তারে বজ্রমুষ্টি দিয়া
পাঞ্চালী সকাশে টানি লয়ে গেল কেশ আকর্ষিয়া।
"বধ, বধ, পাষণ্ডেরে, খণ্ডে খণ্ডে কাটো এর দেহ'—
কেহ কয়। 'শূলে দাও'—বলিয়া উঠিল কেহ কেহ।

কহিল ফাল্গুনি—'দেবি এনেছি এ সন্তানঘাতকে
যাহা খুসী দণ্ড দাও এ পাষণ্ডে, এ মহাপাতকে।"
এতক্ষণে অশ্রুজল উছলিল পাঞ্চালীর চোখে
সমস্ত দিনের পরে। উন্মাদিনী বজ্রসম শোকে
সহসা লভিয়া সংজ্ঞা রজ্জুবদ্ধ গুরুপুত্রে দেখি
কহিল চমকি—'পার্থ, হায় হায় করিয়াছ ওকি !
ঘাতকে করিয়া বধ জননীর পুত্রশোক দূর
হয় কভু ? মাতৃহৃদি শান্তি পায় হয়ে কি নিষ্ঠুর ?
মনে পড়ে স্নেহমুগ্ধ তব গুরুপত্নীর বদন,
মনে পড়ে দগ্ধ ভিক্ষু সে গুরুর কাতর নয়ন।
মুক্ত কর, মুক্ত কর, দেখি ওরে ফেটে যায় বুক,
উথলিছে পুত্রশোক হেরি শুষ্ক গুরুপুত্রমুখ
গুরুপুত্রে প্রণমিয়া কৃষ্ণা কয়—"হে ব্রাহ্মণ, ক্ষম,
দৈবদায়ী, তুমি শুধু উপলক্ষ তব খড়্গসম।"
মুক্ত হ'ল অশ্বত্থামা, ভীমসেন উঠিল গুমরি
পাঞ্চালী বলিল গিয়া কৃষ্ণপদে শোকার্তি সংবরি।
যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ধন্য দেবি !' নিষ্পন্দ নীরব
নতশির ধনঞ্জয়। মৃদু হাস্য হাসিল কেশব।

(চ) রজনী প্রভাত হলে
রাজপুরী হতে শ্রীদাম গেলেন চলে।
ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন পথে—হায়,
কিছু প্রার্থনা করা তো হ'ল না লজ্জায়, কুণ্ঠায়।
থাকগে তুচ্ছ ধন
ধন্য হলাম, লাভ হ'ল মোর শ্রীকৃষ্ণদর্শন।
রিক্ত হস্তে শ্রীদাম পশিয়া গ্রামে
দেখিলেন সেথা কে যেন নামায়ে এনেছে অমরা ধামে।

নাই সে কুটীর তার
তার ঠাঁয়ে আছে বিশাল প্রাসাদ অনুরূপ দ্বারকার।
প্রাসাদ তোরণে মঙ্গলঘট কদলী বিটপী রাজে
দাসদাসিগণ ছুটিতেছে গৃহমাঝে
অবাক হইয়া রহিলেন চেয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল ;
স্বপ্ন, না মায়া, ভ্রম,—না—ইন্দ্রজাল।
বিশ্বজগৎ লুপ্ত নয়নে ঘনালো অন্ধকার
গৃহিণীর ডাকে চমক ভাঙিল চেতনা ফিরিল তার।
গৃহিণী সাদরে করিলেন আহ্বান—
"এস এস প্রভু, তব যাচ্ঞায় এ যে বন্ধুর দান।
পথে কেন খাড়া ? গৃহে এসো সত্বর
জনে ভরে গেছে তব পুরী দেখ, ধনে ভরে গেছে ঘর।"
শ্রীদাম বলেন।—"কাঙালিনী প্রিয়া স্থির হও স্থির হও,
ইহারে মায়ায় ছলনা জানিয়া সতর্ক হয়ে রও।
চাই নাই কিছু, ধন লোভ ছিল মনে
তাহারি দণ্ড জানিও এ সব ধনে।
বনে বসি তপ করে যারা যোগে যাগে
মুক্তি পাইতে তাদের গৃহিণীর অনেক জন্ম লাগে।
রাশি রাশি এই সম্পদ মাঝে জয় করি প্রলোভন
তপ কর হেথা, একজনমেই পাইবে মুক্তিধন।
ধনলাভ করি করিও না উল্লাস,
গুরু দায়িত্ব দিয়াছেন হরি তাই কর বিশ্বাস।
এক জনমেই মুক্ত করিতে সখা মোর অভিলাষী
তাই দীন জন পালনের লাগি দিলেন এ ধনরাশি।"

নবম শ্রেণী সমাপ্ত

দশম শ্রেণী

রামায়ণী কথা, রাজর্ষি, কাব্য-মঞ্জুষা

রামায়ণী কথা

ভাবার্থ

নিম্নলিখিত অংশগুলির ভাবার্থ লিখ :

(১) রথ দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইল। রাজা ধূলিশয্যায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন,—প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। চৈতন্যলাভ করিয়া দশরথ দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে কৌশল্যা এবং বামপার্শ্বে কৈকেয়ী ; তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, "আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ করিলাম। তুমি আজ হইতে আমার স্ত্রী নহ।" তৎপর করুণকণ্ঠে বলিলেন,—"দ্বারদর্শিগণ, আমাকে শীঘ্র রাম-মাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাও, আমি অন্যত্র সান্ত্বনা পাইব না।" পুত্রদ্বয় ও রাজবধূবিরহিত শ্মশানতুল্য গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজা বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। রাজা দশরথের তন্দ্রা আসিল, কিন্তু অর্দ্ধরাত্রে জাগিয়া উঠিয়া কৌশল্যাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, রামের রথের পশ্চাতে আমার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে। আমি দৃষ্টি ফিরিয়া পাই নাই, তুমি আমাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর।"

ছয়দিন পরে সুমন্ত্র শূন্য রথ লইয়া ফিরিয়া আসিল। রামকে লইয়া রথ গিয়াছিল, রাম-শূন্য রথ দর্শনে অযোধ্যাবাসীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। সুমন্ত্র দেখিলেন, অযোধ্যার হরিৎছদ শ্যামল তরুরাজি যেন ম্লান-মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কুসুম-কুল গুচ্ছে গুচ্ছে শুষ্ক হইয়াছে। পল্লবান্তরালে অঙ্কুর ও কোরক ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে, পক্ষীগুলি গুণ্ঠিতপক্ষে মৌন হইয়া নীড়ে বসিয়া আছে, মূলবদ্ধ থাকাতে তরুগুলি রামের সঙ্গে যাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহাদের শাখাপল্লব যেন সেই

পথে উন্মুখ হইয়া আছে। হর্ম্ম্যসমূহের শিখর ও বাতায়নে অযোধ্যা-বাসিনীগণের সুন্দর চক্ষু শূন্য রথ দেখিয়া মুহুর্মুহু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। "রামকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?" বলিয়া প্রজাগণ সুমন্ত্রকে সজলচক্ষে প্রশ্ন করিল। উত্তর না দিয়া বাষ্পপূর্ণ চক্ষে সুমন্ত্র রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার স্বর শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মহিষিগণ কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার প্রিয়তম রামের সংবাদ লইয়া সুমন্ত্র আসিয়াছে, তাহাকে কেন কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ না?"

ভাবার্থ—রামের রথ চোখের আড়াল হইয়া গেলে দশরথ জ্ঞান হারাইলেন, প্রজারা হাহাকার করিতে লাগিল। চেতনা পাইয়া রাজা দেখিলেন যে, কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তাঁহার দুই পাশে রহিয়াছেন। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর তিনি রামজননী কৌশল্যার গৃহে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য দ্বারদর্শীদের বলিলেন। রাম-লক্ষ্মণ ও সীতাশূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজা কাঁদিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রে কিন্তু তন্দ্রাভঙ্গে তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন যে, রামের সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে—তিনি কৌশল্যাকে দেখিতে পাইতেছেন না, কৌশল্যা তাঁহাকে হাত দিয়া স্পর্শ করুন। সুমন্ত্র ছয় দিন পরে রথ লইয়া ফিরিয়া আসিলে সেই শূন্য রথ দেখিয়া অযোধ্যাবাসীর হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। সুমন্ত্র দেখিলেন যে, বৃক্ষলতাগুলি ও পক্ষিকুল নীরব। প্রাসাদের শিখর ও বাতায়ন হইতে অযোধ্যাবাসিনীরা শূন্য রথ দেখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। সুমন্ত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই দশরথ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন; রাণীরা ইহাতে শোকে আকুল হইয়া উঠিলেন।

(২) সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী হইয়া বিশাল সৈন্য অসীম জলরাশির অনন্তপ্রসারিত ক্রীড়া লক্ষ্য করিল। কোথাও জলরাশি ফেনরাজি-বিরাজিত ওষ্ঠে কি উৎকট অট্টহাস্য করিতেছে—কোথাও প্রকাণ্ড উর্ম্মি সহকারে কি উদগ্র নৃত্য করিতেছে। তিমি, তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলাসুর-গণের আন্দোলনে উহা গাঢ়রূপে আবর্ত্তিত—বায়ু দ্বারা উদ্ধত হইয়া

বিপুল সলিলবক্ষ যেন আকাশকে প্রগাঢ় পরিরম্ভণ করিয়া আছে। অনন্ত সমুদ্রের একমাত্র উপমা আছে, সেই উপমা আকাশ এবং আকাশের এক উপমা সমুদ্র। উভয়েই বায়ু কর্তৃক আলোড়িত হইয়া অনন্তকাল দিগন্তবিশ্রুত শব্দে কি মন্ত্রসাধন করিতেছে, সমুদ্রের ঊর্ম্মি, আকাশের মেঘ, সমুদ্রের মুক্তা, আকাশের তারা কে গণিয়া শেষ করিবে? সমুদ্র আকাশে মিশিয়াছে, আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে। অনন্তকাল হইতে আকাশ ও সমুদ্র দিগ্বধূগণের অঞ্চল আশ্রয় করিয়া যেন পরস্পরের সঙ্গে ঘনীভূত সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করিতেছে। এই বিপুল সমুদ্রের অগাধ তলদেশ নক্র-কুম্ভীরাদির নিকেতন। ঊর্ম্মিগণের সঙ্গে প্রমত্ত ও ক্ষিপ্তপ্রায় ঝঞ্ঝার কি উদ্দাম প্রলাপ কথোপকথন চলিতেছে? মৌন বিস্ময়ে তীরে দাঁড়াইয়া অসংখ্য সুগ্রীবসৈন্য ভীত চক্ষে এই অসীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল। ইহা উত্তীর্ণ হইবে কিরূপে?

ভাবার্থ—বিরাট সৈন্যদল সমুদ্রের তীরে গিয়া বিশাল জলরাশির বিপুল ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। কোথাও জলের ফেনা যেন অট্টহাস্য করিতেছে, কোথাও বা যেন জলরাশি নৃত্য করিতেছে। তিমি, তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলদানবের আন্দোলনে জলরাশি আবর্তিত হইতেছে। বায়ুক্ষুব্ধ জলরাশি যেন আকাশকে স্পর্শ করিতেছে। অনন্ত সমুদ্র আর অনন্ত আকাশ—একটি অপরটির উপমা। উভয়েই বায়ুসঞ্চালনে সংক্ষুব্ধ। সমুদ্রের ঊর্মি ও মুক্তা, আকাশের মেঘ ও তারকা—দুইই অগণিত। অনন্তকাল হইতে সমুদ্র ও আকাশ দিগন্তে মিলিত হইয়া যেন পরস্পরের নিবিড় স্পর্শলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই বিপুল সমুদ্রের নিচে ভয়ঙ্কর প্রাণীদের আবাসস্থল। প্রমত্ত তরঙ্গ আর বিক্ষুব্ধ ঊর্মির মধ্যে যেন কী কথোপকথন চলিতেছে। সুগ্রীবসৈন্য ভীতচক্ষে এই অনন্ত জলরাশি দেখিতে লাগিল—এই বিশাল সমুদ্র পার হইবার কি উপায় হইতে পারে তাহা চিন্তা করিতে লাগিল।

(৩) যে কাব্যের ঘটনা জীবনব্যাপী, সে কাব্যের চরিত্রগুলি নাটকের রীতি অনুসারে বিচার্য্য নহে। এই দীর্ঘকালের নানারূপ অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্ত্তা বিচিত্র

হইয়া থাকে—তাহা সময়োপযোগী হয় কিনা—তাহাই সমধিক পরিমাণে বিচার্য্য। শ্রেষ্ঠতম সাধুরও সারাজীবনের অন্তবর্ত্তী দুই একটি ঘটনা বা উক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোকে ধরিলে তাহা তাদৃশ শোভন বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। অবস্থার ক্রমাগত উৎপীড়ন সহ্য করিয়া লোকে সাধারণতঃ সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন হইলেও দুই এক স্থলে ভাবের ব্যত্যয় ঘটা স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া রামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন—তাহা তাঁহার সমগ্র জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলে দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অবস্থার আলোকপাতে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহা অনেক সময়েই অন্যরূপ প্রতিপন্ন হইবে। তাঁহার "দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক" উক্তিগুলি বাদ দিলে হয়ত তিনি আমাদের সহানুভূতির অত্যূর্দ্ধে যাইয়া পড়িতেন, আমরা তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতাম না। রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্যায়, উহা কচিৎ নমিত হইয়া ভূ-স্পর্শ করিলেও সেই অবনয়ন তাহার নভস্পর্শী গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করে না—পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করে মাত্র।

রামচন্দ্র সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপনার চরিত্রকে অপূর্ব্ব শ্রীসমন্বিত রাখিয়াছেন—তাঁহার কোন চিন্তা বা কার্য্যই পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হইতে উত্থিত হয় নাই ; এমন কি, বালীকেও তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাপহারী দস্যু বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্য দণ্ড দিতেও গিয়াছিলেন। সুগ্রীবের শত্রু, তাঁহার শত্রু—তাঁহাকে বধ করিতে তিনি অগ্নিসমক্ষে প্রতিশ্রুত ছিলেন, এই প্রতিশ্রুতি পালনও তিনি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উত্তরাকাণ্ড-বর্ণিত সীতাবর্জ্জনেও দৃষ্ট হয় রাম যাহা স্বকর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন—তাঁহার জীবনকে সম্যকরূপে নৈরাশ্যপূর্ণ করিয়াও তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এই ঘটনায়ও তাঁহার চরিত্রের সতেজ পৌরুষের দিকটাই জাজ্জ্বল্যমান করিয়াছে। মহাকাব্যের কোন গূঢ় দেশে অবস্থার দারুণ নিপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি দুই একটি অধীর

বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া হট্টগোল করা এবং হিমালয়ের কোন শিলা বা পাদপে একটু ক্ষতচিহ্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া পর্ব্বত রাজের মহত্ত্বকে তুচ্ছ করা তুইই একবিধ। পল্লবগ্রাহী পাঠকগণ রামচরিত্রের তদ্রূপ সমালোচনার ভার লইবেন। বাল্মীকির অঙ্কিত রামচরিত্র অতি মাত্রায় জীবন্ত—এ চিত্রে সূচিকাবিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়—এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধূম-বিগ্রহে পরিণত হইয়া পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।

ভাবার্থ—বিশাল মহাকাব্যের কেন্দ্রচরিত্র রামচন্দ্র। নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া এই চরিত্রটির বিকাশ। সুতরাং এই চরিত্রের বিচার নাটকের নায়ক-চরিত্রের বিচারের মত হইবে না। কেবল দেখিতে হইবে রামচন্দ্রের উক্তি ও কার্য সময়োপযোগী হইয়াছে কিনা। কোন একটি কথা বা একটি কাজকে সমস্ত জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এককভাবে বিচার করা সঙ্গত নয়। রামের চরিত্র বিরাট বৃক্ষের মতো সমুন্নত; তাঁহার চরিত্রে সামান্য যে তুই একটি দোষ দেখা যায় তাহা বনস্পতির ভূতলস্পর্শী তুই একটি শাখার মতো, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের মহিমার হানি হয় না। রামচন্দ্রের চরিত্র উৎকৃষ্ট নীতিরই অনুসরণ করিয়া সমুজ্জ্বল হইয়াছে—তিনি কেবল পরের অনিষ্ট করিবার জন্য কোনো চিন্তা বা কার্য করেন নাই। বালীকে পাপচরিত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন। সুগ্রীবের শত্রু বলিয়াই বালী তাঁহার বধার্হ হইয়াছে—বালীবধের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সেই প্রতিশ্রুতি-পালনও তিনি ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উত্তরাকাণ্ডের সীতাবিসর্জনেও দেখি যে, রাম আপনার জীবনকে নৈরাশ্যে ভরিয়া দিয়াও যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন—ইহা তাঁহার চরিত্রের পৌরুষদৃপ্ত সতেজতারই পরিচায়ক। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনার নিপীড়নে তিনি যে তুই একটি অধীর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই--শিলা বা বৃক্ষের ক্ষতচিহ্নে পর্বতের মহত্ত্বহানি হয় না। বাল্মীকি যে রামের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নিরতিশয় জীবন্ত—তাহা গ্রন্থভুক্ত অবাস্তব আদর্শমাত্রে পরিণত হয় নাই।

(৪) ভরত জ্যেষ্ঠের পদতলে লুটাইয়া বলিলেন, "আমার জননী মহাঘোর নরকে পতিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন; আমি

আপনার ভাই, শিষ্য দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল, ভরত বলিলেন, "আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইব, প্রতিশ্রুতি পালন আমারই কর্ত্তব্য।" কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া কুটীরদ্বারে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় তাঁহাকে সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা প্রদান করিলেন। জটাভার শোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটের স্থানীয় হইল; সহস্র ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়-কালে বলিলেন, "রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" অযোধ্যার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ভরত বলিলেন, "অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।" নন্দীগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কল-পরিহিত ফলমূলাহারী রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন? তাঁহারা সকলে কাষায় বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন, সেই কাষায় বস্ত্রপরিহিত সচিববৃন্দ-পরিবৃত, ব্রত অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন।

ভাবার্থ—ভরত রামের পায়ে লুটাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার মাতা ঘোরতর পাপ করিয়াছেন, রাম যেন তাঁহাকে ক্ষমা করেন। ভরত রামের ছোট ভাই ও দাসানুদাস—তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যেন রাম সিংহাসন গ্রহণ করেন। বহু বিতর্কের পর ভরত বলিলেন যে, তিনিই চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন। রামকে কোনোমতে সম্মত করিতে না পারিয়া ভরত অবশেষে অনশনব্রত গ্রহণ করিয়া কুটীরের দ্বারে পড়িয়া রহিলেন। রাম তাঁহাকে সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা দিলেন। ভরত সেই পাদুকা আপনার মাথায় তুলিয়া লইলেন—জটার উপরে পাদুকা অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হইল। বিদায়ের সময় ভরত বলিলেন যে, তিনি চৌদ্দ বৎসর সেই পাদুকার উপর রাজ্যভার সমর্পণ

করিয়া রামের প্রতীক্ষা করিবেন—তাহার পর রাম না ফিরিলে তিনি অগ্নিতে জীবন বিসর্জন দিবেন। ভরত রামহীন অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না —তিনি নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। উহা ঋষির আশ্রমে পরিণত হইল। জটাবল্কলধারী ফলমূলাহারী ভরতের অনুবর্তী সচিববৃন্দ বহুমূল্য পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিলেন। এইভাবে ব্রতক্লিষ্ট ভরত পাদুকার উপর রাজছত্র ধরিয়া চৌদ্দ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্তসার

নিম্নলিখিত অংশগুলির সংক্ষিপ্তসার লিখ :—

(৫) আরণ্যজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল—কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদ সহকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসানুদেশের পুষ্পিত বন্যতরুরাজি হইতে কুসুম চয়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চূর্ণকুন্তলে পরাইয়া দিতেন ; গৈরিক-রেণু দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেন, পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনী তীরে অবগাহন করিতেন কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন, আর এদিকে মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিতেন, কখনও পরশুহস্তে শালশাখা কর্ত্তন করিতেন, কখনও অস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশপেটিকা হস্তে লইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বৃষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতেন। একদিন দেখিতে পাই, শীতকালের তুষার-মলিন জ্যোৎস্নায় শেষ রাত্রিতে যবগোধূমাচ্ছন্ন বনপন্থায় নালশেষ-নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। অন্য একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূট পর্ব্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতটে যাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কখনও তিনি কোমল-দর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপত্র দ্বারা রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও

বা দেখিতে পাই তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্য বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড শুষ্ক বন্য বেতস লতার দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া মধ্য ভাগে জম্বু শাখা দ্বারা সীতার উপবেশন জন্য 'সুখাসন' রচনা করিতেছেন। এই সংযমী স্নেহবীর ভ্রাতৃসেবায় তাঁহার নিজসত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্তসার—বনবাসের কঠোর অংশ লক্ষ্মণকেই ভোগ করিতে হইয়াছিল—তিনি তাহা সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। রাম পার্বত্য পুষ্প চয়ন করিয়া বা গৈরিক রেণু দিয়া সীতাকে সাজাইতেন—সীতার সহিত ক্রীড়ায় তাঁহার দিন আনন্দে কাটিয়া যাইত। আর লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়িয়া পর্ণশালা নির্মাণ করিতেন—সমস্ত সামগ্রী লইয়া একস্থল হইতে অন্যস্থলে গমন করিতেন, কখনও বা অগ্নি জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিতেন। তিনি শীতের শেষরাত্রে বনপথ দিয়া গিয়া সরোবর হইতে জল তুলিতেন—চিত্রকুটের পর্ণশালা হইতে সরসীতীরে যাইবার পথ বৃক্ষশাখায় চীরখণ্ড বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিতেন। তিনি কোমল পত্রপল্লব দিয়া রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া রামের জন্য অপেক্ষা করিতেন। আবার দেখি যে, বেতসলতা ও কাষ্ঠাদি দিয়া তিনি সীতার জন্য সুখাসন রচনা করিতেছেন। বস্তুতঃ, এই সংযমী স্নেহাতুর বীর অগ্রজের সেবার জন্য আপনাকে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

(৬) অযোধ্যার বিষণ্ণ, শোককরুণ, প্রভাহীন রাজপ্রাসাদের কক্ষে কক্ষে আত্মীয়দৃষ্টিবর্ষিত ঘৃণায়, লজ্জা ও দৈন্যে অবগুণ্ঠনবতী কিভাবে আপনাকে লুকাইয়া ফিরিতেন, তাহার চিত্র ক্ষণে ক্ষণে আমরা কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া শিহরিয়া উঠি। সীতার অলক্তরাগবর্জ্জিত পদ্মকোষ-সমপ্রভ পদযুগল কণ্টকক্ষত হইতেছে, এই আশঙ্কায় যে তপ্ত শ্বাস উঠিত—সেবাপরায়ণ লক্ষ্মণের বন্য জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া যে অশ্রুবিন্দু প্রলুব্ধ হইত—ইন্দীবরশ্যাম রামচন্দ্রের মলিনকান্তি মনে করিয়া রাজ্যে যে আর্ত্তনাদ উঠিত—পরিব্রাজকবেশী ফলমূলাহারী ভরতের দৈন্য দেখিয়া প্রজাদের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের যে আবেগ অধীর হইয়া উঠিত—অযোধ্যাময়, নন্দীগ্রামময় অপার কারুণ্যের মধ্যে যে একটা উদ্দাম ঘৃণা ও ক্রোধের ভাব প্রতি মুহূর্ত্তে রোষকষায়িত চক্ষে বিধবা রাজ্ঞীর প্রতি বিচ্ছুরিত হইয়া অবজ্ঞা বর্ষণ করিত—সেই অবজ্ঞা

ও ঘৃণা হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য অভিমানিনী প্রবলপ্রতাপান্বিতা রাজ্ঞী কোন্ যবনিকার অন্তরালে, কোন্ নিগূঢ় কক্ষতল আশ্রয় করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর কিভাবে কাটাইয়াছিলেন, জানি না; কবি সে যবনিকা উত্তোলন করেন নাই, কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক লোকেরা শেষ পর্য্যন্ত কিছু না দেখিয়া পরিতৃপ্ত হন না। সারেঙ্গের মধুর স্বরের সঙ্গে একতান কণ্ঠে বৈষ্ণব গায়ককে গাহিতে শুনিয়াছি প্রত্যাগত রামকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৈকেয়ী বলিতেছেন—

'এতদিন পরে ঘরে আলিরে রামধন।
মা বলে ডাকে না ভরত, মুখ দেখে না শত্রুঘন।

সংক্ষিপ্তসার—কৈকেয়ী যে কী ক'রে অযোধ্যার শোকাচ্ছন্ন বিষাদ-মলিন রাজপ্রাসাদে আত্মীয়দের ঘৃণাদৃষ্টির সমুখে লজ্জায়, কুণ্ঠিত হয়ে দিনযাপন করতেন তা কল্পনা করতেও আমরা শিউরে উঠি। সীতা ও লক্ষ্মণের দৈহিক ক্লেশের কথা স্মরণ ক'রে অযোধ্যাবাসীর মনে যে বেদনা জাগত, শ্যামলকান্তি রামচন্দ্রের মলিনতা স্মরণ করে বা সর্বত্যাগী ভরতের কঠোর মুনিব্রত স্মরণ করে অযোধ্যায় আর নন্দীগ্রামে যে হাহাকার জাগত তা' একটা প্রচণ্ড ঘৃণা, বিদ্বেষ আর ক্রোধের মূর্তি ধরে স্বামিহীনা কৈকেয়ীর দিকে ধাবিত হত। অভিমানিনী কৈকেয়ী কী করে চোদ্দ বছর কাটিয়েছিলেন তা' আমরা জানি না। কবি আমাদের সে দৃশ্য দেখান নি। কিন্তু আধুনিক যুগের লোকেরা শেষ পর্যন্ত না দেখে তৃপ্ত হয় না। সেই জন্য গ্রাম্য গায়কের গানে শোনা যায় যে, গৃহপ্রত্যাগত রামকে বুকে ধরে কৈকেয়ী বলছেন—রাম, এতদিন পরে ফিরে এলি, ভরত মা বলে ডাকে না, শত্রুঘ্ন মুখ দেখে না।

(৭) সীতার কাহিনী দুঃখ, পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী। এই সত্য চিত্র বাল্মীকি চিরজীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল আলেখ্য হিন্দুস্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও সুশোভিত। অলক্ষিত-ভাবে সীতার সতীত্ব হিন্দুস্থানের পত্নীকুলের মধ্যে অপূর্ব্ব সতীত্ববুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। নূতন সভ্যতার স্রোতে নূতন বিলাস-কলাময় চিত্র দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী

অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহীন না হই! এস মাতা! তুমি সহস্র সহস্র বৎসর গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় হিন্দুর গৃহে যে পুণ্য শক্তির সঞ্চার করিয়াছ—তাহার পুনরুদ্দীপন কর, আবার ঘরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি ভারতবাসিনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈন্যে, তুমি তাঁহাদিগের কঠোর সহিষ্ণুতায় প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও পবিত্র আত্মসমর্পণের মধ্যে বিরাজ কর। তোমার সুকোমল অলক্তরাগ-রঞ্জিত পাদযুগ্মের নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে সতীত্বের বার্ত্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত—তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি ভগবানের দান। আমাদিগের নানা দুঃখের ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছায়া অলক্ষ্যে ভাসিয়া বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়া আমাদের স্বল্প খাদ্য ও ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম তৃপ্তিকর হইয়া উঠে।

সংক্ষিপ্তসার—সীতার কাহিনী দুঃখ, পবিত্রতা ও ত্যাগে অপরূপ—কবি বাল্মীকি-রচিত সীতার চিরজীবন্ত চিত্র ভারতের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত। সীতার সতীত্ব ভারতের নারীদের মধ্যে সতীত্ববোধ জাগ্রত করিয়া আমাদের গৃহকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। নূতন সভ্যতার বিলাসময় দৃশ্য দেখিয়া আমরা যেন সেই অমর চিত্রের প্রতি বিমুখ না হই। জননী সীতা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুর গৃহে যে পুণ্যশক্তি সঞ্চার করিয়া আসিতেছেন আজ তাহার পুনরুজ্জীবন হউক। তিনি ভারতনারীর লজ্জা, বিনয়, দৈন্য, কঠোর সহিষ্ণুতা ও আত্মসমর্পণের মধ্যে বিরাজ করুন। সীতা আমাদের আদর্শমাত্র নন, কবির সৃষ্টিমাত্র নন, তাঁহাকে আমরা ভগবানের দানরূপে পাইয়াছি। আমাদের নানা দুঃখ ও বিপদের মধ্যে সীতার প্রতিচ্ছবি অলক্ষ্যে প্রতিফলিত হয় এবং তাহাতেই আমাদের দরিদ্র জীবন পরম আনন্দময় হইয়া উঠে।

(৮) এই তাপসচরিত্র সেবক রামকার্য্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির ইহাই প্রাক্-সূচনা। হনুমান অশোকবনে সীতার ম্লান, উপবাসশীর্ণ, ক্লিন্ন-কাষায়বাসিনী মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন—রাবণ সহস্ররূপে শক্তিসম্পন্ন হউক—তাহার রক্ষা নাই—ইনি লঙ্কার পক্ষে কাল-রজনী-স্বরূপিণী। রামের অমোঘবাণ যদি

প্রভাবশূন্য হয়, এই সাধ্বীর তপঃপ্রভাব তাহাতে তীক্ষ্ণতা প্রদান করিবে। সীতা আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ। অপর সহায় উপলক্ষ মাত্র, সীতা—"রক্ষিতা স্বেন শীলেন।" ধর্ম্মনিষ্ঠ হনুমান ধর্ম্মবল কি তাহা জানিতেন, এইজন্যই সীতাকে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত আশঙ্কা দূরীভূত হইল—আত্মপক্ষের বলের উপর প্রবল আস্থা জন্মিল।

এই নৈতিক পবিত্রতা আমরা কিষ্কিন্ধ্যা হইতে প্রত্যাশা করি নাই। যেখানে বালীর ন্যায় মহিমান্বিত রাজা স্বীয় কনিষ্ঠের বধূকে হরণ এবং স্ত্রীঘটিত কলহে লিপ্ত হইয়া মায়াবীকে হত্যা করিয়াছিলেন, যেখানে রামসখা মহাপ্রাজ্ঞ সুগ্রীব জ্যেষ্ঠের জীবিতকালেই তাঁহার পত্নীকে স্বীয় প্রমোদশয্যায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যেখানে পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া অতিরিক্ত পানে মুক্তলজ্জা তারা সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন্ নাই—সেই কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে উগ্রতপা, তীক্ষ্ণ নৈতিকবুদ্ধিসম্পন্ন, কর্ত্তব্য কার্য্যে সতত জাগ্রতচক্ষু, কলুষহীন, বিলাসবর্জ্জিত ও বিপদে অকুণ্ঠিত, দাস্যভক্তির অবতার হনুমানকে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

সংক্ষিপ্তসার—হনুমানের চরিত্রের মধ্যে একটা অসামান্য দৃঢ়তা ও পবিত্রতাবোধ ছিল। রামের কার্যে তিনি যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা যে সিদ্ধ হইবে তাঁহার আচরণেই তাহার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। অশোক বনে বন্দিনী সীতার তপস্বিনী মূর্তি দেখিয়াই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, রাবণের আর রক্ষা নাই—লঙ্কার বিনাশ সমাগতপ্রায়। এই সাধ্বীর সাধনার প্রভাব রামের বাণকে তীক্ষ্ণতর করিয়া লঙ্কাকে ছারখার করিয়া দিবে। সীতা আপনার ধর্ম দ্বারা রক্ষিতা—সীতার অপরিসীম ধর্মবল উপলব্ধি করিয়া হনুমান্ আত্মপক্ষের শক্তির উপর নূতন করিয়া বিশ্বাস ফিরিয়া পাইলেন। বস্তুতঃ তাঁহার এই নৈতিক উৎকর্ষ কিষ্কিন্ধ্যার পক্ষে অপ্রত্যাশিত। যেখানে বালী বা সুগ্রীব ভ্রাতৃবধূকে প্রমোদের সঙ্গিনী করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই—পতিনিষ্ঠার অভিনয় করিয়া তারা যেখানে সুগ্রীবের প্রমোদসঙ্গিনী হইয়াছে, সেই নীতিবোধহীন পরিবেশে তাপসব্রতী, তীক্ষ্ণধী, কর্তব্যনিষ্ঠ, নিষ্পাপ, বিলাস-

পরাঙ্মুখ, বিপদে নির্ভীক, দাস্যপ্রেমের মূর্তপ্রতীক হনুমানের চরিত্র আমাদের কাছে যেন অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হয়।

(৯) আমাদের ঋষিগণ গলিত পত্র আহার করিয়া ধর্ম্মব্রত পালন করিতেন, শকুন্তলা আপনার পৃষ্ঠবিলম্বিত কেশরাশির শোভা সংবর্দ্ধনের জন্য একটি পল্লবকেও বৃক্ষচ্যুত করিতে পারিতেন না—এ সকল কবি-কল্পনা নহে; বিশ্বপ্রেম এমনই উদার কোমলতায় হিন্দুর হৃদয়পূর্ণ করিয়াছিল। এখনও এদেশের গৃহলক্ষ্মীগণ গৃহের সামান্য পরিচারক-দিগকে অগ্রে ভোজন করাইয়া আপনারা সর্ব্বশেষে খাইয়া থাকেন। বিধবাগণের কঠোর ত্যাগের ছবি এখনও আমাদের চক্ষুর উপর বিরাজ করিতেছে। আধুনিক সভ্যতার বিলাসকলাবিড়ম্বিত রমণীমণ্ডলীর নিকট নিবৃত্তির এই নির্ম্মল আদর্শ কি চিরদিনই উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে? আমরা "জাতি" এই শব্দের অর্থ বুঝি নাই; nationality কথা বিদেশীয়; আমরা পক্ষপাতদুষ্ট ক্ষুদ্র গণ্ডীর সৃষ্টি করি নাই, আমাদের নীতি ও শিক্ষা-দীক্ষা উদার, বিশ্বজনীন, প্রশান্ত। "সতত অভ্যাগত গুরু", "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রভৃতি কথাগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় আমরা জাতি কি বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করি না—আমাদের শিক্ষা-নীতি সমগ্র জগৎকে লক্ষ্য করে। আমাদের প্রেম, আমাদের ক্ষমা, আমাদের স্বার্থ ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে—উহা সার্ব্বজনীন, উহা উদার বায়ুমণ্ডলের ন্যায় বিশ্বব্যাপক। বিশ্বরক্ষার চিরন্তন নিয়মাবলীর মধ্যে গণ্য আমাদের ধর্ম্ম কে না জানে—পিতাপুত্রের সম্বন্ধের ভিতরে, বান্ধবতার ভিতরে, দাম্পত্য ও ভৃত্যভাবের ভিতরে, বাৎসল্যের রূপে, সখ্যের রূপে, মাধুর্য্যের রূপে, দাস্যের রূপে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ। তাহার উচ্চ শান্তিনিলয় বেদান্তধর্ম্ম; সে রাজ্য কলহদুষ্ট, স্বার্থপুষ্ট, ব্যাধের ন্যায় লুব্ধ মনুষ্য জগতের অত্যূর্দ্ধ, যেখানে আমাদের হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ এই শান্তি ও ধর্ম্মের রাজ্য যেন সেইখানে ইহার পরম পরিতৃপ্ত মনুষ্যকে চিরমৌনী করিয়া ফেলে, ইহা সমস্ত ভেদবুদ্ধি মুছিয়া ফেলিয়া মনুষ্যের যে গম্ভীর, সৌম্য ও করুণার মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, তাহা জগতে অতুলনীয়।

সংক্ষিপ্তসার—প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ, প্রেম সর্বব্যাপী ছিল। ঋষিদের গলিতপত্রে প্রাণধারণ বা শকুন্তলার শোভার্থে একটি পল্লবও গ্রহণ না করা কবির কল্পনামাত্র নয়। হিন্দুর হৃদয় বিশ্বপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। গৃহলক্ষ্মীদের সকলের শেষে আহার্য গ্রহণ, বিধবাদের ত্যাগ এখনও আমাদের চোখের সমুখে ভাসিতেছে—আধুনিক বিলাসপরায়ণা নারীদের কাছেও এ আদর্শ উপেক্ষিত হইবার নয়। জাতীয়তার সংকীর্ণ বোধ আমাদের মধ্যে নাই—আমাদের নীতি ও শিক্ষা-দীক্ষা একান্ত উদার। আমাদের নীতি-শিক্ষা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দৃষ্টি জাতি বা বর্ণবিশেষকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বের দিকে প্রসারিত। আমাদের প্রেম, আমাদের স্বার্থ সকলই বিশ্বকে লইয়া। বিশ্বের আদর্শকেই আমরা ধর্মের স্থান দিয়াছি। আমরা পরিবারের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে ধর্মের বোধ জাগ্রত করিয়াছি। শান্তিময় বেদান্ত-ধর্ম আমাদের আদর্শস্থানীয়! আমাদের আদর্শ কলহ, সংকীর্ণ স্বার্থ ও লোভের ঊর্ধ্বে। আমাদের ধর্ম তাহার পরম শান্তির আদর্শ দিয়া মানুষের সমগ্র সত্তাকে পরিতৃপ্ত করে, সমস্ত ভেদবুদ্ধি দূর করিয়া তাহার হৃদয়কে করুণায় পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়। জগতে এই ধর্মের এই আদর্শের তুলনা নাই।

ভাবসম্প্রসারণ

নিম্নলিখিত কয়েকটি সুভাষিতের ভাব-সম্প্রসারণ কর ঃ—

(১) পক্কশস্যের যেরূপ পতনের ভয় নাই, সেইরূপ মনুষ্যের মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত কারণ উহা অবধারিত।

মানুষ মৃত্যুকে যেমন ভয় করে এমন আর কোনো কিছুকে নয়। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি কী যে হইবে তাহা কেহ সত্য করিয়া জানে না—মৃত্যুর মধ্যদিয়া জীব ধ্বংস হইয়া যায়, কেবল এইটুকু দেখা যায়। মানুষ আপনার অবলুপ্তিকে ভয় করে। সুতরাং সে জীবনকে একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায় এবং মৃত্যুর নামে একান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠে।

কিন্তু মানুষ যতই ভয় করুক না কেন, মৃত্যুই মানুষের শেষ পরিণতি এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনেই ইহা অবশ্যম্ভাবী। মানুষের জীবন যখন পরিণতি লাভ করে, যখন সে বৃদ্ধ হয়, তখন তাহার জীবন শেষ হইয়া আসে—মৃত্যুর মধ্যে তখন তাহা পরিণতি লাভ করে। বস্তুত মৃত্যু বিলুপ্তিমাত্র নয়। ইহা

জীবনের শেষ পরিণতিমাত্র। ওষধির জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে শস্যটি নবহরিৎ বর্ণ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা পক্ব হইয়া অবশেষে আপনার এবং বৃক্ষেরও জীবনাবসান ঘটায়—তাহা নব পাদপের জন্মের ক্ষেত্র রচনা করে। মানুষের জীবনেও তেমনই বংশের মধ্যদিয়া এক- জীবনের অবসান ও অপর জীবনের অভ্যুত্থানের সত্যটি ব্যক্ত হইয়াছে। এই সত্যটি অন্তরে উপলব্ধি করিলে মানুষের মৃত্যুভয় বিদূরিত হইয়া যায়।

(২) অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে।

পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস ঘটে যাহার উপর মানুষের কোনো হাত নাই। ঘটনার স্রোত এরূপভাবে বহিয়া যায়, আকস্মিকভাবে এমন অনেক অভিনব সংঘটন হয় যে, মানুষ তাহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে একরূপ বাধ্যই হইয়া পড়ে। এই আকস্মিকতা, মানুষের অনায়ত্ত এই শক্তিকে দৈব বলা হয়। মানুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও দৈব বলবান হইয়া অনেক সময় তাহার সমস্ত প্রয়াসকে বিফল করিয়া দেয়।

এইজন্য কেহ কেহ দৈবই বলবান বলিয়া সমস্ত কর্মের জন্য দৈবকেই দায়ী করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু ইহা দীনতা ও শক্তিহীনতার লক্ষণ। দৈব মানুষের অনায়ত্ত বটে, কিন্তু পুরুষকার আয়ত্ত। মানুষ আপনার শক্তিকে জাগ্রত করিয়া কর্মব্রতে অগ্রসর হইলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কোনো কাজ সফল হইবে কি হইবে না দৈবের উপর তাহা ছাড়িয়া না দিয়া আপনার পৌরুষের বলে, অক্লান্ত কর্মসাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভের প্রয়াস সর্বপ্রথমে করা উচিত। প্রথম হইতেই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া হাল ছাড়িয়া দেওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ। মানুষকে তাহার পুরুষকারকে অবলম্বন করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। দৈবের ক্রিয়া যখন অনিশ্চিত, তখন পুরুষকারের সহায়তা-গ্রহণই প্রকৃষ্ট পথ। যথার্থ শক্তিমান ও শৌর্যশালী ব্যক্তি দৈবকে উপেক্ষা করিয়া আত্মশক্তির উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন।

(৩) স্বেচ্ছাবৃত দুঃখেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, সুখ মানুষের একান্ত অভিপ্রেত, কিন্তু মানুষের জীবনের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে অনুভব করা যায় যে, মানুষ সুখকেই চরম মূল্য দেয় নি—সে চিরকাল প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে দুঃখকে

স্বীকার করে এসেছে। অজানা দেশ আবিষ্কার করার জন্য অভিযাত্রিদল সহস্র ক্লেশ হাসিমুখে বরণ করেছে, বৈজ্ঞানিক কোনো সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেছে। মানুষ যে জীবনে দিন দিন এত সমৃদ্ধিলাভ করছে, সে যে পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করছে, এর মূলে আছে তার অন্তহীন দুঃখবরণের ব্রত।

মানুষের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যেও আমরা এই দুঃখবরণের চিত্র দেখতে পাই। মানুষ মানুষকে ভালোবেসে তার জন্য সানন্দে নানা দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। মানুষের সমস্ত স্নেহসম্বন্ধের সঙ্গে দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণের ইতিহাস জড়িত। পিতামাতা সন্তানের জন্য দুঃখ স্বীকার করেন, সন্তান পিতামাতার জন্য দুঃখ স্বীকার করে, ভাই ভাইয়ের জন্য দুঃখ বরণ করে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য দুঃখকে হাসিমুখে মেনে নেয়, বন্ধু বন্ধুর জন্য দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে এগিয়ে যায়। বস্তুত এইভাবে দুঃখস্বীকারেই মানুষের সার্থকতা, এই-ই মানুষের মনুষ্যত্ব। সুখে নয়, আরামে নয়, তপঃসাধনায়, দুঃখবরণে মানুষের জীবনের পরম সার্থকতা, মানুষের চরম মর্যাদা।

রাজর্ষি

[রাজর্ষি ভিন্ন জাতীয় পুস্তক, অর্থাৎ ইহা একটি উপন্যাস। একটি কাহিনীর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কতকগুলি চরিত্র ইহার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাবসম্প্রসারণ বা ভাবার্থ যাহা কিছুই লিখিত হউক না কেন, কাহিনীর ঘটনাগুলি ও চরিত্রের মোটামুটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। এইজন্য এই বইগুলির আলোচনায় অন্যপ্রকার রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।]

•

গোবিন্দমাণিক্য-চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

গোবিন্দমাণিক্য রাজা হইয়াও সন্ন্যাসীর মতো শান্ত নিরাকুল ছিলেন। তবে সন্ন্যাসীর মতো তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্য ছিল না। তাঁহার অন্তর অন্তহীন প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। এই প্রেমের বশবর্তী হইয়াই তিনি ভুবনেশ্বরীর মন্দির হইতে জীববলি তুলিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দেবী যদি জগজ্জননী হন তাহা হইলে তাঁহার কাছে জীবের প্রাণ বলি দেওয়ার সার্থকতা নাই—ইহাতে দেবীর পূজার নাম করিয়া মানুষের অন্তরের হিংসাপ্রবৃত্তিকেই পরিতৃপ্ত করা হয় এই মাত্র। গোবিন্দমাণিক্যের অন্তরের প্রেম মানুষের অন্তরের অপ্রেমকে দূর করিতে চাহিয়াছে—তাতা ও হাসি উপলক্ষ হইয়া মন্দিরে বলিনিষেধের সংকল্প দৃঢ় করিতে চাহিয়াছে এইমাত্র।

সংসার হইতে অপ্রেম দূর করিবার জন্যই তিনি, ভ্রাতা নক্ষত্ররায় যখন রঘুপতির প্রভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন নগরের বাহিরে জনজীবনের বাহিরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে বলিয়াছিলেন। নক্ষত্ররায় অপরাধ স্বীকার করিলে তিনি তাহাকে অকুণ্ঠচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, বিচারে নক্ষত্ররায় নির্বাসনদণ্ড লাভ করিলে তিনি শোকাকুল হইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে নক্ষত্ররায় যখন সুজার আদেশ লইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে অগ্রসর হইলেন তখন তিনি অনর্থক রক্তপাত যাহাতে না হয় তাহার জন্য রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া বৈরাগীর বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, হিংসাপ্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে তাহা ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিয়া মানুষকে নৃশংস করিয়া তুলে, মানুষ প্রেম দিয়াই মানুষের

প্রেম জাগাইতে পারে। গোবিন্দমাণিক্যের অন্তহীন প্রেমই তাঁহার ঘোরতর শত্রু রঘুপতিকে এবং অকারণে তাঁহার ক্ষতিকারক শাহসুজাকে তাঁহার সঙ্গে মিলিত করিয়াছে।

গোবিন্দমাণিক্যের অন্তরের এই প্রেম শিশুদের প্রতি নিবিড় স্নেহের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে। আখ্যায়িকার সূত্রপাতে হাসি ও তাতার সহিত তাঁহার খেলার দৃশ্যটি মনোহর, বালক ধ্রুবের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও প্রীতির সীমা ছিল না, পরে রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার পর তিনি তাঁহার অপার স্নেহ অসংখ্য শিশুর মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। শিশুর হৃদয়ে প্রেমই প্রধান বৃত্তি—শিশুদের হৃদয়ের স্পর্শ পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রেম নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

হৃদয়ে অন্তহীন প্রেম থাকিলেও গোবিন্দমাণিক্য হৃদয়বৃত্তির অনুরোধে কর্তব্যকার্যে অবহেলা করেন নাই। ধ্রুবকে বলি দিতে চেষ্টা করিবার অপরাধে রঘুপতির সঙ্গে নক্ষত্ররায়কে তিনি নির্বাসন দণ্ড দিয়াছিলেন। নক্ষত্ররাযকে নির্বাসিত করিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও কর্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে সেই কাজ করিতে হইয়াছে। মন্দিরে বলিনিষেধ কালেও তাঁহার চিত্তের সেই দৃঢ়তা দেখিতে পাই। রঘুপতির প্রবল বিরুদ্ধতা, অমাত্যদের অসন্তোষ, প্রজাদের অমঙ্গলের আশঙ্কাসঞ্জাত বিরাগ সত্ত্বেও তিনি বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। অনর্থক ভ্রাতৃবিরোধ ও প্রজাধ্বংস অনুচিত মনে করিয়া তিনি কর্তব্যবোধেই নক্ষত্ররাযকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের সীমাহীন প্রেমের সহিত তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য ও দৃঢ়তা মিশিয়া তাঁহাকে সর্বদিক দিয়াই মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আপনার সমুন্নত চরিত্রের গুণে 'রাজর্ষি' নামটি সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন।

রঘুপতি-চরিত্র বর্ণনা কর।

রঘুপতি-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে তাহা কার্যসাধনে তাঁহার অদম্য শক্তি। তাঁহার চরিত্রের মধ্যে যে একটা দুর্বার বেগ ছিল তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। সংকল্প-সাধনে তাঁহার দৃঢ়তা আমাদের মুগ্ধ করে।

রঘুপতি ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের পুরোহিত। তিনি বহুকাল ধরিয়া দেবীর

পূজা করিয়া আসিতেছেন। গোবিন্দমাণিক্য সহসা দেবীর বলি নিষিদ্ধ করিয়া দিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। এতকাল ধরিয়া যে প্রথা চলিয়া আসিয়াছে রাজা আপনার রাজশক্তির প্রয়োগ করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিবেন ইহা মানিয়া লওয়া এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের পক্ষে একরূপ অসম্ভবই ছিল। গোবিন্দমাণিক্যের আদেশে বলিদান বন্ধ হইলে তাঁহার আত্মাভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত, তাঁহার আত্মাভিমান আহত হওয়াতেই তিনি গোবিন্দমাণিক্যের সর্বথা বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং বাধার পর বাধার সম্মুখীন হইযাও নিরুৎসাহ বা ভগ্নোদ্যম হন নাই। দুর্বল-চরিত্র নক্ষত্ররায়কে অগ্রজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত করা, গোবিন্দমাণিক্যের হত্যায় জয়সিংহকে উত্তেজিত করা, রাজার বিরুদ্ধে প্রজার মন বিগাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্যে তাঁহার চরিত্রের প্রচণ্ড বেগই ব্যক্ত হইয়াছে। আপনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই—এমন কি পুত্রতুল্য প্রিয় শিষ্য জয়সিংহকে প্রতারণা করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই।

রঘুপতির চরিত্রের আর একটি উপাদান তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। গোবিন্দ-মাণিক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্বলচরিত্র নক্ষত্ররায়কে তিনি যেভাবে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং তাহাকে যেভাবে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহার বুদ্ধিশীলতারই পরিচয় দেয়। বিজয়গড়ের দুর্গ হইতে সুজাকে মুক্তিদান তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সুজার নিকট হইতে রাজকীয় আদেশ গ্রহণ করিয়া তিনি যেভাবে গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার রাজনীতিবোধ ও অধ্যবসায় যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের প্রবল বিরুদ্ধতা করিলেও রঘুপতির হৃদয়ে যে প্রেমের অভাব ছিল এমন নয়। শিষ্য জয়সিংহের প্রতি তাঁহার স্নেহের সীমা ছিল না। আত্মাভিমান আহত হওয়ায় গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে তিনি জয়সিংহকে উত্তেজিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু জয়সিংহ আত্মবলিদান দিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। রঘুপতি প্রথমে এই আঘাতের তীব্রতা যেন বুঝিতে পারেন নাই। তিনি গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন

এবং ত্রিপুরা হইতে নির্বাসিত হইয়া গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যেভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় বুঝিবা তিনি শোক ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগের পর তাঁহার অন্তর জয়সিংহের শূন্যতা অনুভব করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। আত্মাভিমানী এই ব্রাহ্মণ একটা তীব্র বিরাগের বশবর্তী হইয়া গোবিন্দমাণিক্যের শত্রুতা করিলেও তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ছিল এবং এই প্রেমই তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছে। জয়সিংহের প্রেমের উপলব্ধিটিই তাঁহাদের মধ্যে সর্বমানবে প্রেমের বোধটি জাগ্রত করিয়াছে এবং তিনি পাষাণময়ী দেবীমূর্তি গোমতীর জলে বিসর্জন দিয়া রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

নক্ষত্ররায় চরিত্রটির পরিচয় দাও।

নক্ষত্ররায় নিতান্ত দুর্বলচরিত্র বুদ্ধিহীন যুবক। রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং নিজে রাজভ্রাতা হইলেও তাঁহার মধ্যে ক্ষত্রিয়সুলভ শৌর্য বিন্দুমাত্র ছিল না। অগ্রজ গোবিন্দমাণিক্যের স্নেহে লালিত হইয়া সে সুখেই জীবন যাপন নির্বাহ করিতেছিল, কিন্তু রঘুপতি তাহাকে নিশ্চিন্ত আরাম হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে দুরূহ কার্য সম্পাদন করিতে সচেষ্ট করিয়াছেন। ধানগাছ যেমন বাতাস যেদিকে প্রবাহিত হয় সেইদিকে লুটাইয়া পড়ে, নক্ষত্ররায়ও তেমনই যখন যেদিক হইতে আদেশ-নির্দেশ বা অনুরোধ আসিযাছে সেদিকে চলিয়া পড়িয়াছে।

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে সর্বতোভাবে চালনা করিয়াছে—বস্তুত রঘুপতির আদেশ অমান্য করিবার শক্তি নক্ষত্ররায়ের ছিল না; তাঁহার প্রবল ব্যক্তিত্বের নিকট তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। রঘুপতি তাহাকে যে অভিযানের বা ষড়যন্ত্রের নায়ক সাজাইয়াছে, তাহাতে সে পুত্তলিকার মতো যেন অভিনয় করিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তরে ক্ষাত্রবীর্যের পরিবর্তে একটি শান্তিপ্রিয় আরামলোলুপ গ্রামপ্রধানের চিত্তবৃত্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ত্রিপুরা হইতে নির্বাসিত হইয়া সে যে নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করিতেছিল তাহা ক্ষত্রিয়ের আদর্শে সমুন্নত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা হইতে স্বতন্ত্র নয়, এবং শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

নক্ষত্ররায়ের চরিত্রে আর একটি দুর্বলতা ছিল—অপরে তাহাকে ছোটো বা ভীরু মনে করিবে ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। রঘুপতি তাহাকে প্রধানত এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সে

ত্রিপুরার সিংহাসনে আরূঢ় হইবার পর তাহার এই দুর্বলতা বহুগুণ বর্ধিত হইয়াছে দেখিতে পাই। সে তখন রঘুপতি হইতে সুরু করিয়া সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিয়াছে—বুঝি বা সকলে তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছে বা ছোটো বলিয়া মনে করিতেছে। এই হীনতা বোধটির প্রতিক্রিয়া তাহাকে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করিয়াছে।

জয়সিংহ চরিত্রটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন কর।

জয়সিংহ নামে মন্দিরের ভৃত্য ছিল, বাস্তবিকপক্ষে সে রঘুপতির শিষ্যস্থানীয় ছিল এবং তাঁহার পুত্রস্নেহের অধিকারী হইয়াছিল। তাহার শৌর্যবীর্যের খ্যাতি ছিল, তাহার মধ্যে যে উদার ভালোবাসা ও গভীর বিশ্বাস ছিল তাহার পরিচয় কেহ জানিত না। সে দেবীর মহিমায় বিশ্বাস করিত—রঘুপতির উপর তাহার বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিল, বস্তুত দেবী ও দেবীর পুরোহিত তাহার গুরু রঘুপতি তাহার কাছে যেন অভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আর সে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে ভালোবাসিয়াছিল, যাঁর জন্য সে হাসিমুখে প্রাণ-বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করিত না।

একদিকে গুরুর ভালোবাসা, অপর দিকে গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি ভালোবাসা এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাত বাধায় তাহার জীবন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যে গোবিন্দমাণিক্যকে সে প্রাণ দিয়া ভালোবাসে তাহার গুরু তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছেন। গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে রঘুপতি যেভাবে নক্ষত্র-রায় ও প্রজাবৃন্দকে উত্তেজিত করিয়াছে তাহাতে তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং ঘোরতর সংশয় তাহার গভীর বিশ্বাসকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। সে দেবীর কার্যে ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিবে না বলিয়া সংকল্প করিয়াছে। কিন্তু প্রাণপ্রিয় গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলিতে তাহার প্রাণ সরে নাই। সে গোবিন্দমাণিক্যকে লক্ষ্য করিয়া তরবারি তুলিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে আঘাত করিতে পারে নাই।

এদিকে রঘুপতির স্নেহের দাবি তাহার হৃদয়কে প্রমথিত করিয়া তুলিল। ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে দেবীর কাছে রাজ-রক্ত আনিয়া দিবার জন্য সে রঘুপতির নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহা পালন করিবার জন্য সে শেষ পর্যন্ত দেবীর সম্মুখে আপনার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রাণবিসর্জন দিয়াছে। এই উদার-প্রাণ বীর যুবক প্রেমের বিক্ষোভে বিশ্বাসের বেদীতে শেষ পর্যন্ত আত্মাহুতি

দিয়া আপনার অন্তরের সংক্ষোভের অবসান ঘটাইয়াছে। তাহার সুমহৎ চরিত্রের স্নিগ্ধ দ্যুতি আমাদের অন্তরকে অমলিন প্রেম ও করুণায় পরিপূর্ণ করিয়া দেয়।

রাজর্ষি উপন্যাসের কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিয়া উপন্যাসের গল্পাংশের পরিচয় দাও।

বলিদান নিষেধ ঃ

তাতা ও হাসি এই দুইটি ভাই ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। রাজা প্রতিদিন এই দুটি শিশুকে লইয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের পাথরের ঘাটে গোমতীর তীরে খেলা করিতেন। একদিন সকালে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের ঘাটে রক্তের দাগ দেখিয়া হাসি রাজাকে 'এত রক্ত কেন' প্রশ্ন করিল। শিশুর এই কাতর প্রশ্ন রাজার অন্তর আলোড়িত করিল। ইহার পর প্রবল জ্বর হইয়া হাসি মারা গেল—মৃত্যুকালে সে 'এত রক্ত কেন' বলিয়া প্রলাপ বকিয়াছিল। রাজা এই রক্তস্রোত, এই বলিদান-প্রথা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিলেন এবং রাজসভায় ঘোষণা করিলেন যে, সে বৎসর হইতে দেবীর মন্দিরে জীববলি হইবে না।

রাজার আদেশের প্রতিক্রিয়া ঃ

গোবিন্দমাণিক্যের আদেশ শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি রাজার উপর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করিতে ও নক্ষত্ররায়কে লইয়া গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রাজার আদেশে বলি বন্ধের ফলে প্রজারা দেবীর রোষ ও দেশের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিল।

জয়সিংহের আত্মদান ঃ

রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের সহিত তাহার ভ্রাতৃহত্যার ষড়যন্ত্র করিতেছেন শুনিয়া ভুবনেশ্বরী মন্দিরের ভৃত্য রঘুপতির একান্ত স্নেহাস্পদ জয়সিংহ রঘুপতিকে এই পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিল। রঘুপতি তাহাকে বুঝাইলেন যে, দেবী রাজার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন—রাজ-রক্ত পাইয়া তিনি তৃপ্ত হইবেন। জয়সিংহ ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিবেন না বলিয়া মনঃস্থির করিল এবং রঘুপতি রাজ-রক্ত আনিবার জন্য তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন।

জয়সিংহ অস্ত্র লইয়া রাজার কাছে গেল, কিন্তু রাজার প্রতি তাহার এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যে, সে তাঁহাকে আঘাত করিতে পারিল না। অবশেষে নিজে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব হওয়ায় দেবীর সম্মুখে আপনার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া আত্মবিসর্জন দিল।

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতির নির্বাসন ঃ

নক্ষত্ররায়কে গোবিন্দমাণিক্যের হত্যায় প্ররোচিত করিতে না পারিয়া প্রিয় সেবক জয়সিংহের মৃত্যুতে কাতর রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের প্রিয়বস্তু নাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নক্ষত্ররায়ের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তিনি রাজার একান্ত প্রিয় ধ্রুবকে (তাতা) হরণ করিয়া দেবীর কাছে বলি দিতে গেলেন—কিন্তু রাজা শেষ মুহূর্তে আসিয়া ধ্রুবকে রক্ষা করিয়া নক্ষত্র-রায় ও রঘুপতিকে বন্দী করিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজাদেশ লঙ্ঘন করিয়া বলির চেষ্টা করার অপরাধে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের নির্বাসন দণ্ড হইল। গোবিন্দমাণিক্য প্রিয় ভ্রাতাকে বিদায় দিলেন।

রঘুপতির চক্রান্ত ঃ

ত্রিপুরা হইতে নির্বাসিত হইয়া রঘুপতি কিছুকাল ঢাকায় থাকার পর রাজমহলে গেলেন। তখন মোগল সম্রাট শাজাহান মৃত্যুশয্যায় শায়িত—দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। সুজা বাংলায় থাকিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। সুজা বিজয়গড় অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া রঘুপতি সেদিকে গেলেন এবং ঘটনাচক্রে সুজার সাক্ষাৎ পাইলেন ও জানিতে পারিলেন যে, সুজা বিজয়গড় আক্রমণ করিবেন, কারণ বিজয়গড়ের দুর্গাধিপতি বিক্রমসিংহ শাজাহানের অনুগত হওয়ায় সুজার হাতে দুর্গ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন।

রঘুপতি বিজয়গড়ে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তিনি খুড়া সাহেব নামক ঐ দুর্গের জনৈক প্রাচীন ব্যক্তির নিকট কৌশলে দুর্গ প্রবেশ ও দুর্গ হইতে নিষ্ক্রমণের গোপন পথ জানিয়া লইলেন। এদিকে সুজা শাজাহানের পক্ষভুক্ত রাজা জয়সিংহ ও সুলেমানের হস্তে পরাজিত হইয়া বন্দী অবস্থায় দুর্গ মধ্যে আনীত হইলেন। রঘুপতি কৌশলে সেই গোপন পথ দিয়া সুজার পলায়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

নক্ষত্ররায় ত্রিপুরা হইতে নির্বাসিত হইয়া রাজ্যের বাহিরে একটি গ্রামে

গেল এবং সেখানে একজন ছোটোখাটো রাজা হইয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতে লাগিল। সে একদিন সমারোহ করিয়া বিড়ালের বিবাহ দিতেছিল, এমন সময় রঘুপতি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সেখান হইতে লইয়া গেলেন। তিনি নক্ষত্ররায়কে সুজার নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট নালিশ করিলেন যে, গোবিন্দমাণিক্য বিনা দোষে নক্ষত্ররায়কে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়া সুজাকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ত্রিপুরার রাজ্য হইতে গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসন ও নক্ষত্ররায়ের রাজ্যলাভের পরোয়ানা-পত্র লইলেন। রঘুপতি আরও অর্থ দিয়া একদল মোগলসৈন্য সঙ্গে লইয়া ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্য ত্যাগ ঃ

গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে নক্ষত্ররায়কে সাদরে রাজ্যে আহ্বান করিলেন, কিন্তু রঘুপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রীতির মিলন ঘটিতে দিলেন না। রঘুপতির চক্রান্তে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে যুদ্ধ যখন আসন্ন-প্রায় হইল, গোবিন্দমাণিক্য অনর্থক রক্তপাত না ঘটাইয়া স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করিলেন। নক্ষত্ররায় 'ছত্রমাণিক্য' উপাধি লইয়া রাজা হইয়া বসিলেন।

রঘুপতির পরিবর্তন ও উপসংহার ঃ

ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে আসিতেই জয়সিংহের জন্য রঘুপতির প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। ক্রমে দেবীর পাষাণ প্রতিমার প্রতি তাঁহার বিরাগ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল এবং তিনি দেবীমূর্তিকে গোমতী নদীতে নিক্ষেপ করিয়া স্বেচ্ছা-নির্বাসিত গোবিন্দমাণিক্যের সহিত মিলিত হইলেন। ছয় বৎসর পরে ছত্র-মাণিক্যের মৃত্যু হইলে সকলের অনুরোধে গোবিন্দমাণিক্য ত্রিপুরার রাজ্যভার পুনর্গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলির সংক্ষিপ্তসার লিখ ঃ—

(১) তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত! বৃষ্টির শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে মেঘ নাই। সূর্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্যকিরণে দশদিক ঝলমল করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চিল ভাসিয়া

যাইতেছে—ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে ; কাঠবিড়ালিরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে। দুই একটি অতি ভীরু খরগোশ সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গোরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে, কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধা পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কলকল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে—নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

সংক্ষিপ্তসার—পরদিন প্রভাতে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশ হইতে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। সূর্যের আলোতে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে একটি বিমল আনন্দ। আকাশে চিল ভাসিতেছে, বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে, কাঠবিড়ালিদের ছুটাছুটির সীমা নাই। দুই একটি খরগোশ মুহূর্তের জন্য ঝোপের বাহির হইয়া আসিয়া আবার ঝোপের আড়ালে লুকাইতেছে। ছাগশিশুরা ঘাস খাইতেছে, গোরুগুলি মাঠে ছড়াইয়া পড়িয়া চরিতেছে। ছেলেমেয়েরা মায়ের আঁচল ধরিয়া নদীতে চলিয়াছে। বৃদ্ধা পূজার ফুল তুলিতেছে। নদীর তীরে অনেকে স্নানের জন্য সমবেত হইয়া নদীর কলধ্বনির সহিত সুর মিলাইয়া কথা বলিতেছে। আষাঢ়ের এই মনোহর প্রভাতে প্রাণময়ী আনন্দমুখরা পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জয়সিংহ একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

(২) উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্নে গোমতীতীরের নির্জন অরণ্যে আমরা দুইজনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের

দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন—সেখানে অন্ধকার গর্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলো কীটের মতো কিল্‌বিল্‌ করিতেছিল, সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্র-রায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন; দেখিলেন, তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখামাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনো মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনো সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে —কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে, কিন্তু দুই-একটা চিল এখনো আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুইভাই যখন নির্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড়ো বড়ো প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদ-শব্দটুকু পর্যন্তও শোনে, তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, অবস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না— চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল, নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল; ভীষণ অদৃষ্টের মত নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন, কিছুই ঠাহর পাইলেন না; নিশ্চয় মনে করিলেন রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন, এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্র-রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল, কে যেন তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে! কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

সংক্ষিপ্তসার—মহারাজ নক্ষত্ররায়কে বলিলেন যে, তাঁহারা দুইজনে সেদিন অপরাহ্ণে গোমতী নদীর তীরে বেড়াইতে যাইবেন। রাজার এই আদেশ শুনিয়া নক্ষত্ররায়ের মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল যে, রাজা এতক্ষণ তাঁহার মনের দিকে চাহিয়াছিলেন—তাঁহার মনের সব ভাবনাগুলি যেন এক মুহূর্তে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ভীতভাবে রাজার মুখের দিকে চাহিলেন।

বেলা পড়িয়া আসিলে মহারাজ নক্ষত্ররায়কে লইয়া বনের দিকে চলিলেন। সন্ধ্যা হইতে দেরী থাকিলেও মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া মনে হইতেছে; কাকগুলি চিৎকার করিতেছে, দুই একটা চিল আকাশে ভাসিতেছে। অগ্রজের সহিত নির্জন বনে প্রবেশ করিয়া নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড়ো বড়ো পুরাতন গাছ নিস্তব্ধ হইয়া যেন ছায়াময় অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া আছে। চারিদিকের রহস্যময় নিস্তব্ধতা দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃৎকম্প হইল। তাঁহার মনে ভয় ও সন্দেহ জাগিল, রাজা তাঁহাকে লোকচক্ষু হইতে দূরে কোথায় লইয়া যাইতেছেন। তিনি মনে করিলেন যে, রাজা সব জানিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য এই বনের মধ্যে আনিয়াছেন। তিনি পলাইবার কথা ভাবিলেন, কিন্তু তাঁহার হাত-পা যেন একটা অদৃশ্য টানে চলিতে লাগিল।

(৩) অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন "দাঁড়াও"।

নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল—সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎ প্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল,

অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন, "কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর রাজা কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত-সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে, সে তো দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোন রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলংকার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা আছে। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয়।"

সংক্ষিপ্তসার—বনের মধ্যে কতকটা ফাঁকা। সেখানে একটি জলাশয়ের ধারে রাজা সহসা বলিলেন, 'দাঁড়াও'। নক্ষত্ররায় চমকিয়া উঠিলেন—

তাঁহার মনে হইল যে, রাজার আদেশে কালের স্রোত যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বৃক্ষগুলি ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল, পৃথিবী ও আকাশ যেন রুদ্ধশ্বাসে চাহিয়া রহিল। বনের মধ্যে তখন আর কোনো শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন বিদ্যুতের প্রবাহের মতো সারা অরণ্যের মধ্যে শব্দময় হইয়া সঞ্চারিত হইতে লাগিল। নক্ষত্ররায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা নক্ষত্ররায়ের দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া নক্ষত্ররায় তাঁহাকে মারিতে চাহেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। নক্ষত্ররায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন নক্ষত্র কি রাজ্যের লোভে তাঁহাকে মারিতে চাহেন। রাজা বলিতে কি কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট আর রাজছত্র বুঝায়? অগণিত লোকের চিন্তার ভার ইহার উপর চাপিয়া আছে। রাজা হইতে চাহিলে সহস্র লোকের দুঃখ, বিপদ ও দারিদ্র্যকে আপনার বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে; যে তাহা করে সে পর্ণ-কুটীরে থাকিলেও রাজা। আর যে পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ করে, সে দস্যু—সহস্র হতভাগ্যের অশ্রু তাহার উপর বর্ষিত হইতেছে—রাজছত্র তাহাকে সেই অভিশাপ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহার রাজভোগের মধ্যে অগণিত দরিদ্রের দারিদ্র্য ও দুঃখ পুঞ্জীভূত। পৃথিবী বশ করিয়া রাজা হইতে হয়—রাজাকে মারিয়া নয়।

(৪) দ্বিপ্রহর হইল। প্রথমে নিকটে পরে দূর-দূরান্তরে, শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। ঝড়ের বাতাসও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় আসিয়াছে। রঘুপতি অমঙ্গল আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময় জীবন্ত ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুতের মতো জয়সিংহ নিশীথের অন্ধকারের মধ্য হইতে সহসা মন্দিরের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জীর্ণ চাদরে দেহ আচ্ছাদিত, সর্বাঙ্গ বাহিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, চক্ষুতারকায় অগ্নিকণা জ্বলিতেছে।

রঘুপতি তাঁহাকে ধরিয়া কানের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন, "রাজ-রক্ত আনিয়াছ?"

জয়সিংহ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন, "আনিয়াছি। রাজরক্ত আনিয়াছি! আপনি সরিয়া দাঁড়ান, আমি দেবীকে নিবেদন করি!" শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস্ মা! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষ্ণা মিটিবে না। জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর কাহারও দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহ বংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এই নে তোর সন্তানের রক্ত। তোর রাজরক্ত এই নে।" গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন —বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল—চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন; পাষাণপ্রতিমা বিচলিত হইল না।

সংক্ষিপ্তসার—রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল। চারিদিকে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল—ঝড়ের বাতাস হু-হু করিয়া বহিয়া যেন কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় সমাগত। রঘুপতি অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হইলেন।

সেই গভীর অন্ধকারে জয়সিংহ সহসা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তাঁহার দেহ চাদরে ঢাকা, সর্বাঙ্গ বৃষ্টিসিক্ত, নিশ্বাস প্রবল, চক্ষুতারকা সমুজ্জ্বল। রঘুপতি তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তিনি রাজরক্ত আনিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়সিংহ বলিলেন যে, তিনি রাজরক্ত আনিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহা দেবীকে দিবেন।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জয়সিংহ দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সত্যই কি তিনি সন্তানের রক্ত—রাজরক্ত চান। তিনি জন্মাবধি তাঁহারই সেবা করিয়াছেন, তাঁহাকেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন—আর কোনো-দিকে চাহেন নাই। তিনি রাজপুত, ক্ষত্রিয়, তাঁহার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, মাতামহ বংশীয়েরা তখনও রাজা। দেবী তবে সন্তানের রক্ত—রাজরক্ত গ্রহণ করুন। জয়সিংহ অঙ্গের চাদর ফেলিয়া দিয়া কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির

করিয়া আপনার বক্ষে আমূল বসাইয়া দিলেন। তিনি প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু প্রতিমা বিচলিত হইল না।

(৫) এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। উত্তর হইতে সহসা পালে পালে ইঁদুর ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। শস্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল, এমন-কি কৃষকের ঘরে শস্য যত কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও অধিকাংশ খাইয়া ফেলিল—রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বন হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া লোকে প্রাণধারণ করিতে লাগিল। বনের অভাব নাই, এবং বনে নানাপ্রকার আহার্য উদ্ভিজ্জও আছে। মৃগয়ালব্ধ মাংস বাজারে মহার্ঘ মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। লোকে বুনো মহিষ, হরিণ, খরগোশ, সজারু, কাঠবিড়ালী, বরা, বড়ো বড়ো স্থলকচ্ছপ শিকার করিয়া খাইতে লাগিল। হাতি পাইলে হাতিও খায়। অজগর সাপ খাইতে লাগিল। বনে আহার্য পাখির অভাব নাই; গাছের কোটরের মধ্যে মৌচাক ও মধু পাওয়া যায়; স্থানে স্থানে নদীর জল বাঁধিয়া তাহাতে মাদকলতা ফেলিয়া দিলে মাছেরা অবশ হইয়া ভাসিয়া উঠে; সেই সকল মাছ ধরিয়া লোকেরা খাইতে লাগিল এবং শুকাইয়া সঞ্চয় করিল। আহার এখনো কোনোক্রমে চলিয়া যাইতেছে বটে কিন্তু অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হইল; প্রজারা বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিল।

তাহারা বলিতে লাগিল, মায়ের বলি বন্ধ করাতে মায়ের অভিশাপে এইসকল দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিল্বন ঠাকুর সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে কহিলেন, "কৈলাসে কার্তিক-গণেশের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কার্তিকের ময়ূরের নামে গণেশের ইঁদুরগুলো ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে।" প্রজারা একথা নিতান্ত উপহাসের ভাবে গ্রহণ করিল না। তাহারা দেখিল, বিল্বন ঠাকুরের কথামতো ইঁদুরের স্রোত যেমন দ্রুতবেগে আসিল তেমনি দ্রুতবেগে সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া

কোথায় অন্তর্ধান করিল—তিনদিনের মধ্যে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। বিল্বন ঠাকুরের অগাধ জ্ঞানের সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কৈলাসে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সম্বন্ধে গান রচিত হইতে লাগিল; মেয়েরা ছেলেরা ভিক্ষুকেরা সেই গান গাহিতে লাগিল, পথে ঘাটে সেই গান প্রচলিত হইল।

সংক্ষিপ্তসার—এই বৎসর সহসা উত্তর হইতে পালে পালে ইঁদুর আসিয়া ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া সমস্ত শস্য এমন কি কৃষকের ঘরে সঞ্চিত শস্যের অধিকাংশ খাইয়া ফেলিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল, ক্রমে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লোকে বন্য ফলমূল ও আহার্য উদ্ভিজ্জ আহার করিতে লাগিল। বাজারে মৃগয়া-লব্ধ মাংস মহার্ঘ হইয়া উঠিলে তাহারা নানা বন্যপশু ও পাখি খাইতে লাগিল—মৌচাকের মধু খাইতে লাগিল, নদীতে মাদকলতা ফেলিয়া মাছ মারিয়া খাইতে লাগিল ও মাছ শুকাইয়া সঞ্চয় করিল। আহার কোনো-ক্রমে চলিলেও সারা দেশে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কোথাও কোথাও চুরি-ডাকাতি হইতে লাগিল—প্রজারা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা বলিল যে, দেবীর বলি বন্ধ করাতে দেবীর অভিশাপে এইসব দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বিল্বন ঠাকুর সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন যে, কৈলাসে কার্তিক-গণেশের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, গণেশের ইঁদুরগুলি কার্তিকের ময়ূরের নামে নালিশ জানাইতে ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে আসিয়াছে। প্রজারা এই কথা উপহাস বলিয়া মনে করিল না। বিল্বন ঠাকুরের কথামতো ইঁদুরগুলি দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়া গেল। বিল্বন ঠাকুরের জ্ঞানসম্পর্কে তখন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। কৈলাসে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ লইয়া গান রচিত হইল—পথে-ঘাটে সেই গান প্রচারিত হইল।

(৬) এই ছায়াশীতল প্রবাহ স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের মধ্যে শান্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন—নির্জন প্রকৃতির সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম নানাদিক দিয়া সহস্র নির্ঝরের মতো তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার হৃদয়ের গুহার মধ্যে সেখান হইতে ক্ষুদ্র অভিমানসকল মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন—

দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে বিমল আলোক ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে, ব্যথা দিয়াছে, কে তাঁহার স্নেহের বিনিময় দেয় নাই, কে তাঁহার নিকট হইতে এক হস্তে উপকার গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে কৃতঘ্নতা অর্পণ করিয়াছে, কে তাঁহার নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই শৈলাসনবাসিনী অতিপুরাতন প্রকৃতির অবিশ্রাম কার্যশীলতা অথচ চিরনিশ্চিন্ত প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া তিনি নিজেও যেন সেইরূপ পুরাতন, সেইরূপ বৃহৎ, সেইরূপ প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন সুদূর জগৎ পর্যন্ত আপনার কামনাশূন্য স্নেহ বিস্তারিত করিয়া দিলেন—সমস্ত বাসনা দূর করিয়া দিয়া জোড় হস্তে কহিলেন, 'হে ঈশ্বর, পতনোন্মুখ সম্পৎশিখর হইতে তোমার ক্রোড়ের মধ্যে ধারণ করিয়া আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছ। আমি মরিতে বসিয়াছিলাম, আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। যখন রাজা হইয়াছিলাম তখন আমি আমার মহত্ত্ব জানিতাম না, আজ সমস্ত পৃথিবীময় আমার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছি।' অবশেষে দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, 'মহারাজ তুমি আমার স্নেহের ধ্রুবকে কাড়িয়া লইয়াছ, সে বেদনা এখনো হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই। আজ আমি বুঝিতেছি যে, তুমি ভালোই করিয়াছ। আমি সেই বালকের প্রতি স্বার্থপর স্নেহে আমার সমুদয় কর্তব্য আমার জীবন বিসর্জন দিতেছিলাম। তুমি আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমি ধ্রুবকে আমার সমস্ত পুণ্যের পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম—তুমি তাহাকে কাড়িয়া লইয়া শিক্ষা দিতেছ যে, পুণ্যের পুরস্কার পুণ্য। তাই আজ সেই ধ্রুবের পবিত্র বিরহদুঃখকে সুখ বলিয়া, তোমার প্রসাদ বলিয়া, অনুভব করিতেছি। আমি বেতন লইয়া ভৃত্যের মতো কাজ করিব না প্রভু, আমি তোমার প্রেমের বশ হইয়া তোমার সেবা করিব।'

সংক্ষিপ্তসার—সেই ছায়াময় স্নিগ্ধশীতল নদীটির পাশে শৈলতলে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতে লাগিলেন। তিনি হৃদয় প্রসারিত করিয়া

আপনার মধ্যে শান্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন—প্রকৃতির সুগভীর প্রেম তাঁহার অন্তরের মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি আপনার হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুদ্র অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্যে উদার আলোক ও বায়ু সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। সমস্ত বেদনা, সমস্ত ক্ষোভ তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া গেল। এই পুরাতন শৈলপ্রকৃতির কর্মশীলতা ও প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া তিনিও এইরূপ প্রশান্ত ও বৃহৎ হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন সমগ্র বিশ্বে আপনার স্নেহ প্রসারিত করিয়া দিয়া, মন হইতে সমস্ত বাসনা দূর করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিলেন—সম্পদের শিখর হইতে পতনের সময় তুমি তোমার ক্রোড়ে আমাকে রক্ষা করিয়াছ। এখন এই পৃথিবীর মধ্যে আপনার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি। তুমি যে স্নেহের ধ্রুবকে কাড়িয়া লইয়াছ সে বেদনা নাই। এখন বুঝিতেছি যে, তুমি ভালোই করিয়াছ, আমি তাহার প্রতি স্নেহে অন্ধ হইয়া কর্তব্যে অবহেলা করিতেছিলাম, তুমি সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। তাহাকে আমার পুণ্যের পুরস্কাররূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন বুঝিতেছি যে পুণ্যের পুরস্কার পুণ্য। ধ্রুবের বিরহদুঃখকে তোমার প্রসাদ বলিয়া মনে হইতেছে। আমি তোমার নিকট বেতন লইয়া ভৃত্যের মতো কাজ করিব না—তোমার প্রেমের বশ হইয়া তোমার সেবা করিব।

কাব্য-মঞ্জুষা

(১) 'প্রার্থনা' কবিতাটির সারাংশ বিবৃত কর।

সারাংশ—এই কবিতায় ঈশ্বরের কাছে আপনাকে সমর্পণ করিবার জন্য কবির অন্তরের ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের কাছে—মাধবের কাছে কবির একান্ত মিনতি এই যে, তিনি যেন অনুগ্রহ করে তাঁকে পরিত্যাগ না করেন। 'তিলতুলসী লইয়া তিনি তাঁহার দেহ মাধবকে চিরকালের জন্য দান করিয়া দিলেন। ভগবান যদি তাঁহার দোষগুণ বিচার করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার লেশমাত্র গুণ পাইবেন না। কিন্তু তাহা ভাবিয়া কবি ভরসা হারান নাই—কারণ তিনি জানেন যে, ভগবান এই জগতের নাথ, আর তিনি এই জগতেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং ভগবান তাঁহাকে ছাড়িতে পারেন না। কর্মফলের বশবর্তী হইয়া মানুষ পশু বা পক্ষী হইয়া যেভাবেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, কবির যেন চিরকাল ঈশ্বরে মতি থাকে। কবি বিদ্যাপতি এই সমুদ্ররূপ সংসার অতিক্রম করিতে নিরতিশয় কাতর—তিনি মুহূর্তের জন্য মাধবের পদ-পল্লব অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন।

(২) 'কাশীরাম দাস' কবিতাটির ভাব বিবৃত করিয়া কবির রচনা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ :—

কবি কাশীরাম দাসের কৃতিত্বের তুলনা নাই। তিনি বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে ভগীরথের সহিত তুলনীয়। স্বর্গ হইতে অবতরণের সময় গঙ্গার বারিধারা যে-ভাবে মহাদেবের জটায় আবদ্ধ হইয়াছিল, ঋষি দ্বৈপায়ন ব্যাস সেইভাবে মহাভারতের অপূর্ব রস সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বঙ্গভূমি সেই রস পান করিতে না পারিয়া তৃষ্ণায় আকুল হইয়া উঠিত। ভগীরথ যেমন কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গার ধারাকে প্রবাহিত করিয়া সগরের সন্তানদের মুক্তিসাধন করিয়াছিলেন, কাশীরাম দাসও সেইভাবে আপনার কঠোর সাধনায় মহাভারতের রস ভাষার পথ দিয়া বঙ্গবাসীর কাছে আনিয়াছেন—বঙ্গের তৃষ্ণা সে বিমল রসে মিটিয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশ তাঁহার সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। মহাভারতের কথা অমৃতেরই তুল্য—তাহা পরিবেশন করিয়া কবি কাশীরাম অশেষ পুণ্যের অধিকারী হইয়াছেন।

কবিতাটি একটি সনেট। ইহার চৌদ্দটি ছত্রের মধ্যে কবি একটি ভাব

নিটোলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কবিতাটির আয়তন হ্রস্ব হইলেও কবি ইহারই মধ্যে অলংকার সৃষ্টিতে আপনার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ববর্তী কবির প্রতি আধুনিক যুগের কবির অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কবিতাটির মধ্যে ব্যক্ত অনুপম রচনা-দক্ষতা কবিতাটিকে উৎকৃষ্ট রচনা করিয়া তুলিয়াছে।

(৩) নিম্নস্থিত অংশটির ভাবার্থ লিখ :—

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
যুড়ি' দুই কর,
নমি হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন,
বজ্রমুষ্টিধর!
চরণে ঝটিকা-গতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা!
উদ্দীপ্ত তেজস-নেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা!
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে!
দোলে মহাকাল-কোলে অণুপরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে!
নমি তোমা', নরদেব! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি!
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ-মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ কলস
ঝলসে কিরণে;
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময়;
ভ্রূভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম-ব্যতিক্রম,
উদয়-বিলয়!

ভাবার্থঃ মানুষের অসামান্য কৃতিত্ব কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। মানবের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানবশক্তির অসামান্য বিকাশের পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়াছেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ আজ প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়াছে। এই যুগের কবি যুগ্ম করে নরদেবের প্রতি প্রণতি নিবেদন করিতেছেন। বিবর্তনের জ্ঞানের অধিকারী মানুষ বিদ্যুৎকে জয় করিয়া বজ্রমুষ্টিতে ঝটিকার গতিতে নীহারিকা ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। সে তার জ্যোতির্ময় চোখে সপ্তসূর্যের শিখা দেখিতেছে। গ্রহের আবর্তনশব্দ তার শ্রুতিগোচর। মহাকালে স্পন্দমান অণু-পরমাণুর স্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিয়াছে। এই পৃথিবীতে নরদেব যেন গর্বে. গৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—প্রকৃতি তাঁহার শোভা বর্ধিত করিয়াছে, তাঁহার পিছনে মন্দিরশ্রেণী—সেখানে বালকণ্ঠে সামগান উত্থিত হইতেছে; মানুষের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ আবর্তিত, কাল বহমান। তার ইঙ্গিতেই যেন সৃষ্টি ও প্রলয় সাধিত হইতেছে।

এই কয়েকটি ছত্রে মানুষের মহিমাবোধ কবি অপূর্ব ভাবকল্পনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মানবের গৌরবের পরিচয়.এখানে তার সুগম্ভীর ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। ভাবগ্রন্থনে, বর্ণনার ভঙ্গিতে, ভাষা ও ছন্দের মধ্যে গাম্ভীর্য সঞ্চারিত হওয়ায় কবিতাটি অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে।

(৪) নিম্নলিখিত অংশটির ভাবার্থ লিখ ঃ—

হাটে হাটে আমি ঘুরে' যে বেড়াই—
সে নহে করিতে হাট ;

হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ।

কত যে মাঠের আঁচলের ধনে
ভরা এ হাটের ডালা.

কত যে মাঠের ছিন্ন-কুসুমে
হাটের গলার মালা !

আড়তে আড়তে বেড়াতে বেড়াতে
বাতাসে অকস্মাৎ

মনের খাতায় উলটিয়া যায়
মাঠের শ্যামল পাত।

আঁখি মুদে' দেখি—মাথার ভিতর
ঘনায় শাওন-ঘোর !
নূতন ধানের ঢেউ দুলে যায়
বুকের শোণিতে মোর !
আঁখি মেলে' দেখি—চতুর কয়াল
মাপিয়া চলেছে মাল,
সূক্ষ্ম হিসাব, লোকসান লাভ—
কত ধানে কত চাল।
তুলে তৌলিয়া ঘানিতে তুলিবে,
তবে যাবে ঠিক জানা—
শর্ষে-ক্ষেতের মাধুরী মরিয়া
বাঁধিল কেমন দানা।
কত না মাঠের কাঁচা শ্যামলতা
পাণ্ডুর হ'ল পেকে',
মাঠের মূল্য চুকাইয়ে দিয়ে
হাট নিল তারে ডেকে' !

ভাবার্থঃ আমরা সকলেই হাটে জিনিস কিনিতে যাই, সেখানে অন্য কোনো চিন্তা আমাদের মনে আসে না। কিন্তু কবি হাটের বুকে মাঠের কান্না অনুভব করিতে যান। হাটের ডালা কত মাঠের ধনে ভরে গেছে—কত মাঠের ছিন্ন ফুলে হাটের মালা গাঁথা হয়েছে। হাটে বেড়াতে বেড়াতে কবির মনে শ্যামল মাঠের ছবি জেগে ওঠে। তাঁর যেন মনে হয় যে, শ্রাবণের ঘন বৃষ্টিপাতে সবুজ ধানগাছ মাথা দুলিয়ে নাচছে। হাটে তিনি দেখেন যে, ব্যবসায়ী ধান চাল মেপে চলেছে—তার সূক্ষ্ম হিসেবের সীমা নেই। মাঠের যে সৌন্দর্য, যে ইতিকথা এখানে তার চিহ্নমাত্র নেই। কী করে যে সর্ষে খেতের মাধুর্য সর্ষে দানায় পরিণত হয়েছে এখানে তার খোঁজ কেহ করে না, এখানে কেবল তাহার ওজনের হিসাবই করা হয়। মাঠের শ্যামলতা পাণ্ডুরতায় পরিণত হলে মাঠের মূল্য চুকিয়ে দিয়ে হাট তাকে ডেকে লয়।

এই কবিতায় কবির যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অভিনব। মাঠ হইতে জিনিস এনে হাটে বিক্রয় করা হয়। ইহাতে হাটের বেচাকেনা জমে ওঠে বটে, কিন্তু মাঠের রিক্ততা ভরে না। কবির অন্তরে মাঠের জন্য একটা গভীর বেদনাবোধ জেগেছে। এই বেদনাবোধই ছত্রকটির মধ্যে সঞ্চারিত হযেছে এবং ইহাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(৫) 'আকিঞ্চন' কবিতাটির ভাব সংক্ষেপে বিবৃত কর।

ভাবসংক্ষেপ ঃ কবি সুখ বা দুঃখ কোনটিকেই স্বীকার করতে ভয় পান না। কিন্তু তাঁর অন্তর সুখ-দুঃখের অনুকূল পরিবেশ কামনা করে। তিনি দুঃখে ভয় পান না। কিন্তু ভগবান যদি তাঁকে দুঃখ দেন তাহ'লে যেন তাঁকে এমন জগতে নিয়ে যান যেখানে সুখের উল্লাস কলরোল নেই। দুঃখকে তিনি প্রসন্ন মনে স্বীকার করতে পারেন, কিন্তু ধনীর আত্মম্ভরিতা ও প্রমোদোল্লাস তাঁর অন্তরকে ব্যথিত ক'রে তুলবে—তাঁর সম্ভ্রমবোধকে পীড়িত করবে। তাঁর আত্মসম্মানবোধ যেমন প্রমোদমত্তের ব্যঙ্গ সহ্য করতে পারবে না, তাঁর হৃদয় তেমনই আর্তের হাহাকার শুনে কাতরতা বোধ করে। ভগবান যদি তাঁকে সুখ দেন তবে তিনি যেন তাঁকে এমন জগতে নিয়ে যান যেখানে দুঃখের আর্তি নেই। দুঃখীর দুঃখ দেখে তিনি সুখভোগ করতে পারবেন না।

এই কবিতার মধ্যে সহজ আনন্দময় জীবনের প্রতি কবির অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। ধনীর প্রমোদোল্লাস আর দরিদ্রের দুঃখ দুই-ই তাঁকে ব্যথিত ক'রে তোলে। কবিতাটির মধ্যে যে সহজ ভগবৎ পরায়ণতার সুর ব্যক্ত হয়েছে তা কবিতাটির প্রধান সম্পদ্। কবি আপনার বক্তব্য বিষয়কে সহজ শোভন তুলনামূলক অলংকারের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(৬) 'সরোবরে সন্ধ্যা' কবিতাটির সারমর্ম লিখ।

সারমর্ম ঃ সরসীর তীরে তালবনের সারি। পদ্ম আর শৈবাল সরসীর শিরোভূষণ আর কেশদামের মতো শোভা পাইতেছে। সন্ধ্যা তাহার ধূসর আঁচলে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়া ঝিঁঝিঁর নূপুর পায়ে বাজাইয়া ধীরে নামিয়া আসিতেছে। সরসীর তীর দুইটি জনশূন্য—ধীবর সন্তান ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। তীরে বাঁধা ডোঙাগুলি সন্ধ্যার বাতাসে কাঁপিতেছে। অন্ধকার হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে রাখালবালক কলার ভেলা ফেলিয়া রাখিয়া গোরুগুলি লইয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। সাদা হাঁসগুলি বাসায় বাসায় শেষবারের মতো পাখা

ঝাড়া দিল। একটি মরালশিশু দলছাড়া হইয়া দূরে একাকী চীৎকার করিতেছে। কৃষ্ণাভ আকাশে ভ্রূরেখার মতো বাঁকা হইয়া একদল বাদুড় দেখা দিল। শৈবালের ভিজা গন্ধে সন্ধ্যার বাতাস ভরিয়া উঠিল। হিমসিক্ত শস্যক্ষেত্র হইতে বাতাস ছুটিয়া আসিতেছে। জলে, স্থলে ও আকাশে মোহময়ী সন্ধ্যার নির্বাক মন্ত্রে এক অশরীরী কল্পযন্ত্রে শান্তিরসধারা ঝরিতেছে।

(৭) 'কালকেতুর বিক্রম' কবিতাটির সারমর্ম লিখ।

সারমর্ম ঃ সকলের আনন্দ বর্ধন করিয়া কালকেতু বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাহার শক্তিশালী দেহে নাক মুখ চোখ কান সব যেন কুঁদিয়া গড়া হইয়াছিল—হাত দুইটি লোহার শাবলের মতো। তাহার রূপগুণের সীমা ছিল না। নবীন শালবৃক্ষের মতো সে বাড়িতে লাগিল। তাহার মাথার চুল চামড়ের মতো, গলায় জালের কাঠি, দুই হাতে লোহার শিকল। তাহার বক্ষ বিস্তৃত, চোখ দুইটি আযত, প্রমত্ত গতি, সিংহের মতো কোমর, দাঁতগুলি যেন মুক্তার সারি। তাহার চোখ দুইটি নাটার মতো ঘুরে, কানে স্ফটিকের কুণ্ডল। বীর ধড়ি পরিয়া সে শিশুদের মধ্যে মণ্ডলের মতো বিরাজ করে। সে যাহার সহিত ডাণ্ডাগুলি লইয়া খেলা করে তাহার প্রাণসংশয় হইয়া উঠে। সে যাহাকে আঁকড়িয়া ধরে সে ভূপতিত হয়—ভয়ে কেহ তাহার কাছে যায় না, শিশুদের সহিত সে তাড়া দিয়া খরগোশ ধরে—দূরে গেলে কুকুর লেলাইয়া দেয়। সে বাঁটুল দিয়া পাখি মারিয়া লতা দিয়া বাঁধিয়া কাঁধে চাপাইয়া বাড়ি লইয়া আসে। গণক আসিয়া শুভক্ষণ গণিয়া দিলে ব্যাধপুত্র কালকেতুর হাতে ধনু দেওয়া হইল। তাহার মাথায় টোপর দিয়া তাহাকে ধনু হইতে বাণ ছাড়িতে শেখানো হইল।

(৮) নিম্নলিখিত অংশটির ভাব বিবৃত করিয়া রচনা-কৌশল সম্বন্ধে মন্তব্য কর।

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি-বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই॥

সারমর্ম ঃ দেবী ঈশ্বরী পাটনীকে আপনার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি ইঙ্গিতে আপনার পরিচয় দিতে পারেন। তাঁহার পিতা গোত্রপ্রধান মুখবংশজাত—স্বামী কুলীন, তিনি বন্দ্যবংশখ্যাত। পিতামহ তাঁহাকে অন্নপূর্ণা নাম দিয়াছেন। তাঁহার স্বামী অনেকের পতি হওয়ায় তাঁহার প্রতি বাম। তাঁহার পতি অতিবৃদ্ধ, সিদ্ধিনিপুণ, তিনি নির্গুণ, তাঁহার কপালে আগুন। তিনি কু-কথায় পঞ্চমুখ, তাঁহার কণ্ঠ বিষে পরিপূর্ণ—তাঁহার সঙ্গে তাঁহার নিরন্তর দ্বন্দ্ব। সতীন গঙ্গাকে স্বামী মাথায় করিয়া রাখেন। স্বামী ভূতের দল লইয়া ফেরেন। পিতা পাষাণ—তাঁহার মৃত্যু নাই। অভিমানে তাঁহার ভাই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন। যে আমাকে আপনার বলিয়া মনে করে, আমি তাহার ঘরে যাই।

[**মন্তব্য ঃ** কাব্যাংশটির দুই অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহার সাধারণ অর্থ স্পষ্ট; শ্লেষগত অর্থের তাৎপর্য এইরূপ—পিতা শ্রেষ্ঠ বংশজাত, স্বামী বন্দনীয় বংশে উৎপন্ন। ব্রহ্মা অন্নপূর্ণা নাম দিয়াছেন। পতি জগৎপতি, বামদেব। পতি আদি পুরুষ, তিনি সিদ্ধির মূল। তিনি গুণাতীত, তাঁহার ললাটে অগ্নিময় চক্ষু। বেদপাঠের জন্য তাঁহার পঞ্চমুখ, বিষ পান করিয়া তিনি নীলকণ্ঠ। হরগৌরীর নিরবচ্ছিন্ন মিলন। মহাদেব স্বর্গ হইতে মর্ত্যে পতিত

গঙ্গাকে আপনার জটায় ধারণ করিয়াছিলেন। স্বামী ভূতনাথ। পিতা হিমালয় পর্বতরাজ, তিনি দেবতা হওয়ায় অমর। ভ্রাতা মৈনাক সমুদ্রে আত্মগোপন করিয়া আছে। যে ভক্তি ভরে ডাকে, দেবী তাহার ঘরে অধিষ্ঠান করেন।]

(৯) নিম্নলিখিত অংশগুলির ভাবসংক্ষেপ সংক্ষেপে লিখ।

(ক) পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বনদেবী-করে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব লতিকার সতি! দিতাম বিবাহ
তরু সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে!

ভাবসংক্ষেপ ঃ আমরা পঞ্চবটী বনে আনন্দে বাস করিতাম। সেই অরণ্যের শোভা বর্ণনার অতীত। সেখানে সর্বদা স্বপ্নে বনদেবীর বনবীণার ধ্বনি শুনিতাম! সরোবরের তীরে বসিয়া পদ্মবনে সূর্যকিরণের খেলা দেখিতাম। কখনও কোনো ঋষিপত্নী আসিয়া আমাদের কুটীর উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেন।

বহুবর্ণরঞ্জিত মৃগচর্ম পাতিয়া দীর্ঘ বৃক্ষের মূলদেশে বসিতাম। কখনো বা ছায়াকে সখা মনে করিয়া তাহার সহিত কথা কহিতাম, কখনও বা হরিণীর সঙ্গে বনে বনে নাচিয়া ফিরিতাম, কখনও বা কোকিলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া গান গাহিতাম। বৃক্ষের সঙ্গে নব লতিকার বিবাহ দিতাম। যখন সেই লতায় মঞ্জরী ধরিত, তখন তাহাকে নাতিনী বলিয়া ডাকিতাম। যখন ভ্রমর গুঞ্জরণ করিয়া তাহার কাছে আসিত তখন তাহাকে নাতিনীজামাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

(খ) বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি—
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।
অর্দ্ধ নিষ্কোষিত অসি করি' যোদ্ধৃগণ,—
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন।
ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল
বন্দুক সদর্পভরে
তুলি নিল অংসোপরে ;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল !
ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল—
গম্ভীর গর্জ্জন করি'
নাশিতে সম্মুখ-অরি
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল।
ছুটিল একটি গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে
ভূতলে হইল মির-মদন পতন !
"হুর্‌রে। হুর্‌রে !"—করি' গর্জ্জিল ইংরাজ।

নবাবের সৈন্যগণ
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ ;
পলাতে লাগিল সবে, নাহি সহে ব্যাজ।

ভাবসংক্ষেপ : বৃটিশের যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিলে সেই শব্দে সারা রণক্ষেত্র, গঙ্গার জল ও আম্রবন কাঁপিয়া উঠিল। যোদ্ধারা তরবারি বাহির করিয়া একবার সূর্যের দিকে, আর একবার পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল—যেন এ জন্মে এই শেষবারের মতো দৃষ্টিপাত। সেনাপতির ইঙ্গিতে সৈন্যগণ এক মুহূর্তে কাঁধে বন্দুক তুলিয়া লইল—সারা রণক্ষেত্র সঙ্গিনে ভরিয়া গেল। ইংরেজ গোলন্দাজরা কামান দাগিলে তাহা হইতে ঘোর গর্জনে আগুন বাহির হইয়া শত্রুকে ধ্বংস করিতে ছুটিয়া গেল। একটি অগ্নিময় গোলা গিয়া মিরমদনের পায়ে লাগিলে সেই প্রচণ্ড আঘাতে মিরমদন ভূপতিত হইলেন। ইংরেজ সৈন্য 'হুর্‌রে হুর্‌রে' বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল। নবাবের সৈন্যগণ ভীত হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে লাগিল—বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না।

(গ) গভীর বসন্ত-নিশি—গভীর গগন,
কলিকাতা নিমতলে, দিতেছে গঙ্গার জলে
ধোয়াইয়া ভারতের বুকভরা ধন ?
পাতিয়ে অঞ্চল-ঢেউ,—আঁধারে দেখিনি কেউ,
মহাযত্নে মন্দাকিনী করিছে গ্রহণ।
পাইয়া কবির ছাই, আনন্দের সীমা নাই,
চলেছে পতিরে দিতে ডগমগ মন !
কতযুগ যুগান্তর হৃতরত্ন রত্নাকর,—
দেবতা লুটিয়া নেছে করিয়া মন্থন,
পরশে করিব ছাই, ফিরিয়া পাইবে তাই,
লবণাক্ত জলে হবে সুধা অতুলন !
ইন্দিরা জন্মিবে শঙ্খে, পারিজাত হবে পঙ্কে,
শুকুতি পরশে হবে মুকুতা-সৃজন !
শৈবাল প্রবাল হবে, সুধাকর ফেন সবে,
হইবে কল্পতরু তৃণতরুগণ !

পাষাণে পড়িলে দাগ হবে মণি পদ্মরাগ,
অঙ্গারে হইবে হীরা, কৌস্তুভ-রতন !
সত্যই কি কবি মরে ? বোঝে না অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন,
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ।

ভাবসংক্ষেপ ঃ বসন্তের গভীর রাত্রি! কলিকাতায় নিমতলা গঙ্গার জলে ভারতের প্রিয় ধনকে ধোয়াইয়া দিতেছে। সেই নিবিড় অন্ধকারে গঙ্গা একান্ত যত্নে সেই দান গ্রহণ করিতেছে। কবির চিতাভস্ম পাইয়া গঙ্গা সানন্দে তাহা স্বামী সমুদ্রকে দান করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। কত যুগ ধরিয়া দেবতারা রত্নাকর মন্থন করিয়া রত্ন লুণ্ঠন করিয়াছে—কবির ভস্মের স্পর্শে সমুদ্র যেন রত্ন ও অমৃত ফিরিয়া পাইবে। তখন শঙ্খে লক্ষীর জন্ম হইবে, পঙ্কে পারিজাত ফুটিবে, শুক্তির ভিতরে মুক্তা জন্মিবে। তখন শৈবাল প্রবাল হইবে, ফেন হইতে চন্দ্র হইবে, তৃণ ও বৃক্ষ কল্পতরু হইবে। তখন সমুদ্রে পাষাণ হইতে পদ্মরাগ ও অঙ্গার হইতে হীরক জন্মিবে। বস্তুত, কবির মৃত্যু নাই, মানুষ বোঝে না যে, কবি স্বর্গের নূতন সম্পদের আযোজন করে—দেবতারা সানন্দে কবির চরণ বন্দনা করেন।

(ঘ) ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে'
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচীমুখে শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি !
ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি'
আবার সে পুঁথি'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।
"আহা আহা"—চীৎকার করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণ-মন-কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায় !

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠ-সুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন।
দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু ;
যমুনা উতলা করি' না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে' শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে'।
"এখনো উঠাতে পারি," করযোড়ে যাচে—
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি' দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন, "আছে ওই নদীতলে !"

ভাবসংক্ষেপ : প্রভু মাটি থেকে বালা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। বালার হীরার মুখগুলি থেকে আলো ঠিকরাতে লাগল। গুরু হেসে একপাশে বালা দু'টি রেখে আবার বইয়ের দিকে মন দিলেন। হঠাৎ একটা বালা পাথরের উপর থেকে গড়িয়ে যমুনার স্রোতে গিয়ে পড়ল। রঘুনাথ 'আহা আহা' ক'রে চীৎকার ক'রে উঠে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গুরু একবারও বই থেকে মুখ তুললেন না। যমুনার কালো জল বালাটি গোপন করে রাখল, ক্রমে দিন শেষ হয়ে গেল। যমুনার জলে বহুক্ষণ ধরে কিছু না পেয়ে রঘুনাথ সিক্তবস্ত্রে, শ্রান্তদেহে গুরুর কাছে এলেন। তিনি করজোড়ে গুরুকে বললেন যে, কোথায় আছে দেখিয়ে দিলে তিনি এখনও চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। গুরু দ্বিতীয় বালাখানি জলে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন যে, বালাটি নদীর জলে আছে।

(৬) ছুটব আমি সরল প্রাণে,
পর্ণকুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুটব আলিপথে।

বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কান জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।
এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙের রাঙা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে' উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে ;
তুচ্ছ ক'রে জোয়ার-ভাঁটা,
এপার-ওপার সাঁতার-কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে
নীল-আকাশের তলে।
বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব না'য়ে,
মাঝ-গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আদুল গায়ে ;
গাঙ্‌-চিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক 'ফটিক জল'
মেঘের ছায়ে ছায়ে।

ভাবসংক্ষেপ : আমি পর্ণকুটীর থেকে সহজ প্রাণে ধানভরা মাঠ কাঁপানো আলপথে ছুটে বেড়াব। বনের মাথায় অন্ধকার ফুঁড়ে দূরে শুকতারা জেগে উঠবে, পাখির মিষ্টি সুরের কাকলিতে কান জুড়িয়ে যাবে। গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেউ কাটিয়ে উজান পথে সাঁতার কাটব। জোয়ার-ভাটা তুচ্ছ ক'রে এপার-ওপার সাঁতার কাটব। জলের বুকে আলো নেচে উঠবে। নৌকোর পাল তুলে, সাহস ক'রে হাল ধরে মাঝ গঙ্গায় গিয়ে আদুল গায়ে মাছ ধরব। গঙ্গার ভাঙা পাড়ের কাছে গাঙ্‌চিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়বে। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় উড়ে চাতক ফটিক জল বলে ডাকবে।

(চ) এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,—
কালো মুখেই কালো ভ্রমর! কিসের রঙীন ফুল?
কাঁচা-ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া;
তা'র সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া!
জালি-লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু;
গা'খানি তা'র শাঙন-মাসের যেমন তমাল-তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লী-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্।
কচি ধানের তুল্‌তে চারা হয়ত' কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তা'র হাসি।
কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরাণ লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়!
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তা'র?—
রঙ পেলে ভাই গড়্‌তে পারি রামধনুকের হার।
কালোর যে জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,—
কালো-বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে-কালো তা'র মাঠেরি ধান, যে-কালো তা'র গাঁও,
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

ভাবসংক্ষেপ: এই গ্রামে একটি চাষার কালো ছেলে আছে—তাহার মাথার চুল লম্বা, তাহার চোখ দু'টি কালো। তাহার কচি মুখ যেন কাঁচা ধানের পাতার মতো সবুজ, তাহার সঙ্গে কচি ঘাসের রং মাখানো। তাহার হাত দু'টি লাউয়ের ডগার মতো সরু—তাহার গা শ্রাবণের তমাল তরুর মতো শ্যামল। তাহার অঙ্গ যেন তৈলচিক্কণ বাদল-মেঘ। বিদ্যুৎকন্যা যেন

আলোর খেলা ভুলিয়া লজ্জায় লুকাইয়া পড়ে। কোনো চাষী যেন কচি ধানের চারা তুলিতে আসিয়া তাহার মুখে কতকটা হাসি ছড়াইয়া গিয়াছে।

কালোর গুণ কম নয়। কালো চোখের তারা দিয়াই পৃথিবী দেখা যায়। কালো কালি দিয়াই বই লেখা হয়। জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই কালো রহস্যে ঢাকা। চাষীদের কালো ছেলে সব জয় করিযাছে। সোনার অলংকারের গৌরব কতটুকু, রং দিয়া রামধনু গড়া যায়। কিন্তু কালো দিয়া যে আলো সৃষ্টি করিতে পারে সে সকলের মন ভোলায়—তাহার জন্য সারা বৃন্দাবন ব্যাকুল। সোনার মুখ নয়—চাষী .ছেলের কালো রং দেখিয়া মন ভরিয়া যায়। শ্যামল গ্রামের শ্যামলিমায় স্নান করিয়া তাহার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম হইয়া উঠিয়াছে।

(ছ) এই উঠানে, এ জেলখানায় দেখছি আলো দিব্যিমানায়,
দুদিন আগে একথা কই ভাবিনি ;
সকল দিনের দৈন্য নাশি' শরৎ এল মধুর হাসি',
সোনার বান আজ এল ভুবনপ্লাবিনী !
ইঁটের পরে ইঁটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমন করেই মানুষকে ভাই শুকায়ে,
হঠাৎ আবার সেই কারাতে শরৎ তারে এম্‌নি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙীন চিঠি লুকায়ে।
সহসা সেই শুভক্ষণে সব-কিছু হয় মধুর মনে,
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে,
কঠিন সে হয় কোমল বড়ো, পুরানো হয় নূতনতরো
রাঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে-ফ্যাকাসে।
আশ্বিনে সেই দিন এসেছে, আলোর নদীর কূল ভেসেছে,
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবনা ?
নিখিলের রং ছড়িয়ে যাবে— তোমরা কি তার সবটা পাবে,
হেথায় আমি একটুও কি পাব না !
বাইরে আলো, দুষ্ট ছেলে— মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে—
ধরার নয়ন ভবে স্বপন-আবেশে,
হেথায় আলো, লক্ষ্মী-মেয়ে— করুণ চোখে রয় সে চেয়ে,
যায় কি পারা থাকতে ভাল না বেসে !

ভাবসংক্ষেপ ঃ এই কারার প্রাঙ্গণে আলো যে এমন শোভন হইতে পারে তাহা কোনোদিন ভাবি নাই। শরৎ আজ ভুবনভরা সোনার আলো লইয়া আসিয়া এতদিনের সব দৈন্য দূর করিয়া দিল। মানুষ ইট দিয়া কারাগার গড়িয়া মানুষকে বন্দী করিয়া তাহার মনটুকু শুকাইয়া ফেলে—সেই কারাগারে শরৎ এমনই করিয়া বিশ্বের বর্ণময় পত্র লইয়া আসে। তখন সব কিছুই মাধুর্যময় বলিয়া মনে হয়—যাহা এতটুকু তাহা বড়ো হইয়া উঠে, যাহা কঠিন তাহা কোমল হয়, পুরাতন নূতন হয়, যাহা বিবর্ণ তাহা রঙিন হইয়া উঠে।

আশ্বিনের শুভদিনে যখন আলোতে সারা বিশ্ব প্লাবিত হইয়া গেল তখন আমার আর চিন্তা কিসের। সারা বিশ্বে রং ছড়াইয়া গেলে কারার বাহিরের সকলেই কি তাহার অংশ পাইবে—এখানে আমি কি তাহার অংশ পাইব না। বাহিরে আলো দুষ্টু ছেলের মতো মাঠে মাঠে খেলিয়া বেড়ায়। এখানে আলো লক্ষ্মী-মেয়ের মতো করুণ চোখে চাহিয়া থাকে। তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকা যায় না।

(১০) নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি অংশের ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ

(ক) **কত চতুরানন মরি মরি যাওত**
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা।

এই বিশ্বের মূলে এমন এক মহাশক্তি আছে যাহা হইতে বিশ্বের সমস্ত কিছুই নিঃসৃত হইতেছে। সেই মহাশক্তিকে ভক্ত ভগবান নাম দিয়াছেন। সৃষ্টিকর্তা বা বিধাতা বলিযা ভারতে যাহাকে কল্পনা করা হয তিনি বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিই সৃষ্টির মূলাধার নহেন। যিনি ভগবান তিনি যেমন সৃষ্টির কারণ তেমনই সৃষ্টির উপাদানও তিনি।

ভক্তের চোখে ভগবানের মহিমার তুলনা নাই। তাহার কাছে ভগবান অনাদি ও অশেষ। এই বিশ্বে বারবার কত সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটিতেছে, এক এক সৃষ্টিতে এক এক চতুর্মুখ ব্রহ্মার উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে—কিন্তু ভগবানের বিন্দুমাত্র বিকার বা ক্ষয় নাই।

বস্তুতঃ ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম এমন প্রগাঢ় যে, তাহা ভগবানকে অনন্ত বলিয়াই মনে করে। কালের প্রবাহে কতযুগ আসিতেছে, কতযুগ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ভগবানের অসীমতার বোধটির বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। মানুষ উপলব্ধি করিতেছে যে, ভগবানের বিশালতার অন্ত নাই—সমুদ্রে যেমন ঢেউ ওঠে আবার ঢেউ পড়িয়া যায় সেইভাবে তাহার বক্ষে নব নব সৃষ্টির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। ভগবানের অসীমতার বোধ অন্তরে জাগ্রত হইলে মানুষের মন আপনিই তাঁহার চরণে নত হইয়া পড়ে।

(খ) **ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি**
কাজ কি রে তোর সে গঠনে ?
তুমি মনোময় প্রতিমা করি'
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।

মানুষ প্রতিমা গড়িয়া যে ঈশ্বরের আরাধনা করে, ইহা ঈশ্বরের যথার্থ আরাধনা বলিয়া প্রকৃত ভক্ত স্বীকার করেন না। যে ভক্ত ঈশ্বরের সন্ধানে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার কাছে প্রতিমা যথেষ্ট নয়। তিনি কেবলমাত্র প্রতিমা পূজা করিয়াই দেবতার আরাধনা শেষ হইয়া গেল বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার সাধনা জড়জগৎ অতিক্রম করিয়া চৈতন্যের জগতে যাত্রা করে। তিনি বাহ্য সাধনায় সন্তুষ্ট থাকেন না, অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের ধ্যানমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তপঃসাধনায় প্রবৃত্ত হন।

অবশ্য সকলের পক্ষে এই মনোময় পূজা সম্ভবপর নয়। সাধারণ মানুষ একটা কিছু বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে না লইয়া অগ্রসর হইতে পারে না। প্রতিমা তাহার ভগবৎকল্পনার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু তাহার সমস্ত ভাবনা ও কল্পনা যদি সেই জড়প্রতিমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার সাধনার গণ্ডি সংকীর্ণ হইয়া যায়। তখন তাহার অধ্যাত্মসাধনা জড়সাধনার মধ্যে পরিসীমিত হইয়া পড়ে। ভগবৎসাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রতিমার বাহ্যরূপ অতিক্রম করিয়া অন্তর্জগতে তাহার ভাবময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(গ) **বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর**
কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার।

ধর্ম মানুষের অন্তরের সম্পদ্। মানুষ আপনার অন্তরে বিশ্বের সারভূত সত্যকে লাভ করিবার জন্য যে সমস্ত পথের সন্ধান করিয়াছে সেই পথগুলিই ধর্মের পথ। সেই সমস্ত পথ অবলম্বন করিয়া মানুষ অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে এমনও দেখা গিয়াছে। কিন্তু সেই পথগুলির বিশেষ কোনো একটিই যে একান্তভাবে সত্য এবং অন্যপথ অবলম্বন করিলে যে ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হয় এমন কথা বলা যায় না। ধর্ম সম্পর্কে মানুষের শেষ কথা এখনও উচ্চারিত হয় নাই, কখনও উচ্চারিত হইবে না।

কিন্তু ধর্মকে লইয়া মানুষের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নাই। যাহা অন্তরের সামগ্রী, তাহাকে বাহিরের মত বা দলের বিষয় করিয়া তুলিয়া মানুষ বিরোধকেই প্রবল করিয়া তোলে। তখন ধর্মের নামে মত বিশেষ মাথা চাড়া দিয়া উঠে, সেই মতের অনুসারী বা প্রবর্তকগণই একমাত্র শ্রদ্ধার্হ পুরুষ বলিয়া ঘোষিত হন, এমন কি সেই মতের সমর্থক বলিয়া রাজা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিও সম্মানিত হন। ক্রমে ধর্মের ক্ষেত্রে প্রবলের প্রতাপ আত্মপ্রকাশ করে—যাহা সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থ ও রাজশক্তি তাহাকে আপনার কাজে লাগাইবার জন্য প্রয়াসী হয়।

অবশ্য ধর্মের ক্ষেত্রে প্রবলের এই প্রয়াস কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ইতিহাসে বারবার দেখা দিয়াছে শক্তিতে অধিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের প্রতাপ বিদূরিত করিয়া সত্যধর্ম বারবার নবনব মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(ঘ) বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিল্-দুনিয়াটা,
মানুষ-ই তাঁহার মহা-মূলধন, কর্ম্ম তাহার খাটা।

সহজতন্ত্রের সাধক কবি চণ্ডীদাস একদিন উদাত্তকণ্ঠে গেয়েছিলেন,

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

মানুষ যুগে যুগে ধর্মের সাধনা করেছে। তার সেই সাধনার পথের শেষপ্রান্তে ভগবান আর সে পথে যাত্রী যে ভক্ত সে মানুষ। মানুষকে বাদ দিলে ভগবানের তাৎপর্যও যেন লুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের অস্তিত্বই ভগবানের গৌরব ব্যক্ত করে।

এই পৃথিবীতে মানুষ তার মননশক্তি, হৃদয়াবেগ আর প্রজ্ঞায় সর্বজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। মানুষ তার বুদ্ধি আর অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে এই

জগতের উপর আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। পৃথিবীতে সেই রাজা। অন্য জীব প্রকৃতির উপর নির্ভর ক'রে দিনযাপন করে, কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে চেষ্টা করেছে।

এই পৃথিবীকে যদি ঈশ্বরের একটা বিরাট কারবার ব'লে ধরা যায়, তাহ'লে মানুষকে তার সবচেয়ে বড়ো মূলধন ব'লে স্বীকার করতে হয়। মানুষ যে কাজ করছে তা' সেই বিরাট ব্যবসায়ীরই কাজ। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মানুষেরই কর্মে, জ্ঞানে, ধ্যানে, তাঁর ঐশ্বর্য বহুগুণিত হচ্ছে। মানুষের প্রাণযজ্ঞেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ—মানুষ আছে ব'লেই তাঁর মহিমা উজ্জ্বল হয়ে প্রকট হয়েছে।

(ঙ) জগত-জননী মা না হ'ত যদি
দোপাটী পে'ত কি কৌটা ?
গোলাপ পে'ত কি রাঙা চেলী তার—
কদলী গরদ গোটা ?

মানুষ ঈশ্বরকে নানাভাবে চিন্তা করেছে। সুদূর অতীতকাল থেকে আরম্ভ করে তার ধর্মসাধনার বিচিত্ররূপের আর সীমাপরিসীমা নেই। মানুষ ভগবানকে স্থূল জড়পদার্থ থেকে আরম্ভ করে প্রাণরূপে, চিন্ময়রূপে, এমন কি বুদ্ধির অতীতরূপে কল্পনা করেছে। তার এই কল্পনার মূলে একদিকে যেমন তার জ্ঞানযোগ রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আছে তার প্রেমযোগ।

মানুষের প্রেমযোগ—তার অন্তরের ভক্তিই মানুষের ভগবৎ কল্পনাকে বিচিত্র ক'রে তোলে। ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা মানুষের অন্তরের ভক্তির একটা চূড়ান্ত নিদর্শন। ভগবানকে পিতৃরূপে দেখলে এই বিশ্বময় তাঁর অসীম ঐশ্বর্যের কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু তাঁকে মাতৃরূপে না দেখলে যে তাঁর অনন্ত স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় না। মা যেমন সন্তানকে ভালোবাসেন, মা যেমন তাঁর সন্তানটিকে আদর করেন, বিচিত্র সুন্দর সাজে সাজান তেমন আর কেউ নয়। ভক্তিবিহ্বল চিত্ত কল্পনা ক'রে যে বিশ্বমাতা এই বিশ্বকে প্রতিক্ষণ অনুপম সৌন্দর্যে পরিপূরিত ক'রে তুলছেন তিনিই দোপাটীতে রঙিন কৌটা দিয়েছেন, গোলাপ ফুলকে যেন লাল চেলী পরিয়েছেন, কদলীকে গরদ দিয়েছেন। তিনি মা ব'লেই বিশ্বময় এত সৌন্দর্য, এত মাধুর্য—সবকিছুই অপরূপ।

একাদশ শ্রেণী

সীতার বনবাস, চরিতকথা, স্বদেশ ও সংকল্প, কমলাকান্তের দপ্তর

সীতার বনবাস

কাহিনী (চলিত ভাষায় লিখিত) ঃ

রাম রাজা হয়ে প্রজাদের সুখবিধানে তৎপর হযে কোশল রাজ্যকে সমৃদ্ধ করে তুললেন। রাজকার্যের পর অবসর সময় সীতার সাহচর্যে আনন্দে কাটত।

ক্রমে সীতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেলে সকলেই আনন্দিত হলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ এক যজ্ঞের আয়োজন করায় কৌশল্যা প্রভৃতি সকলে সেখানে গেলেন, কেবল রাম আর লক্ষ্মণ সীতার জন্য যেতে পারলেন না।

সকলে চলে গেলে সীতা বিমর্ষ হয়ে পড়ায় রামের আদেশে লক্ষ্মণ রামজীবনের চিত্রপট নিয়ে এলেন। বিভিন্ন চিত্রে রামের বিবাহ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, চিত্রকূট যাবার পথ, দক্ষিণারণ্য, পঞ্চবটী প্রভৃতি অঙ্কিত ছিল। ক্লান্তিবশতঃ সীতা সব চিত্র দেখতে পারলেন না। পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠায় তিনি কিছুকাল তপোবনে ঋষিবধূদের সঙ্গে থাকবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করলে রাম সানন্দচিত্তে সম্মতি দিলেন, বললেন যে, পরদিন প্রভাতেই যাত্রার আয়োজন করা হবে।

সীতা নিদ্রিত হবার পর দুর্মুখ নামে এক গুপ্তচর রামের কাছে রাজ্যের সংবাদ জানাতে এল। সকলে যে রামের গুণকীর্তন করে দুর্মুখ সে কথা জানাল। কেউ কোনো দোষের কথা বলে কিনা জানবার জন্য রাম বারবার দুর্মুখকে প্রশ্ন করলেন। দুর্মুখ তখন জানাল যে, সীতা দুশ্চরিত্র রাবণের গৃহে দীর্ঘকাল একাকিনী বন্দিনী থাকলেও রাম তাঁকে পুনর্গ্রহণ করায় কেউ কেউ তাঁর নিন্দা করে। এই কথা জেনে রাম মর্মাহত হলেন। তিনি নিজে গভীর মর্মবেদনা অনুভব করা সত্ত্বেও প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করতে মনস্থ করলেন।

রাম তাঁর ভ্রাতাদের কাছে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে লক্ষ্মণ বললেন যে,

দুর্জনের বাক্য শুনে নিরপরাধা সীতার বিসর্জন উচিত নয়—বিশেষ করে সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে নিজের বিশুদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। রাম বললেন যে, দূরদেশে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তার কথা সকলে জানে না বা পরীক্ষার কথা শুনলেও তার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ করতে পারে। তিনি যখন প্রজানুরঞ্জন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, তখন হয় সীতা পরিত্যাগ না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করবেন। তিনি বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে রেখে আসবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন।

পরদিন সকালে রথ প্রস্তুত হলে সীতাকে নিয়ে লক্ষ্মণ তপোবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সীতা প্রথমে আনন্দিত হলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এক অজ্ঞাত কারণে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি লক্ষ্মণকে সে কথা বললে লক্ষ্মণ শোকাকুল হলেও কোনো কথা বললেন না। অবশেষে বাল্মীকির আশ্রমের কাছে এসে লক্ষ্মণ সীতাকে রামের আদেশের কথা জানালেন। সেই মর্মভেদী সংবাদ শোনামাত্রই সীতা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। পরে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে অদৃষ্টের জন্য নানা পরিতাপ করে লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন। সীতা সেই অরণ্যমধ্যে একাকিনী কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কান্না শুনতে পেয়ে বাল্মীকি এসে তাঁকে সাদরে আপনার আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

সীতাকে বনবাস দিয়ে রামের অন্তর তীব্র বেদনায় ক্লিষ্ট হতে লাগল। তিনি কোনরকমে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন, অন্যবিষয়ে তাঁর উৎসাহ থাকল না।

এদিকে সীতার দু'টি যমজ সন্তান হল—তাদের নাম রাখা হল কুশ আর লব। বাল্মীকির আশ্রমে তারা ঋষিবালকদের মতো প্রতিপালিত হতে লাগল। মহর্ষির মুখে রামচরিত শুনলেও তাঁরা নিজেদের বা জননীর পরিচয় জানত না।

রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বশিষ্ঠদেব সস্ত্রীক ধর্মাচরণ কর্তব্য ব'লে তাঁকে পুনরায় বিবাহ করতে বললেন। সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে যজ্ঞক্ষেত্রে স্বর্ণময়ী সীতা-প্রতিমা স্থাপন করা হল।

লব-কুশের বয়স বারো বছর হবার পর বাল্মীকি তাদের সঙ্গে রামের পরিচয় করে দেবার উপায় চিন্তা করছিলেন। এমন সময় রামের দূত অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে এল। তিনি সীতাকে সেই সংবাদ জানিয়ে লব-কুশকে রামায়ণ গান করবার জন্য সঙ্গে নিয়ে নৈমিষারণ্যে যজ্ঞক্ষেত্রে গেলেন।

সেখানে রাম যে যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন তা দেখে সকলেই চমৎকৃত হলেন।

বাল্মীকি লব-কুশকে বিভিন্ন স্থানে রামায়ণ গান করতে আদেশ করলেন। তাদের মুখে রামায়ণ গান শুনে সকলের মন মুগ্ধ হল। রাম লোকমুখে তাদের প্রশংসা শুনে তাদের ডেকে পাঠালেন। লব-কুশের মুখে সীতার রূপসাদৃশ্য দেখে রামের অন্তর আশা-নিরাশায় দোলায়মান হল।

লব-কুশের রামায়ণ গান শুনে রাম তাদের প্রভূত পুরস্কার দিতে চাইলে তারা ঋষির শিক্ষামত সেই পুরস্কার গ্রহণ করল না। কৌশল্যা তাদের আকৃতিতে সীতার সাদৃশ্য দেখে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরদিন বাল্মীকি লব-কুশের আসল পরিচয় জানালে সকলে আনন্দিত হলেন। বাল্মীকি সীতাকে নিয়ে সভায় এসে রামের সীতা-পরিগ্রহ সম্পর্কে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সকলে একবাক্যে সম্মত না হওযায় রাম সীতার পুনরায় পরীক্ষা দেবার প্রস্তাব করলেন। এই নিদারুণ কথা শুনে দীর্ঘবিরহে কাতরা সীতা বেদনাহত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

রাম-চরিত্র ঃ

রামায়ণের রাম-চরিত্র আপনার মহিমায় সমুজ্জ্বল। 'সীতার বনবাসে' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রামের যে চিত্র অঙ্কন করিযাছেন তাহা রামের কঠোরতার সহিত যথেষ্ট পরিমাণে কোমলতারও সঞ্চার করিয়াছে।

এখানে রাম-চরিত্রের দু'টি দিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—একটি তাঁহার প্রজানুরঞ্জন-বৃত্তি আর একটি তাঁহার পত্নীপ্রেম। রাম রাজা হিসাবে আদর্শ হইয়া আছেন, কারণ তিনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া অবধি প্রজাদের কল্যাণের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করিযা দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রজাদের মধ্যে যে সুখসমৃদ্ধি ছিল তাহা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি যে গুপ্তচরের সাহায্যে রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ রাখিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রজাদের মধ্যে কেহ কেহ সীতা-সম্পর্কে নিন্দাবাদ করায় তিনি সীতাকে বিসর্জন দিয়াছেন। অবশ্য এই বিসর্জন বড়ো সহজে হয় নাই—সীতাকে তপোবনে নির্বাসিত করিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। তথাপি তিনি প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য, তদুপরি প্রজার কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়া সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি যদি

রাজ্যের ভার গ্রহণ না করিতাম এবং ধর্ম সাক্ষী করিয়া, প্রজারঞ্জন-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে অমূলক লোকাপবাদে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতাম। যদি রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে জীবনধারণের ফল কি?" তাঁহার রাজধর্ম পালনের আদর্শ রাজকুলের অনুকরণীয়। এই রাজধর্মের অনুরোধে তিনি সীতাবিসর্জনে প্রবল বেদনা ভোগের পরও প্রজাগণের বিনা অনুমোদনে সীতাকে গ্রহণ করেন নাই এবং সীতার পরীক্ষার কথা বলিযাছেন।

রাজধর্ম পালনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করিলেও সীতার প্রতি রামের প্রেমের সীমা ছিল না। যেখানে কাহিনীর সূত্রপাত হইযাছে সেখান হইতেই আমরা সীতার প্রতি তাঁহার অন্তহীন প্রেমের পরিচয পাই। দুর্মুখের মুখে সীতার নিন্দা শোনামাত্রই তাঁহার চিত্ত বেদনায় অভিভূত হইযা পড়িযাছে। অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা ও কল্যাণবুদ্ধি ছিল বলিয়া যদিও তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তবুও সীতার প্রতি তাঁহার প্রেম বিন্দুমাত্র কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সীতাবিচ্ছেদের দুঃখ তাঁহার অন্তরকে বেদনায মথিত করিয়া দিয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞকালে আমরা তাঁহার পত্নীপ্রেমের আর একটি নিদর্শন পাই—সস্ত্রীক ধর্মাচরণ বিধেয হওয়ায় তিনি সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া যজ্ঞক্ষেত্রে স্থাপিত করিযাছিলেন।

কর্তব্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে রাম-চরিত্রের শেষ পর্যায় অপরূপ মহিমায সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চারিত্রিক সমুন্নতি এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

সীতা-চরিত্র ঃ

সীতার চরিত্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মহাশয গ্রন্থটির শেষ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন, "সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন; তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা, মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে, সীতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

সীতা-চরিত্রে একান্ত সুশীলতা ও সারল্য প্রথম হইতেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। অষ্টাবক্র মুনি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে আসিলে সীতা সাগ্রহে

সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। চিত্রদর্শনকালে চারি ভ্রাতার বিবাহ-দৃশ্যে লক্ষ্মণ কর্তৃক উর্মিলার অনুল্লেখে দেবরের প্রতি সীতার মৃদু পরিহাস উপভোগ্য। সীতার সরলতা এতদূর ছিল যে, চিত্রে শূর্পণখাকে দেখিয়া তিনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতিগত শান্তশীলতার জন্যই সীতা তপোবনে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ যখন রামের আদেশে তাঁহাকে তপোবনে রাখিয়া আসিতেছেন তখন তিনি পরম বেদনার মধ্যেও রামকে প্রণাম ও অপর সকলকে স্নেহ-সম্ভাষণ এবং ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যাগত হইলে শ্বশ্রূদের প্রণিপাত জানাইতে বলিয়াছেন। আপনার সরলতা ও সুশীলতার জন্যই তপোবনের জীবনে তিনি সংগতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন।

সীতার পাতিব্রত্য, পতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা যুগযুগ ধরিয়া ভারতনারীর কাছে আদর্শরূপে বরণীয় হইয়া আছে। চিত্রদর্শন কালে এবং তাহার পরে রামের সহিত বিশ্রম্ভালাপের সময় রামের প্রতি তাঁহার প্রেম নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রজানুরঞ্জনের জন্য রাম যখন সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন তখন রামৈক-জীবিতা সীতার অন্তর বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি রামের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র অভিযোগ করেন নাই। বরং লক্ষ্মণ যখন রাম কঠিন-হৃদয় বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, "সকলই অদৃষ্টাধীন ; আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়াছে ; তুমি আর সেজন্য কাতর হইও না ; শোকসংবরণ কর।" রামের প্রতি অতুলনীয় প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি সেই বেদনাময় মুহূর্তে লক্ষ্মণকে বলিতে পারিয়াছিলেন, "আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, আমি সেজন্য তত কাতর নহি ; পাছে আর্যপুত্রের মনে ক্লেশ হয় সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইয়াছি।...তোমায় আমার অনুরোধ এই, তাঁহার নিকটে থাকিবে, ক্ষণকালের নিমিত্তেও তাঁহারে একাকী থাকিতে দিবে না ; একাকী থাকিলেই তাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল।"

এই পতিপ্রাণা নারী পতি কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া সন্তানদ্বয়ের মুখ দেখিয়া কোনোমতে জীবন যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু নিদারুণ মর্মবেদনায় তাঁহার প্রাণশক্তি শেষ হইয়া আসিয়াছিল, পুনঃ পরীক্ষার কঠিন প্রস্তাব তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

লক্ষ্মণ-চরিত্র—রাম ও সীতার সহিত লক্ষ্মণ যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। এই উন্নতচিত্ত পুরুষ অগ্রজের সেবায় আপনার সব কিছু উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাম ও সীতা এই দুইজন যেন তাঁহার কাছে জীবন্ত বিগ্রহের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

প্রথমেই দেখি যে, সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ রামের নির্দেশে চিত্রদর্শন করাইতেছেন। এই অংশে বিবাহের চিত্রদর্শনের সময় তিনি অপর সকলের পরিচয় দিয়াছেন, কেবল উর্মিলার উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার প্রকৃতিগত শান্তশীলতা ও লজ্জাশীলতা ব্যক্ত হইয়াছে।

রাম যখন লক্ষ্মণকে সীতানির্বাসনের আদেশ দিলেন, তখন তাঁহার মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। একদিকে পরমগুরু অগ্রজের আদেশ অপর দিকে জননীতুল্যা অগ্রজ পত্নীর প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। তিনি কী করিয়া সীতাকে বনবাসে দিয়া আসিবেন? তিনি প্রথমে রামকে এই সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু রাম কিছুতেই সংকল্পচ্যুত না হওয়ায় তাঁহাকেই সীতাকে বনে রাখিয়া আসিতে হইয়াছে। তিনি যেভাবে এই দুরূহ কর্তব্য পালন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি রামকে কঠিন-হৃদয় বলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও নতমস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

ভাবসম্প্রসারণ

১। অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ। কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত। কিন্তু এইরূপ প্রণয় জগতে নিতান্ত বিরল ও একান্ত দুর্লভ।

প্রেম বা ভালবাসা জগতের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধন। সমস্ত সংসারকে এই প্রেমই ধারণ করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু প্রেম যথার্থ না হইলে, অকৃত্রিম না হইলে প্রেমের কোন গৌরব নাই। যে ভালবাসা মাত্র চোখের নেশা, যে ভালবাসা মাত্র স্বার্থসিদ্ধির উপায়, যাহা সুখের দিনে সমৃদ্ধির দিনে অনায়াসেই পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের দিনে বিপদের দিনে অন্তর্হিত হইয়া যায়—তাহা প্রকৃত প্রেম পদবাচ্য নয়। সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, যৌবনে ও

ঊর্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে ঊর্মিলার দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ, কোনও উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি! দেখুন, দেখুন, হর-শরাসনের ভঙ্গবার্ত্তাশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন, আমাদের অযোধ্যাগমন পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন; আর, এদিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য্য, তাঁহার দর্প সংহার করিবার নিমিত্ত, শরাসনে শর সন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাবাদ শ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, এজন্য বলিলেন, লক্ষ্মণ! এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় আছে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? সীতা রামবাক্য শ্রবণে আন্দোলিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এমন না হইলে সংসারের লোকে, এক বাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবেক কেন?

ভাবার্থ—লক্ষ্মণ চিত্রপটে মিথিলা-বৃত্তান্তের দিকে সীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সীতা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন যে, রাম হরধনু ভঙ্গ করিতেছেন এবং জনক তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। অপর স্থলে বিবাহসভার চিত্রে চারি ভ্রাতাকে সুসজ্জিত দেখা যাইতেছে। তাঁহার মনে হইতেছে যেন তিনি সেই সময়ে ফিরিয়া গিয়াছেন। রামও বলিলেন যে, তিনি যে সময় সীতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সময়ের কথা তাঁহার মনে জাগিতেছে। লক্ষ্মণ তখন চিত্রপটে অঙ্কিত সীতা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে দেখাইয়া দিলেন। তিনি লজ্জাবশতঃ ঊর্মিলার উল্লেখ না করায় সীতা সকৌতুকে ঊর্মিলার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মণ তখন পরশুরামের চিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইলেন—হরধনু ভঙ্গের কথা শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অযোধ্যাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং রাম তাঁহার দর্পচূর্ণ করিতে ধনুতে তীর যোজনা করিয়াছেন। রাম আপনার প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া লক্ষ্মণকে চিত্রের অন্য দর্শনীয় বিষয় দেখাইতে বলিলেন। সীতা তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া রামকে বলিলেন যে, তিনি নিজের প্রশংসা শুনিয়া বিব্রত বোধ করেন বলিয়াই সকলে তাঁহার প্রশংসা করে।

(২) দুর্ম্মুখমুখে সীতা-সংক্রান্ত অপবাদ বৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া রাম হা হতোঽস্মি বলিয়া, ছিন্নতরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন, এবং গলদশ্রুলোচনে, আকুল বচনে, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়, কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম! ইহা অপেক্ষা, আমার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাত হওয়া ভাল ছিল। কি জন্যে এখনও জীবিত রহিয়াছি? আমি নিতান্ত হতভাগ্য; নতুবা, কি নিমিত্তে, উপস্থিত রাজ্যাধিকারে বিসর্জ্জন দিয়া আমায় বনবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল? কি নিমিত্তেই দুর্ব্বৃত্ত দশানন, পঞ্চবটীতে প্রবেশপূর্ব্বক, প্রাণপ্রিয়া জানকারে লইয়া গিয়া, নির্ম্মল রঘুকুল অভূতপূর্ব্ব অপবাদদূষিত করিয়াছিল? কি নিমিত্তেই বা সেই অপবাদ, অদ্ভুত উপায় দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে অপসারিত হইয়াও দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া, সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইবেক? সর্ব্বথা আমার জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ দুঃখ ভোগের নিমিত্তই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, অমূলক বলিয়া, এই অপবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করি; অথবা, এ জন্মের মত নিরাপরাধা জানকীরে বিসর্জ্জন দিয়া, কুলের কলঙ্ক বিমোচন করি; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনও আমার মত উভয় সঙ্কটে পড়ে না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম, কিয়ৎক্ষণ, অধোদৃষ্টিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, অথবা এ বিষয়ে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, সর্ব্বোপায়ে লোকরঞ্জন করাই আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম; সুতরাং জানকীরেই বিসর্জ্জন দিতে হইল। হা হত বিধে! তোমার মনে এই ছিল। এই বলিয়া, রাম মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

ভাবার্থ—দুর্ম্মুখের মুখে সীতার অপবাদের কথা শুনিয়া রাম শোকাহত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন এবং সাশ্রুনয়নে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে

এই সর্বনাশের সংবাদ শোনা অপেক্ষা বজ্রাঘাত সহনীয় ছিল। তিনি নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়াই তাঁহাকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইতে হইয়াছিল, পঞ্চবটীতে দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া রঘুবংশে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিল এবং সেই অপবাদ আশ্চর্যজনকভাবে দূর হইলেও এখন আবার তাহাই নূতনরূপে দেখা দিয়াছে। তিনি কেবল দুঃখভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখন তিনি কী করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি এই লোকাপবাদ মিথ্যা বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিবেন, না নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্ক দূর করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না।

এইভাবে পরিতাপ করিয়া রাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন যে, এবিষয়ে কী করণীয় তাহার বিচারের অবকাশ নাই। তিনি যখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সর্বপ্রকারে প্রজানুরঞ্জন তাঁহার কর্তব্য—তাঁহাকে সীতাবিসর্জন দিতে হইবেই। এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

(৩) লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাম বলিলেন, বৎস! যা বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা জানকী একাকিনী রাবণ গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, যথার্থ বটে; এবং রাবণও অতি দুর্বৃত্ত, তাহার কোনও সংশয় নাই। কিন্তু, দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধানের পর, আর্য্যা আপনার সম্মুখে আনীত হইলে, আপনি, লোকাপবাদ ভয়ে, প্রথমতঃ, গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; পরে, অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা, তিনি শুদ্ধাচারিণী বলিয়া নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হইলে, তাঁহারে গৃহে আনিয়াছেন। সে পরীক্ষাও সর্ব্বজনসমক্ষে সমাহিত হইয়াছিল। আমরা উভয়ে, আমাদের সমস্ত সেনা ও সেনাপতিগণ এবং যাবতীয় দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সাধুবাদ প্রদান-পূর্ব্বক, আর্য্যা একান্ত শুদ্ধাচারিণী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে আর পরগৃহবাস নিবন্ধন অপবাদে দূষিত করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, আপনি কি কারণে এরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অমূলক লোকাপবাদ

শুনিয়া, ভবাদৃশ মহানুভবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সামান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য ; যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাই বলে ; এবং যাহা শুনে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। আর্য্যা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারিণী, সে বিষয়ে, অন্ততঃ আমি যতদূর জানি, আপনাকার অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, আর্য্যাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলে, লোকে আমাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিবেক ; এবং ধর্ম্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদিগকে দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবেক। অতএব, আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যাবধারণ করুন। আমরা আপনার একান্ত আজ্ঞাবহ ; যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই, অসন্দিহান চিত্তে শিরোধার্য্য করিব।

ভাবার্থ—লক্ষ্মণের এই বিনীত কাতর উক্তি শুনিয়া রাম তাঁহাকে নির্ভয়ে সমস্ত কথা বলিতে বলিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন যে, সীতা একাকিনী রাবণের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং রাবণও দুর্বৃত্ত ইহা সত্য ; কিন্তু রাম রাবণকে শাস্তি দিয়াও লোকাপবাদের ভয়ে সীতাকে গ্রহণ করিতে প্রথমে সম্মত হন নাই। কিন্তু সর্বজনসমক্ষে এক অলৌকিক পরীক্ষায় সীতার পবিত্রতা প্রমাণিত হইলে তিনি সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা দুইজন, সমগ্র সৈন্য, দেবগণ, ঋষিগণ সকলেই তাঁহাকে পবিত্রচরিত্রা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আর লোকাপবাদের আশঙ্কা নাই। মিথ্যা লোকাপবাদ শুনিয়া রামচন্দ্রের মতো মহাত্মার বিচলিত হওয়া অনুচিত। সামান্য লোকের বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকায় তাহারা যাহা শুনে তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে—তাহাদের কথায় আস্থা রাখিলে চলে না। সীতার শুদ্ধতা সম্পর্কে রামচন্দ্রের অন্তরে সন্দেহ নাই এবং তিনি যে পরীক্ষা দিয়াছেন তাহাতে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন যদি সীতাকে বিসর্জন দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া গণিত এবং ধর্মতঃ পাপগ্রস্ত হইব। সুতরাং সকল দিক বিচার করিয়া কাজ করা কর্তব্য। আমি আপনার যাহা আদেশ তাহা অবশ্যই পালন করিব।

(৪) এই বলিতে বলিতে, জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, লক্ষ্মণ! নিষ্ঠুর বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, বিধাতার অপরাধ কি; সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করে। আমি জন্মান্তরে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফল ভোগ করিতেছি। বোধ করি পূর্ব্বজন্মে, কোনও পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিয়োজিত করিয়াছিলাম; সেই মহাপাপেই আজ আমার এই দুরবস্থা ঘটিল; নতুবা আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধাচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন; তথাপি যে এমন সময়ে আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, সে কেবল আমাব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ। বৎস! আমি বনবাসে কাতর নহি। আর্য্যপুত্রের সহবাসে, বহুকাল বনবাসে ছিলাম; তাহাতে একদিন, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আর্য্যপুত্র সহবাসে যাবজ্জীবন বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছুমাত্র দুঃখ হইত না। সে যাহা হউক, আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্য্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব। তাঁহারা আর্য্যপুত্রকে করুণাসাগর বলিয়া জানেন; আমি প্রকৃত কারণ বলিলে তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ভাবিবেন আমি কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই মুহূর্ত্তে, তোমার সমক্ষে, জাহ্নবী জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবনধারণের ফল কি বল? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয়? আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, আর্য্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও আমার প্রাণ বিয়োগ ঘটিতেছে না, বোধ করি আমার মত কঠিন প্রাণ আর কারও

নাই ; নতুবা, এখনও নির্গত হইতেছে না কেন ? অথবা, বিধাতা আমায় চিরদুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ; প্রাণত্যাগ হইলে, তাঁহার সে সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায় ; এজন্যই জীবিত রহিয়াছি।

সংক্ষিপ্তসার—সীতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে কেন এত দুঃখ বিধান করিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। বিধাতাকে দোষ দেওয়া অনুচিত, কারণ সকলে নিজের কর্মফলই ভোগ করে—তিনিও জন্মান্তরের কর্মফল ভোগ করিতেছেন। সম্ভবতঃ পূর্বজন্মে তিনি কোনো পতিব্রতা নারীকে পতিবিযুক্তা করিয়াছিলেন, সেইজন্য এই অবস্থায় পড়িয়াছেন। নতুবা রামের স্নেহ এবং তাঁহার পতিনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিলে রাম যে এমন সময়ে তাঁহাকে বিসর্জন দিবেন তাহা মনে হয় না। ইহা তাঁহার কর্মফল মাত্র। তিনি বনবাসে কাতরা নন, পূর্বে রামের সহিত বনবাসে সুখেই ছিলেন। তাঁহার সহিত যাবজ্জীবন বনবাসেও তাঁহার দুঃখ নাই। তাঁহার মনে এই দুঃখ যে, তিনি মুনিপত্নীদের কী বলিবেন। তাঁহারা রামকে করুণাময় বলিয়া জানেন। তাঁহারা মনে করিবেন যে, রাম তাঁহাকে নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতেন তবে তিনি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন—তাঁহার আর জীবনে প্রয়োজন কী ! তিনি নিতান্ত কঠিনহৃদয়া হওয়ায় পরিত্যাগ সংবাদ শুনিয়াও জীবিত আছেন। অথবা বিধাতা তাঁহাকে চিরদুঃখিনী করিতে সংকল্প করায় তাঁহাকে জীবিতা রাখিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার

(৫) লক্ষ্মণ, পুনরায় পরম যত্নে, রামচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ; এবং, তাঁহার তাদৃশী দশা দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর্য্য যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহাতে এ জন্মে আর সুস্থচিত্ত হইতে পারিবেন না। শোকাপনোদনের কোনও উপায় দেখিতেছি না। যাহা, হউক, সান্ত্বনার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি, এইরূপ আলোচনা করিয়া, বিনয়পূর্ণ প্রণয়গর্ভ বচনে বলিলেন, আর্য্য ! শোকে ও মোহে এরূপ অভিভূত হওয়া, ভবাদৃশ মহানুভবের পক্ষে, কদাচ উচিত নহে। আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। যাদৃশ

বিধিনির্ব্বন্ধ ছিল, ঘটিয়াছে ; নতুবা আপনি অকারণে অথবা সামান্য কারণে, আর্য্যাকে বিসর্জ্জন দিবেন, ইহা কাহার মনে ছিল। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে ; উন্নতি হইলেই পতন হয় ; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে ; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের, কোনও কালে, অন্যথা ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমুদয়ের আলোচনা করিয়া, আপনাকার শোকসংবরণ করা উচিত। বিশেষতঃ আপনি সকল লোকের হিতানুশাসন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ; সে জন্যেও আপনাকার শোকাভিভূত হওয়া বিধেয় নহে। প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগ শোকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভবাদৃশ মহানুভবদিগের একান্ত শোকাভিভূত হওয়া কদাচ উচিত হয় নাই। প্রাকৃত লোকেই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। অতএব, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; এবং অন্তঃকরণ হইতে অকিঞ্চিৎকর শোককে নিষ্কাশিত করিয়া, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন। আর আপনাকার ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি কেবল লোক-বিরাগ সংগ্রহের ভয়ে, আর্য্যারে নির্বাসিত করিয়াছেন। আর্য্যাকে গৃহে রাখিলে, প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করিবেক, কেবল এই আশঙ্কায়, আপনি তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন। এক্ষণে, তাঁহার নিমিত্ত শোকাকুল হইলে, সে আশঙ্কার নিরসন হইতেছে না। সুতরাং, যে দোষের পরিহাসমানসে আপনি ঈদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, সেই দোষ পূর্ব্ববৎ রহিতেছে ; আর্য্যার পরিত্যাগে কোনও ফলোদয় হইতেছে না। আর, ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি যত দিন শোকাভিভূত থাকিবেন, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। প্রজাপালন কার্য্য উপেক্ষিত হইলে, রাজধর্ম্ম প্রতিপালন হয় না। অতএব সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন ; আর অধিক শোক ও মনস্তাপ করা কোনও ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে : অতীত বিষয়ের অনুশোচনায় কালহরণ করা সদ্বিবেচনার কার্য্য নয়।

সংক্ষিপ্তসার—লক্ষ্মণ বহুযত্নে রামের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। রামের সেই অবস্থা দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, রাম যেরূপ শোকাকুল হইয়াছেন তাহাতে তিনি আর সুস্থচিত্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি রামকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন যে, তাঁহার মতো মহাত্মার পক্ষে এইভাবে শোকার্ত হওয়া উচিত নয়। বিধাতার বিধান বলিযাই তিনি সীতাকে বিসর্জন দিয়াছেন। এই জগতে সুখের পর হয় দুঃখ—কোনো কিছুই একভাবে থাকে না। এই কথা ভাবিয়া শোক দূর করা কর্তব্য। বিশেষতঃ তিনি সকলের কল্যাণসাধনের যে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিযাছেন তাহাতে এইরূপ শোকাহত হওয়া অনুচিত। সামান্য লোকেই শোকে ও মোহে বিমূঢ় হইয়া পড়ে। সুতরাং তিনি ধৈর্য অবলম্বন করিয়া রাজকার্যে মনোনিবেশ করুন। লোকবিরাগের আশঙ্কায় তিনি সীতাকে বনবাস দিয়াছেন, এখন যদি তিনি শোকাকুল হইয়া রাজকার্য পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই দুষ্কর কর্ম নিষ্ফল হইয়া পড়িবে। শোকাহত হইয়া প্রজাপালনে অমনোযোগী হইলে রাজধর্ম পালনে ব্যত্যয় ঘটিবে। সুতরাং সকল বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি ধৈর্য ধারণ করুন।

(৬) এ দিকে, মহর্ষি বাল্মীকি, সীতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ দেখিয়া, মনে মনে সর্ব্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না; আর, কুশ ও লব, রাজাধিরাজ তনয় হইয়া সারাজীবন তপোবনে কালযাপন করিবেক, ইহাও কোনও মতে উচিত নহে, তাহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম, এ উভয়ের শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব, যাহাতে সপুত্রা সীতা পুনরায় পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোনও উপায় উদ্ভাবিত করিবার প্রয়োজন কি? শিষ্য দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাইয়া, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুত্রা সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। এই স্থির করিয়া, ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া, মহর্ষি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত

লোকানুরাগপ্রিয় ; কেবল লোকবিরাগ সংগ্রহের ভয়ে, পূর্ণগর্ভা অবস্থায়, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীরে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন ; এখন, আমার কথায়, তাঁহারে সহজে গৃহে লইবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কোনও সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, কোনও মতে, উচিত কল্প হইতেছে না। এই দুই বালক, উত্তরকালে, অবশ্যই কোশলসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেক ; এই সময়ে, পিতৃসমীপে নীত হইয়া, রাজনীতি বিষয়ে বিধিপূর্ব্বক উপদিষ্ট না হইলে, রাজকার্য্য নির্ব্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্য্যাদা রক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেক। বিশেষতঃ রাজা রামচন্দ্র, আমি কোশল রাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া, অনুযোগ করিতে পারেন। অতএব, এ বিষয়ে আর উপেক্ষা বা কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ পাঠান উচিত অথবা, একেবারেই তাঁহার নিকটে সংবাদ না পাঠাইয়া বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য ; তাঁহারাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

সংক্ষিপ্তসার—এদিকে মহর্ষি বাল্মীকি সীতার সেই অবস্থা দেখিয়া এবং লব-কুশের বয়স বারো বৎসর হওয়ায় চিন্তা করিলেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা তাহাতে তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন বলিযা বোধ হয় না। লব-কুশ রাজপুত্র হইয়াও চিরকাল তপোবনে থাকিবে ইহাও সংগত নয়। তাহাদের ধনুর্বিদ্যা ও রাজধর্ম এই দুইটি বিষয় শিক্ষার সময় চলিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় সীতার পুনর্গ্রহণের উপায় চিন্তা করা উচিত। তিনি একবার মনে করিলেন যে, রামকে তপোবনে আনাইয়া নিজে রাজধানীতে গিয়া সীতার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিবেন। কিন্তু তাঁহার মনে পড়িল যে, রাম প্রজানুরঞ্জনের জন্য পূর্ণগর্ভা সীতাকে বনবাস দিয়াছেন ; এখন তাঁহার কথামাত্রেই তিনি তাঁহাকে গৃহে লইবেন কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, কোনো সংবাদ না দিয়া নিশ্চিত থাকা উচিত নয়। এই দুই বালক ভবিষ্যতে অবশ্যই অযোধ্যার রাজা হইবে। এই সময়ে পিতার নিকট যথাযোগ্য উপদেশ না পাইলে ইহারা রাজ্য পরিচালনায় অপটু হইবে। আর রাম তাঁহাকে কোশল রাজ্যের কল্যাণে উদাসীন বলিয়া অনুযোগ করিতে পারেন। সুতরাং

আর কালক্ষেপ না করিয়া রামকে সংবাদ দেওয়া উচিত বা পুর্বে বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের মতামত জানা কর্তব্য।

(৭) সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি, রামের চিত্ত এত চঞ্চল এবং সীতানির্ব্বাসনে শোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকলজ্জার ভয়ে আর ধৈর্য্য অবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া, বিজন প্রদেশ সেবনের নিমিত্ত, নিরতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন; এ জন্যে বলিলেন, অদ্য তোমরা ইচ্ছামত যে কোনও অংশের গান কর; কল্য প্রভাত অবধি, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া, তোমাদের মুখে সমস্ত কাব্যের গান শুনিব। তাহারা, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। সভায় সমস্ত লোক, মোহিত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে, সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম, কবির পাণ্ডিত্য ও রচনার লালিত্য দর্শনে নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাব্য কাহার রচিত, কাহার নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছ? তাঁহারা বলিল, মহারাজ! এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকির রচিত; আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকটেই সমস্ত শিক্ষা করিয়াছি। তখন, রাম বলিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। আজ তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে; তোমাদিগকে আর অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; এখন তোমরা আবাসে গমন কর।

এই বলিয়া, তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় দিয়া, রাম সে দিবস শীঘ্র সভা ভঙ্গ করিলেন, এবং বিশ্রাম-ভবনে প্রবেশ করিয়া. একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া, আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপন সন্তান দেখিলে, লোকের চিত্তে যেরূপে স্নেহের ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই; আমারও, ইহাদিগকে দেখিয়া, ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এইরূপ হইবার কোনও কারণই দেখিতেছি

না। ইহারা ঋষিকুমার; আর যদিই বা ঋষিকুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি। আমি যে অবস্থায় যেরূপে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি দুঃসহ শোকে ও অসহনীয় অপমানভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোনও দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে, তেমন অবস্থায়, প্রাণ ধারণে সমর্থ হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করিয়াছেন, এবং তাহাদের লালন পালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে এত সৌভাগ্য কোনও ক্রমে সম্ভাবিত হইতে পারে না।

সংক্ষিপ্তসার—বালক দুইটিকে দেখার পর হইতেই রামের অন্তর এত চঞ্চল ও সীতানির্বাসনের দুঃখ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি ধৈর্য ধারণ করা অসাধ্য মনে করিয়া সভাভঙ্গ করিয়া নির্জনে থাকিবার অভিলাষে সেদিন অল্প শুনিয়া পরদিন প্রভাত হইতে তাহাদের গান সমস্তটা শুনিবেন জানাইলেন। তাহারা সংগীত আরম্ভ করিলে সকলে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। রামও রচনার উৎকর্ষ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কাব্যের রচয়িতা ও তাহাদের সংগীত শিক্ষাদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা জানাইল যে, এই কাব্য মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত এবং তাহারা তপোবনে থাকিয়া তাঁহার কাছেই এই গান শিখিয়াছে। তিনি কাব্যের অশেষ প্রশংসা করিয়া সেদিনের মতো তাহাদের বিদায় দিলেন। সভা ভঙ্গ করিয়া রাম বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বালকদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইল কেন? তাঁহার অন্তরে বাৎসল্যরসের সঞ্চার হইতেছে। অথচ ইহারা ঋষিকুমার। ঋষিকুমার না হইলেও তাঁহার আশার সম্ভাবনা কোথায়? সীতাকে বনবাস দিলে তিনি শোকে ও অপমানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে তিনি হয় আত্মঘাতিনী হইয়াছেন আর না হয় কোনো বন্যজন্তু তাঁহাকে বধ করিয়াছে। সুতরাং তিনি যে সেই অবস্থায় সন্তান প্রসব করিয়া লালন-পালন করিতে পারিয়াছেন, এইরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র।

(৮) কিয়ৎক্ষণ অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, কুশ ও লব সীতার তনয় বলিয়া, কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি, নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে, হা বৎসে জানকি! ইহা বলিয়া, ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে, একান্ত বিকলান্তঃকরণ হইয়া, অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, সকলেরই হৃদয়ে সীতার শোক এত প্রবলভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিল যে, সকলেই নিতান্ত অস্থির হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, নিরতিশয় অধীরা হইয়া, উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, ঐ দুই কুমারকে কেহ আমার নিকটে আনিয়া দাও; ক্রোড়ে লইয়া, একবার আমি উহাদের মুখচুম্বন করিব; উহারা আমার জানকীর তনয়; উহাদিগকে দেখিয়া, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; হয় তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি উহাদের নিকট যাই; ক্রোড়ে লইয়া, একবার উহাদের মুখচুম্বন করিলে, আমার জানকী শোকের অনেক নিবারণ হইবেক। ঐ দেখ না, উহাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। উহারা সভায় প্রবেশ করিবামাত্র, যেন কেহ আমায় বলিয়া দিল, ঐ তোমার রাজ্যের দুই বংশধর আসিতেছে; সেই অবধি উহাদের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমি, বার বৎসরে, সীতাকে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু উহাদিগকে দেখিয়া, আমার সীতাশোক পুনরায় নূতন হইয়া উঠিয়াছে। হা বৎসে, জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, অদ্যাপি জীবিত আছ, কি এই পাপিষ্ঠ নরলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছ, কিছুই জানি না। এই বলিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কৌশল্যা পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে সযত্ন হইয়া, পুনরায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন, কৌশল্যা, নিরতিশয় অধৈর্য্য হইয়া, বলিতে লাগিলেন, এখনও তোমরা উহাদিগকে আমার নিকট

আনিয়া দিলে না ; না হয় কেহ একবার, লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া, আমার নাম করিয়া বলুক ; লক্ষ্মণ এখনই উহাদিগকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দিবেক।

সংক্ষিপ্তসার—কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইবার পর কৌশল্যার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, লব-কুশ সীতার সন্তান। তিনি তখন সীতার নাম করিয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন। সকলে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিছুক্ষণ সংগীত শুনিবার পর সীতার শোকে সকলেই কাতর হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা নিরতিশয় কাতর হইয়া উন্মত্তার মতো বলিতে লাগিলেন যে, কেহ ঐ কুমারদ্বয়কে তাঁহার কাছে লইয়া আসুক। তিনি উহাদের কোলে করিয়া উহাদের মুখচুম্বন করিবেন। উহারা সীতার সন্তান। উহাদের দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। উহাদের তাঁহার কাছে আনা হউক বা তিনিই তাহাদের কাছে যাইবেন। উহাদের কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিলে তাঁহার সীতা বিচ্ছেদের শোক প্রশমিত হইবে। উহাদের অবয়বে রাম ও সীতার সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সীতার যে শোক কৌশল্যা ভুলিয়াছিলেন কুমারদ্বয়কে দেখিয়া তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছে। সীতা কোথায় আছেন, তিনি জীবিতা কি মৃতা তাহার কিছুই তিনি জানেন না।—এই বলিয়া তিনি পুনরায় মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সকলের যত্নে তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তিনি লব-কুশকে তাঁহার কাছে আনাইবার জন্য লক্ষ্মণকে তাঁহার নাম করিয়া বলিতে বলিলেন।

চরিতকথা

ভাবসম্প্রসারণ

(১) যে অভিমান ও দর্পের বশে……এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল যেগুলি অতি সামান্য ও আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও বিদ্যাসাগরের প্রকৃত পরিচয় দানে সহায়তা করে। বিদ্যাসাগরের সাজাত্যবোধ, আত্মমর্যাদাজ্ঞান ও শ্রমনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। তিনি মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালী ছিলেন। এই বাঙালীত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার আজীবন চটিজুতা ব্যবহারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার যে বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল, তাহা নহে। বাঙালীরা চিরকাল চটিজুতা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এখন বিদেশীদের দেখিয়া প্রাচীন চটি পরিত্যাগ করিয়া সকলেই বুট পরিতে আরম্ভ করিয়াছে—এই পরানুকরণ-প্রিয়তার প্রতিবাদেই তিনি সারাজীবন চটিজুতা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। চটিজুতা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন জুতা কিনিবার যে সামর্থ্য ছিল না তাহা নয়, চটিজুতার বিশেষ গড়নটিকে তিনি যে পছন্দ করিতেন তাহাও নয়। আমাদের দেশের জিনিষ, পিতৃপিতামহগণ এই জিনিষই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, ইহা ব্যবহার করিতে কাহারও লজ্জা হওয়া উচিত নয়। অথচ সেকেলে বা দেশী সস্তা জিনিষ মনে করিয়া উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া যাহারা চটিজুতা পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাদের ব্যবহারের প্রতিবাদেই যেন বিদ্যাসাগরের চটির উপর অনুরাগ জন্মিল। বিষয়টি সামান্য কিন্তু উহা হইতে তাঁহার আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে হয়। কোন এক সুবেশধারী নব্যযুবক ষ্টেশনে নামিয়া নিজের স্যুটকেশটি বহন করিতে অসমর্থ হইয়া 'কুলী' 'কুলী' করিয়া যখন চিৎকার করিতেছিল। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ যুবকের নিকট হইতে স্যুটকেশটি চাহিয়া লইয়া হাতে করিয়া তাহার বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনের এই ঘটনাটির তাৎপর্য ইহা নয় যে, যুবকটির উপর করুণা হওয়াতে তিনি তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। নিজের কাজ নিজে করাতে কোন লজ্জা নাই, কায়িক শ্রম অমর্যাদাকর নহে, শক্তি সামর্থ্য থাকিতে নিজের কাজের জন্য

অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়াই লজ্জার বিষয়—এই কথাটা বুঝাইয়া দিবার জন্যই তিনি মোট বহন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর চটিজুতাশুদ্ধ পা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া কার সাহেবের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন আর যুবকের হাত হইতে মোট কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ঘটনা দুইটি আলাদা কিন্তু উভয় ঘটনাতেই বিদ্যাসাগর চরিত্রের যে দিকটা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা তাঁহার প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ।

(২) বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই সে জিনিষ বাংলাদেশে চলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাংলাদেশের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সেই কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্যই লেখক এই উক্তি করিয়াছেন। সাধারণ লোকে মনে করে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় কেবল উপন্যাস লেখক হিসাবে কিন্তু আসলে তা নয়, তাঁহার পরিচয় আরও ব্যাপক ও গভীর। মাত্র একজন উপন্যাস লেখক দেশের মর্মস্থানকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন করিয়াছেন এমন ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। 'বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটি জিনিষকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিষ বাংলাদেশে চলিতেছে।'

লেখকের উক্তিটি যে অত্যুক্তি নয়, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—যাহার মূলে গ্রীক নাই তাহা জগতে অচল। ঐ বাক্যকেই ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর বলিতেছেন—যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিষ বাংলাদেশে অচল। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া লেখক এই মতটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের প্রথম উপন্যাস লেখক নহেন, তাঁহার পূর্বেও বাংলা ভাষায় অন্য লেখক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় হাত না দেওয়া পর্যন্ত উপন্যাস বাংলাদেশে চলে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার পর হইতেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাস রচনার প্লাবন দেখা দিল। মাসিক পত্রিকার ব্যাপারও একই প্রকার। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে প্রথম মাসিক পত্র সম্পাদক ছিলেন না। বঙ্কিমের পূর্বে কিছু কিছু মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত কিন্তু বঙ্কিম নিজে মাসিক পত্র সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশে মাসিক পত্র মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারে নাই। উপন্যাস ও মাসিক পত্র উভয়ই বিদেশী জিনিষ; একদেশের গাছ অন্য দেশের জমিতে লাগাইয়া তাহাতে ফসল ফলানো যথেষ্ট কৃতিত্বের

কথা। বঙ্কিমের এই কৃতিত্ব ছিল। নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ বা সাহিত্য রচনার জন্য বঙ্কিমের পূর্বে অনেকেই আহ্বান জানাইয়াছেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন বাঙালী তাহা অনুসরণ করে নাই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে তাঁহার প্রচলিত আদর্শ সকলেই অনুসরণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা চালাইয়াছেন বাংলাদেশে তাহাই চলিযাছে।

(৩) সাহিত্য ধর্মের অধিকার বহির্ভূত নহে।

ধর্মকে কোন সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়া উহাকে একটি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিযা রাখিলে ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝা কঠিন হইতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। যাহা ধরিযা থাছে তাহাই ধর্ম। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনের যাহা অবলম্বন তাহাই ধর্ম। সুতরাং সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের দেশে দেখার উপায নাই। আমাদের শাস্ত্রানুসারে ধর্মকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হইযাছে। এই অশ্বত্থের মূল মৃত্তিকায় নহে এবং ইহা ঊর্দ্ধমুখীও নহে। ধর্মরূপী এই অশ্বত্থের মূল স্বর্গে, দেবলোকে। এই অশ্বত্থ পৃথিবীর দিকে ছড়াইযা পড়িযাছে। ইহার শাখা-প্রশাখায ধর্মরূপ পত্রপল্লব ও ফুলফল শোভিত হইযাছে। বিভিন্ন কর্মের মধ্যদিযা এইখানে ধর্মের ফুল ফুটিতেছে। সাহিত্যও এক ধর্ম। ইহার মধ্যদিয়াও মানবজীবন স্ফূর্তি লাভ করে। সেইজন্য সাহিত্যও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মের অভিপ্রায লোকস্থিতি, সাহিত্যও লোকস্থিতির সহায়ক। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মার যোগসাধন, বিভিন্ন কালের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি—ইহা সাহিত্যের কাজ। সাহিত্যও লোকস্থিতির সহায়ক বলিযাই ইহাকে ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মনে করিতে হইবে। সমগ্র পৃথিবী যখন মন্বন্তরে জলপ্লাবিত হইযা যাইতেছিল তখন স্বয়ং ধর্ম বরাহরূপ ধারণ করিযা পৃথিবীসহ বেদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্ম সাহিত্যের রক্ষকও বটে। এইভাবে দেখা যায ধর্ম ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহাদের একটিকে অন্যটি হইতে পৃথক করিবার উপায় নাই।

নিম্নলিখিত অংশগুলির ভাবার্থ লিখ :

(১) অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট

জিনিষকে বড় করিয়া দেখায় ; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন ; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। দুই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবলপর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

ভাবার্থ—অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ছোট জিনিষকে বড দেখানো হয়। বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার যন্ত্রের প্রচলন হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী বড় জিনিষকে ছোট দেখাইয়া দেয়। তাঁহার সুমহৎ চরিত্রের পাশে আমাদের দেশের অন্য সকল বড় লোককে ছোট বলিয়া মনে হয়—আমাদের বাঙ্গালীত্বের গর্ব ক্ষুদ্র হইয়া যায়। চারিদিকের সমস্ত ক্ষুদ্রতার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্ব একটা অনতিক্রম্য গিরিচুড়ার মতো চিরসমুন্নত হইয়া থাকে।

(২) এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই ; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে ; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই ; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল ঃ বঙ্গদেশে তাহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে

লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে; আমাদের মত যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেইজন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে মনে দ্বিধা জন্মে। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য-জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকটে নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতাপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদায় বিপত্তি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে, অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

ভাবার্থ—বাংলাদেশে এই দুর্বল জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের মত কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহার চরিত্র সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া আপনাকে মহিমায় সমুন্নত রাখিয়াছে। ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, কপটাচার—কোনো কিছুরই নিকট তিনি মাথা নত করেন নাই। যাহাদের জীবনে সংগ্রাম প্রাত্যহিক ব্যাপার তাহাদের মধ্যেই এরূপ পুরুষের আবির্ভাব

সম্ভবপর। আমাদের মতো শক্তিহীন জাতির মধ্যে তাঁহার মতো পুরুষের আবির্ভাব বিস্ময়ের বিষয়। বিদ্যাসাগরের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য-জাতিসুলভ বিবিধ গুণ ছিল। ইউরোপীয় চরিত্রের পৌরুষ সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে না থাকিলেও বিদ্যাসাগরের চরিত্রে ছিল। তাঁহার বাল্যজীবন—প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জীবনই নিজের বা পরের জন্য সংগ্রাম করিয়া কাটিয়াছিল। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্র গঠনে সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু পুরুষানুক্রমে তিনি রক্তের মধ্যে এমন একটা বীর্য লাভ করিয়াছিলেন যাহার বলে তিনি বীরের মতো সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন। জীবনে দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তি যথেষ্টই আসে; কিন্তু সেই সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যাইবার মতো পৌরুষের দৃষ্টান্ত বাঙ্গালীর মধ্যে নিতান্তই বিরল।

(৩) পাশ্চাত্ত্য দেশে ফিলানথ্রপি নামে একটি পদার্থ আছে; তাহার বাঙ্গলা নাম মানবপ্রীতি। এই মানবপ্রীতি কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে; সমস্ত মানবসমাজ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিক্যাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। এই লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগদিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার, কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোকহিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, প্রাচ্যদেশে তাহার তুলনা মিলে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভিতর এমন একটা স্ফূর্ত্তি রহিয়াছে, যেন তাহা আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয় এবং অন্য কোন মূর্ত্তিধারণের সুবিধা না পাইলে, এই মানবপ্রীতির ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। যে স্ফূর্ত্তির বশে ইংরাজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনটাকে অবলীলা-ক্রমে বিসর্জ্জন দেয়, এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে; আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া, অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি

সহিতে না পারিয়া, পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। পরের উপকার যেন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; আপনার নিজত্বের অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক।

ভাবার্থ—পাশ্চাত্ত্য দেশে যাহাকে ফিলান্থ্রপি বলে, সেই মানবপ্রীতি কোনো সংকীর্ণ সমাজে আবদ্ধ থাকে না। ইহা সমগ্র মানবসমাজে রাজ্য-নির্বিশেষে প্রসারিত। লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া সমগ্র বিশ্বময় অজস্রভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহার জন্য স্বার্থত্যাগের সীমা নাই। এই লোকহিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে যাহা আছে তাহা প্রাচ্যদেশে দেখা যায় না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মধ্যে এমন একটা স্ফূর্তি আছে যাহা আপনাকে মানবপ্রীতি বা বিশ্বহিতৈষণার রূপে প্রকাশিত করিয়া দেয়। ইহারই প্রেরণায় ইংরাজ যুবক নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবন বিসর্জন দেয়। এই পরহিতৈষণার মূলে ব্যক্তিচরিত্রের স্ফূর্তি আছে—প্রাণের উচ্ছলতা যেন আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পরোপকারের চেয়ে আত্মপ্রকাশনাই ইহাদের অধিকতর পরিচায়ক বলা যায়।

(৪) বিদ্যাসাগর এইরূপ ফিলানথ্রপিষ্ট বলা চলে না। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই, যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্ব্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার

হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব-ঘটিত ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

ভাবার্থ—বিদ্যাসাগরকে পাশ্চাত্ত্য ভাবের মানবপ্রেমিক বলা চলে না। তাঁহার লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ধরণের—ইহা নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র বা সমাজশাস্ত্রের মুখাপেক্ষী ছিল না। এমন কি তাঁহার লোকহিতৈষণার অনেক কাজ আধুনিক সমাজতত্ত্ব অনুমোদন করিবে না। দুঃখ দেখামাত্রই তাহার প্রতিবিধানের কথা আধুনিক সমাজতত্ত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু কাহারও দুঃখ দেখিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন—তাহাতে কাহার ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে সে জটিল প্রশ্ন লইয়া চিন্তা মাত্র করিতেন না। বস্তুতঃ, দুঃখের সম্মুখীন হইবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব দূরীভূত হইয়া যাইত—তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মানবপ্রীতি প্রকৃতিতে অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

নিম্নলিখিত অংশগুলির সারসংক্ষেপ লিখ ঃ—

(৫) রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শন-মাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবাহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে

কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম; বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না কিন্তু প্রাচ্যদেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেন; কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময় ঘেঁষিতে পারিত না। বায়ুপ্রবাহে দ্রুত-সানুমানের মধ্যে দ্রুমের চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান্ চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি দ্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান্‌ই বিদ্যাসাগরের সহিত তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহে সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসার-তাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে সেই জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

সংক্ষিপ্তসার—বিদ্যাসাগর মহাশয় রামায়ণ ও উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নায়ক রামচন্দ্র অল্পেই অশ্রু বিসর্জন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতেও দেখা যায় যে, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের বাহিরটা বজ্রের মতো কঠোর হইলেও অন্তরটা ছিল কুসুম-সুকুমার। রোদন সাধারণতঃ নিন্দিত ব্যাপার। কিন্তু ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। বিদ্যাসাগর নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, কিন্তু তিনি পরের জন্য অশ্রু বিসর্জন

না করিয়া পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখ বা বান্ধবের মৃত্যু-সংবাদে তিনি কাতর হইতেন—জ্ঞান বা বৈরাগ্যের উপদেশে কোনো ফল হইত না। বায়ুপ্রবাহে পর্বত টলে না, বৃক্ষই কম্পিত হয়—এজন্য বৃক্ষের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু পর্বত হইতে জলধারা নিঃসৃত হইয়া পৃথিবী ও জীবকুলকে রক্ষা করে—এদিক দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্বতের সহিত তুলনীয়। যে দেশের ভূভাগ গঙ্গার পুণ্যস্রোতে যুগ যুগ ধরিয়া শস্যসমৃদ্ধ, রামায়ণের পুণ্যগাথা যে জাতির হৃদয় যুগ যুগ ধরিয়া জুড়াইয়া আসিয়াছে সেই দেশে সেই জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব স্বাভাবিক।

(৬) এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁহারা বলেন, মানব-সমাজের সুখদুঃখ, রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি ও ভালবাসাবাসি যথাযথরূপে চিত্রিত করাই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য ; উহাতে কল্পনার খেলার অবসর নাই। ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। আর এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, পাপপুণ্যের ফলাফলের তারতম্য দেখাইয়া সমাজের নীতিশিক্ষার ও ধর্মশিক্ষার বিধানই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে সফলতা দেখিয়াই নবেলের উৎকর্ষ বিচার করিতে হইবে। ইঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে যেমন ভট্টিকাব্য, ইঁহাদের মতে ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে তেমনি নবেল ; কাব্যের ছলনা করিয়া পাঠকগণকে কাঁদানই নবেল-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবসমাজের যথাযথ চিত্র আঁকিতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন ; আর নীতিশাস্ত্র অতি সাধুশাস্ত্র, ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা মনে করিয়া লইতে পারি—নবেলও এক কাব্য এবং সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। কেবল নীতিশাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শনশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টি যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।

সংক্ষিপ্তসার—এক শ্রেণীর সমালোচক মানবজীবনের সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে রূপায়িত করাকেই উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন ; ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। আর এক শ্রেণীর সমালোচক উপন্যাসকে ধর্ম ও নীতিশিক্ষার উপায়মাত্র বলিয়া মনে করেন ; ইঁহারাও

বঙ্কিমচন্দ্রকে তেমন ভাল বলেন না। ইঁহাদের মতে কাব্যের ছলনা করিয়া ধর্ম বা নীতি উপদেশ দেওয়াই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। মানবসমাজের চিত্র-অঙ্কনে নৈপুণ্য প্রয়োজন ; নীতিশাস্ত্রও প্রশংসনীয় বটে। তবে মনে রাখা উচিত যে, উপন্যাসও একপ্রকার কাব্য এবং সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রাণস্বরূপ। নীতিশাস্ত্র —এমন কি দর্শনশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রকে উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় বলিলেও ক্ষতি নাই—তবে বিষয়টি সুন্দর না হইলে কাব্য হয় না।

(৭) আজিকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃশ্যহস্ত আমাদের জাতীয় জীবনকে যেরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যতই উচ্চস্থানে অবস্থান করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য মূর্ত্তির পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আজ ব্যগ্র হইব, ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র কত দিক্ হইতে আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার গণনা দুষ্কর। ইংরাজীতে একটা বাক্য চলিত হইয়াছে, যাহার মূলে গ্রীক্ নাই, সে জিনিস জগতে অচল। বলা বাহুল্য, এখানে জগৎ অর্থে কেবল পাশ্চাত্ত্যদেশ বুঝায়। আমরা যদি ঐ বাক্যকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলি যে, যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিষ বাঙ্গালাদেশে অচল,—তাহা হইলে নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। ইংরাজী গতিবিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে,—মোমেণ্টাম ; বাঙলায় উহাকে 'ঝোঁক' শব্দে অনুবাদ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটা জিনিষকে 'ঝোঁক' দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিস বাঙলাদেশে চলিতেছে। সেই জিনিষগুলা গতি উপার্জ্জন করিবার জন্য যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল ; বঙ্কিমচন্দ্র হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন, আর উহা চলিতে লাগিল,—তাহার পর আর থামে নাই।

সংক্ষিপ্তসার—বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে অত্যুচ্চ স্থানের অধিকারী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার প্রভাব যে আজ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবনকে পরিচালিত করিতেছে, সে কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জীবনকে বহুভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে যে, যাহার মূলে গ্রীক নাই, তাহা অচল। আমরা বলিতে পারি, যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র

নাই, সে জিনিষ বাংলাদেশে অচল। গতিবিজ্ঞানে 'মোমেণ্টাম' বলিয়া একটি শব্দ আছে—উহাকে বাঙ্গালায় 'ঝোঁক' বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যে-কয়েকটি জিনিষকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন কেবল সেইগুলিই চলিতেছে। বঙ্কিমের নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া ঐগুলি চলিতেছে—আর থামে নাই।

(৮) বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার কোন্ কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, অন্য কেহই সেইরূপ হন নাই। বিদেশের ভাষা অবলম্বন করিয়া আমরা যে বড় হইতে পারিব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়া বড় হইবার চেষ্টা যে অস্বাভাবিক ও উপহাস্য, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুপূর্ব্বে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের লোকের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য দেশের ভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন; তিনি বাঙ্গালায় সাময়িকপত্র প্রচার করেন, বাঙ্গালায় বেদান্তশাস্ত্র প্রকাশ করেন; দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইবার জন্য দেশের লোকের অবোধ্য ভাষায় দেশের লোককে সম্বোধনের অদ্ভুত প্রণালী, তাঁহার স্থিরবুদ্ধি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এমন কি, তিনিই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালাভাষার প্রথম শেষ ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী বাঙ্গালীরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই; হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, হিন্দুস্থানের হিন্দুসন্তানের আশ্রয় বা অবলম্বন, হিন্দুসন্তানের জ্ঞাতব্য বা রক্ষিতব্য কিছুই নাই। বর্ব্বর জাতির প্রাচীন সাহিত্যে ক্ষীরসমুদ্র ও দধিসমুদ্রের কথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই সিদ্ধান্ত করিয়া লর্ড মেকলে এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আনয়ন করিলেন। বিদেশের এই নূতন আমদানি শিক্ষাকে এদেশের লোকে সমাদরে গ্রহণ করিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল যে, এই বর্ব্বরের ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা হইবে। ইংরাজীশিক্ষার প্রথম ধাক্কায় আমাদিগকে ঘর

হইতে বাহিরে লইয়া পরের দ্বারে ভিক্ষার্থিবেশে স্থাপিত করিয়াছিল ; বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে ডাকিয়া আনেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালাভাষাকে সংস্কৃত করিয়া উহাকে সাহিত্য-সৃষ্টির উপযোগী করিয়াছিলেন ; বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে পুনঃসংস্কৃত করিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজী লিখিয়া যশস্বী হইবার অস্বাভাবিক দুরভিলাষের বন্ধন হইতে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন।

সংক্ষিপ্তসার—বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো কাজ এই যে, তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন—এই কার্যেই তিনি সফল হইয়াছেন। বিদেশী ভাষা বা বিদেশী সাহিত্য যে আমাদের বড়ো করিতে পারে না, বঙ্কিমচন্দ্রই তাহা আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বহু পূর্বে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের লোকের আলোচনার জন্য বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন—দেশের অবোধ্য ভাষায় দেশের লোককে সম্বোধন করার কথা তিনি সংগত মনে করেন নাই। একমাত্র তিনিই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুর সংস্কৃতি হইতে কিছুই যে জানিবার নাই ইহা যেন স্থির হইয়া গেল। এদেশের সাহিত্যকে বর্বরের সাহিত্য আখ্যা দিয়া লর্ড মেকলে এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তন করিলেন—এদেশের লোকেরাও সেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বর্বর ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি ব্যর্থ হইবে মনে করিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ধাক্কায় আমরা পরের দ্বারে ভিখারী হইয়াছিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের আপন ঘরে ফিরাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষাকে মার্জিত করিয়া সাহিত্যের উপযোগী করিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র উহাকেই আবার মার্জিত করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া ইংরেজিতে লিখিয়া যশস্বী হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন।

(৯) বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিষ বাঙ্গালাদেশে চলে না। রামমোহন রায় বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে বাঙ্গালাসাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই ; তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুণ্যতোয়ে বাঙ্গালাভাষাকে স্নান

করাইয়া, তাহার দৃপ্তকলেবর শিক্ষিতসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন ; কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্ম্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

সংক্ষিপ্তসার—বঙ্কিমচন্দ্র মূল না হইলে বাংলাদেশে কিছু চলে নাই। রামমোহন বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির যে প্রয়াস করিয়াছিলেন পরবর্তী কালের শিক্ষিত বাঙালী তাহার বিরুদ্ধতা করিযাছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পুণ্যস্থান করাইয়া শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে আনিযাছিলেন কিন্তু শিক্ষিত সমাজ তাহার সমাদর করেন নাই। রামমোহন বা ঈশ্বরচন্দ্রের কৃতিত্ব বা মহত্ত্বের কথা অস্বীকার না করিয়াও একথা বলা যায় যে, তাঁহারা যে-কার্যে সফল হন নাই, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা আপনার প্রতিভার বলে অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

(১০) যাহার নাম ধর্ম্ম, তাহাই স্বভাব এবং স্বভাবের নামান্তরই 'স্বাস্থ্য'। স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি এবং আমার বিবেচনায় আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জাবোধ করি না ; আমরা স্বদেশীকে বিদেশীয় ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না। এই সকল অস্বাভাবিক আচরণ আমাদিগকে সর্ব্বত্র অশোভন ও অসমঞ্জস করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি নিজ জীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। যাঁহারা তাঁহার জীবনের আখ্যান জানেন, তাঁহারাই বলিবেন, এই অস্বাভাবিকতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি উৎকট ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সেদিন 'সঞ্জীবনী'-পত্রিকায় পড়িতেছিলাম,

—'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপ্রচারকালে ইংরেজি বাগ্মিতার প্রশ্রয়-দাতা ছিলেন না।' এই একটি আচরণেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার বিরোধিরূপে দেখিতে পাই, অন্য উদাহরণের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

সংক্ষিপ্তসার—ধর্মই স্বভাব, স্বভাবই স্বাস্থ্য ; স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি। বিদেশের আক্রমণে আমাদের দেশে যে অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে তাহাই আমাদের ব্যাধি—ইহা আমাদের পক্ষে উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে। আমরা বিদেশী পরিচ্ছদ ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হই না, বিদেশী ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে স্বদেশীয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে লজ্জা বোধ করি না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজের জীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার জীবনের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন যে, এই অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তাঁহাকে কী ত্যাগই না স্বীকার করিতে হইয়াছিল। 'সঞ্জীবনী'-পত্রিকায় পড়িতেছিলাম যে, মহর্ষি ইংরেজীতে বাগ্মিতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার এই একটি আচরণেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, তিনি সকল প্রকার অস্বাভাবিকতার বিরোধী ছিলেন।

(১১ ব্যাক্‌টীরিয়ার নাম আজ লোকের মুখে মুখে ;—বিশেষ সম্প্রতি কলিকাতা সহরে ওলাউঠা ও বসন্তের এই প্রকোপকালে। সম্প্রতি কলিকাতার অর্দ্ধেক লোক বসন্তের টীকা লইল ; বাকি অর্দ্ধেক হয়ত দুই দিন পরে ওলাউঠার টীকা লইবে। যেরূপ হাওয়ার গতি দেখিতেছি, তাহাতে কিছুদিন পরে কুক্কুর-দংশনেও টীকা লইতে হইবে ; ইহা বোধ করি বিধাতার বিধান,—ভবিতব্য। বস্তুতঃ শ্বাপদসমাকুল অরণ্যানী আর মানুষের ভয়বিধায়িনী নহে ; শয্যাতলে লুক্কায়িত কালভুজঙ্গও আর যমদূতী নহে ; এখন স্থূলদৃষ্টির অগোচর কমা-বাসিলাস অথবা দাঁড়ি-ভিব্রিও কখন্ কোন অলক্ষিতে দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া অকস্মাৎ অন্তরাত্মাকে তাহার প্রিয়তম আধার হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কাতেই অন্তরাত্মা একরকম পূর্ব্ব হইতে ওষ্ঠ-প্রান্তে অবস্থিত থাকেন। প্রকৃতই আজকাল 'শঙ্কাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তম্'।

জীবিতব্য কিরূপে তাহা ভাবিবার দরকার নাই ; জীবন যে এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য।

সংক্ষিপ্তসার—বাক্‌টীরিয়ার নাম এখন সকলেই শুনিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় অর্ধেক লোক বসন্তের টীকা লইয়াছে—বাকি অর্ধেক লোক হয়তো কিছুকাল পরে ওলাউঠার টীকা লইবে। হয়তো কিছুকাল পরে কুকুরে কামড়ানোরও টীকা লইতে হইবে। এখন আর মানুষ হিংস্র জন্তুসমাচ্ছন্ন ঘন বন বা সর্পকেও ভয় করে না। এখন দৃষ্টির অগোচর কমা-ব্যাসিলাস প্রভৃতি বীজাণু কখন্ অলক্ষ্যে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ সংশয় করিবে এই আশঙ্কায় প্রাণ যেন পূর্ব হইতেই ওষ্ঠাগত হইয়া থাকে। বর্তমানে সকলেই শঙ্কায় ব্যাকুল। কিভাবে বাঁচিতে হইবে তাহা ভাবা নিষ্প্রয়োজন, এ পর্যন্ত যে বাঁচিয়া আছি তাহাই আশ্চর্য।

(১২) শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ ছুরিকার সাহায্যে মনুষ্যের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার কোথায় কি আছে, সন্ধান করিয়া দেখেন ; এবং সেই অনুসন্ধানে কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু সেই শবদেহের প্রতি তাঁহাদের যে বিশেষ একটা অনুরাগ জন্মে, তাহা বলা যায় না। আপনার কাজটা সারিয়া ফেলিয়াই তাঁহারা বিবিধ 'ডিস্‌ইনফেক্টাণ্ট্' প্রয়োগে আপনার শরীরের অশুদ্ধি, ছুরিকার অশুদ্ধি ও টেবিলের অশুদ্ধি তাড়াতাড়ি শোধনের জন্য ব্যস্ত হয়েন। দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকের কার্য্যকে কতকটা এইরূপ শবব্যবচ্ছেদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা এই মৃতজাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া, তাহা হইতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া, যথেষ্ট আনন্দ বা কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন ; কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাঁহাদের পক্ষে কতটা প্রীতিকর হয়, তাহা বলিতে পারি না। আচার্য্য মক্ষমূলর কিন্তু ইহাকে ঠিক্ শবদেহ বলিয়া ভাবিতেন না। অন্ততঃ এই দেহের ধমনীগুলির মধ্যে এককালে রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হইত এবং ইহার হৃৎপিণ্ড এককালে প্রাণের শক্তিযোগে স্পন্দিত হইত, ইহা তিনি

বুঝিতেন ; এবং বাক্যের দ্বারা ও কার্য্যের দ্বারা তাঁহার এই মনোভাবের পরিচয় দিতেন। সুতরাং আমরা সেই স্বর্গগত আচার্য্যের নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ।

সংক্ষিপ্তসার—শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া অনুসন্ধান করিযা নূতন তথ্য আবিষ্কারের পরমানন্দ লাভ করেন। শবদেহের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র মমতা থাকে না—তাঁহারা কাজটা সারিয়া ফেলিয়াই প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আপনার শরীরের অশুদ্ধি, ছুরিকার অশুদ্ধি ও টেবিলের অশুদ্ধি দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইযা পড়েন। যে সকল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের কাজ এই শব-ব্যবচ্ছেদের সহিত তুলনীয়। তাঁহারা এই মৃতজাতির দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করিযা আনন্দ বা কৌতুক বোধ করেন—কিন্তু ইহার স্পর্শ তাঁহাদের কাছে প্রীতিকর হয না। কিন্তু অধ্যাপক মক্ষমূলর ইহাকে শবদেহ বলিয়া মনে করিতেন না। ইহার মধ্যে যে এককালে প্রাণশক্তি ছিল তাহা তিনি বুঝিতেন ও সেইভাবে আচরণ করিতেন। আমরা সেজন্য এই স্বর্গত আচার্যের কাছে চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ।

(১৩) বলেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনে যে বিশিষ্টতা ছিল, সেই বিশিষ্টতার গঠনকর্ম্মে, তাঁহার পিতৃব্যের কতটুকু কৃতিত্ব ছিল, আমরা বাহির হইতে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। তবে রবিরশ্মির প্রভাব হইতে আপনাকে আচ্ছন্ন রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। অথবা বাঙ্গালার সাহিত্য জগতের বহু গ্রহ, উপগ্রহ ও বহুতর উল্কাপিণ্ড যাঁহার নিকট হইতে স্থায়ী বা ক্ষণিক প্রভা সংগ্রহ করিয়া দীপ্তি লাভ করিতেছে, বলেন্দ্রের মত অনুগামী ও অনুচরে তাঁহার জ্যোতির আংশিক প্রতি-ফলনে ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু নাই। বরং এত সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তিনি যে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার সামর্থ্যের বিশিষ্টতা। গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনায় তাঁহার এই নিজস্ব শক্তির স্পষ্টতর পরিচয় মিলে। তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মূল্য তাঁহার গদ্য রচনার সমান না হইতে পারে ; কিন্তু ইহাতে তাঁহার নৈসর্গিক শক্তির স্বাতন্ত্র্যের অধিক স্ফূর্ত্তি আনে। অন্ততঃ আধুনিক

বঙ্গের অধিকাংশ কবির মত তিনি রবি-প্রতিভায় অভিভূত হন নাই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, সেই সাহিত্যের প্রভাবে তিনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া তিনি আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্তসার—বলেন্দ্রনাথের জীবনের বিশিষ্টতার গঠনকর্মে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা ছিল তাহা বলা কঠিন। রবির আলোক হইতে নিজেকে আচ্ছন্ন রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের দীপ্তি বাংলার ছোটো-বড়ো অগণিত সাহিত্যিকের মধ্যে এমনভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে যে, তাঁহার মধ্যে তাহার আংশিক প্রকাশে ক্ষুণ্ন হওয়া নিষ্প্রয়োজন। বরং রবীন্দ্রনাথের এত কাছে থাকিয়াও তিনি যে নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন। তাঁহার গদ্য রচনার চেয়ে কবিতাগুলিতেই ইহা স্পষ্টতর। তাঁহার কবিতা গদ্যের মতো মূল্যবান্ না হইলেও স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। ইহার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নাই। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন—উহা আত্মসাৎ করিয়া, তিনি আপনার স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

সংকল্প ও স্বদেশ

উদ্ধৃত কাব্যাংশগুলির ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ—

(১) —ওরে তুই ওঠ আজি !
আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি

. ...

দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। (পৃঃ ১১—১২)

সারাদেশে যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছে—জগৎ জুড়িয়া কাহার শঙ্খনাদ ! কোথায় ক্রন্দনধ্বনি শোনা যাইতেছে—অনাথা আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। শক্তিমান দুর্বলের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ্ গ্রাস করিতেছে। স্বার্থ যথেচ্ছ পীড়ন করিতেছে। ক্রীতদাস ভীত হইয়া আত্মগোপন করিতেছে। ইহাদের মুখে ভাষা নাই—ইহারা যুগ যুগ ধরিয়া অজস্রবিধ অত্যাচার ও পুঞ্জীভূত দুঃখ আপনার শিরে বহন করিয়া চলিয়াছে এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে সন্তান-সন্ততিদের দিয়া আসিয়াছে। এজন্য তাহারা অদৃষ্টকে গঞ্জনা দেয় না, দেবতাকে ইহার জন্য নিন্দা করে না, মানুষের উপর কোনো দোষারোপ করে না—তাহারা নির্বিকারচিত্তে কোনোমতে দুই মুঠা অন্ন সংগ্রহ করিয়া জীবন যাপন করে। যখন কোনো দাম্ভিক, অত্যাচারী নিষ্ঠুরভাবে তাহার সেই অন্নটুকু কাড়িয়া লয়, তখন সে বিচারের দাবির কথা ভুলিয়া একবার ভগবানকে ডাকে এইমাত্র।

এইখানে কবি একান্ত আবেগের সহিত নিপীড়িত দরিদ্র জনগণের নিদারুণ দুঃখ, দারিদ্র্য এবং অসহায়তার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কবির আন্তরিকতা এখানে সমস্ত কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া সবলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই অবস্থায় কাহারও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার অধিকার নাই, সকলকেই কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া এই অবস্থার মূল কারণ উন্মূলিত করিতে হইবে—ইহার জন্য কবি যেমন আপনাকেও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, তেমনই সকলকে আহ্বান জানাইতেছেন।

(২) এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
... ...
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি। (পৃঃ ১২)

দীন-দরিদ্র দুর্বল মানুষ বহুযুগ ধরিয়া সবলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। এখন ইহাদের মুখে ভাষা দিয়া, অন্তরে সাহস সঞ্চার করিয়া ইহাদিগকে প্রতিবাদে মুখর করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাদের সকলকে একত্র হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে বলিতে হইবে। ইহাদের এই শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন জানে যে, যে-অন্যায়কারী অত্যাচারীর ভয়ে সে কাতর, সে তাহারও চেয়ে ভীরু—তাহারা যদি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে ভয়ে পলাইতে পথ পাইবে না। যে অন্যায় করে, স্বয়ং দেবতা তাহার প্রতি বিমুখ—মুখে দর্প প্রকাশ করিলেও আপনার দুর্বলতা সম্পর্কে সে সচেতন।

কবি আপনাকে তাঁহার সমগ্র প্রাণ দিয়া তাহাদের জাগাইয়া তুলিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই অগণিত নরনারীর জীবনে দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, বেদনার সীমা-পরিসীমা নাই। ইহাদের অন্ন, প্রাণবায়ু, আনন্দময় জীবন ও সাহস দিতে হইবে। কবির অন্তরে অত্যাচারিত দরিদ্র জনগণের প্রতি যে মমতা সঞ্চারিত হইয়াছে তাহারই প্রেরণায় তিনি তাহাদের মধ্যে মানবশক্তি সঞ্চার করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার সমবেদনাশীল কবিকল্পনা দৈন্যপীড়িত দুর্বল মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়া সর্বাঙ্গীণ জাগরণের চিত্রটি উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কন করিয়াছে।

(৩) আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠি অলংকার রাশি
... ...
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন। (পৃঃ ২৫)

অলস ভাববিলাসের মধ্যে শ্রেয় নাই। কর্মই মনুষ্যত্বের বিকাশের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সেইজন্য কবি ভক্তিরসের মধ্যে অবগাহন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন নাই। তিনি কর্তব্যকর্ম করিবার গুরুভার আপনার স্কন্ধে বহন

করিতে চাহেন। এই কর্মসংক্ষুব্ধ সংসার যুদ্ধক্ষেত্রের মতোই সংঘাতময়। কবি পৃথিবীর সেই অজস্রবিধ দুঃখ ও তাপের সাধনা স্বেচ্ছায় বরণ করিতে চাহেন। এই রণক্ষেত্রে সংগ্রামের জন্য তিনি বিধাতার নিকট হইতে অস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন। বিধাতার আশীর্বাদ ও ভগবদ্দত্ত চারিত্রিক দৃঢ়তা লইযাই তিনি বিশ্বের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারিবেন। তিনি সেই দুরূহ সাধনায় ব্যর্থকাম হইতে পারেন—ঘোর প্রতিকূলতা তাঁহাকে তীব্র আঘাত দিতে পারে; কিন্তু তবুও তিনি সেই নিষ্ফলতা ও আঘাতকে বিধাতার দান বলিযা প্রশান্তচিত্তে স্বীকার করিযা লইতে দ্বিধাবোধ করিবেন না। ঈশ্বরের কর্ম করিয়াই তিনি ধন্য হইবেন।

এই কবিতার মধ্যে কবির কর্মপ্রেম ভগবৎপ্রেম একই সঙ্গে ব্যক্ত হইযাছে। কবি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন—কিন্তু অলস ভাবকল্পনার মধ্যে ডুবিয়া থাকা তাঁহার কাম্য নয। কর্মব্রত পালন করিবার একান্ত কামনা কবিতাটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত—ইহাই কবিতাটিতে অপূর্ব শক্তি সঞ্চার করিযাছে।

(৪) তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
... ...
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। [পৃঃ ৩১]

বিধাতা প্রতি মানুষের হাতে ন্যাযবিচারের, সত্যপ্রতিষ্ঠার অধিকার দিয়াছেন। পৃথিবীতে যে-নীতি প্রচলিত, তাহা রক্ষণ করিবার ভার সকলের উপরই সমর্পিত, যদি কেহ সেই নীতি লঙ্ঘন করে, যদি কেহ অন্যায আচরণ করে, তাহা হইলে তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কবি ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার সেই গুরু দাযিত্ব সবিনযে আপনার মাথায় গ্রহণ করিতে চাহেন। বিধাতার অভিপ্রায সাধন করিবার সময তিনি যেন কাহাকেও ভয না করেন।

যেখানে ক্ষমা দুর্বলতার নামান্তর, সেই অন্যাযের ক্ষেত্রে তিনি রুদ্রের আদেশে যেন নিষ্ঠুর হইয়া অন্যায়কারীকে দমন করিতে পারেন। বিধাতার ইঙ্গিতে যেন তাঁহার মুখে সত্যবাক্য বাহির হইয়া ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হয। বিধাতার এই বিচারক্ষেত্রে তিনি যেন বিধাতার সম্মান রক্ষা করিতে পারেন। যে অন্যায করে আর যে সেই অন্যায সহ্য করে, বিধাতার ঘৃণা যেন তাহাদের তিলে তিলে দগ্ধ করে।

কবির অন্তরে সত্যের পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি সত্যের মর্যাদা, ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য বিধাতার কাছে শক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। বিধাতার উপর নির্ভর ও সেইসঙ্গে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কবিতাটিকে তেজোময় করিয়া তুলিয়াছে। শেষ দুইটি ছত্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সুভাষিত উক্তি-গুলির অন্যতম।

(৫) তব কাছে এই মোর······রাখিবারে স্থির। [পৃঃ ৪২]

কবি সমস্ত দীনতা পরিহার করিয়া আপনার মধ্যে কঠোর বীর্যলাভের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহার অন্তরে যেটুকু ক্ষীণতা, যেটুকু দুর্বলতা আছে, ভগবান যেন তাহা সবলে তাঁহার অন্তর হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেন। তিনি নিছক সুখাবেগ চাহেন না—বীর্যলভ্য কঠোর সুখই তাঁহার কাম্য। দুঃখের মধ্যেও তিনি এমন বীর্য চাহেন যাহাতে তিনি হাসিমুখে সমস্ত দুঃখ উপেক্ষা করিতে পারেন। তিনি ভক্তির মধ্যে এমন বীর্য চাহেন যে, এই বিশ্বের কর্মযজ্ঞের মধ্যে তাহা যেন সার্থক হইয়া উঠিতে পারে—তাঁহার স্নেহ-প্রীতি সবই যেন পরম পুণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তিনি অন্তরের মধ্যে এমন বীর্য চাহেন যাহার বলে তিনি শক্তির মদমত্ততা উপেক্ষা করিতে পারেন—অথচ দুর্বলকে যেন হীন জ্ঞান না করেন। আপনার অন্তরকে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা হইতে উর্ধ্বে তুলিয়া রাখিবার জন্য তিনি বীর্য ভিক্ষা করিয়াছেন—বিধাতার চরণে শির নত করিয়া আপনাকে স্থির রাখিবার জন্য তিনি বীর্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যে-সত্য সংকল্প ছিল, তাহা দুর্বলের সাধনার বস্তু নহে। তাহা সাধন করিবার জন্য অমিতবীর্যের প্রয়োজন। এই কবিতাটিতে তাঁহার সেই বীর্যপ্রার্থনা ও জীবনের প্রতি তাঁহার সত্যদৃষ্টি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম।

নিম্নলিখিত অংশগুলির ভাবার্থ লিখ ঃ—

(৬) আমি ভালবাসি, দেব, এই বাঙলার
দিগন্ত প্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার

··· ··· ··· ···

সব ছেড়ে যেতে পারি দুঃখে ও মরণে। (পৃঃ ৩২)

আমি এই বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ইহার সুদূর প্রসারিত ক্ষেত্রগুলিতে এক উদার প্রশান্তি নিত্য বিরাজমান। এখানে উন্মুক্ত নীল আকাশে অনাবৃত আলো যেন ভৈরবী রাগিণীতে বৈরাগ্যের সুর জাগাইয়া তুলে। বাংলার নদীতটে তরঙ্গ আসিয়া পড়িয়া একটি মধুর ধ্বনিতরঙ্গ জাগাইয়া তোলে। তরুচ্ছায়াশীতল পল্লীর গৃহে গৃহে একটি স্নেহের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এইখানে আমার যে গৃহ, তাহা যেমন আকাশ, বাতাস ও আলোকে সমৃদ্ধ, তেমনই সন্তোষ, কল্যাণ ও প্রেমে পরিপূর্ণ। বিধাতার দূত যখনই আহ্বানবাণী লইয়া আসিবেন, তখনই যেন প্রসন্ন মনে সব কিছু ছাড়িয়া দুঃখের মধ্যে এমন কি মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি।

এই কবিতায় কবির স্বদেশপ্রেম ও ভগবদ্‌প্রেমের যুগপৎ মিলন সাধিত হইয়াছে। কবি এই বাংলার স্নিগ্ধ উদার পরিমণ্ডলের কথা স্মরণ করিয়াছেন—সেই সঙ্গে ইহা যে বিধাতারই দান এবং বিধাতার আহ্বানে যে তাঁহাকে সুখনীড় ত্যাগ করিয়া দুঃখ ও মৃত্যুবরণ করিতে যাত্রা করিতে হইবে এই বোধটিও তাঁহার অন্তরে সদাজাগ্রত। কবিতাটির মধ্যে সকল প্রশান্তির সহিত সহজ ভক্তির সুর মিশিয়া গিয়াছে। ফলে, কবিতাটি সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করে।

(৭) বাসনারে খর্ব করি দাও হে প্রাণেশ।

... ...

ভাসাইয়া আপনারে সহজের স্রোতে।

[পৃঃ ৩৯]

বাসনা মানুষকে সত্যের পথে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। সে তাহার সামান্য ইচ্ছাটুকু পূরণ করিবার জন্য বৃহৎ সত্যের সহিত বিরোধ করিতে দ্বিধাবোধ করে না। এই বিশ্বকে উপেক্ষা করিয়াই যেন তিলমাত্র বাসনা আপনাকে পরিতৃপ্ত করিতে উদ্যত হয়।

কবি ভগবানের কাছে এই দুর্বার বাসনা দূর করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তাঁহার অন্তরে বাসনা দূর হইয়া যেন এক মহাসন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত এক বিমল সন্তোষের ধারা এই বিশ্বের উপর অনুক্ষণ ঝরিতেছে—এই সর্বজনলভ্য অমূল্য সুখই সকলের চেয়ে দুর্লভ—কারণ বাসনা ইহাকে পাওয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখে। এই বিশ্বের জল-স্থল, আকাশে যে সহজ সুখ পরিব্যাপ্ত, তা কী করিয়া কবির চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইবে—সহজের

সুখে ভাসিয়া কবি কী করিয়া জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিবেন ইহাই চিন্তা করিয়াছেন।

কবি সন্তোষকে পরম ধন বলিয়া জানিয়াছেন—ইহাই বিশ্বব্যাপী পরম সুখের সন্ধান দিতে পারে। কবিতাটির ছত্রে ছত্রে সন্তোষলভ্য সেই পরম সহজ সুখের স্পর্শ যেন ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

(৮) তোমার মাঠের মাঝে তব নদীতীরে
তব আম্র বনে ঘেরা সহস্র কুটীরে

ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহু পাশে। (পৃঃ ৪৮)

কল্যাণী বঙ্গজননী তাঁহার স্নেহাঞ্চল দিয়া তাঁহার সন্তানদের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ক্লেশ দূর করিয়া দিযাছেন। তাঁহার কাজের শেষ নাই। বাংলার মাঠ, আম্রবনগুণ্ঠিত কুটির, দোহন-মুখর গোষ্ঠ, ছায়াশীতল বনস্পতি, দ্বাদশ দেউল—সর্বত্রই বঙ্গমাতা নিজে অহর্নিশি হাসিমুখে অজস্র কাজ করিয়া চলিযাছেন।

কিন্তু বঙ্গজননীর সন্তানদের এই পৃথিবীতে কোনো কাজ নাই। এই বিশ্ব-সংসারে সে কর্মহীন হইয়া পড়িয়া আছে। বঙ্গজননী সে কথা জানেন না। তিনি তাঁহার সন্তানদের শিযরে জাগিয়া রাত্রিদিন কাজ করিয়া চলিতেছেন, প্রভাত হইবার সময তিনি পুজার ফুল ফুটাইয়া তুলেন—মধ্যাহ্নে আপন পল্লবদল প্রসারিত করিয়া তিনি স্নিগ্ধছায়া রচনা করেন—যখন রাত্রি আসে তখন নদীগুলি যেন ঘুম পাড়ানি গান গাহিয়া ক্লান্ত গ্রামগুলিকে আপনার স্নেহাবগুণ্ঠনের মধ্যে টানিযা আনে।

বাংলার পল্লীশ্রী কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে—বাংলার প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও মনোহর শান্ত-স্নিগ্ধ-পরিবেশ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। কল্যাণময়ী বঙ্গজননীর কর্মব্যস্ত রূপ দেখিয়া তাঁহার অন্তরের একটি বেদনা কাঁটার মতো পীড়া দিতেছে —বাঙালী কাজের ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর তুলনায় অনেক পিছাইয়া আছে। কাবতাটির মধ্যে বঙ্গজননীর প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

(৯) যে তোমারে দূরে রাখি……কী দিবে সম্মান। [পৃঃ ৫৫]

যে বিদেশী জাতি আমাদের স্বদেশকে ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া দেয়, আমরা আত্মসম্মান হারাইয়া তাহাদের বেশ পরিধান করিয়া তাহাদের কাছে প্রশংসা পাইবার আশায় ঘুরিয়া বেড়াই। বিদেশীরা আমাদের স্বদেশকে জানে না, তাই তাহারা এদেশকে অপমান করে। আমরা এমন অধম যে, এই মাতৃভূমির সন্তান হইয়াও আমরা ইহার নিন্দা করিতে দ্বিধাবোধ করি না। স্বদেশের দৈন্যই যে আমাদের ভূষণ একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। পরের ধন চাহিয়া আপনার ভিক্ষার ঝুলি ভর্তি করার মধ্যে গৌরব নাই। স্বদেশ যদি আমাদের সামান্য শাকান্ন দেয় তবে তাহাতেই যেন আমাদের পরিতৃপ্তি হয়, স্বদেশে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহা সূক্ষ্ম না হইয়া মোটা হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাই আমাদের সমস্ত লজ্জা দূর করিবে। দেশজননী যদি তাঁহার স্নেহাঞ্চলে আমাদের আশ্রয় দেন, তাহা হইলে যে বিদেশী জাতি এদেশকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করে সে আমাদের কী সম্মান দিবে।

এই কবিতাটিতে কবির স্বদেশের গৌরববোধ সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দেশের প্রতি কবির আন্তরিক প্রেমের সীমা ছিল না—সেই সঙ্গে আত্মমর্যাদাবোধ সংযুক্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত জাতিকে পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করিয়া স্বদেশের দিকে ফিরিয়া চাহিতে নির্দেশ দিয়াছে। কবিতাটির ছত্রে ছত্রে ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা ও স্বাবলম্বনের গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে।

স্নেহগ্রাস

(১০) অন্ধ মোহবন্ধ তব……সম্পত্তি তোমার। [পৃঃ ৫৬]

বাংলার স্নেহময়ী জননী তাঁহার সন্তানকে আপনার স্নেহময় কোলটিতে লইয়া বিশ্বের সমস্ত আঘাত হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন। কবি তাঁহাকে সেই মোহময় বন্ধন হইতে সন্তানকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করিতেছেন। সন্তানকে তিনি যেন আপনার স্নেহের কারাগারে বন্দী করিয়া না রাখেন। সর্বক্ষণ তাহাকে আপনার স্নেহ দিয়া ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার লালনে নিরতিশয় রস সঞ্চার করিলে সে দুর্বল হইয়া পড়িবে। জননী কি আপনার স্নেহাতুর চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সন্তানের মনুষ্যত্বের গৌরব হরণ করিতে

পারেন? যাহাকে দীর্ঘকাল গর্ভে লালন করিয়া তিনি মুক্ত বাতাসে জন্ম দিয়াছেন, তাহাকে কি তিনি স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন—সে কি তাঁহার অংশমাত্র হইয়া তাঁহার অনুগামী হইবে? তাহা নহে। সন্তান মাতাব সম্পত্তি নয়—জন্মমাত্র সে আপনার গৌরবে অদ্বিতীয়, তাহার উপর বিশ্ববাসীর দাবি আছে, সর্বোপরি বিশ্বদেবতার প্রতি তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে।

বাঙালীর জীবনে যে জননীর স্নেহাধিক্য আছে তাহা যে তাহাকে কঠোর কর্তব্য পালন করিতে বা জীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য নব নব দুঃখকে বরণ করিতে দিতেছে না, তাহার সমগ্র চরিত্রকে যে তাহা দুর্বল করিয়া তুলিতেছে তাহা কবি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিযাছেন। শেষ দুটি ছত্রে তাঁহার উদার জীবনদৃষ্টির পরিচয ব্যক্ত হইয়াছে।

বঙ্গমাতা

(১১) পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে······মানুষ ক'রনি। [পৃঃ ৫৭]

বঙ্গজননীর স্নেহ বাঙালীকে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ করিযা রাখিযাছে। বাঙালী বলিয়া সে আত্মপরিচয় দিতে পারে বটে, কিন্তু বিশ্বের প্রশস্ত অঙ্গনে তাহার মনুষ্যত্বের পরিচয সংকুচিত। স্নেহময়ী বঙ্গজননী তাহাকে মানুষ হইযা উঠিবার অবকাশ দেন নাই। কবি স্নেহবন্ধন হইতে তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য বঙ্গজননীকে অনুরোধ করিযাছেন। সে জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে গিযা পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখের মধ্য দিযা আপনার জীবনকে বিকশিত করিযা তুলুক। স্বদেশের গৃহাঙ্গন ছাড়িযা সে দেশ-দেশান্তরে গিয়া আপনার স্থান করিযা লউক। ছোটো-খাটো নিষেধের বেড়া ভাঙিয়া, দুর্বল ভালোছেলে না হইযা সে যেন কঠিন দুঃখ বহন করিযা আপনার হাতে আপনার ভালোমন্দ গড়িযা তুলিতে পারে। তাহারা সুখলালিত হইয়া শীর্ণ, শান্ত ও সাধু হইয়া আছে—তাহাদের মধ্যে প্রাণশক্তির স্ফুরণ নাই। তাহারা এবার লক্ষীছাড়া হইয়া বিশ্বাঙ্গনে আপনার শক্তি দিযা মনুষ্যত্বের মহার্ঘ সম্পদ অর্জন করুক।

বাঙালীর স্নেহগুণ্ঠিত জীবনের পরিধি বিস্তৃত হউক, বাঙালী বিশ্বের ক্ষেত্রে আপনাব শক্তি দিযা আত্মপ্রতিষ্ঠা করুক—কবির এই ইচ্ছাটি এখানে কাব্যাকারে ব্যক্ত হইযাছে। শেষ দুই ছত্রে কবিহৃদয়ের গভীর মর্মবেদনা ব্যক্ত হইয়াছে—বাঙালী যে মনুষ্যত্বের দাবিতে বিশ্বে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই এই বোধটি তাঁহাকে একান্তভাবে পীড়িত করিয়াছে।

দুই উপমা

(১২) যে নদী হারায়ে স্রোত······চরণ না সরে। [পৃঃ ৫৮]

ভারতবর্ষ একদিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিল—তখন তাহার জীবন বহুভাবে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। কালে তাহার সেই অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন জীর্ণ লোকাচার তাহার জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কবি জাতির এই অবস্থাকে স্রোতহীন নদীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। যে নদীর স্রোত নাই, সেই নদীর জলে অজস্র শৈবাল জন্মাইয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া তাহার জলকে পঙ্কিল ও বদ্ধ করিয়া তুলে। লোকাচারের শৈবালবদ্ধ জাতির উন্নতির আশা প্রতি পদে খর্ব হয়, প্রতি পদে ব্যাহত হয়।

যে পথে মানুষ সর্বদাই চলে, সে পথে তৃণগুল্ম জন্মিতে পারে না। যে পথে কেহ চলে না, সে পথ কণ্টকে আকীর্ণ হইয়া চলার অযোগ্য হইয়া পড়ে। তেমনই যে জাতির গতি থামিয়া গিয়াছে, সেই জাতির পথ নানা কুসংস্কার ও অন্ধ নিষেধের কণ্টকে দুর্গম হইয়া উঠে। ভারতে এককালে জ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা ছিল, তখন তাহার বুদ্ধি নব নব বিষয় সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু এখন ভারতবর্ষ পুরাতন আদর্শকে ধ্রুব বলিয়া মানিয়া লইয়া অর্থহীন নিষেধে জাতির অগ্রগমন একরূপ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

সাধারণভাবে দুইটি উপমার মধ্য দিয়া জাতির গতি-সত্যের কথা বলিয়া কবি নিপুণভাবে আপনার জাতির দুর্বলতার কারণটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

(১৩) ভদ্র মোরা শান্ত বড় পোষমানা এ প্রাণ
বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান
... ...
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন। (পৃঃ ৬১)

সাধারণ ভদ্র বাঙালীর জীবনে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা বা উন্মাদনা নাই। তাহার জীবনে ভদ্রতা ও শান্তিই একমাত্র অবলম্বন। তাহার বাহিরের সাজ-সজ্জায় ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, আলাপ বা আচরণেও ভদ্রতার পরিচয় ব্যক্ত হয়। কিন্তু তাহার প্রকৃতির মধ্যে আলস্য বাসা বাঁধিয়াছে। গৃহ-জীবনের প্রতি একান্ত আকর্ষণ তাহাকে বাহিরের সমস্ত উন্মাদনা হইতে

সরাইয়া রাখিয়াছে। তাহার তৈলচিক্কণ দেহে নিদ্রালসতার ভাব—বহু যুগের আলস্য তাহার শক্তিহীন খর্বদেহে মেদবৃদ্ধি ঘটাইয়াছে।

এই সুখলালিত নিস্তরঙ্গ জীবন কবির কাম্য নয়। তিনি ইহার চেয়ে আরব দেশের বেদুইনদের জীবন কাম্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। বেদুইনের পায়ের নিচে সুদূর প্রসারিত মরুভূমি পড়িয়া আছে। তাহার উপর দিয়া সে বালি উড়াইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে। তাহার জীবন যেন আকাশের উদারতার মধ্যে বেগে প্রবাহিত হইতেছে—হৃদয়ের একটা অনির্বাণ ক্ষুধা জাগিয়া আছে। মরুভূমির ঝড়ের মতো সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সাহসে বুক ভরিয়া সে যাত্রা করিয়াছে।

কবির অন্তরে জীবনকে সাগ্রহে বরণ করিবার জন্য যে আকুলতা আছে তাহা বাঙালীর শান্ত স্তিমিত জীবনের মধ্যে তৃপ্তি পাইতেছে না। বেদুইনের উত্তেজনাময় জীবন যাপনের কামনা তাঁহার অপরিসীম জীবনতৃষ্ণার পরিচয় দিয়াছে। কাব্যাংশটিতে নিস্তরঙ্গ জীবনের প্রতি বিরাগ ও উন্মাদনাময় জীবনের প্রতি অনুরাগ সুব্যক্ত হইয়াছে।

(১৪) রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস
তুমিই প্রাণের প্রিয়।

... ...

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব। (পৃঃ ৬৫)

ভারতবর্ষ কোনোদিন রাজসম্পদকে বড়ো মনে করে নাই। সে চিরকাল অন্তরের সাধনাকে, তপশ্চর্যাকেই বড়ো করিয়া দেখিয়াছে। কবির কাছে তাহার তাপসমূর্তি প্রতিভাত হইতেছে। তিনি পরজাতির কাছে ভিক্ষালব্ধ রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া এই তাপসের উত্তরীয় গ্রহণ করিবেন। ভারতের দৈন্যের মধ্যে মহাসম্পদ নিহিত, তাহার মৌনের মধ্যে অগ্নিময় মন্ত্র অনুস্যূত হইয়া আছে। কবি জাতির মধ্যে সেই সম্পদ, সেই মন্ত্র প্রার্থনা করিয়াছেন। ভারতের সেই মন্ত্র সমস্ত ভয় দূর করিয়া দেয়, সমস্ত শোককে শান্ত করে, মৃত্যুকে অতিক্রম করে। অতীতকালে তপোবনের মধ্যে যে উদার সত্যসাধনা ছিল, সে যুগে রাজার আচরণে যে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠা ছিল—মহাজীবনের সেই মহৎ গরিমাময় আদর্শকে কবি আপনার চিত্তে গ্রহণ

করিতে চাহেন। সেই মহামন্ত্র জাতির শঙ্কা দূর করিয়া তাহাকে মৃত্যু উত্তরণ করিতে শিক্ষা দিবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষেব প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর অনুরাগ ছিল। প্রাচীন ভারতের ত্যাগের আদর্শকে তিনি একান্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। সেই মহৎ আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষ পরম গৌরবের মধ্যে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, ইহাই কবির বিশ্বাস। এখানে তিনি প্রাচীন ভারতকে সম্বোধন করিয়া তাহার কাছে সেই সমুন্নত জীবনাদর্শ প্রার্থনা করিতেছেন। এই প্রার্থনার মধ্যে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

নিম্নলিখিত কাব্যাংশগুলির সংক্ষিপ্তসার লিখ :—

(১৫) দিকে দিকে দেখা যায়……ব্রাহ্মণ মহিমা। [পৃঃ ৭২]

প্রাচীন ভারতবর্ষের দু'টি রূপ—একটি ক্ষত্রিয়ের বীর্যে সমুজ্জ্বল, অপরটি ব্রাহ্মণের তপস্যায় প্রশান্ত।

প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, বিদর্ভ, বিরাট, অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী প্রভৃতি রাজ্য আপন আপন শক্তির গৌরবে যেন আকাশকে পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, তরবারির ঝন্ঝন্ শব্দ, ধনুর জ্যা-নির্ঘোষে রাজশক্তি ব্যক্ত করিতেছে। প্রতিনিয়ত কর্মকোলাহলে রাজার রাজধানী মুখরিত। তাহার অদূরে ব্রাহ্মণের তপোবন। সেখানে নগরের উল্লাস নাই—সেখানে একটি ভাবসুগম্ভীর মৌন ও উদার শান্তি বিরাজ করিতেছে। নগরীতে ক্ষত্রিয়ের শক্তির গৌরব উন্মত্তভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে; তপোবনে ব্রাহ্মণের সংযত শান্ত জীবনের মহিমা নিবিড় শান্তি ও মৌনের মধ্যে ব্যক্ত হইতেছে।

(১৬) এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে……উন্মুক্ত বাতাসে। [পৃঃ ৭৩]

এই ভাগ্যহীন দেশের জীবন অহেতুক ভয়ে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। ভগবান যেন এই প্রতিক্ষণের অপমান, অন্তরে-বাহিরে ভীতির দাসত্ব, অসংখ্য ভয়ের কাছে মানবমর্যাদা বিলুণ্ঠিত হওয়ার নিয়ত অসম্মান, মানবাত্মার এই ঘোর লজ্জা তাঁহার চরণের আঘাতে বিদূরিত করিয়া দেন। এ দেশের অধি-বাসীদের অন্তরে যে সাহসের একান্ত অসদ্ভাব এবং তাহাই যে তাহার জীবনকে সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছে কবি তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

(১৭) একদা এ ভারতের কোন……নাহি অন্য পথ। [পৃঃ ৮০]

ভারতবর্ষ ধ্যাত্মসম্পদে দীন নয়—তাহার সুমহান্ ঐতিহ্য আছে। সুদূর অতীতে এদেশের মানুষের সুগভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধি হইয়াছিল। সেদিন ভারতের তপোবনে কোনো এক মহাপ্রাণ পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—বিশ্ববাসীরা—দেবপদবাচ্য অমৃতের পুত্ররা শোনো, তমসার পারে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ আছেন তিনি সেই মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া, কেবল তাঁহার দিকে চাহিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, ইহা ছাড়া আর অন্য পথ নাই।

আবার ভারতে কে সেই মহান্ আনন্দের বাণী আনিয়া দিবে, কে সেই অমৃতময় মহামন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিবে, কে সেই উজ্জীবনের মন্ত্রপাঠ করিয়া পরম অভয়ের বাণী শোনাইবে। কবি মনে করেন সেই অধ্যাত্ম উপলব্ধিই একালের দুর্গত ভারতের মুক্তির একমাত্র পথ।

(১৮) এ মৃত্যু ছেদিতে হবে……তোমাদের মতো। [পৃঃ ৮১]

যে প্রভাত আসিয়াছে তাহা কেবলমাত্র একটা প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র নয়, তাহার মধ্যে নিখিল বিশ্বের জাগরণের সুর ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে। আমাদের চারিদিকে জড়বস্তুর আবর্জনা আমাদের সমগ্র চিত্তকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে—জড়তা আমাদের প্রাণকে ভয়াতুর করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু এই প্রভাতে কর্মময় এই বিশ্ব-সংসারে জাগিয়া উঠিতে হইবে। জ্ঞান, কর্ম, গতি ও আচার-বিচারে যে পর্বতপ্রমাণ বাধা আমাদের সম্মুখে আছে, তাহা দূর করিয়া দিয়া বিহঙ্গের মতো সকলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মুক্তির সুরের আনন্দে সমগ্র সত্তা পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। অজ্ঞানের, সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া একদিন এই বিশ্বকে পরম আলোকে আলোকিতরূপে দেখিতে হইবে। সত্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া সংশয়হীন চিত্তে ঘোষণা করিতে হইবে যে, মানুষও অমৃতের অধিকারী —দিব্যলোকবাসী দেবতাদের মতোই আমরাও অমৃতের পুত্র।

(১৯) শতাব্দীর সূর্য আজি গেল……কাড়াকাড়ি-গাতি।

[পৃঃ ৮৪]

শতাব্দীর গৌরবসূর্য হিংসার রক্তমেঘে অস্তমিত হইল। আজ জাতিতে জাতিতে বিরোধ প্রবল অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় মারণমন্ত্র জাগাইয়া তুলিতেছে।

সভ্যতা ক্রূর সর্পের মতো আপনার কুটিল ফণা তুলিয়া চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে অতর্কিতে দংশন করিয়া তীব্র বিষ বর্ষণ করিতেছে। আজ সারা পৃথিবী জুড়িয়া এক বিরাট সংগ্রাম চলিয়াছে—স্বার্থ ও লোভ প্রবল হইয়া উঠিয়া জাতিপুঞ্জের মধ্যে প্রবল বিরোধের সঞ্চার করিয়াছে। এই নিদারুণ সংক্ষোভে নির্লজ্জ বর্বরতা বাহিরে একটা ভদ্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহার পঙ্কিল আবাস ছাড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঘোরতর অন্যায় জাতি-প্রেমের নাম ধরিয়া নিঃসংকোচে আপনার শক্তির দম্ভ দিয়া ন্যায়ধর্ম ও সত্য-ধর্মকে ভাসাইয়া দিতে চাহিতেছে। যে কবিরা সত্যের পূজারী হইবেন তাঁহারা মানুষের অন্তরে অবিশ্বাসের কালোছায়া ও জিঘাংসার ভীতি সঞ্চার করিয়া এই স্বার্থলোলুপতার জয়গান করিতেছেন।

(২০) চিত্ত যেথা ভয়শূন্য……করো জাগরিত। [পৃঃ ৯০]

মানুষের অন্তর যেখানে নির্ভয়, যেখানে সে আত্মসম্মানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, জ্ঞান যেখানে অবারিত, যেখানে সংকীর্ণ স্বার্থ এই পৃথিবীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে নাই, যেখানে বাক্যস্রোত হৃদয় হইতেই উৎসারিত হয়, যেখানে কল্যাণকর্ম অবারিত নদীর স্রোতের মতো চারিদিকে বিনা বাধায় বহুভাবে আপনাকে সার্থক করিবার অবকাশ পায়, যেখানে মরুভূমি যেভাবে স্রোতোধারাকে গ্রাস করিয়া ফেলে, আচার সেভাবে বিচারকে বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই বা পৌরুষকে শতধা বিভক্ত করে নাই, যেখানে জগৎ-পিতা তুমিই সমস্ত কর্ম, চিন্তা ও আনন্দের উৎসস্বরূপ, তুমি আপনার কঠিন হস্তের আঘাতে সেই সত্যস্বর্গে ভারতকে জাগ্রত করিয়া তোলো—সেই পুণ্যালোকে ভারতের উদ্‌বোধন হোক।

(২১) হে ভারত, নৃপতিরে……ব্রহ্মের সম্মুখে। [পৃঃ ৯৩]

ভারতবর্ষ কোনোদিন ভোগকে বড়ো করিয়া দেখে নাই—ত্যাগকেই, ধর্মকেই সে জীবনের সবচেয়ে বড়ো আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের রাজধর্মের যে আদর্শ যুগ যুগ ধরিয়া প্রচলিত, তাহা রাজাকে ভোগে প্রবৃত্তি না দিয়া সর্ববিধ রাজভোগ ত্যাগ করিয়া দরিদ্রের বেশ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছে। ভারতের আদর্শ বীর ধর্মযুদ্ধে শত্রুকে জয় করিয়া তাহাকে ক্ষমা করেন—জয়-পরাজয় ভুলিয়া অস্ত্র সংবরণ করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন না।

ভারতে কর্মের যে আদর্শ তাহা নিরন্তর কর্মপ্রয়াসের মধ্যে সার্থকতা দেখিতে পায় নাই, ব্রহ্মে সর্বকর্মের ফল সমর্পণকেই সে বড়ো বলিয়া জানিয়াছে। ভারতের আদর্শ গৃহী কেবল স্বার্থটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না—সে তাহার প্রতিবেশীদের, আত্মীয় ও বন্ধুদের, অতিথি ও অনাথদের প্রতি আপনার আশ্রয়চ্ছায়া প্রসারিত করিয়া দেয়। ভারতে ভোগ সংযমের সহিত সংযুক্ত, দৈন্য নির্মল বৈরাগ্যে সমুজ্জ্বল এবং সম্পদ পুণ্যকর্মের কারণ হওয়ায় মঙ্গল-বিধায়ক। ভারতবর্ষ সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত সুখদুঃখ বা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া সংসারকে ব্রহ্মের সম্মুখে রাখিতে উপদেশ দিয়াছে।

(২১) হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে······মঙ্গল উদার।

[পৃঃ ৯৪]

ভারতবর্ষ যে শিক্ষাদান করিয়াছে তাহা যে সম্পদ প্রদান করে তাহা বাহির হইতে দেখিলে স্বল্প মনে হয়—বাহ্যতঃ তাহা দৈন্যের প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহার অন্তরে অন্তরে ঐশ্বর্যের সীমা নাই। আধুনিক সভ্যতা আড়ম্বরময়, তাহার আস্ফালনের সীমা নাই, দরিদ্রের রক্তশোষণ করিয়া তাহা স্ফীতকায়, তাহার প্রচণ্ড লৌহবাহুর বর্বরতা স্পর্ধার সহিত আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এই সময় কে অসংকোচে ভারতের সেই শান্তসৌম্য মূর্তি গ্রহণ করিবে—যে মূর্তি বাহিরে দেখিতে দীনের মতো হইলেও অন্তরে সম্পদে ও শান্তিতে নিরতিশয় দুর্লভ? সভ্যতার এই সর্বনাশা আয়োজনের মধ্যে কে আপনার অন্তরের অন্তরে আত্মার কল্যাণময় সম্পদ সংগ্রহ করিয়া রাখিবে?

কমলাকান্তের দপ্তর

কয়েকটি সুভাষিত উক্তির ভাবসম্প্রসারণ কর।

(১) পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

ফুল যে ফুটে, ইহাতে তাহার আপনার সৌন্দর্য বা সুগন্ধ প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সে আপনার জন্যই তাহার সৌন্দর্য ও সুরভি প্রকাশিত করে না। তাহার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারে এমন চক্ষু যদি না থাকিত, তাহার সুরভি উপভোগ করিতে পারে এমন ঘ্রাণেন্দ্রিয় যদি না থাকিত, তাহা হইলে ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভের কোনো তাৎপর্যই থাকিত না। পরের জন্যই ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভ—পরের জন্য সে আপনাকে ফুটাইয়া তোলে।

মানুষের হৃদয় ফুলের মতো কোমল, সুন্দর এবং দয়া, প্রেম প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ। মানুষের হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি আপনা আপনি প্রকাশিত হয় না—তাহার প্রকাশের জন্য বাহিরের একটা অবলম্বন প্রয়োজন। পরকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের হৃদয় আত্মপ্রকাশের অবকাশ পায় এবং তাহার সদ্‌বৃত্তিগুলি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে। স্বার্থের মধ্যে হৃদয়ের প্রকাশ নাই। মানুষের হৃদয় যদি অপর কোনো মানুষের প্রতি প্রসারিত না হয় তাহা হইলে তাহার কোনো সার্থকতা নাই। এই বিশ্বসংসারে পরের জন্য হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া দেওয়াই কর্তব্য। পরকে ভালোবাসিলে, পরের কল্যাণসাধন করিতে প্রয়াসী হইলেই মানুষের হৃদয় নব নব সদ্‌গুণে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে। পরার্থে আত্মনিবেদন করিলেই মানুষের জীবন সার্থক হয়। যিনি পরের জন্য আত্মদান করিয়াছেন তাঁহার জীবনই ধন্য, এ সংসারে তাঁহার আদর্শই অনুসরণীয়।

(২) প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।

জগৎ-সংসারে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্কের মূলে প্রীতি বর্তমান। মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতি আছে বলিয়াই তাহার সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার জীবন আনন্দে পরিপূরিত হইয়াছে। মানুষের অন্তরে প্রীতি যদি

না থাকিত, পরের জন্য মানুষ যদি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিত, তাহা হইলে সংসারে কোনো বন্ধনই থাকিত না—মানুষ তখন একা একা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত। পিতামাতার স্নেহ, পতি বা পত্নীর প্রেম, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রীতি, সৌহার্দ্য প্রভৃতি মানুষের জীবন ভরিয়া আছে। হৃদয়ের এই সদ্‌বৃত্তিটুকু না থাকিলে মানুষের জীবন নিরানন্দে ভরিয়া যাইত—আপনার হৃদয়কে পরের জন্য উৎসর্গ করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

প্রীতি ঈশ্বরের স্বরূপ—এই বিশ্বসংসার প্রীতিতে বিধৃত হইয়া আছে। আমাদের দেশে উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, আনন্দই ব্রহ্ম। আকাশে-বাতাসে, জলে, স্থলে, গৃহে, অরণ্যে এই আনন্দ বিরাজ করিতেছে—এই আনন্দ না থাকিলে কেইবা প্রাণধারণ করিত। ঈশ্বরই আনন্দরূপে, প্রীতিরূপে, প্রেমরূপে বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন বলিয়া এই জগতে এত আনন্দ, এত মাধুর্য। প্রীতিরূপী ঈশ্বরের আরাধনা মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। সংসারের মধ্যে সর্বত্র প্রীতি প্রসারিত করিয়া ঈশ্বরের পরম প্রেমকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। প্রেমের মধ্যেই মানুষের চরম প্রকাশ, চরম সার্থকতা।

(৩) গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী, তাহার বৃদ্ধির কি উপায় হইতে পারে না?

দেহ ও মনের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। মানুষ তাহার দৈহিক পরিতৃপ্তির জন্য অনেক কিছুই করিয়া থাকে—কিন্তু তাহাতে তাহার মনের সুখ জন্মে না। বাহ্য উন্নতির জন্য আধুনিক যুগে নানা প্রয়াস করা হইতেছে, কিন্তু তাহাতে মনের কোনো তৃপ্তি সাধিত হইতেছে না, তাহাতে মানুষের আত্মা আনন্দ পাইতেছে না।

যেসব বিষয় বাহিরের সুখবিধান করে সেগুলি যে মন্দ এমন নয়। কিন্তু তাহাই সর্বস্ব নয়। বাইবেলে একটি সুন্দর কথা আছে—Man shall not live by bread alone. কেবল ভালো করিয়া আহার করিলেই মানুষের তৃপ্তি হয় না—মনের তৃপ্তিই আসল তৃপ্তি। সেই মনের তৃপ্তি সঠিক হইতে পারে অপরকে ভালোবাসিয়া। মানুষ যখন ভালোবাসে, তখন তাহার দৈহিক কোনো সুখ জন্মে না, কিন্তু একটা অনির্বচনীয় আনন্দরসে তাহার মন ভরিয়া উঠে। অধুনা মানুষের বাহ্য সুখবৃদ্ধির জন্য অশেষবিধ আয়োজন করা হইতেছে, কিন্তু তাহার অন্তরের সুখসাধনের জন্য কেহ অগ্রসর হয় নাই। ফলে, বাহিরের

সুখ যত বাড়িতেছে, মানুষের অন্তর ততই অতৃপ্ত হইয়া হাহাকার করিতেছে। পৃথিবীতে মানুষের অশান্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্তরে অতৃপ্ত মানুষ তাহার যথার্থ পিপাসানিবৃত্তির পথ খুঁজিয়া না পাইয়া বাহ্য সুখসম্ভার পুঞ্জীভূত করিতে চাহিতেছে। যেদিন মানুষ বাহ্য সুখ ছাড়িয়া অন্তরের মুখের দিকে দৃষ্টি দিবে, সেইদিন তাহার চিত্তে সন্তোষ জন্মিবে, আনন্দ উৎসারিত হইবে।

(৪) ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা—অন্য হৃদয় কামনা।

অপরের হৃদয়ের স্পর্শলাভই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড়ো কামনা। মানুষ যখন অপরের হৃদয়ের প্রীতি অর্জন করিতে পারে তখনই সে পরম তৃপ্তি লাভ করিতে পারে।

মানুষ আপনার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অনেক কিছু করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার সমস্ত প্রয়াসই নিছক আত্মসুখের জন্য নয়। যে ব্যক্তি ধন উপার্জন করে, প্রিয়জনের সুখবিধানের ইচ্ছা তাহার অন্তরে থাকে। যে ব্যক্তি যশলোভী, সে ব্যক্তি অপরের মনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। আত্মসুখার্জনের মূলে স্বজনের সুখ-সাধনের একটা বাসনা থাকে। যে ব্যক্তি নিছক আত্মসুখপরায়ণ, পরের জন্য কোনোদিন বিন্দুমাত্র চিন্তা করে নাই, সে ব্যক্তি পশুত্বের স্তর অতিক্রম করিয়া মানুষ হইয়া উঠে নাই।

মানুষ অপরের হৃদয়কে লাভ করিবার জন্য অহরহ চেষ্টা করিতেছে। তাহার এই প্রয়াস যে সজ্ঞান এমন নয়। তাহা মানুষের সমস্ত কার্যের মূলে অন্য মানুষের অন্তরের সংস্পর্শ লাভ করিবার একটা প্রচ্ছন্ন কামনা বর্তমান। যতদিন সে অপরের হৃদয়ের নিকট প্রতিদান লাভ করিতে না পারে, ততদিন সে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ, মানুষের প্রেম লাভ করিলেই তাহার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া যায়—তখনই জীবন সার্থক বলিয়া মনে হয়।

(৫) ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি ?

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটা বিপুল ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলে বর্তমানে ধনীরই ধনবৃদ্ধি হয়—দরিদ্রের দুঃখ তাহাতে বিন্দুমাত্র লাঘব হয় না। দেশের যখন ধনহানি হয়, তখন ধনীর ধনসম্ভার কিছু পরিমাণে কমিয়া যায় বটে,কিন্তু দরিদ্রের দুঃখভার বাড়িয়া যায়। বস্তুতঃ, দেশের ধনবৃদ্ধি হইলে ধনীর ধনভাণ্ডার যতটা স্ফীত হয়, দরিদ্রের দুঃখলাঘব তাহার তুলনায় সামান্য হয়। সুতরাং সমাজের ধনবৃদ্ধিতে দরিদ্রের বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকিতে পারে না।

বর্তমান যুগে সমাজ যখন ধনীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, তখন দরিদ্রকে পদে পদে দুঃখভোগ করিতে হয়। তাহার দুঃখভার কোনো মতেই লাঘব হয় না। ধনিক সমাজ আপনার সুবিধার জন্য যেসব নিয়মের প্রবর্তন করে সেগুলির অধিকাংশই দরিদ্রের পক্ষে পীড়াদায়কমাত্র হয়। বস্তুতঃ দরিদ্রদের মুখ চাহিয়া ধনীসমাজ নিয়ম রচনা করে নাই—স্বার্থরক্ষার জন্য যে যে নিয়ম প্রযোজন, কেবল সেই সেই নিয়মই প্রবর্তিত হইযাছে। এই ধনিকপ্রধান সমাজের প্রতি দরিদ্রের বিন্দুমাত্র পোষকতা থাকিতে পারে না—সমাজের উন্নতি বলিতে যেখানে ধনিকের উন্নতি বোঝায় সেখানে দরিদ্রের তাহাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকিতে পারে না।

(৬) পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।

মানুষ মনে করে যে, নিজের সুখসাধন করিলেই সে স্থায়ী আনন্দ লাভ করিবে। এইজন্য সে ধন, মান, যশ প্রভৃতি অর্জন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু এইগুলি তাহাকে দীর্ঘকাল তৃপ্তি দিতে পারে না। ধনার্জন করিয়া কখনও স্থায়ী সুখলাভ হয় না। ধনার্জনে সাময়িকভাবে আত্মতৃপ্তি লাভ হয বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী—তাহা অধিকতর ধনস্পৃহা জাগাইয়া তুলে। মানুষ যখন যশ অর্জন করে, তখন সাময়িকভাবে সে সুখী হয় বটে, কিন্তু সেই সুখ তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। ইন্দ্রিয সুখেও মানুষের সন্তোষ নাই—মানুষের তৃষ্ণা সুখের সামগ্রীকে অবলম্বন করিয়া উত্তরোত্তর কেবল বাড়িয়া চলে মাত্র। এমন কি বিদ্যার্জনেও মানুষের চরম তৃপ্তি নাই।

মানুষের সুখলাভের সহিত স্বার্থ জড়িত থাকে বলিয়া তাহা ক্ষণস্থায়ী। মানুষ যখন পরের জন্য আত্মবিসর্জন করে তখন তাহার মধ্যে স্বার্থজনিত সংকীর্ণতা থাকে না। পরের কল্যাণসাধনের জন্য কোনো কাজ করিতে পারিলে তাহাতে হৃদযের যে বিমল আনন্দের উদয় হয় তাহা উদার ও সীমাহীন। পরের জন্য আত্মত্যাগ করিলে হৃদয়ের যে প্রসন্নতা জন্মে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী—স্বার্থের মালিন্য তাহাকে আবিল করিতে পারে না। সুতরাং যে কার্যের মূলে পরের সুখসাধনের বাসনা স্পষ্টভাবে বা প্রচ্ছন্নভাবেও থাকে, তাহাই মানুষকে যথার্থ সুখ, যথার্থ তৃপ্তিদান করিতে পারে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশের ভাবার্থ লিখ ঃ—

(১) সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি, উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুম-সুবাসিত, স্বচ্ছ-কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবন বিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসারসমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিতলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।

ভাবার্থ—যৌবনে যে সুখের বস্তু ছিল, প্রৌঢ় বয়সে তাহা কমিয়া যায় না। ক্ষতি-অর্জন দুই-ই আছে—ইহাদের মধ্যে অর্জনই বেশী। বয়স বাড়িলে সুখপ্রদ বস্তু বেশী পরিমাণে সঞ্চিত হয়। তবে যত বয়স বাড়ে স্ফূর্তি তত কমিয়া যায়। পৃথিবী, আকাশের তারা বা আকাশের নীলিমা আর তত মনোহারী বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ এই যে, যৌবন অতীত হইলে আশার রঙীন কাচ থাকে না। যৌবনে সুখ অল্প হইলেও সুখের আশা সুপ্রচুর—প্রৌঢ় বয়সে সুখার্জন প্রচুর হইলেও সেই অফুরন্ত আশা আর থাকে না। যখন অভিজ্ঞতা ছিল না তখন অনেক আশা করিতাম। এখন বুঝিয়াছি যে, জীবনের বহু দুঃখ ও নিরাশার মধ্যে আশা নিতান্ত কম। এখন জানিতে পারিযাছি যে, পৃথিবীতে যত ভালো জিনিস আছে তাহার সহিত অনেক খারাপ জিনিস অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া আছে। এখন এ-বোধ জন্মিয়াছে যে, পৃথিবীর সর্বত্র ভালো জিনিস নাই—এমন কি অনেক মন্দ জিনিসও ভালো জিনিসের মতো দেখায়।

(২) এদেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙা রাঙা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙা দেখা যায়, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই। কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙা রাঙা। যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তূলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

ভাবার্থ—বর্তমানে এদেশে এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের দেখা পাওয়া যায়, ইঁহারা দেশহিতৈষী নামে পরিচিত। আমি তাহাদের শিমুল ফুল বলিয়া মনে করি। শিমুল ফুলের মতোই এই দেশপ্রেমিকদের দেখিতে শুনিতে ভালোই, কিন্তু নেড়া গাছে যেমন শিমুল ফুল মানায় না, এই দরিদ্র দেশে তেমনই ঐরূপ শোভাসর্বস্ব দেশপ্রেমিক ভালো দেখায় না। পাতার আড়ালে ঢাকা

শিমুল ফুলের মতো অল্প অল্প দেখা গেলেই ভালো হইত। শিমুল ফুলে যেমন গন্ধ নাই বা কোমলতা নাই, কেবল রূপ আছে—তেমনই এই দেশহিতৈষীদের বিন্দুমাত্র গুণ বা সহৃদয়তা নাই, তাঁহাদের আছে কেবলমাত্র বাহ্য শোভা। শিমুল ফুল হইতে ফল হইলে সারবান কিছু পাইবার আশা করি, কিন্তু চৈত্র-মাসের রৌদ্রে এই ফলগুলি ফাটিয়া তুলা বাহির হইয়া উড়িয়া যায়; এই দেশ-হিতৈষীরা যখন কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন, তখন যথার্থ হিতের আশা করা গেলেও শেষ পর্যন্ত কেবল অর্থহীন, গুরুত্বহীন বক্তৃতা দিয়া তাঁহারা দেশ ভরিয়া দিতে চাহেন।.

(৩) মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয়জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন;—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost"। ধর্ম্ম বহ্নির অদ্বিতীয় কবি, সেণ্ট পল। ভোগ-বহ্নির পতঙ্গ, "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা"। রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত", ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরের ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি,

আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

ভাবার্থ—পতঙ্গ যেভাবে আগুনে পুড়িয়া মরিতে চাহে সেইরূপ প্রত্যেক মানুষই কোনো-না-কোনো আগুনে পুড়িয়া মরিতে চাহে। কেহ বা পুড়িয়া মরে, কেহ বা বাহ্য আবরণে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান, ধন, মান, রূপ, ধর্ম, ইন্দ্রিয়—সবই বহ্নিবৎ। এই সংসারে বহ্নি আর আবরক কাচ দুই-ই আছে। এইজন্য আমরা আলো দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ঝাঁপ দিতে গিযা আবার ফিরিয়া আসি। আবরণ না থাকিলে সংসারে সকলেই পুড়িয়া যাইত। ধর্মানুরাগী সকলেই চৈতন্যদেবের মতো ধর্মকে উপলব্ধি করিতে পারিলে কেহই রক্ষা পাইত না। সক্রেতিস, গেলিলিও জ্ঞান-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিযাছেন—অনেকে আবার আবরণে ঠেকিয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই যে, এই সংসারে প্রত্যহ অসংখ্য মানব-পতঙ্গ বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছে। এই দাহের বর্ণনার নাম কাব্য। মান-বহ্নিতে দুর্যোধন পতঙ্গের দাহের বর্ণনা মহাভারত মহাকাব্য। 'প্যারাডাইস্ লস্ট' জ্ঞান-বহ্নিতে দহনের কাব্য। ধর্ম-বহ্নিতে দহনের কবি সেণ্ট পল। ভোগ-বহ্নির কাব্য 'আণ্টনি-ক্লিওপেট্রা', রূপ-বহ্নির কাব্য 'রোমিও জুলিয়েত', ঈর্ষা-বহ্নির কাব্য 'ওথেলো', ইন্দ্রিয়-বহ্নির কাব্য 'গীতগোবিন্দ' ও 'বিদ্যাসুন্দর'। রামায়ণে স্নেহ-বহ্নিতে সীতার দাহ। বহ্নি কি তাহা অপরিজ্ঞাত। রূপ, তেজ, তাপ প্রভৃতি শব্দ প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন—দর্শন বা বিজ্ঞান, কাব্য বা ধর্মগ্রন্থ ইহার কথা বলিতে পারে না। ঈশ্বর, ধর্ম, জ্ঞান বা স্নেহ যে কি তাহা আমরা জানি না—তবুও সেই অজ্ঞাত অলৌকিক পদার্থের সন্ধানে আমরা পতঙ্গের মতো ঘুরিয়া বেড়াই।

(৪) এখন আয়, পাখা! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্প কাননে বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস—আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলেমিশে পঞ্চম গাই। তোরও

কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা ; আমারও পুঁজিপাটা এই আফিঙ্গের ডেলা ; তুই এ সংসারে পঞ্চম-স্বর ভালবাসিস—আমিও তাই ; তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস ? আমিই বা কারে ? বল দেখি, পাখী কারে ? যে সুন্দর, তাকেই ডাকি ; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত-সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুই-ও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা ; তুইও কিছু জানিস না, আমিও জানি না ; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পৌঁছিবে না কেন ? আয়, ভাই, একবার মিলেমিশে দুইজনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

ভাবার্থ—পাখি! একবার এসো—দুইজনে মিলিয়া পঞ্চম-স্বরে গাই। আমাদের দুইজনেরই সমান সুখ, সমান দুঃখ। তুমি ফুলের বনে গাছে গাছে আপনার আনন্দে গান গাও আর আমি আপনার আনন্দে দপ্তর লিখিয়া বেড়াই। তোমার ও আমার একমাত্র আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। তোমার সম্বল গলা আর আমার সম্বল আফিঙের ডেলা। তোর মতো আমিও এই সংসারে পঞ্চম-স্বর ভালোবাসি। তুই পঞ্চম-স্বরে কাকে ডাকিস্—আমিই বা কাকে ডাকি ?

সুন্দরকেই—ভালোকেই ডাকি। আমার ডাক যে শোনে তাহাকেই ডাকি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইযা ইহাকেই ডাকি। এই সুন্দর জগতে যিনি আত্মা—তাহাকেই তুমি ও আমি দুইজনেই এই সুন্দর জগৎ শরীরের আত্মাকেই ডাকি—জানিযা ডাকা বা না জানিয়া ডাকা একই কথা। কাহাকে যে ডাকি তাহা কেহই জানি না। তোমার ডাক ও আমার ডাক দুই-ই পৌঁছিবে। সমস্ত শব্দ গিযা পৌঁছায় এমন কান থাকিলে তোমার ও আমার ডাক গিয়া পৌঁছাইবে। এসো, দুইজনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

(১) অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদ্‌মণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসার-

সাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, একথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেকদিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে, শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটি গুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন-পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতিপুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্মের জন্য বাহ্য সুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে, কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানসপটে, সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পতিপদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে। এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামি চরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি!

যখন আমি ভাবি যে, কিছুদিন হইল, আমাদের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের মিছা রূপের বড়াইয়ে কাজ কি?

ভাবার্থ—স্বল্পকালস্থায়ী রূপ যে নারীদের একমাত্র সম্পদ, সংসারের একমাত্র অবলম্বন—একথা অনেকবার শুনিলেও আর শুনিতে চাহি না। নারী রূপের চেয়ে বহুগুণে মহৎ গুণের অধিকারী। নারীর মধ্যে সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিযাছে। মাতা যে ভাবে সন্তানকে লালন করেন বা মহিলারা যে ভাবে পীড়িতের শুশ্রূষা করেন, তাহা দেখিয়া নারীর সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওযা যায। নারী যে ভাবে পতিপুত্রের জন্য জীবন বিসর্জন বা ধর্মের জন্য সুখ বিসর্জন করেন তাহা দেখিয়া নারীর প্রীতি ও ভক্তি উপলব্ধি করা যায।

উৎকৃষ্ট নারীদের কথা চিন্তা করিলে চোখের সম্মুখে সহমরণে প্রবৃত্ত নারীর চিত্র ফুটিয়া উঠে। দেখিতে পাই যে, সাধ্বী সাদরে স্বামীর চরণ বক্ষে লইয়া অগ্নিমধ্যে বসিয়া আছেন। অগ্নি ধীরে ধীরে তাঁহার একটি করিয়া অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে, তথাপি তিনি স্বামীর চরণ ধ্যান করিতেছেন। ক্রমে অগ্নিশিখা বর্ধিত হইয়া কাযাকে ভস্মীভূত করিয়া দিল।

যখন মনে পড়ে যে, অল্প কিছুকাল পূর্বেও আমাদের দেশের রমণীবৃন্দ এইভাবে মরিতে পারিযাছেন তখন আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয় যে, আমাদের অন্তরেও মহত্ত্বের বীজ আছে, কালে আমরাও তাহার পরিচয় দিতে পারিব। বঙ্গের মহিলাবৃন্দ রত্নস্বরূপা—তাঁহাদের রূপের গৌরবে প্রযোজন নাই।

(৬) সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম এ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান?"

বালকেরা বলিল, "বাঙলা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে?"

"আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে ?"

"আমরাই।"

বিক্রয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ব কদলী।

ভাবার্থ—সাহিত্যের বাজারে গিয়া দেখিলাম যে, বাল্মীকিপ্রমুখ ঋষি কবিবৃন্দ সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অমৃত ফল বিক্রয় করিতেছেন। কয়েকজন বিক্রেতা লিচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর প্রভৃতি বিদেশীয় ফল বিক্রয় করিতেছেন—সেগুলি পাশ্চাত্ত্য দেশের সাহিত্য। খুব ভিড়ের জন্য একটি দোকানে ঢুকিতে পারিলাম না—সেখানে অগণিত শিশু ও নারী ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। আমি সেটি কিসের দোকান জিজ্ঞাসা করিলাম। বালকেরা উত্তর দিল যে, সেটি বাংলা সাহিত্যের দোকান। কাহারা বিক্রেতা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বালকগুলি বলিল যে, তাহারাই বেচিতেছে। তবে দুই একজন বড়ো মহাজনও আছেন এবং বাজে বিক্রেতাদের নাম পশ্বাবলী গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। কাহারা কিনিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করাতে বালকেরা জানাইল যে, তাহারাই ক্রেতা। কি বিক্রয় করা হইতেছে দেখিতে ইচ্ছা হওয়ায় দেখিলাম যে, খবরের কাগজে কয়েকটি অপক্ব কলা রহিয়াছে—খবরের কাগজে প্রকাশিত অসার রচনাই বাংলা সাহিত্য।

নিম্নলিখিত অংশগুলির সারসংক্ষেপ লিখ :—

(১) দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে—নিবিতেছে আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃ-সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ

লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিনী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক্—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগভুজা, নানা প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিনী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

সংক্ষিপ্তসার—কালপ্রবাহ প্রচণ্ড বেগে দিগন্তের দিকে ধাবমান—লেখক তাহার উপর ভেলায় বসিয়া আছেন। সেই অন্তহীন তরঙ্গসংকুল কালস্রোতে নক্ষত্রগুলি উঠিতেছে ও বিলীন হইয়া যাইতেছে। আর লেখক একা—শঙ্কাতুর চিত্তে মা মা বলিয়া ডাকিতেছেন। এই কালসমুদ্রে তিনি বঙ্গমাতার সন্ধানে আসিয়াছেন। মা কোথায়? সহসা কানে স্বর্গীয় বাদ্য ধ্বনিত হইল—দিগন্তে ঊষাপ্রভ আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ বাতাস বহিল—সেই তরঙ্গময় স্রোতের উপরে স্বর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা লেখকের দৃষ্টিগোচর হইল। লেখক চিনিলেন এই মৃন্ময়ী তাঁহার জন্মভূমি। মাতৃমূর্তির দশ হাত দশ দিকে বিস্তৃত—তাহাতে নানা শক্তি শোভা পাইতেছে। পদতলে শত্রু নিপীড়িত—চরণাশ্রিত বীরসিংহ শত্রুমর্দনে নিযুক্ত। লেখক আশা করিতেছেন একদিন জননীর সর্বৈশ্বর্য্যময় রূপ, শোভা ও শক্তির সমন্বয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিবে।

(২) দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল,

জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরন্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি, দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, মা বঙ্গজননি! মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি? . . . .

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব. মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল কাঁসি, কাড়া নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো"—বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গ পূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণাম দিবে—কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা।

সংক্ষিপ্তসার—দেখিতে দেখিতে সেই স্বর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা কালপ্রবাহে ডুবিয়া গেল। চারিদিক জলকল্লোলে পরিপূরিত হইল। তখন করযোড়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বঙ্গমাতাকে ডাকিয়া লেখক বলিলেন—জননী, উঠ মা! এবার সৎ হইয়া তোমার মুখরক্ষা করিব। দেবাশ্রিতা জননী—এবার স্বার্থ ভুলিয়া

পরের কল্যাণসাধন করিতে অগ্রসর হইব—অধর্ম, আলস্য ও ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিব। উঠ মা—কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল। মা উঠিলেন না—উঠিবেন না কি?

লেখক স্বদেশবাসিগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—এসো ভাই-সকল—আমরা অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিয়া দ্বাদশ কোটি হস্তে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনিব। এই কাল-সমুদ্রকে অসংখ্য বাহুর তাড়নায় মথিত করিয়া এই স্বর্ণপ্রতিমাকে মাথায় করিয়া আনিব। যদি না পারি ডুবিব। যাহার মা নাই তাহার জীবনে কাজ কী? এসো প্রতিমা তুলিয়া আনিলে পূজার খুব ধুম হইবে। সৎকীর্তির খড়্গ দিয়া মায়ের কাছে দ্বেষকে বলি দিব—পুরাবৃত্তকার বঙ্গের জয় ঘোষণা করিবে। কত বিদগ্ধ জন মায়ের কাছে আসিবে, দেশী বিদেশী কতলোক মায়ের চরণে প্রণাম করিবে—কত দীন-দুঃখী প্রসাদ পাইবে। চারিদিকের উৎসব-আয়োজনের মধ্যে ভক্তেরা মা মা বলিয়া ডাকিবে।

(৩) চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙলা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌত বাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমাত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কলকল তর তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভ মধ্যে, যবন ভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্র-

গণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদ শব্দ মাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙলার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল। কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সাহস বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল, শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদী-সৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোক বিন্দুবৎ, জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

সংক্ষিপ্তসার—একমাত্র শ্মশানভূমি নবদ্বীপ আছে—বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে সেদিকে চাই; সেখানে সপ্তদশ যবন বঙ্গবিজয় করিয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র পল্লীকে বেড়িয়া প্রবাহিত গঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি সেই আনন্দস্বরূপিনী মাতার চরণ ধোয়াইয়া দিতে, তাঁহাকে বেড়িয়া নাচিতে, সেই ধনেশ্বরীর জন্য সুদূর দেশ হইতে ধন আনিতে, সেই সৌন্দর্যময়ীর রূপের ছায়ায় রূপসী হইতে, সেই পুষ্পাভরণার প্রসাদি ফুল লইয়া মালা পরিতে—সেই জননী রাজলক্ষ্মী কোথায়? তিনি বুঝিবা যবন-

ভয়ে তোমার গর্ভে ডুবিয়াছিলেন—কুপুত্রদের আর মুখ দেখাইবেন না বলিয়া আর উঠেন নাই।—আমি সেদিনের দৃশ্য কল্পনা করিয়া কাঁদি। উন্নত বর্শা লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে গভীর রাত্রিতে যবনসেনা আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া বঙ্গলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন। সহসা চারিদিক অন্ধকার হইল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। চারিদিকে ঘোরতর অমঙ্গল দেখা গেল। কুঞ্জবনে পাখিদের ও গৃহমধ্যে ময়ূরের কণ্ঠ থামিয়া গেল। পূজার সময় নানা বিপর্যয় ঘটিল। জরা, আতঙ্ক ও মৃত্যু চারিদিক ছাইয়া ফেলিল। চারিদিক যখন ঘোরতর অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল—তখন রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। ক্রমে সেই তেজোরাশি জলমধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে।—দেশলক্ষ্মী যদি না গঙ্গার জলে ডুবিলেন, তবে কোথায় গেলেন ?

(৪) প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈসার সময়। আমি অন্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না।—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ, দ্বেষ, ভোগাসক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থির বুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়। এইজন্য, আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয়চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, একথা বলিতে হইবে না ; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয় চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবাল-বৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য ; তারপর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি ? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্য জীবন লক্ষ বর্ষ

পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, পরের জন্য হউক, বিষয়-কার্য্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?—পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।

সংক্ষিপ্তসার—প্রাচীন বয়সই বিষয়চর্চার সময়। যাঁহারা জরাগ্রস্ত নহেন, যাঁহারা যুবা নন বলিয়াই বুড়া, তাঁহাদের কথাই বলা হইতেছে। যৌবন কাজের সময় হইলেও অপরিণত বুদ্ধি, ভোগপ্রবৃত্তি প্রভৃতির জন্য যৌবনে কাজ প্রায়ই ভালো হয় না। যৌবন অতীত হইয়া গেলে মানুষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন, স্থিতধী ও আসক্তিহীন হয় বলিয়া এই সময়ই কার্যের অবসর। এই সময় মুনিবৃত্তির ভান না করিয়া বিষয়চিন্তা করিবে।

অনেকে বলিতে পারেন যে, শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত সকলেই বিষয়ান্বেষণ করিতেছে। সেরূপ বিষয়ান্বেষণে বৃদ্ধকে প্রবৃত্ত করিতে চাহি না। যৌবনের কাজ আপনার জন্য, যৌবনের পরের কাজ—পরের জন্য। মনে হইতে পারে যে, আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারি না, পরের কাজ করিব কী ভাবে? বস্তুতঃ, পৃথিবীতে আপনার কাজ করিয়া কখনও শেষ হয় না—মানুষের স্বার্থপরতার সীমা নাই। বার্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে মনে করিয়া পরহিতে অগ্রসর হও। ইহাই যথার্থ মুনিবৃত্তি।

যদি কেহ মনে করেন যে, বৃদ্ধকালেও বিষয়-কার্য করিলে পরলোকের কাজ

করিব কবে—ঈশ্বরচিন্তা কবে হইবে?—আশৈশব পরলোকের কাজ করিতে হইবে—শৈশব হইতে ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে। যে কাজ সকলের উপরে বার্ধক্যের জন্য তাহা রাখিয়া দিলে চলিবে না। সর্বসময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন বা অন্য কোনো কাজের ক্ষতি হয় না। বরং দেখা যাইবে যে, ঈশ্বরভক্তির সহিত সংযুক্ত হইলে সকল কাজই কল্যাণকর ও নির্দোষ হয়।

অনুশীলনী

৩১। নিম্নলিখিত অংশগুলির ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ—

(ক) মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য।

(খ) রামায়ণ ও মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।

(গ) পক্কশস্যের যেরূপ পতনের ভয় নাই, সেইরূপ মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত—কারণ উহা অবধারিত।

(ঘ) মুকুট পরা শক্ত কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।

(ঙ) হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়া শাস্ত্রের বিধি।

(চ) পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায় কিন্তু মার্জনাভার বহন করা যায় না।

(ছ) আর সকলেই অতি সহজেই ভাইয়ের মত ব্যবহার করে, কেবল নিজের ভাই করে না।

(জ) নমি আমি প্রতিজনে,— আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ!

(ঝ) তাঁরি নাম নিয়ে খাটিবে যেজন অন্ন তো তার মুখে—
বিধাতার সেই সাচ্চা বাচ্চা কখনো পড়ে না দুখে।
তবে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি
অর্থ তাহার—চেনে না সে তার শক্তির সংহতি।

(ঞ) আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই।

(ট) সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে, উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে।

(ঠ) অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

(ড) স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে উঠে।

(ঢ) যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম-বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

(ণ) স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

(ত) মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইবে।

(থ) মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ।

(দ) প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।

(ধ) দুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম—এক কুকুর জাতীয়, আর এক বৃষ জাতীয়।

(ন) পরসুখবর্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না?

(প) চোর দোষী বটে কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী।

(ক) যদি সভ্য ও উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করযোগ্যা।

২। অংশগুলির ভাবার্থ লিখ ঃ

(ক) 'সূর্য ভিন্ন জগৎ ও জল ভিন্ন শস্য বাঁচিতে পারে'— কিন্তু রামকে ছাড়িয়া আমি জীবনধারণ করিতে অসমর্থ। এই সকল কথা বলিয়া কখনও রাজা ক্রুদ্ধস্বরে কৈকেয়ীকে গঞ্জনা করিলেন, কখনও কৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীর পদে পতিত হইলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয় কিছুমাত্র আর্দ্র হইল না; তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"মহারাজ শিবি সত্যরক্ষার জন্য স্বীয় মাংস শ্যেন পক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন, সত্যবদ্ধ হইয়া অলর্ক চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন, সমুদ্র সত্যবদ্ধ থাকাতে বেলাভূমি আক্রমণ করেন না; তুমি যদি সত্যরক্ষা না কর, তবে এখনই আমি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" মহারাজ দশরথ ক্রমেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; অভিষেকোৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে রাজগণ আগত হইয়াছেন; বহু বৃদ্ধ গুণবান ও সজ্জনগণ একত্র হইয়াছেন; তাঁহাদিগকে লইয়া কল্য যে মহতী সভার অধিবেশন হইবে, তিনি সেই সভায় উপস্থিত হইবেন কিরূপে? আর জগতে তিনি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিবেন না; মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য; মহামান্য রাজা দশরথের যে সম্মান পর্বতের ন্যায় উচ্চ ও অটুট ছিল, আজ তাহা ভূলুণ্ঠিত হইবে। একদিকে এই ঘোর লজ্জা—অপরদিকে চির-স্নেহময়, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বশ্য, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্রের ইন্দীবর সুন্দর মুখখানি মনে পড়িয়া দশরথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

(খ) প্রেমের পুরস্কার ছিল প্রেম, সৎকর্মের পুরস্কার ছিল আত্মতৃপ্তি, ইহা হইতে উচ্চতর স্বর্গের কল্পনা সমাজে প্রচলিত ছিল না; সেই যুগে সমস্ত বৃত্তির স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ ও চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্য যৌথ-পরিবার-প্রথা উৎকৃষ্টরূপে মনুষ্য-সমাজের উপযোগী ছিল। সেইরূপ গৌরবোজ্জ্বল অবস্থা প্রকৃতই সমাজের কোনকালে হইয়াছিল কিনা তৎসম্বন্ধে কাহারও মনে দ্বিধা থাকিতে পারে। কিন্তু সমাজ যে এইরূপ এক মহিমায় মণ্ডিত শান্তিময় নিকেতনে পৌঁছিতে পারে, রামায়ণ কাব্যে সেই সম্ভাবনা যাথার্থ্যে পরিণত হইয়া অমরবর্ণে চিত্রিত হইয়া আছে। মনুষ্যের সৎপ্রবৃত্তিনিচয়ের বিকাশ করিবার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় আবশ্যক—বর্তমান য়ুরোপীয়-সমাজ সেই বিদ্যালয়ের

স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই বিদ্যালয় স্বভাবের ছন্দে, উদার ধর্মনীতির ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে—স্বর্গীয় পবিত্র আলোক এবং প্রাণ-সঞ্চারী বায়ুপথ নিরোধ করিয়া প্রাচীর তুলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। রামায়ণে চিত্রিত যৌথ-পরিবার সেই মহাবিদ্যালয়।

(গ) সহসা রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া উদাসীন হওয়া, লেখায় যতটা সহজ মনে হয় বাস্তবিক ততটা সহজ নহে। রাজবেশ ছাড়িয়া দিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরা নিতান্ত অল্প কথা নহে। বরঞ্চ রাজ্য পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু আমাদের আজন্মবাসের ছোটোছোটো অভ্যাস আমরা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না। তাহারা তাহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়া আমাদের অস্থিমাংসের সহিত লিপ্ত হইযা আছে, তাহাদিগকে নিয়মিত খোরাক না জোগাইলে, তাহারা আমাদের রক্তশোষণ করিতে থাকে। কেহ যেন মনে না করেন যে, গোবিন্দমাণিক্য যতদিন তাঁহার বিজন কুটিরে বাস করিতেছিলেন ততদিন কেবল অবিচলিত চিত্তে স্থাণুর মত বসিয়াছিলেন। তিনি পদে পদে আপনার সহস্র ক্ষুদ্র অভ্যাসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। যখনই কিছুর অভাবে তাঁহার হৃদব কাতর হইতেছিল তখনই তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মনের সহস্রমুখী ক্ষুধাকে কিছু না লইতে দিযা বিনাশ করিতেছিলেন। পদে পদে এই শত শত অভ্যাসের উপর জয়ী হইযা তিনি সুখ লাভ করিতে-ছিলেন।

(ঘ) যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়!
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধকীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য-বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ,
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায়?
মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জল-তলে
ফেলিস্, পামর!
ফিরে দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক ছলে?

(ঙ) বঙ্কিমের সহিত অন্যের এ বিষয় প্রভেদ আছে। নীর বর্জন করিয়া ক্ষীর গ্রহণের ক্ষমতা একা রাজহাঁসেরই আছে। বঙ্কিমচন্দ্ররূপী রাজহংস পাশ্চাত্ত্য-নীর হইতে যে পরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, আমাদের মত দাঁড়কাকের দ্বারা ততটার সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিম-চন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে তিনি কেবল ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই; তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।

(চ) বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া, সীতার শোকানল প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এ পর্যন্ত, রাম সীতাগতপ্রাণ বলিয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর, তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, রাম তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবার্তা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাম আবার বিবাহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া, তিনি একেবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন; রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ক্ষোভ, সেই সীতার পক্ষে, একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার উপর তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কোনও অংশে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

(ছ) আমি কেবল চিরকাল গর্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এইজন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি?

সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে,

নাই ; রাজকর্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধ মাত্র অবশিষ্ট আছে ; তাহা সম্পাদিত হইলেই, আপনকার রাজ্যাধিকার আর কোন অংশে অঙ্গহীন থাকে না। আমরা ইতঃপূর্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিব। যাহা হউক, যখন মহারাজ স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে ; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের আদেশ প্রদান করুন।

(খ) এই লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগদিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার, কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোকহিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, প্রাচ্যদেশে তাহার তুলনা মিলে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভিতর এমন একটা স্ফূর্তি রহিয়াছে, যেন তাহা আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয় এবং অন্য কোন মূর্তি ধারণের সুবিধা না পাইলে, এই মানবপ্রীতির ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। যে স্ফূর্তির বশে ইংরেজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনটাকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দেয়, এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্তি হইতেই উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্তি বর্তমান রহিয়াছে। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া, অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া, পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। পরের উপকার যেন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ; আপনার নিজত্বের অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক।

(গ) সমাজের বর্তমান অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষে পরের কাজ করে, কেননা, পরের কাজটা ভাল কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ ; উহাতে লাভ নিজেরও আছে, সমাজেরও লাভ আছে। ইহলোকে, এবং হয়ত ইহলোকের পর আর একটা যে লোক আছে শোনা যায়, সেইখানে, এই কাজের জন্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায় খাইতে চায়, পিপাসার উত্তেজনায় জলার্থী হয় ; শারীরবিজ্ঞানঘটিত কোন তত্ত্ব তখন তাহার মনে স্থান পায় না ; এমন কি, ক্ষুধার ও পিপাসার তাড়নায় এমন খাদ্য ও এমন পানীয় সে উদরস্থ করিয়া ফেলে যে, শারীরবিজ্ঞান তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে ; সেইরূপ পরার্থপরতা তখনই

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে স্থান পাইবে, যখন মনুষ্য সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের মুখে আপনা হইতে ধাবিত হইবে। তাহার এই কার্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে, কি অমঙ্গল হইবে, তাহা চিন্তা করিতে সে সময় পাইবে না। মনুষ্যের ইতিহাসে যদি কখন এইরূপ দিন আইসে, যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপে মনুষ্যকে পরের কাজে প্রেরিত করিবে, তখন হয়ত রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং কারাগার ও গির্জাঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্র-শালিকায় একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে।

(ঘ) আমি কেবল চিরকাল গর্ত বুজাইয়া আসিয়াছি—কখনও পরের জন্য ভাবি নাই। এইজন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি—সংসারে আমার সুখ নাই। পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রযোজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি, আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি? সুখে আমার অধিকার নাই তাই বলিয়া মনে করিও না যে তোমরা বিবাহ করিযাছ বলিযা সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইযা থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। যে বিবাহে প্রীতিশিক্ষা হয় না সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

(ঙ) কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ প্রিয়তম সীতায উদ্ধারি
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী—
কাঁদেন সরযূ তীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ লক্ষ্মণ, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর? কি কহিব সুধিবেন যবে

মাতা—'কোথা রামচন্দ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর? কি বলে বুঝাব
ঊর্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে!
উঠ বৎস, আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিবে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে
প্রাণাধিক!